শ্রীশ্রীচণ্ডী মাহাত্ম্য

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on *Sri Sri Chandi* before the students of Indian Spiritual Heritage Diploma Course at Ramakrishna Mission Vivekananda University, Belur Math in the year 2013
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

ভূমিকা

যে কোন ধর্মকে শক্তিশালী হওয়ার জন্য চারটি স্তম্ভের দরকার। ধর্মের প্রথম স্তম্ভ হল দর্শন, দ্বিতীয় স্তম্ভ পুরাণ বা মিথ্। ধর্মের তৃতীয় স্তম্ভ উপাচার। উপাচার মানে, যেখানে পূজা অর্চনা করার বিধি বলে দেওয়া হয়েছে। হিন্দুদের উপাচার প্রধানতঃ আসে তন্ত্র শাস্ত্র থেকে। তন্ত্রাদি শাস্ত্রেরও একই উদ্দেশ্য – পূজা অর্চনার দ্বারা কি করে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পাওয়া যায়। চতুর্থ স্তম্ভ হল স্মৃতিশাস্ত্র। প্রত্যেকটি মানুষ তার জন্ম থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কোন কোন অবস্থায় কি কি ধরণের আচরণ করবে তার কথা স্মৃতিশাস্ত্র বলে দিচ্ছে। স্মৃতিশাস্ত্রেরও একই উদ্দেশ্য, ধর্মাচরণের দ্বারা কিভাবে মানুষ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ করতে পারবে।

আমাদের মূল গ্রন্থ হল বেদ, বেদের কথাই শেষ কথা। হিন্দু ধর্মের এই চারটি স্তম্ভে যা কিছু আছে তার সবটাই বেদেই কোথাও না কোথাও সূত্রাকারেই হোক বা বৃহদাকারেই হোক, আগে থেকেই আছে। বেদের মূল বক্তব্যকে আধার করেই হিন্দু ধর্মের দর্শন, উপাচার, স্মৃতি ও পুরাণ গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে। অনেকে বলেন পুরাণ, তন্ত্র, স্মৃতি স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্টি হলেও পরের দিকে বেদের দর্শন এদের মধ্যে ঢুকে গেছে। যাই বলা হোক না কেন, এই চারটে স্তম্ভ বেদের বাইরে কখনই যাবে না। যেহেতু বেদ পাঠে সবার অধিকার ছিল না, আর এখন যদিও বেদ পাঠে সবার অধিকার হয়ে গেছে, কিন্তু বেদ সবাই বুঝতে পারে না। সেইজন্য এই চার ধরণ শাস্ত্রের যে কোন একটি শাস্ত্রকে যদি কেউ অবলম্বন করে নেয়, যেমন মনুস্মৃতি, কেউ যদি সারা জীবন মনুস্মৃতিই পাঠ করতে থাকে আর সাথে সাথে মনুস্মৃতিতে যা যা ধর্মাচরণের কথা বলা হয়েছে, সেই মত অনুযায়ী যদি আচরণ করতে থাকে, তাহলে তার চারটে পুরুষার্থই সিদ্ধি হবে। তেমনি শুধু মহাভারতকেই যদি কেউ সারা জীবন পাঠ করে যায় তাতেই তার বেদ, উপনিষদ পাঠের ফল হয়ে যাবে।

পাশ্চাত্য জগতে মিথ্ মানে legends বা প্রাচীন কথা কাহিনী। কিন্তু হিন্দুদের মিথ্ পাশ্চাত্য জগতের অর্থে মিথ্ নয়। যদিও আমরা প্রায়ই মিথোলজি শব্দ ব্যবহার করছি, কিন্তু এখানে এর ঠিক ঠিক শব্দ হল ইতিহাস পুরাণ। যখনই ইতিহাস পুরাণ বলা হয় তখন সেটি একটি বিশেষ অর্থবোধক হয়ে যায়। এখানে ইতিহাস পুরাণের অর্থ হল, যে কথা ও কাহিনী মানুষের ব্যক্তিত্বকে আধ্যাত্মিক ভাবধারায় বিকশিত করছে, সেই কথা ও কাহিনীকেই আমাদের পরম্পরাতে পুরাণ বলা হবে। পাশ্চাত্যের মিথোলজি মামুলি সাহিত্যিক রচনা ছাড়া কিছু নয়। হিন্দু ধর্মে যত পুরাণ রচিত হয়েছে এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল মানুষকে মোক্ষের দিকে নিয়ে যাওয়া। কোন হিন্দু উপনিষদ, গীতা পাঠ নাও করতে পারে কিন্তু আঠারাটো পুরাণের যে কোন একটি পুরাণকে নিয়ে যদি সারা জীবন পারায়ণ করতে থাকে, সাথে সাথে তার অর্থ অনুধাবন করতে থাকে তাহলেও সেই মুক্তির দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। মুক্তি যদিও না হয় ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের যে কোন একটি পুরুষার্থে সে সিদ্ধি পেয়ে যাবে। এমনকি সমগ্র মার্কণ্ডেয় পুরাণ না পাঠ করে মার্কণ্ডেয় পুরাণের ছোট্ট একটি অংশ শ্রীশ্রীচণ্ডী যদি নিয়মিত পারায়ণ করে যায়, এর ভাব ও অর্থের যদি অনুধ্যান করতে থাকে তাতেও তাকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের দিকে নিয়ে যাবে। ইতিহাস পুরাণ বলতে দুটি গ্রন্থকে বোঝায়, বাল্মীকি রামায়ণ আর ব্যাসদেব রচিত মহাভারত। অন্য দিকে পৃথক ভাবে আমাদের আঠারোটি পুরাণ আছে। পরের দিকে আরও আঠারোটি পুরাণ রচিত হয়েছে যেগুলোকে বলা হয় উপপুরাণ। উপপুরাণেরও একই উদ্দেশ্য, মানুষকে চারটে পুরুষার্থের দিকে নিয়ে যাওয়া। আমাদের যত পুরাণ বা ইতিহাস পুরাণ আছে সবারই উদ্দেশ্য ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের দিকে নিয়ে যাওয়া।

এই চারটি স্তম্ভের প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। যে মানুষের বুদ্ধির যেমন যেমন বিকাশ হয়েছে সেই ক্ষমতার জোরে উপনিষদ সেই মানুষকে মোক্ষের দিকে নিয়ে চলে যায়, যেখানে পৌঁছে জগতের অন্যান্য সব কিছু খসে পড়ে যায়। যিনি উপনিষদ অধ্যয়ন করছেন, উপনিষদের তত্ত্বকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেই দিন অতিবাহিত করছেন তখন উপনিষদ মেনেই নিয়েছে যে তাঁর আর সাংসারিক বা জাগতিক কোন চাহিদা নেই, ইহকাল বা পরকালের কোন কিছুই তাঁর কাঙ্খিত নয়। সংসারে স্ত্রী-পুত্র থেকে আনন্দ পাওয়া, ধন-সম্পদ থেকে সুখ পাওয়ার কামনা, মৃত্যুর পর স্বর্গে যাওয়ার ইচ্ছা এগুলো সব তাঁর খসে পড়ে গেছে। এবার তিনি শুধু বুদ্ধি ও

বিচারকে অবলম্বন করে এগোচ্ছেন। উপনিষদ যেমন একটি দর্শন, ঠিক তেমনি আরও অনেক দর্শন হিন্দু ধর্মে স্থান করে নিয়েছে, যেমন সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন, বৈশাষিক দর্শন ইত্যাদি, এরাও আমাদের এভাবেই নিয়ে যাবে, যেভাবে উপনিষদ নিয়ে যাচ্ছে। সাধারণতঃ দর্শনের উদ্দেশ্য ধর্ম, অর্থ ও কামের থেকেও বেশী করে মুক্তির দিকে নিয়ে যাওয়া। অন্য দিকে একমাত্র পূর্বমীমাংসকরা মুক্তি ব্যাপারটা মানবে না, এদের কাছে মুক্তির অর্থ ব্রহ্মার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া।

ইতিহাস পুরাণ কথা-কাহিনীর মাধ্যমে আমাদের শ্রেয়োর পথে নিয়ে যায়। ইতিহাস আর পুরাণের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল ইতিহাস ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোকে আধার করে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে চলে যায়। অন্য দিকে পুরাণের প্রধান চরিত্র হল দেবী, দেবতা, অপ্সরা, রাক্ষস, দৈত্য। যে চরিত্রগুলোকে আমরা কোন দিন চর্মচক্ষে দেখতে পাইনা, পুরাণ এদেরকেই তার কথা-কাহিনীর আধার তৈরী করেছে। বাল্মীকি রামায়ণের প্রধান চরিত্র শ্রীরামচন্দ্র একজন ঐতিহাসিক চরিত্র, মহাভারতের প্রধান চরিত্র পঞ্চ পাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ এনারাও ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু পুরাণের প্রধান চরিত্র হল ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শিব। ইতিহাস পুরাণ আর পুরাণের মধ্যে এটি একটি বড় পার্থক্য।

আঠারোটি পুরাণে মোটামুটি সাড়ে পাঁচ লক্ষের মত শ্লোক আছে। পুরাণের বৈশিষ্ট্যই হল পাঁচটি বিষয়কে নিয়ে আলোচনা করা। এই সাড়ে পাঁচ লক্ষ শ্লোক শুধু এই পাঁচটা বিষয়কেই নিয়ে বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমে আলোচনা করে গেছে। পুরাণের প্রথম আলোচ্য বিষয় হল সর্গ, সর্গ মানে যেখানে সৃষ্টি কিভাবে হয় বলা হচ্ছে। দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হল প্রতিসর্গ, সৃষ্টির বিনাশ কীভাবে হবে। তৃতীয় বংশ, ভারতের দুটি নামকরা বংশ সূর্যবংশ আর চন্দ্রবংশের উৎপত্তির কাহিনী। চতুর্থ বংশানুচরিত, এই দুটি বংশে যাঁরা জন্ম নিয়েছিলেন তাঁদের জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা। পঞ্চম হল মন্বন্তর, প্রত্যেক কল্পে যত জন মনু হবেন তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করা। প্রত্যেকটি পুরাণকে এই পাঁচটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে। এই পাঁচটির বাইরে অন্যান্য জিনিষগুলো মহাভারতের সাথে এক। কিন্তু এখানে একটাই তফাৎ, তা হল পুরাণের মূল চরিত্রগুলো হল দেবী দেবতারা। কিন্তু মহাভারতে আমাদের মত রক্ত মাংসের মানুষরাই হলেন মূল চরিত্র।

চণ্ডী একদিকে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত বলে চণ্ডীকে যেমন পুরাণ বলা যেতে পারে, অন্য দিকে চণ্ডী তন্ত্রের ভাবধারা দ্বারাও প্রভাবিত। কারণ তন্ত্রের মূল বক্তব্য চণ্ডীতেই এসে গেছে। পুরাণের চারজন মূল দেবতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও শক্তির পূজাই সারা দেশে বিভিন্ন ভাবে হয়ে আসছে। তার মধ্যে বিভিন্ন কারণে ব্রহ্মার পূজা ভারতে বলতে গেলে বন্ধই হয়ে গেছে। সারা ভারতে একমাত্র পুস্করেই ব্রহ্মার মন্দির আছে, আরও কয়েকটি জায়গায় থাকতে পারে কিন্তু অন্যান্য দেবতাদের মন্দিরের তুলনায় অতি নগণ্য। ব্রহ্মা ছাড়া থেকে গেলেন বিষ্ণু আর শিব। বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ আর শক্তির আরাধনাই ভারতে এখন সব থেকে বেশি হয়। শক্তিকে আবার নানান রূপে আরাধনা করা হয়। সেই কারণে ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে চণ্ডীর ভূমিকাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

চণ্ডীকে আমরা পুরাণ বলছি, এই পুরাণের আবার নিজস্ব কতকগুলি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যেমন সব পুরাণকেই সৃষ্টি ও প্রলয়ের বর্ণনা অবশ্যই করতে হবে। সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে বলবে সৃষ্টির আগে কিছুই ছিল না। বেদের নাসদীয় সুক্তেও বলা হয় প্রথমে কিছুই ছিল না, অর্থাৎ আগে অসৎই ছিল। সেখান থেকেই সৃষ্টি হয়ে হয়ে আজ আমরা সবাই এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। এই অসৎকে কেউ শূন্য বলেন, তাঁরা বলেন প্রথমে কিছুই ছিল না, শূন্য থেকেই সৃষ্টি এসেছে। আবার অসৎকে কেউ অভাব বলে। বেদে কিন্তু এভাবে অসতের ব্যাখ্যা করা হয় না, বেদ বলছে প্রথমে যা কিছু ছিল তা ইন্দ্রিয়গোচর ছিল না। ইন্দ্রিয়গোচর না হওয়ার জন্য তাকে অসৎ বলা হয়। ইন্দ্রিয়গোচর না হলেও সৃষ্টির প্রথমে কিছু একটা ছিল। অভাবকে যে অর্থে নেওয়া হয় সেই অভাব ছিল না, খরগোশের যেমন শিং হয় না সেই অর্থে তখন কোন অভাব ছিল না, কিছু না কিছু ছিল। তবে যা কিছু ছিল তা ইন্দ্রিয়ের অগোচরই ছিল। ইন্দ্রিয় থাকলে তো ইন্দ্রিয়গোচর হবে, কারণ ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের বিষয় একই সাথে সৃষ্টি হয়, তাই ইন্দ্রিয়গোচর হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। ব্যাপারটা হল, তখন দুই ছিল না। দুই ছিল না, তাহলে কি এক ছিল? এই জায়গাতে এসে ব্যাপারটা ধারণা করা খুব কঠিন হয়ে যায়। যখন দুই থাকে, যুস্মদ্ আর অস্মদ্ প্রত্যয় থাকে তখন পরিষ্কার বোঝা যায় আমি আছি আর জগৎ আছে। আমি আপনাকে বা

আপনি আমাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানছি বা জানছেন, কিংবা মন দিয়ে যাচ্ছেন বা আত্মা দিয়ে যাচ্ছেন তাতে কোন কিছু আসে যায় না, কিন্তু আপনি জানতে পারছেন। যখন দুই নেই, আমি আর তুমি এক হয়ে গেল তখন কি থাকছে? দর্শনের কাছে এটি একটি বিরাট বড় সমস্যা। ঠাকুর বারবার বলছেন, যে অবস্থায় দুই নেই সেই অবস্থার কথা মুখে বলা যাবে না। সেইজন্য বলা হয় অদ্বৈত অবস্থা। অদ্বৈত অবস্থায় একও বলা যাবে না আবার দুইও বলা যাবে না। যখন এক আছে বলা হবে তখন এক বলার জন্যতো কাউকে থাকতে হবে। এক বলার জন্য কাউকে যদি থাকতেই হয় তাহলে তো তখন দুই হয়ে গেল।

ঠাকুর অদ্বৈত অবস্থাকে বোঝাবার জন্য এই উপমাটি প্রায়ই ব্যবহার করতেন। দশটি জলপূর্ণ পাত্র আছে। সেই দশটি পাত্রে সূর্য প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। দশটি প্রতিবিম্বিত সূর্য আর উপরে আসল সূর্যকে নিয়ে মোট এগারটি সূর্য হয়ে গেল। এবার একটি একটি করে পাত্রকে ভাঙা শুরু হল। একটি একটি করে নটি পাত্রকে ভাঙার পর একটি পাত্র থেকে গেল। এখন তাহলে দুটি সূর্য আছে। উপরে আসল সূর্য আর নীচে একটি প্রতিবিম্বিত সূর্য। এবারে এই শেষ পাত্রটিও ভেঙে দেওয়া হল। ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন, এখন কটি সূর্য থাকল? তখন যাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি বলছেন – একটি সূর্য থেকে গেল। ঠাকুর বলছেন – তা নয়, কি আছে সেটা আর মুখে বলা যাবে না। এখানে ঠাকুর জলপূর্ণ পাত্র আর সূর্যকে মন আর চৈতন্যের উপমা রূপে নিয়েছেন। মন হল জলপূর্ণ পাত্রের মত যেখানে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। এখন মন যদি না থাকে তখন যা আছে তা মুখে বলা যাবে না, কারণ মনই তো নেই, তাই একটি আসল সূর্য আছে এই কথা কে বলবে! যেদিন কেউ এই সহজ যুক্তিকে বুঝে নেবে সেদিনই সে ঠিক ঠিক অদ্বৈতকে বোঝার জন্য এগোতে পারবে। অদ্বৈতের এই ধারণা না হওয়া পর্যন্ত আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত হওয়া খুব কঠিন। দশটি পাত্র ভেঙে যাওয়ার পর কটি সূর্য আছে, এই প্রশ্নের উত্তরে সবাই নিশ্চিত ভাবে বলে দেবে একটি সূর্যই আছে। মনই তো নেই, কে বলবে কী আছে! তাই কী আছে মুখে বলা যাবে না। কেউ এই অবস্থাকে শূন্য বলতে পারে, আবার কেউ এক বলতে পারে আবার কেউ অদ্বৈতও বলতে পারে। যে শূন্য বলবে সে বৌদ্ধ ধর্মে চলে যাবে, যে এক বলবে সে খ্রিশ্চান কিংবা মুসলমান হয়ে যাবে। হিন্দুরা সব সময় এই অবস্থাকে অদ্বৈত বলে। হিন্দুদের মধ্যে আবার যাঁরা বৈষ্ণব, তাঁরা বলবেন – তখন একমাত্র কৃষ্ণই থেকে যান। এই ব্যাপারে বৈষ্ণব আর ইসলাম ও খ্রিশ্চান ধর্মে কোন পার্থক্য থাকে না। কিছু নেই কিন্তু একটি সূর্য থেকে গেল, একটি সূর্য থেকে গেল মানে কৃষ্ণ থেকে গেলেন। ওনারা যখন গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে বলছেন সৃষ্টি শেষ হয়ে গেল তখন তাদের মনেও প্রশ্ন আসছে সৃষ্টি শেষ হয়ে যাওয়ার পর কী থাকছে? তখন তাদের কিছু তো একটা বলতে হবে। যদি ওনারা বলে দেন সৃষ্টির পর কিছু থাকে না তখন ওদের ধারণা হয়ে যাবে সৃষ্টি শূন্য থেকে হয়। কিছুক্ষণ পর তাদের মাথায় আসবে শূন্য থেকে তো কিছু সৃষ্টি হয় না, তাহলে বাবাজী যা বলেছেন সব ভুল বলেছেন। আসলে সৃষ্টির পর যা আছে তা মুখে বলা যাবে না, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যাবে না। যা মুখে বলা যাবে না, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যাবে না সেটাই হয়ে যায় অসৎ। সেইজন্য বলছেন সৃষ্টি অসৎ থেকে হয়। যখন দৃশ্য নেই দ্রষ্টা নেই তখন কি আছে মুখে বলা যাবে না।

হিন্দু ধর্মের মননশীল মুনি ঋষিরা ধ্যানের গভীরে চিন্তা করে করে একটা জায়গায় পৌঁছেলেন, যেখানে দেখছেন দৃশ্য আছে দ্রষ্টা আছে, এই দৃশ্য আর দ্রষ্টা আবার মিলে এক হয়ে যায়। যখন দ্রষ্টা আর দৃশ্য এক হয়ে যায় তখন মুখে কিছুই বলা যায় না। এনারা তখন সাধারণ মানুষকে বোঝাবার জন্য এর নাম দিলেন, অখণ্ড বা অনন্ত। সেই অনন্তে রয়েছে কারণ সলিল। সলিল মানে জল, জল থেকেই সব কিছুর জন্ম। আর কারণ হল কার্যের পেছনে যে শক্তি কাজ করে। সেইজন্য বলছেন সেই কারণ সলিল থেকে সব কিছুর সৃষ্টি হয়, এরপর আবার যখন প্রলয় হয়ে যাওয়ার পর সৃষ্টির সব কিছু নাশ হয়ে যায় তখন সেই কারণ সলিলই শুধু থাকে। কিন্তু যদি বলা হয় শুধু জলই আছে, সেটা আবার যুক্তিতে দাঁড়াবে না। সেইজন্য বলছেন ওই কারণ সলিলে ভগবান শয়ন করে আছেন। ভগবান কীভাবে শয়ন করে আছেন? তিনি অনন্ত নাগের উপর শায়িত। নাগ সর্পকুলের একটি জাতি, ওই নাগ জাতির যিনি শ্রেষ্ঠতম তাঁর নাম অনন্তনাগ, ভগবান সেই অনন্ত নাগের শয়ন করে আছেন।

এখান থেকে সরে গিয়ে আমরা এখন একটু অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি। গল্প বলার ইচ্ছা মানবজাতির অন্যতম একটি প্রাচীনতম ইচ্ছা। খুব কম মানুষই পাওয়া যাবে যারা গল্প বলতে চায় না বা গল্প শুনতে চায় না। গল্প

বলার ইচ্ছা এবং পরনিন্দা আর পরচর্চা পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত, যেমনি কারুর একটা কিছু দোষ পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে অন্যকে বলে মানুষ তৃপ্তি পায়। এই যে বাড়িয়ে বলা হচ্ছে এটাই কাহিনী। কাহিনী তৈরী করা আর গল্প বলা আমাদের স্বভাবেই রয়েছে। তিন চার বছরের শিশু কম কথা বলছে, বুঝতে হবে শিশুর মধ্যে কোন গোলমাল বা সমস্যা আছে। সব বাচ্চাই জগতের সব কিছুকে অবাক হয়ে দেখতে থাকে আর তার খুব কাছের লোককে তাকে হাত পা নেড়ে, চোখ বড় করে সব কিছু বলতে থাকে। আর যে জিনিষ সে আগে কখন দেখেনি, জানে না সেই জিনিষের ব্যাপারে সে শুনতে চায়, জানতে চায়। এখনকার মা-বাবারা তাদের বাচ্চাদের অত কথা শোনবার বা শোনাবার সময় পায় না, সময় যদিও বা থাকে তাদের ধৈর্যও নেই। এই কাজটা এখন বাচ্চার দাদু, দিদিমা, ঠাকুরমারা করেন। ঠাকুরমা দিদিমারাও গল্প বলতে চাইছেন আবার গল্প শুনতেও চান। সৃষ্টির পর থেকে জগতে এমন কোন সময় ছিল না যখন কেউ গল্প বলতে চাইতেন না বা শুনতে চাইতেন না। আর এমন কোন দিনও আসবে না যেদিন গল্প বলা ও গল্প শোনা বন্ধ হয়ে যাবে।

কিছু দিন আগে ভারতের পুস্তক প্রকাশনী সংস্থাগুলো নিজেদের মধ্যে হিসাব করে দেখতে চাইলেন ভারতে তাঁরা এই কয়েক বছরের মধ্যে কোন ধরণের বই কে কেমন ছাপিয়েছে এবং কত পুস্তক বিক্রী করেছে। হিসাব করে দেখা গেলে ভারতে সব থেকে বেশি বই ছেপেছে গীতা প্রেস। দ্বিতীয় স্থানে অমর চিত্রকথা। এই হিসাবটা শুধু এই জন্যই দেখানো হল যে, আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর যে কোন পুস্তক ভারতে সবার উপরে থাকে। ঠিক তার নীচেই আছে কথা কাহিনী। গীতা প্রেস ভারতের সব কটি পুরাণের কাহিনীগুলোকে ছাপিয়ে দিয়েছে, যার ফলে তাদের বই বাজারে বেশি বিক্রী হচ্ছে। কাহিনী হল প্রত্যেক মানুষের ভেতরকার একটা চিরন্তন ক্ষুধা। কাহিনী আবার অনেক রকমের হয়, কিছু কাহিনী খুবই সাদামাটা গ্রাম্য কাহিনী। গ্রাম্য কাহিনীতে সাধারণতঃ পশুপাখি, পাহাড়, নদী, গাছপালাই স্থান করে নিয়েছে। দ্বিতীয় কিছু কাহিনী আছে, যেখানে মানুষকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে চায়। এর ঠিক উপরেই কিছু কাহিনী আছে যেগুলোকে রূপকথা বলা যায়, যেসব কাহিনীতে নানা রকমের ভূত-প্রেত আছে, যেখানে পরী, রাজকুমার, রানী, রাক্ষসরা দাপিয়ে বেড়ায়। এখান থেকে শেষ ধাপে এসে যায় মিথস্ বা পৌরাণিক কাহিনী। ইংরাজীতে মিথ্ শব্দ অন্য অর্থে ব্যবহার করা হয়, এই মিথই যখন হিন্দুরা বলে তখন তা একটু অন্য অর্থে বলে। এই মিথস্এ কিছু কিছু আধ্যাত্মিক সত্যকে আধার করে কাহিনী চলতে থাকে। এবার সাহিত্যকে যদি দুটো অংশে ভাগ করে দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে একদিকে মিথস্ গুলো চলে আসবে অন্য দিকে থাকবে নানা রকমের সাদামাটা গল্প। এই সাদামাটা গল্পের মধ্যে নাটক, কাব্য, উপন্যাস থেকে শুরু করে সাহিত্যের সব কিছুই ঢুকে যাবে।

মিথস্ বিহীন সাহিত্য মূলতঃ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই ষড়রিপুকে কেন্দ্র করেই চলে। চোখ কান বন্ধ করে বলে দেওয়া যায়, যে কোন সাহিত্য এই ছটি রিপুর এক বা একাধিক রিপুকে নিয়েই কোন না কোন ভাবে খেলা করছে। যখন শক্তির উপর খেলা করবে সেখানেও আমি তোমার উপর জয়ী হব এই মদ রিপু খেলা করছে। কিন্তু এই কাহিনীই যখন ভারতীয় মিথসে চলে আসে তখন এই রিপুগুলো আর মূলে থাকে না, তখন মূলে এসে যায় আধ্যাত্মিক সত্যকে কীভাবে জগতের সামনে নিয়ে আসা যেতে পারে। তুমি আর এই আধ্যাত্মিক সত্য এক, এই বোধকে জাগাবার দিকে যখন নিয়ে যাওয়া হয় তখন দুটি পথ খুলে যায়। একটা পথ হল যেখানে কেন্দ্র হল ভগবান বা দেবতাদের মত কিছু কিছু দিব্য শক্তি। দ্বিতীয় হল, আমাদের যে রাজা, সম্রাট ছিলেন তাদেরকে কেন্দ্র করে কাহিনী এগোতে থাকে। রাজাদের কেন্দ্র করে যখন কাহিনী এগিয়েছে তখন রামায়ণ, মহাভারতের মত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। যখন দেবতাদের কেন্দ্র করে কাহিনী চলে তখন আমরা তাকে পুরাণ বলছি। মূলতঃ এই দুই ধরণের সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। রামায়ণ মহাভারতে যেমন দেবতারা আছেন আবার পুরাণেও সাধারণ মানুষও ভালো ভাবেই স্থান পেয়েছে। কিন্তু দুটো ক্ষেত্রেই কেন্দ্রটা পাল্টে যায়। মানব জীবনের মূল লক্ষ্য হল, স্বামীজী যেমন বলছেন each soul is potentially Divine, এই potentialityকে express করা।

সৃষ্টি যখন হয়েই গেছে, কিন্তু তাকে তো আবার সৃষ্টির আদিতে ফিরে যেতে হবে, এই যে পুরো জিনিষটা সেই দিব্য সত্তাতে ফেরত যাবে, ফিরে যাওয়ার এই ব্যাপারটা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে গিয়ে পুরাণ নিয়ে এল

কারণ সলিল। কারণ সলিলে ভগবান বিষ্ণু শয়ন করে আছেন। এবার ভগবান বিষ্ণু এক এক করে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করার পর সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিটা ছড়িয়ে গেছে। সৃষ্টি ছড়িয়ে যাবার পর এবার তিনি চেষ্টা করছেন সব সৃষ্টিকে গুটিয়ে আমি আবার আমার জায়গায় ফেরত যাব। আমার অবস্থায় ফেরত যাওয়া, এই ব্যাপারটাকে স্বামীজী বলছেন – অনু বা ব্যষ্টি চাইছে সমষ্টির সাথে এক হতে। মূল কথা হল, সৃষ্টি যেটা ভগবান থেকে বেরিয়ে এসেছে সে এবার ভগবানের কাছেই ফেরত যেতে চাইছে। ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় যখন পুরো সৃষ্টি কোন ভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে মিশে যায় তখন মনে হয় কোথাও যেন কিছুক্ষণের জন্য সব কিছু থেমে গেল। এরপর বিষ্ণু আবার অগোচর হয়ে গেলেন, অসৎ হয়ে গেলেন। কিছু কাল অসৎ হয়ে পড়ে থাকার পর আবার বিষ্ণু গোচর হতে শুরু করেন, মানে আবার সৃষ্টি হতে আরম্ভ হয়ে গেল। সব কিছু যেন তাঁরই লীলা মাত্র। এই লীলার মধ্যে কিছু দিনের জন্য তিনি গোচর হয়ে যান আবার একটা সময়ের পর তিনি অগোচর হয়ে যান, অগোচর মানে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া। এভাবেই অনাদিকাল থেকে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় চক্রাকারে চলছে তো চলছেই।

সৃষ্টিকে বর্ণনা করার অনেক পথ আছে। একটা পথ হল গল্পের পথ, নানা রকমের কাহিনীর মাধ্যমে সৃষ্টির ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মনে একটা ধারণা তৈরী করা। সৃষ্টির ব্যাপারে নামকরা প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী হল – বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে পদ্ম বেরিয়ে এল, সেই পদ্মের উপর ব্রহ্মা বসে আছেন। ব্রহ্মা এবার সৃষ্টি করতে শুরু করলেন। ব্রহ্মা আবার দেখছেন বিষ্ণুও আছেন। ব্রহ্মা ভাবছেন বিষ্ণুকে আমিই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু বিষ্ণু বলছেন – আমিই তোমাকে সৃষ্টি করেছি। মাঝখানে আবার শিব ঢুকে যাচ্ছেন। আবার দেখা যায় এই তিনজনের মধ্যে দেবতারাও এসে যাচ্ছেন। এইভাবেই ধীরে ধীরে পৌরাণিক কাহিনীগুলো একের পর এক আসতে থাকে। ব্রহ্মার অনুগামীরা বলছে ব্রহ্মাই শ্রেষ্ঠ, অন্য দিকে বিষ্ণুর ভক্তরা বলছেন ব্রহ্মা নয় বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ, শিবের চেলারাও ছাড়বে না, তারা বলছে শিব শ্রেষ্ঠ। একজনকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতে গিয়ে নানা রকমের কাহিনীর উদ্ভব হতেই থাকে। এর মধ্যেই আবার কত রকমের ইতিহাস, ইতিহাসও এক ধরণের কাহিনী। ফিজিক্স দিয়ে যখন ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তখন সেটাও একটা কাহিনী।

সৃষ্টি, সৃষ্টির নাশ, এগুলো দেখার সময় অনেক মজার ব্যাপার হয়ে যায়। আমি আর আমার মন এক, আমার মন যা আমি তাই। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আসলে কি? আমি যা সেটাই জগৎ। আমার বাইরে কোন জগৎ নেই, যা কিছু হচ্ছে সব আমার ভেতরেই হচ্ছে। স্বামীজী বলছেন External world is a mere suggestion। এই যে দিব্য সত্তা, যেখানে ভগবান বিষ্ণু আছেন আর এদিকে এই যে জগৎ, এই দুটোকে মেলাবার জন্য নানা রকম কাহিনীর সাহায্য নিতে হয়। কেউ পুরাণের সাহায্য নিচ্ছে, কেউ উপনিষদের সাহায্য নিচ্ছে আর কেউ ফিজিক্সের, কেউ ইতিহাসের, কেউ কেমেস্ট্রির সাহায্য নিচ্ছে। দিব্য জগৎ আর এই বাহ্য জগতের বৈষম্যকে মেলানোর জন্য সবাই নানা রকমের কাহিনীর আশ্রয় নিয়ে থাকে। ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, ইতিহাস, অঙ্ক যেমন এক একটি কাহিনী আর পুরাণও একটি কাহিনী। একদিকে আমাদের আত্মা বলছেন আমি দিব্য, স্বামীজী যাকে বলছেন each soul is potentially divine, অন্য দিকে আমাদের মনের কাছে এই জগতকেই সত্য বলে মনে হচ্ছে। জগতকে সত্য মনে করছি বলে ইন্দ্রিয় দিয়েই হোক আর মন দিয়েই হোক এই জগতকে অনুভব করছি। সত্য জগৎ থেকে দিব্য জগতে যাওয়ার জন্য তাই কাহিনীর দরকার। পুরাণ বলুন, বিজ্ঞানের সব শাখাই বলুন, বিগ্ ব্যাঙের থিয়োরিই বলুন আর ইতিহাসই বলুন, সবই কাহিনী। এর মধ্যে কোনটাই সত্য নয়। তাহলে সত্য কোনটা? যার কাহিনী আপনার মনে পছন্দ হয়।

এর মধ্যে ইতিহাসে কিছু সমস্যা এসে যায়। ঠাকুর বলছেন, লঙ্কায় রাবণ মলো আর বেহুলা কেঁদে আকুল হল। কোথায় কোন লঙ্কায় রাবণ মরেছে আর কোথায় বেহুলা কেঁদে মরছে। চন্দ্রগুপ্ত কোথায় কবে রাজা ছিল তাতে আমার আর কি আসে যায়! কোথায় কোন বিজ্ঞানীর মাথায় কি একটা চিন্তা এসে গেল, সেই চিন্তা থেকে একটা বিগ ব্যাঙের থিয়োরী নিয়ে চলে এল, তাতে আপনার আমার কি এসে গেল! বিগ ব্যাঙ কত লক্ষ বছর আগে হয়েছিল তাতে আমাদের কি আসে যায়! আমাদের মুনি ঋষিরা যখন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি রচনা করলেন তখন তাঁদের কাছে একটাই দর্শন ছিল, তা হল – এই জগতে তুমিই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ। তোমাকে ছাড়া জগতে আর কোন কিছুই তোমার কাছে গুরুত্ব নেই। তুমি যা জগৎ তাই। এখন তুমি তোমার এই জাগতিক ভাব থেকে

তোমার দিব্য ভাবে যাওয়ার জন্য একটা ভালো কাহিনীকে অবলম্বন করে এই জাগতিক ভাব থেকে তুমি বেরিয়ে গিয়ে মুক্তির আনন্দ আস্বাদ কর। এই কারণেই পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের এত মাহাত্ম্য। কাহিনীর মাধ্যমে তোমাকে বলে দেওয়া হল ভগবান নারায়ণ আছেন। এখন তাঁর চারটে হাত ছিল কি দুটো হাত ছিল তাতে কিছু যায় আসে না, হাজারটা হাত লাগিয়ে দিলেও কোন কিছুই আসবে যাবে না। মূল কথা হল দিব্য সত্তা আছে, সেই দিব্য পুরুষ ছাড়া আর কিছু নেই। এবার প্রশ্ন হবে দিব্য পুরুষ এক না দুই? অবশ্যই দুই হবে কারণ তিনি আছেন অনন্ত নাগও আছে আর কারণ সলিলও আছে। কিন্তু সাধারণ লোককে বোঝানর জন্য বলা হয় তিনি ছাড়া কিছু নেই। যদি কেউ অনন্তকে বুঝতে চায়, যেমন বলছেন ব্রহ্মা যে পদ্মের উপর বসে আছেন এই পদ্মের শেকড়টা কোথা থেকে শুরু হয়েছে জানতে হবে। তিনি এখন আলোর মত গতিবেগে শেকড়ের উৎসের দিকে চলেছেন। এই ভাবে কয়েক লক্ষ বছর যেতে থাকলেন, কিন্তু কোথাও শেকড়ের শেষ মাথাটা ধরতে পারছেন না। এখানেও সেই একই বক্তব্যকে এনে বোঝান হচ্ছে তিনি অনন্ত।

যাঁরা ঠিক ঠিক বেদান্তী, যাঁদের মস্তিষ্ক খুব উন্নত এবং মন যাঁদের প্রচণ্ড বিচারশীল ও যুক্তিপ্রবণ, যাঁরা একটুও ডান দিক বাম দিক করেন না, তাঁরা বলছেন সৃষ্টির আগে কিছু একটা ছিল যেটা ইন্দ্রিয়ের অগোচর। সেখান থেকে সৃষ্টি হল। কিন্তু কীভাবে সৃষ্টি হল আমাদের জানা নেই। সেইজন্য আমরা বলি মায়া। মায়া থেকে বেরিয়ে এল তিনটে গুণ – সত্ত্ব, রজো ও তমো। এই তিনটে গুণ এক অপরের সাথে মিশে মিশে সব কিছু বেরিয়ে এই সৃষ্টিটা এসে গেছে। এখান থেকে ফেরত যাবার উপায় কি? বেদান্ত বলছে তুমি নেতি নেতি করে তোমার দিব্য সত্তায় ফেরত চল। এটাও একটা কাহিনী, এই কাহিনীও আমাদের একটা স্বতন্ত্র পথ বলে দিচ্ছে। এই রকম আরও অনেক পথ তৈরী হল, আমরা এখানে যত শাস্ত্র পড়ছি সবই এক একটা পথ। পুরাণ বলছে সৃষ্টির নাশ হয়ে গেলে একমাত্র ভগবান বিষ্ণুই থেকে যান, তিনি তখন ক্ষীর সাগরে অনন্ত নাগের উপর যোগনিদ্রায় শায়িত থাকেন। সেই ভগবান থেকে এক সময় আবার ব্রহ্মার সৃষ্টি হল। যখন ভক্তি করা হয়, ভগবান বিষ্ণুরই ভক্তি করা হোক বা শিবেরই ভক্তি করা হোক, তিনি তাঁর ভক্তকে ওই দিব্য অবস্থায় নিয়ে চলে যাবেন। এভাবেই পুরাণের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীশ্রীচণ্ডী এই রকমই একটি পুরাণ, যা মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ব্রহ্মার মাহাত্ম্যকে বড় করে দেখানো হয়েছে।

বস্তু সমূহ বিশিষ্ট এই জগতকে বেদান্ত কখন না করছে না। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মাকে মানেন, বিষ্ণুকেও মানেন আবার শিবকেও মানেন, দেবতা, অসুর, ঋষি সবাইকেই তিনি মানেন। এবার আরেকটু গভীরে গিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে, ভগবান বিষ্ণুর দুটি রূপ। একটা রূপ হল তিনি সব কিছুর পারে অর্থাৎ সৃষ্টির আগে। দ্বিতীয় রূপ হল একবার সৃষ্টিটা যখন হয়ে গেল তখন এই সৃষ্টিতেও ভগবান বিষ্ণুকে পাওয়া যাবে, কারণ চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই। ভগবান বিষ্ণুকে একটা জায়গায় রাখতে হবে, তাই তাঁকে ক্ষীর সাগরে রাখা হল। এইভাবে না বললে ভগবানকে বোঝানো যাবে না। সৃষ্টিতে সব কিছু আছে, ব্রহ্মা হলেন সব কিছুর আদিকর্তা। ভগবান শিব যিনি, তিনি ধ্যানরত। আমাদের ভেতরের যে স্বভাব, সেই স্বভাব অনুসারে দেবতারা আছেন আর অসুররাও আছে। দেবতা শব্দ এসেছে দিব্ ধাতু থেকে, যাঁরা আত্মশক্তি ও শুভ শক্তিতে বিশ্বাস করেন তাঁরাই দেবতা। অসু মানে প্রাণ, যারা প্রাণশক্তিতে বিশ্বাস করে তারা হয়ে গেল অসুর। একজন খুব সুন্দর উপমা দিয়ে দেখাচ্ছেন – যেমন একটা এ্যটম্ আছে, এ্যটমের মাঝখানে থাকে নিউক্লিয়াস, যেখানে প্রোটন নিউট্রন আছে আর তার চারিদিকে ইলেক্ট্রনগুলো বন্ বন্ করে ঘুরছে। ইলেক্ট্রন গুলো অসুর, খুব শক্তিমান বলে খুব ছুটোছুটি করতে থাকে। সব কিছুকে দৃঢ় করে ধরে রাখার জন্য পজিটিভ শক্তি মাঝখানে বসে আছে। মাঝে মাঝে যখন ইলেক্ট্রন গুলো বাড়াবাড়ি করে বসে, যেমন কোন কারণে শক্তির ভারসাম্যে বিচ্যুতি এসে গেল বা একটা অতিরিক্ত ইলেক্ট্রন ঢুকে গেল, মাঝখানে যারা বসে আছে তারা কিন্তু চুপচাপ বসে আছে। প্রোটন বা নিউট্রোনে কখন পরিবর্তন হয় না, যত রকম পরিবর্তন আসে সব ইলেক্ট্রনেই আসে। অসুরগুলো খুব চঞ্চল, এরা মাঝে মাঝে গোলমাল লাগিয়ে বসে। যখন গোলমাল পাকিয়ে ফেলে তখন চেষ্টা করা হয় ভেতর থেকেই গোলমালটা ঠিক করে দিতে। যখন ভেতর থেকে হয় না তখন বাহ্যিক ভাবে চেষ্টা করতে হয়। সেইজন্য বলা হয় অসুররা যে মুহুর্তে প্রচণ্ড ক্ষমতাবান হয়ে গেল এবারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভারসাম্যটা বিগড়ে যাবে। ভেতরে দেবতাদের যে পজিটিভ শক্তি আছে সেই শক্তি আর ভারসাম্য ধরে রাখতে

পারবে না। তখন সব কিছু সামলাতে ভগবানকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। ভগবান বিষ্ণু হলেন নিউট্রাল, তাঁর কাছে দেবতারা যা, অসুররাও তাই।

ভগবান একটা জিনিষ কখনই হতে দেবেন না, তা হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নাশ হয়ে যেতে তিনি কখনই দেবেন না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে দেখলে তিনি এমন কিছু একটা করে দেবেন যাতে অসুরগুলো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে আসে। শুধু অসুররাও নয়, যদি তিনি দেখেন দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র বা অন্য কোন দেবতা তাঁর ক্ষমতাকে অপপ্রয়োগ করছেন তখন ঋষিদের দিয়ে এমন কিছু একটা অভিশাপ দিয়ে দেবেন যাতে সেই দেবতাও সোজা হয়ে যাবে। ইন্দ্রের একবার অহঙ্কার খুব বেড়ে গিয়েছিল। দুর্বাসা মুনি সেই সময় ইন্দ্রের দরবারে গেছেন। ইন্দ্রের আদর যত্নে খুশি হয়ে তিনি ইন্দ্রকে একটা দিব্য মালা উপহার দিয়েছেন। দুর্বাসা মুনি প্রচণ্ড রাগী। ইন্দ্র দেখল এই দিব্য মালা এমন আর কি! এর থেকে ঢের ভালো ভালো মালা আমার রত্নভাণ্ডারে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ইন্দ্র দুর্বাসা মুনির দেওয়া দিব্য মালাটা দিয়ে দিল তার হাতিকে। দিব্য মালার গন্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ছুটে আসছে দেখে হাতি মালাটা খুলে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। কি করে দুর্বাসা দেখেন ইন্দ্রকে দেওয়া দিব্য মালা মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে। আর যায় কোথায়, আমার দেওয়া মালাকে মাটিতে ফেলে দেওয়া! দুর্বাসা ইন্দ্রকে অভিশাপ দিয়ে দিলেন। ইন্দ্রের যে অহঙ্কার হয়েছিল, সেটাকে নাশ করার জন্য ভগবান একটা উপায় করে দিলেন।

অন্য দিকে ঋষিরা একমাত্র যম নিয়মাদি করে করে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিকে চলে যাচ্ছেন, তাঁদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য জগতে কোন বিঘ্ন উৎপন্ন হয় না। কিন্তু ঋষি যদি সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত না থাকেন তাহলে তাঁর তপস্যায় অনেক রকম বিঘ্ন এসে যাবে। হয়তো তাঁর মধ্যে বিভিন্ন রকম কাম বাসনা জেগে উঠল, এবার তপস্যা ছেড়ে বাসনা পুর্তির জন্য নেমে পড়লেন। অসুরদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, তারাও যখন প্রচণ্ড তপস্যা করতে থাকে তখন তাদের মধ্যেও কোন একটা বিশেষ বস্তুর প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি এসে যায়। আর তা নাহলে অস্বাভাবিক ক্রোধ বৃত্তি এসে গ্রাস করে নেবে, যেমন দুর্বাসা মুনি, তাঁর মধ্যে এমন কিছু একটা গোলমাল ছিল, যার জন্য তিনি ক্রোধ বৃত্তিকে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। অন্য দিকে বিশ্বামিত্র, তাঁরও ভেতরে অনেক গোলমাল ছিল বলে উপরের দিকে যেতে অনেক সময় লেগে গিয়েছিল। ভগবান যখন দেখেন ঋষির মধ্যে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের অভাব অথচ তপস্যা করে প্রচুর ক্ষমতা পেয়ে যাচ্ছেন তখন তিনি এমন কিছু একটা করে দেবেন, কোন অপ্সরাকে পাঠিয়ে বা কারুর কিছু সর্বনাশ করিয়ে ঋষির সব ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেবেন। বিশ্বামিত্র তপস্যা করে যখনই ক্ষমতা পেয়ে যেতেন তখন তিনি বশিষ্ঠ মুনির উপর আক্রমণ করে সেই ক্ষমতাকে নষ্ট করে ফেলতেন, কখনও আবার কোন নারীর সংসর্গে পড়ে সব ক্ষমতা বেরিয়ে যেত। ভগবান ক্ষমতার ভারসাম্যকে কখনই নষ্ট হতে দেবেন না। আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ে যাঁরা এগোচ্ছেন তাঁদেরও ভগবান সহজে ছেড়ে দেন না। ভগবান বুদ্ধের কাছে মাড় এসেছিল, যিশুর কাছে অনেক রকম প্রলোভন এসেছিল, ঠাকুরও বলছেন শেষ অবস্থায় একজন গোরা ইংরেজের বেশে তাঁর কাছে এসে কত রকমের প্রলোভন দিতে শুরু করেছিল। ভগবানের মধ্যে ঈশ্বরীয় শক্তি, এই ঈশ্বরীয় শক্তির কাজ হলে জগতে ভারসাম্য বজায় রাখা।

এখন দেবতাদের দিক থেকেই হোক, অসুরদের দিক থেকেই হোক বা ঋষি-মুনিদের দিক থেকেই হোক যেভাবেই হোক, মানুষ অত্যন্ত সাধারণ হলেও তার মধ্যে সব রকম গুণই আছে, দেবতাদের গুণও আছে, অসুরদের গুণও আছে আবার ঋষি-মুনিদের গুণও আছে। মানুষ ইচ্ছে করলে দেবতাদের পথ নিতে পারে, ইচ্ছে করলে অসুরদের পথে নেমে যেতে পারে আবার ইচ্ছে করলে ঋষিদের পথ অনুসরণ করে দেবতাদের থেকেও অনেক উপরে চলে যেতে পারে। যেমন সমাজে কেউ যদি খুব বাড়াবাড়ি কিছু করতে যায় তখন সমাজই তাকে আটকে দেবে। সে হয়তো বলবে – আমি ভালো কাজ করতে চাইছি, কিন্তু আমাকে এত বাধা বিঘ্নের সম্মুখিন হতে হচ্ছে কেন! বাধা বিঘ্ন আসছে কারণ তুমি সঠিক পথ অনুসরণ করে করছো না। কেউ বলছে আমি শাস্ত্রের কথা শুনতে চাইছি, আমি জপ-ধ্যান করতে চাইছি, কিন্তু আমাকেও এত বাধা বিঘ্ন ঠেলে এগোতে হচ্ছে কেন? কারণ সে সঠিক পথ অবলম্বন করেনি। পরিবারের ভারসাম্য, সমাজের স্থিতিশীলতা নষ্ট করাটাও ভগবান বরদাস্ত করবেন না। সমাজের স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করে তুমি যদি কিছু করতে যাও সমাজই তোমাকে আটকে দেবে। তুমি যদি সব দিক ঠিক রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাও, তখন আর ভারসাম্যও ক্ষুণ্ন হবে না, তোমার পথেও কেউ বাধা সৃষ্টি করতে

যাবে না। এরপরও তোমার উপর দু-চারটে ধাক্কা, কিছু ঝড়-ঝাপ্টা আসবে, এসব আসার পরেও তুমি যদি তোমার পথ থেকে সরে না আস, তখন বুঝে গেলে তুমি এই পথে চলার জন্য প্রস্তুত, এরপর তোমার পথে কেউ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আসুরিক শক্তিকে, যে আসুরিক শক্তির প্রভাব অত্যাধিক মাত্রায় বেড়ে গিয়ে জগতের সব কিছুর ভারসাম্যকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে, ঈশ্বরীয় শক্তি দিয়ে এই আসুরিক শক্তি কীভাবে বশে এনে জগতের ভারসাম্যকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, তারই মূল কাহিনী চণ্ডীতে বলা হয়েছে।

সংসার থেকে মানুষ এত চড়-চাপড়, লাথি-ঝাঁটা খেয়ে যাচ্ছে তবুও সে সংসারকে ভুলতে পারে না। এটাই মায়া। ছেলে একটি মেয়েকে ভালোবেসেছে, সেই মেয়ে তাকে ছেড়ে অন্য আরেকটি ছেলের সঙ্গে ঘুরছে, তখনও সে বলে যাচ্ছে আমি মেয়েটিকে ভুলতে পারছি না। এটাই মায়া। চণ্ডীতে ঠিক এই জিনিষটাই প্রথমের দিকে নিয়ে আসা হয়েছে। সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন আর সমাধি নামে এক বৈশ্য ছিলেন। এদের দুজনেই জগৎ-সংসার থেকে প্রচণ্ড মার খেয়ে জঙ্গলে চলে এসেছে। এখানে এসেও রাজা তার হাতিকে ভুলতে পারছে না, যে ছেলে আর বউ মিলে সমাধি বৈশ্যের সব টাকা-পয়সা কেড়ে মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে সেই সমাধিও জঙ্গলে এসে ছেলে-বউকে ভুলতে পারছে না। ঠাকুর বলছেন, তিন কুলে যার কেউ নেই তাকে দিয়েও মহামায়া একটা বেড়াল পুষিয়ে সংসার করিয়ে নেন। ওই বেড়ালের দুশ্চিন্তায় তার এখন আর কাশী যাওয়া হচ্ছে না। এই মায়াটা কী? কে বলবে মায়া কী! বেদান্তীরা একটি বাক্যে বলে দেবে – মায়া মানে 'মা' 'য়া'। 'মা' মানে যার কোন অস্তিত্ব নেই আর 'য়া' মানে যাকে জানা যায় না। যে জিনিষকে জানা যায় না সেটাই মায়া। অন্ধকারকে অন্ধকার দিয়ে জানা যাবে না, অন্ধকারকে আলো দিয়েও জানা যাবে না, এটাই মায়া। কিন্তু সাধারণ মানুষ মায়ার এই সহজ অর্থকে তার জীবন-যুদ্ধে মেনে নিতে পারে না। সেইজন্য সাধারণ লোকদের বিভিন্ন কাহিনী শোনান হয়। জাগতিক সত্তাকে যে দিব্য সত্তার সঙ্গে মেলানো হবে তার জন্য সাধারণ মানুষের কাহিনী চাই।

মায়ারই আবার আরেকটি রূপ শক্তি। আচার্য শঙ্করও গীতার ভাষ্যে কোথাও মায়া, কোথাও শক্তি শব্দকে ব্যবহার করেছেন। আমাদের মত সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে মায়া, কারণ আমি ভুলে গেছি আমি কে, আমার আসল স্বরূপ কি সেটাই আমি মনে করতে পারছি না। আবার ভগবানের ক্ষেত্রে এই মায়াই হয়ে যায় তাঁর শক্তি, যে শক্তি দিয়ে তিনি সবাইকে ভুলিয়ে রেখেছেন। মায়া শক্তি মানে ভগবানের আবরণ শক্তি, যে শক্তি ভগবানের স্বরূপকে আবৃত করে রেখেছে। ভগবানের কার্যটাই ভগবানের শক্তি। জগতকে যদি আমরা নাম-রূপের খেলা রূপে দেখি তখন এটাই মায়া। জগতকে যখন ভগবানের লীলা রূপে দেখি তখন এটাই তাঁর শক্তি। মায়া আর শক্তি নির্ভর করে আপনি এই জগতকে কী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখছেন। মায়া যেটা তা ভগবানরই মায়া। তিনি মায়া দিয়ে নিজের প্রকৃত স্বরূপকে ঢেকে দিয়ে এই জগতকে দেখিয়ে দিচ্ছেন। শক্তির দিক থেকে দেখলে তিনিই নিজের শক্তিতে এই জগৎ রূপে বিরাজ করে খেলা করছেন, জগৎ যেন তাঁরই বিলাস। মায়া আর ঈশ্বর কিন্তু কখনই এক নয়। মায়া বলা হয় অজ্ঞানের দৃষ্টিতে। এই অজ্ঞানকে নিয়ে দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা অদ্বৈতবাদীদের আক্রমণ করে। তারা বলে, ভগবানের মধ্যে মায়া কোথা থেকে আসবে! যিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপ, যিনি আলোর স্বরূপ তাঁর মধ্যে অন্ধকার কোথা থেকে আসবে! সেইজন্য মায়া আর ঈশ্বর কখন এক হবে না। কিন্তু শক্তির দিকে থেকে এক, ঠাকুরও বলছেন ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। শক্তির দিকে থেকে ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ হওয়ার জন্য অদ্বৈতবাদীদের যুক্তিগুলো আর খাটবে না। আসলে ঈশ্বর থেকে কীভাবে সৃষ্টি হয়, এটা জানার কোন পথ নেই। সৃষ্টিকে আপনি মায়া মেনে দিয়ে ব্যাখ্যা করলে এক রকম হবে, শক্তি মেনে ব্যাখ্যা করলে আরেক রকম হবে, এখানে কোনটাই দোষের নয়। আসলে আমাদের মন যে ভাবে ভাবছে জগৎ তাই। জগৎ মানে আপনার মন, আপনার মনও যা জগতও তাই। আপনার মন এখন কোন ভাবে আছে, কোন রূপকে আপনার মন নিতে চাইছে সেটা আপনার মানসিকতার উপর নির্ভর করে। আপনার মন যদি সব কিছুকে যুক্তিতর্ক দিয়ে কেটে উড়িয়ে দিতে চায় তখন আপনি মায়াকে মানবেন। যাদের মধ্যে ভক্তিরস টইটুম্বুর তারা জগতের সব কিছুতে ভগবানের শক্তির খেলা দেখবে। এখানে দুর্গাসপ্তশতী চণ্ডীতে দুটোকেই নেওয়া হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে মায়াকে দেখানো হয়েছে, আর ভগবান থেকেই এই মায়াশক্তি বেরিয়েছে। কারণ এই মায়াকে ভগবানের সঙ্গেই থাকতে হবে। মায়া ভগবানের সঙ্গেই আছে কিন্তু ভগবানের সঙ্গে এক নয়। কিন্তু ঈশ্বর আর তাঁর শক্তি অভেদ, যেমন শক্তিমান আর তার শক্তি

দুটো এক। বাজীকর আর বাজীকরের খেলা এই দুটো কখনই এক নয়। আমাদের দিক থেকে মায়া, কারণ আবরণ এসে গেছে আর শক্তির ক্ষেত্রে ভগবানের দিকে থেকে আসছে, তাঁর শক্তিতে খেলা চলছে। সহজ উপমা হল, আমরা এখানে সবাই বসে আছি, এটাকে আপনি নাম আর রূপের খেলা যদি দেখেন তাহলে পূর্ণব্রহ্মই আছেন। পূর্ণব্রহ্ম রূপে দেখলে আমাদের নাম আর রূপটাই মায়া, মায়া মানে মিথ্যা, এর সাথে ঈশ্বরের কোন সম্পর্কই নেই। আমরা যে সবাইকে নাম আর রূপে দেখছি এটা আমাদের মনের ভুল। কিন্তু যদি দেখি আমরা সবাই ঠাকুরেরই সন্তান, তখন এটাই ঠাকুরের শক্তি হয়ে গেল। দৃষ্টিভঙ্গীটা পুরো পাল্টে গেল। মনের ভুল যখন হয় তখন এটা আমাদের ব্যাপার। ব্যষ্টি যখন হচ্ছে তখন আমার আপনার ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে, তখন মায়া। যখন সমষ্টি রূপে বলা হয় তখন সবাইকে নিয়ে বলা হচ্ছে, তখন ঈশ্বরের সঙ্গে কোন সম্পর্কই থাকছে না। এখানে নাম আর রূপ দিয়ে ঈশ্বরকে আবৃত করে দেওয়া হচ্ছে, এই নাম আর রূপটাই মায়া। এগুলো শুনে একদিনে ধারণা করা যায় না, অনেক দিন লেগে থাকতে থাকতে যখন স্পষ্ট হবে তখন আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ভগবান হলেন শুদ্ধ চৈতন্য, শুদ্ধ চৈতন্য নিষ্ক্রিয়। এই নিষ্ক্রিয় ভাবকে দেখানোর জন্য বলছেন সৃষ্টি চলছে কিন্তু তিনি ক্ষীর সাগরে অনন্ত নাগের উপর শয়ন করে আছেন, সৃষ্টি কার্যে তিনি কখন নাক গলান না। তিনি শুভতেও যান না, অশুভতেও যান না। কেন যান না? কারণ দুটোই তাঁর, সেইজন্য শুভ আর অশুভতে কখনই তাঁর কোন প্রভেদ হয় না। দেখার মধ্যে একটাই, শুভ আর অশুভের ভারসাম্যটা যেন নষ্ট না হয়ে যায়। এখন অনেকে প্রশ্ন করে ভগবানের কানের ময়লা থেকে মধু আর কৈটভের জন্ম। তিনি অমল, তাঁর মধ্যে মল এল কোত্থেকে? এক নাস্তিক সেন্ট অগস্টিনকে প্রশ্ন করেছিল – ভগবান যখন সৃষ্টি করছিলেন না তখন তিনি করছিলেন? তিনি রেগে বললেন 'তোমাদের মত নাস্তিকদের জন্য তিনি নরক সৃষ্টি করছিলেন'। ওই প্রশ্নেরও এই উত্তরই হয়, তুমি যাতে প্রশ্ন করতে পার সেইজন্য ভগবানের কানে ময়লা এসেছে। পৌরাণিক কাহিনীতে একটা বক্তব্যকে দাঁড় করাবার জন্য তাঁরা কোন একটা উপমা নিয়ে আমাদের কল্পনার মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। এগুলোকে জগতের সাথে মিলিয়ে দেখতে যাওয়াটা ঠিক নয়। পুরাণাদি যাঁরা রচনা করেছেন সেই রচনার মধ্যে তাঁদের অনেক রকম কল্পনা এসে গেছে। তাঁরা ভগবানকে পুরুষ রূপে, মানুষ রূপেই দেখছেন। সেই রকম দেখার জন্য মানুষের যা যা বৃত্তি তার সবই ভগবানের মধ্যে চলে আসে। আর যখন অবতারে নিয়ে আসেন তখন মানুষের সব কিছুকেই পুরো দমে নিয়ে আসেন। কিন্তু তখনও তাঁর মধ্যে যে চৈতন্য শক্তি সেটাকে অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রেখে দেন।

ব্যাসদেব প্রথমে বেদের বিভাজন করে যে বেদ বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সেই বেদকে তিনি একটা জায়গাতে বেঁধে দিলেন। এরপর তিনি মহাভারত রচনা করলেন। বলা হয় এত কিছু করার পরেও ব্যাসদেবের মনে নাকি শান্তি ছিল না। ব্যাসদেবের মনের অশান্তির কথা জানতে পেরে দেবর্ষি নারদ তাঁকে শ্রীকৃষ্ণচরিত রচনা করতে উপদেশ দিলেন। এরপর ব্যাসদেব ভাগবত রচনা করলেন। ভাগবত রচনা করার পরেও ব্যাসদেবের মধ্যে সৃজন করার স্পৃহাটা থেকেই গিয়েছিল। সেইজন্য মৃত্যুর আগে পর্যন্ত নাকি তিনি তাঁর লেখনী বন্ধ করেননি। সবাই বলে আঠারোটি পুরাণ নাকি তাঁরই রচনা। তবে বর্তমানে যে আকারে আমরা পুরাণকে পাই, তাতে মনে হয় না যে ব্যাসদেব সব কটি পুরাণ রচনা করেছিলেন। যে ব্যাসদেব সহজ সরল ভাষায় মহাভারত রচনা করলেন, অথচ সেই ব্যাসদেবই যখন সাধারণ মানুষদের জন্য ভাগবত রচনা করলেন তখন সেই ভাগবতের ভাষা এত দুর্বোধ্য ও এত কঠিন যে বড় বড় পণ্ডিতরাও এর ঠিক ঠিক অর্থ উদ্ধার করতে রীতিমত হিমসিম খেয়ে যান। ব্যাসদেবের মত এত বড় জ্ঞানী পুরুষ কখনই এত কঠিন ভাষায় কোন কিছু রচনা করবেন না। উচ্চমানের সৃজনশীল পুরুষরা সব সময় তাঁদের বক্তব্য খুব সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করেন। যে সাহিত্যে শব্দের চাতুর্যকে নিয়ে খেলা করা হয়, শব্দকে নিয়ে ছল চাতুরি করা হয়, বুঝতে হবে সেই সাহিত্যকারের মধ্যে সাহিত্য প্রতিভার কিছু ঘাটতি আছে। সৃষ্টিকর্তা যত উচ্চস্তরের হবেন তাঁর সৃষ্টিও তত সহজ সরল হবে। আধুনিক চিত্রকলা, আধুনিক কবিতা সাধারণ লোক কিছুই বুঝতে পারে না, সৃষ্টিকর্তা নিজে বুঝিয়ে না দিলে কারুরই বোঝার সাধ্য নেই যে তিনি কি বলতে চাইছেন। আসলে এগুলো হল নিকৃষ্ট মানের খুব সাধারণ প্রতিভার নিদর্শন। সাধারণ প্রতিভা এমন একটা চালাকির আশ্রয় করে কিছু রচনা করে দেখাতে চেষ্টা করবে যেন অসাধারণ কিছু। কিন্তু যাঁরা অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন তাঁরা অতি অসাধারণ জিনিষকে খুব সাধারণ আর অত্যন্ত সহজ ভাবে উপস্থাপন করে দেন। যেমন

ঠাকুরের কথামৃত, কত সহজ সরল ভাষায় বলা, বুঝতে কোথাও কোন অসুবিধা হয় না। এরপর আপনি যত সাধনা করবেন তত সহজ সরল কথার গভীরে প্রবেশ করতে থাকবেন। যত extra ordinary work হয়, এটা হল তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্যাসদেব একজন extra ordinary প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাই আমরা মনে করতে পারি ভাগবতের মত কঠিন কাজ তিনি করবেন না। অথচ ভাগবতের অনেক শ্লোক অত্যন্ত সহজ সরল, সবাই পরিষ্কার বুঝতে পারেন কি বলতে চাইছেন। সেইজন্য অনেকের একটা ধারণা যে, ব্যাসদেব নিজে খুব সংক্ষিপ্তাকারে, হয়তো দুই কি চার হাজার শ্লোকে ভাগবত রচনা করেছিলেন, সেটাকেই পরবর্তি কালে তাঁর শিষ্যরা বিস্তার করে গেছেন। পুরাণাদিতে কোন নিয়ম ছিল না যে, এর মধ্যে কেউ কলম চালাতে পারবে না। একমাত্র বেদ উপনিষদে কোন ভাবে কেউ কিছু করতে পারতেন না। আর অনেকে মনে করেন যে বাল্মীকি রামায়ণেও কেউ কলম চালাননি। কিন্তু বাকি সব শাস্ত্রে ওনাদের শিষ্যরা শাস্ত্রের কলেবর বৃদ্ধি করতেই থেকে গেছেন। ইদানিং কালের পণ্ডিতরা আঠারোটি পুরাণকে তিনটে শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন – ব্রহ্মাপুরণ, শিবপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ। প্রত্যেকটিতে ছটি ছটি করে পুরাণ। এই হিসাবটাও আবার মেলে না। হিসাবে না মেলার জন্য পণ্ডিতরা দেখান কীভাবে এই অংশটা আগে অমুক পুরাণে ছিল, সেই অংশকে টেনে আবার এই পুরাণে নিয়ে আসা হয়েছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ এসেছে ব্রহ্মাপুরাণ থেকে, অর্থাৎ ব্রহ্মাপুরাণের অন্তর্গত ছয়টি পুরাণের মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণ একটি। সমস্ত পুরাণের একটি প্রধাণ বৈশিষ্ট্য হল, কোথাও না কোথাও পুরাণ মহাভারত থেকে প্রভাবিত হয়েছে। যেমন ভাগবত পুরাণে প্রথমেই মহাভারতের ঘটনা দিয়ে শুরু করা হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণও মহাভারত দ্বারা অনুপ্রাণিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণের কথা বলছেন মার্কণ্ডেয় ঋষি। ব্যাসদেবের চারজন শিষ্যের মধ্যে জৈমিনিও একজন শিষ্য ছিলেন। জৈমিনি মুনি একদিন মার্কণ্ডেয় ঋষির কাছে গিয়ে বলছেন ‘আমার মনে কিছু জিজ্ঞাসা আছে, আপনি কৃপা করে আমার জিজ্ঞাসার সমাধান করে দিন’। মার্কণ্ডেয় ঋষি সমাধানের জন্য রাজী হয়ে কি জিজ্ঞাস্য আছে জানতে চাইলেন। জৈমিনি মুনির প্রথম প্রশ্ন ছিল ‘ভগবান বিষ্ণু হলেন নিরাকার কিন্তু তিনি অবতার হয়ে মানুষ রূপে সাকার হলেন কী করে’? দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিলেন ‘পঞ্চ পাণ্ডবরা এত শক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের পাঁচ জন সন্তান মারা গেল কী করে’? এই ধরণের অনেক প্রশ্ন করছেন, তার মধ্যে ছিল দ্রৌপদী কী করে পাঁচ জন পুরুষকে বিয়ে করলেন। সব প্রশ্ন শোনার পর মার্কণ্ডেয় ঋষি বললেন ‘হে জৈমিনি! আমার এখন সন্ধ্যা-বন্দনার সময় হয়ে গেছে তাই এই মুহুর্তে তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারছি না। যাই হোক, তুমি এক কাজ কর। তুমি এখন জঙ্গলে চলে যাও। সেখানে চারটে পাখি আছে, চারটে পাখিই বেদজ্ঞ। এরাই তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেবে’।

এই কাহিনীটিও নেওয়া হয়েছে মহাভারত থেকে। মহাভারতেও চারটে পাখির বর্ণনা আছে, যাঁরা বেদজ্ঞ ছিলেন। মহাভারতে যদিও কাহিনীটা একটু পাল্টে গেছে। দ্রোণ নামে একজন ঋষি ছিলেন, কিভাবে কিভাবে তাঁর এই চারটে সন্তান পাখি রূপে জন্ম নিয়েছিল, সেটাও আবার খুব লম্বা কাহিনী। যত রকম অভিশাপ, অভিশাপ থেকে নরক গমন, আর সেই নরকের বর্ণনা সব পুরাণেই পাওয়া যায়। দেবর্ষি নারদ একবার কোন কাজে স্বর্গে গিয়েছিলেন। স্বর্গের রাজা ইন্দ্র দেবর্ষিকে খুব খাতির যত্ন করে বলছেন ‘আমাদের স্বর্গে অনেক অপ্সরা আছে, আসুন আপনাকে অপ্সরাদের নাচ দেখাই। আপনি বলুন আগে কোন অপ্সরার নাচ দেখবেন?’। নারদ হলেন দেবর্ষি আবার ব্রহ্মার মানসপুত্র, অপ্সরার নাচে তাঁর আর কী আগ্রহ থাকবে! তবুও ইন্দ্রের প্রতি সম্মান জানিয়ে বললেন ‘আপনার অপ্সরাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠতমা তাঁর নাচই দেখান’। এখন অপ্সরাদের মধ্যে জানাজানি হয়ে যাবে কোন অপ্সরা স্বর্গের শ্রেষ্ঠতমা অপ্সরা। এই নিয়ে তো রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমাদি যত অপ্সরা ছিল সবাই চুলোচুলির অবস্থায় চলে গেছে। এ বলে আমি শ্রেষ্ঠ, সে বলে আমি শ্রেষ্ঠ। সবাই বলছে আমার মত শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। নারদ সেখানেই বলে দিলেন, আপনারা নিজেরা আগে ঠিক করে নিন কে শ্রেষ্ঠতমা। কোন ভাবেই শ্রেষ্ঠত্বের মীমাংসা হচ্ছে না দেখে নারদ বললেন ‘ঠিক আছে! আর চুলোচুলির দরকার নেই। হিমালয়ের ওখানে দুর্বাসা মুনি তপস্যা করছেন, আপনাদের মধ্যে যে গিয়ে দুর্বাসার তপস্যাকে টলিয়ে দিতে পারবেন তিনিই স্বর্গের শ্রেষ্ঠতমা অপ্সরা রূপে স্বীকৃতা হবেন’। দুর্বাসা মুনির নাম শুনতেই সব অপ্সরারা পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে আর বলছে আমার শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপার দরকার নেই। কিন্তু একজন অপ্সরা ছিল যার অহঙ্কারের শেষ নেই। সেই অপ্সরা গর্ব

করে বলল 'আমি চললাম দুর্বাসার তপস্যা ভঙ্গ করতে। দুর্বাসার তপস্যাকে আমি নাড়িয়ে দেখিয়ে দেব'। দুর্বাসা মুনি হিমালয়ে তপস্যায় রত। কত বছর ধরে কিছু না খেয়ে তপস্যা করে যাচ্ছেন, শরীরটা অস্তিচর্মসার হয়ে গেছে। দুর্বাসার মুনির আশ্রমের এক ক্রোশ দূর থেকেই এই অপ্সরা গান গাইতে শুরু করে দিয়েছে। মনে অভিশাপের ভয়ও আছে বলে সরাসরি কাছে চলে যায়নি। যাই হোক গান শুনে দুর্বাসা মুনির ধ্যানটা একটু নড়েছে। তিনি ভাবছেন মিষ্টি গলার গান কোথা থেকে আসছে! তিনি যোগীরাজ, যোগশক্তি দিয়ে বুঝে গেলেন – ও! এই অপ্সরা এসেছে আমাকে মুগ্ধ করতে। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে সেই অপ্সরার কাছে চলে গেছেন। অপ্সরার গান থামিয়ে দিয়ে বলছেন 'ওরে খেপী! তুই এসেছিস আমার তপস্যায় বিঘ্ন করতে! তোর রূপের খুব অহঙ্কার হয়েছে! এক্ষুণি তুই অপ্সরা থেকে পাখি হয়ে যা'। এরপর অপ্সরাকে বিচ্ছিরি রকমের আরও অনেক অভিশাপ দিতে থাকলেন। সব অভিশাপ শুনে অপ্সরার তো এখন কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছে, তার রূপের অহঙ্কার সব উড়ে গেছে। এরপর সেই অপ্সরা পাখি হয়ে তার থেকে সন্তানাদি হয়েছে। এরপর পুরাণে বিরাট লম্বা কাহিনী। আমরা আর এই কাহিনীর মধ্যে যাচ্ছি না। পুরাণের সব কাহিনীকে যে খুব প্রমাণিত বলে মানা হয় না তার একটা প্রধান কারণ হল, এখানে জৈমিনি মার্কণ্ডেয়কে যে প্রশ্ন করছেন তার প্রথম লাইনটাই খুব আপত্তিজনক। তার কারণ, জৈমিনি ছিলেন তখনকার দিনের একজন শ্রেষ্ঠতম ঋষি, যিনি আবার ব্যাসদেবের শিষ্য। ব্যাসদেবের শিষ্যের মনে এই ধরণের প্রশ্নের উদয় হবে যে প্রশ্নের উত্তর তাঁর জানা থাকবে না, আর সেই উত্তর জানার জন্য তাঁকে যেতে হচ্ছে ত্রিকালজ্ঞ ঋষি মার্কণ্ডেয় মুনির কাছে, এই ব্যাপারে সবারই সন্দেহ হওয়াটা কোন আশ্চর্যের নয়। আর শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বকে নিয়ে জৈমিনির মত ঋষি প্রশ্ন করবেন এটা ভাবাই যায় না।

তাহলে পুরাণ কেন এই প্রশ্নগুলোকে জৈমিনির মুখ দিয়ে করাল? কারণ এই ধরণের প্রশ্ন আমার আপনার মত সাধারণের মনেই উঠবে। মহাভারতের কাহিনী পড়ার পর আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন উঠতে পারে, সেগুলোকেই পুরাণে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্যাখ্যা করার সময় প্রসঙ্গক্রমে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, বংশানুচরিত ও মন্বন্তরকে নিয়ে আলোচনা করছেন। পুরাণের বৈশিষ্ট্যই হল এই কাহিনী থেকে চলে যাবে অন্য এক কাহিনী, সেই কাহিনী থেকে চলে গেল আরেকটা কাহিনীতে, এইভাবে ঢুকতে ঢুকতে আসল কাহিনীটাই আমাদের কাছে হারিয়ে যাবে। এইভাবে কাহিনী থেকে কাহিনী চলতে চলতে একটা জায়গায় মার্কণ্ডেয় মুনি নিজেই সেই কাহিনীকে ধরে নিয়েছেন। সেখানে এখন ক্রৌষ্টিক মুনি এসেছেন। যে জায়গাতে মার্কণ্ডেয় মুনি নিজে কাহিনীকে ধরে নিলেন সেখানেই আসছে চণ্ডীর কাহিনী। ক্রৌষ্টিক মুনি একবার মার্কেণ্ডেয় ঋষিকে মন্বন্তরের কথা জিজ্ঞেস করেছেন। ব্রহ্মার একটা দিন আর একটি রাত নিয়ে হয় কল্প। মানুষের আয়ু একশ বছর, এই একশ বছর দেবতাদের একটা দিন। এই হিসাবে দেবতাদের একশ বছর মানে ব্রহ্মার একটা দিন, আর সেটাই ব্রহ্মার একটি রাত। ব্রহ্মার একটি দিন আর একটি রাতকে মিলিয়ে হয় কল্প। প্রত্যেকটি কল্পতে চৌদ্দজন করে মনু হন।

এই কল্পে প্রথম মনু ছিলেন স্বয়ম্ভু মনু, দ্বিতীয় মনুর নাম স্বারোচিষ। বর্তমান মনুর নাম বৈবস্বত, ইনি সূর্যের পুত্র। এর পরের কল্পে যিনি রাজা হয়ে আসবেন তাঁর নাম সাবর্ণিক বা সাবর্ণি। চণ্ডী হল সাবর্ণিক মনুর কাহিনী। মার্কেণ্ডেয় পুরাণে মার্কেণ্ডেয় ঋষি বিভিন্ন মনুর কাহিনী বলে যাচ্ছেন। বলতে বলতে একটা জায়গায় এসে ক্রৌষ্টক মুনি মার্কেণ্ডেয় ঋষিকে জিজ্ঞেস করছেন বর্তমান মনুর পর যিনি মনু হবেন তিনি কীভাবে মনু পদে নির্বাচিত হবেন? যাঁরা মনু হন তাঁরা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। ব্রহ্মা হলেন সবার উপরে, ব্রহ্মার পরেই হলেন মনু। মনু মানে কল্পের যিনি রাজা। মনু হওয়ার জন্য মনুষ্য জন্মে প্রচুর যজ্ঞ-যাগ করা চাই, প্রচুর তপস্যা ও পূণ্যকর্ম করা চাই। নিষ্কাম ভাবে তপস্যা করে করে একটা স্তর পেরিয়ে গেলে তো তাঁর মুক্তি হয়ে যাবে, তাহলে তো তিনি আর মনু হতে পারবেন না। সেইজন্য তাঁকে একটু বাসনা রাখতে হবে। এগুলো বেদান্ত, গীতা ও যোগশাস্ত্রের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। গীতাতে একই কথা বলছেন, পূর্ণ নিষ্কাম ভাবে তপস্যা করলে মুক্তি, একটু বাসনাও যদি থাকে তাহলে আবার তাকে জন্ম নিতে হবে। গীতায় বলছেন *কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্*, যখন কল্প শেষ হয়ে যায় তখন সমস্ত ভূতকে লীন করে দিই আবার কল্প যখন আরম্ভ হয় তখন আবার সবাইকে টেনে সৃষ্টিতে নামিয়ে আনি। এমন হতে পারে কেউ সাত আট মন্বন্তর আগে এমন তপস্যা করেছিল যার জন্য সে মনু হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। কিন্তু তার আগে মনু হওয়ার প্যানেলে আরও অনেকের নাম ওয়েটিং লিস্টে

আছে। সাবর্ণি যিনি মনু হতে যাচ্ছেন তাঁকেও অনেক দিন অপেক্ষার তালিকায় মনু হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। সাবর্ণি দ্বিতীয় মন্বন্তরেই তপস্যা করে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারও আগে আরও অনেকে মনু হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন বলে সাবর্ণিকে অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছে। তাই দ্বিতীয় মন্বন্তরে তপস্যা করে আট নম্বর মন্বন্তরে গিয়ে তাঁকে মনু হতে হচ্ছে। মনুর কাল শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাঁরা আরও উচ্চস্তরে চলে যান। এগুলো সব পৌরাণিক কথা কাহিনী, এর সব কিছুকে বেশী টানা হিঁচড়ে করতে নেই। আমাদের উদ্দেশ্য হল আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করা, সেই জ্ঞান অর্জনের জন্য যতটুকু দরকার সেটুকু নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব।

চণ্ডীর উপর আলোচনা শুরু করার আগে আমাদের দুচারটে কথা ভালো করে জেনে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। বিক্রীর দিক দিয়ে বিশ্ব সাহিত্যের বাজারে যে দশটি বইকে প্রচুর সম্মান দেওয়া হয় তার মধ্যে বাইবেল প্রথম স্থানে রয়েছে। দ্বিতীয় স্থান থেকে শুরু করে দশম স্থান পর্যন্ত যে কটি বইয়ের নাম দেওয়া আছে এই বইগুলোর নাম ভারতের বেশির ভাগ লোক কোন দিন শোনেওনি। ওর মধ্যে কিছু কিছু বই আছে যে বইগুলো আমাদের মানসিকতার সঙ্গেও মিলবে না। এর মধ্যে একটি বইয়ের নাম জর্জ অরওয়েলের লেখা এ্যনিমাল ফার্ম, কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করে লেখা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস যারা একটু আধটু পড়েন সন্দেহ হয় কেউ এই বইটির নাম শুনেছেন কিনা। এ্যনিমাল ফার্ম মোটামুটি ভারতে সব আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। এ্যনিমাল ফার্ম ছাড়া এ্যলিসিন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড একটা বই যেটা সত্যিকারের কাহিনী, বাচ্চারাও পড়তে পারে। এর বাইরেও আরও কয়েকটি খুব ভালো বই আছে যেগুলো অবশ্যই অনুবাদ করা হয়েছে, কিন্তু কেউ পড়েছে বলে সন্দেহ আছে। এগুলোকে নিয়ে যদি আরও গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তাতে আরও কয়েকটি খুব হতাশাজনক ছবি বেরিয়ে আসবে। ভারতের ইংরাজী জানা পাঠকরাই কিন্তু এই সব কটি বই পড়েন অথচ এই বইগুলির বাংলা বা হিন্দী অনুবাদ কেউ পড়ে না।

বাংলা হিন্দীতে সবাই কোনগুলো পড়ে? আমাদের এই চণ্ডীতে যে ধরণের কাহিনী চলছে, অর্থাৎ কথা ও কাহিনীতে যেখানে মানবিক আবেগগুলিকে খুব স্থূল ভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে। এইসব সাহিত্যে মানুষের মনের বিভিন্ন আবেগের যে প্রতিমূর্তি করা হয়েছে সেটাকে খুব স্থূল স্তরে চিত্রিত করা হয়েছে। বাংলার শরৎচন্দ্রের উপন্যাস, নায়িকার চোখ দিয়েও জল বেরিয়ে যাচ্ছে, নায়কের চোখ দিয়েও শুধু জল বেরিয়ে যাচ্ছে। এই ধরণের উপন্যাস পড়ে বলবে – আঃ হাঃ কী দারুণ! এর থেকে একটু উপরে গেলে ফেলুদার গল্প, তা নাহলে নন্টে ফন্টে। ওখান থেকে সোজাসুজি পরের ধাপ হল যারা শুধু গীতা উপনিষদ নিয়েই পড়ে থাকেন। যে সমাজে মানুষের একটা অংশ শুধু গীতা উপনিষদ পড়ছে আর তার ঠিক পরের ধাপে নন্টে ফন্টে পড়ছে, ফেলুদা পড়ছে তাহলে বুঝতে হবে সেই সমাজে মারাত্মক কিছু গোলমাল আছে। একদিকে আপনি ফেলুদাতে রমণ করছেন আর অন্য দিকে আপনি সোজা উপনিদষদ গীতাতে চলে যাচ্ছেন, এই জিনিষ কখন হতে পারে না। এই দুটোর মাঝখানে যে একটা স্তর আছে, যেখানে চিন্তন মননের অনুশীলনের দ্বারা বুদ্ধির বিকাশ হয়, যেটাকে বলে reading for pleasure, মনের গঠণ যে জিনিষে হয় সেই জিনিষের পুরোপুরি অভাব। সমগ্র ভারত উপমহাদেশে এই জিনিষটা নেই বললেই হয়।

আমরা সবাই জানি এবং সবাই বলছি ভারত এক মহান দেশ, কিন্তু ভারতের ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যা কিছু হতে পারে সবটাই আমাদের পূর্বজরা দিয়ে গেছেন, এতে কারুরই কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই আধ্যাত্মিকতাকে ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে গিয়ে প্রচুর গোলমেলে ছবি বেরিয়ে আসে। আমেরিকাতে যেখানে তুলনাত্মমূলক ধর্ম পাঠ্যক্রম আছে সেখানেও বলছে যে, ধর্মের ব্যাপারে এমন কোন জিনিষ নেই যেটা ভারতে পরীক্ষা-নিরিক্ষা করা হয়নি। এবার ধর্ম আর মোক্ষকে সরিয়ে দিলে থেকে যাবে অর্থ আর কাম। টাকা কীভাবে বানাতে হবে এর উপর একটি বই ভারতবর্ষে নেই। অর্থশাস্ত্রের যে কথা আমরা শুনে থাকি তাতে অর্থশাস্ত্রের কিছুই নেই, ওতে যা আছে তা হল রাজধর্ম। কামশাস্ত্রের উপর বাৎসায়নের একটি বই আছে কিন্তু সেই বইকেও আজ পর্যন্ত কেউ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। এরপর বিষয় অনুযায়ী যদি আসা যায়, ইতিহাস বলে কোন কিছু যে আছে ভারতে আগে কেউ জানতই না। ভূগোল – পুরাণে কিছু বিচিত্র ধারণা ছিল সপ্তদ্বীপ, জম্বুদ্বীপ, সপ্তসমুদ্র এগুলোকেই মানুষ পুষে রেখেছে। উত্তরে হিমালয় আছে, দক্ষিণে সমুদ্র আছে, পশ্চিমে

যারা আছে সবাই ম্লেচ্ছ, আর দক্ষিণে সব অসুররা আছে, এই বলে ভূগোলের কাহিনী শেষ হয়ে যাচ্ছে। অঙ্কের ক্ষেত্রে আর্যভট্ট, ভাস্করাদির মত কয়েকজন খুব বড় মহাত্মারা ছিলেন, এনারা হলেন ভারত মহাসমুদ্রে ছোট্ট ছোট্ট দ্বীপের মত। এনাদের বাইরে শুভঙ্করীর অঙ্ক, শতকিয়া, যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের মধ্যে গণিতের সব কিছু শেষ হয়ে যায়। এ্যালজেব্রা, জিওমেট্রি এগুলো ভারতে ছিল ঠিকই কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাহিত্যে আরও করুণ অবস্থা। দু-চারজন সংস্কৃতের পণ্ডিত কবি বা সাহিত্যিক ছিলেন, তার মধ্যে একজন নামকরা হলেন কালিদাস। কিন্তু কজন কালিদাসের রচনা ভারতে পড়ে? বেশির ভাগ লোকের কালিদাসের কাব্য বোঝার ক্ষমতাই নেই। দণ্ডি, বাণভট্ট এই রকম কয়েকজন সংস্কৃতের নামকরা সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁরা লিখেছেন ঠিকই, কিন্তু পণ্ডিতরা একটু আধটু পড়তেন, ওখানেই সব শেষ।

গত এক হাজারে একটি বইও ভারতীয় ভাষায় লেখা হয়নি, যে বই ভারতের আপামর জনসাধারণ থেকে শুরু করে জ্ঞানী গুণীরা এবং ভারতের বাইরেও পাঠক আগ্রহ নিয়ে পড়ছেন। এই ধরণের কথা বললে সংস্কৃতের পণ্ডিতরা তেড়েফুড়ে এসে বলতে শুরু করবেন আমাদের এই বই সেই বই আছে। আছে ঠিকই, কিন্তু পণ্ডিতরা ছাড়া এসব বইয়ের খবর আর কেউ জানে না। দর্শনের ক্ষেত্রে আরও করুণ অবস্থা। তার কারণ বেদ উপনিষদকে আধার করে যে ষড়দর্শন এসেছে, ষড়দর্শনের যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা তাঁরা স্বাধীন ভাবে মৌলিক চিন্তা করেছেন। কিন্তু তাঁদের অনুগামীদের পুরো শক্তিটা চলে যেত সম্পূর্ণ বেদ মুখস্ত করতে, তারপর পরম্পরাতে কি কি বিদ্যা এসেছে সেগুলো মুখস্ত করতে। যতক্ষণে সব মুখস্ত হত ততক্ষণে দেখতেন তাঁদের চল্লিশ বছর পেরিয়ে গেছে। এরপর যে মৌলিক চিন্তা করে দর্শনকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন সেই শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যেত। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে শুধু শব্দ নিয়ে খেলা করা হয়েছে। এমনকি দর্শনেও শব্দ নিয়ে খেলা করা গেছে, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে তর্কাতর্কি বাগবিতণ্ডাতে পণ্ডিতরা এমন ভাবে মেতে থাকতেন যে তাঁদের কোন মৌলিক চিন্তা করার ইচ্ছেই জাগত না।

বিদেশে ফ্রান্স, বৃটেন, জার্মান যেখানেই যান, সেখানে যাঁরা ভদ্র সংস্কৃতি সম্পন্ন পরিবার ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের বাড়িতে একটা করে লাইব্রেরি থাকত। সেখানে ঘর ভর্তি বই, ওখানেই সাহেব চা, কফি যা খাওয়ার খেতেন। আমাদের এখানে এখনও সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী পরিবারে দেখা যায় তাঁদের ঘরে পাঁচ ছটি আলমারি শুধু বইয়ে ঠাসা। এই প্রজন্মের কারুর হয়ত বই পড়ার আগ্রহ নেই কিন্তু বাপ-ঠাকুর্দার আমলের বইগুলো সামলে রেখেছে। কিন্তু আমার বাড়িতে একটা লাইব্রেরি থাকবে এই ইচ্ছা ভারতে আগে কোথাও কারুর মধ্যে ছিল না। ফলে ভারতীয় সমাজের সমস্যা হয়ে গেছে, একদিকে ঋষিরা, তাঁরা সত্যিকারের জ্ঞানী ছিলেন, ঋষিদের ছেড়ে দিলে সোজা নেমে আসছে একেবারে গেঁয়ো সমাজে। হয় একদিকে ঋষিরা আছেন আর অন্যদিকে একেবারে গেঁয়োরা আছে, মাঝখানে কেউ নেই, একেবারে ফাঁকা। ভারতে বিগত দু হাজার বছরের যে ইতিহাস তাতে শুধু ছোটখাটো বিষয়ে এই ভাষ্য, তার বিরুদ্ধে সেই ভাষ্য, তার আবার উপভাষ্য, এছাড়া কিছু নেই। পাণ্ডিত্য দেখাচ্ছেন কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কিসে পাণ্ডিত্য দেখাচ্ছেন? শুধু শব্দবিন্যাস আর শব্দের খেলার উপর পাণ্ডিত্য। কিন্তু কোন একটা মৌলিক ভাবকে নিয়ে পাণ্ডিত্য করার কথা সেটা করা হয়নি। তার ফলে পুরো সমাজটা ফাঁপা। একদিকে উচ্চমার্গের ঋষিরা অন্যদিকে গেঁয়োরা, মাঝখানটা পুরো ফাঁপা।

ভারতে প্রথম স্বামীজীই দেশের লোকেদের মৌলিক চিন্তা ভাবনা করাতে শেখালেন। ধর্মের তত্ত্বগুলি যেমনটি আছে ঠিক তেমনটি থাকবে, কিন্তু এখানেও তিনি সবাইকে চিন্তা করার জন্য বাধ্য করছেন। তত্ত্ব যা আছে তাই থাকবে কিন্তু তোমাকে খাটতে হবে। স্বামীজী ভারতের নবনির্মাণের কথা বলতে গিয়ে অনেক রকম কথা বলছেন, সেখানে বলছেন তোমাদের ঠাকুর মৌলিক ছিলেন, তোমাদেরও সবাইকে মৌলিক হতে হবে। পড়াশোনা যদি না থাকে মৌলিক হবে কী করে! চিন্তার জগতে নিজেকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা যদি না থাকে মৌলিক হবে কী করে! পড়াশোনা আর চিন্তার অভাব ভারতে বরাবরই ছিল। ফলে বিদেশ থেকে ভারতের উপর যখনই আক্রমণ এসেছে, তা সে তলোয়ার নিয়েই হোক আর সংস্কৃতি নিয়েই হোক, আমরা সব সময় মার খেয়ে এসেছি। মূল কথা হল চিন্তার জগতে যতক্ষণ না বিচরণ করা হবে ততক্ষণ সে বড় হতে পারবে না। চিন্তার জগতে বিচরণ করতে হলে পড়াশোনা করতে হবে। সেই বইগুলোই পড়াশোনা করতে হবে যে বইতে চিন্তন করার মত সুযোগ আছে। একদিকে আমাদের ঋষিদের চিন্তা-ভাবনা আছে আর অন্য দিকে গেঁয়ো লোকদের চিন্তা-ভাবনা আছে। কিন্তু

মাঝখানে যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের একটা পথ আছে এই পথকে যদি না ধরা হয় তা হলে জেনে রাখবেন হয় সে ঋষি নয়তো গেঁয়ো।

আলবেরুনি তাঁর ভারতের উপরে ইতিহাসের বইতে লিখছেন, এখানকার লোকেরা মনে করে তাদের মত মহৎ কেউ নেই, তাদের ধর্মের মত উদার ধর্ম কোথাও নেই, তাদের ভাষা মহৎ। বলার পর বলছেন – অথচ সবটাই ফাঁপা। তিনি একটা একটা করে প্রমাণ দিয়ে দেখাচ্ছেন কেন তিনি ফাঁপা বলতে বাধ্য হচ্ছেন। আপনি মনে করছেন আপনি মহৎ, একটা গেঁয়ো আদিবাসিও মনে করে সে মহৎ। অন্যেরা আগে আপনাকে মহৎ বলছে কিনা দেখুন। কত সন্ন্যাসীই তো ঘরবাড়ি ছেড়ে নির্জনে গিয়ে তপস্যা করছেন। তিনি বলবেন আমি কোন কামিনী-কাঞ্চনে লিপ্ত নই আমি তাই মহৎ। তিনি হয়তো ইংরাজী জানেন না, তাতে কোন অসুবিধা নেই। এবার যদি তাঁকে বলা হয় আপনি কোন স্কুলে গিয়ে রোজ এক ঘণ্টা স্বামীজীর উপর, বেদান্তের উপর লেকচার দিন। তখন তিনি কী বলবেন? তাতো আমি পারবো না। তাহলে আপনি কি পারবেন? আপনি মনে করছেন কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী মহাত্মা, সকাল-বিকাল ঠাকুরের নাম নিচ্ছেন। অবশ্যই এই দিক দিয়ে আপনি মহৎ। কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না, কোথায় ভেতরে আপনার সব কিছু ফাঁপা হয়ে যাচ্ছে। কোন ভাবে প্রলোভনাদির মত কোন একটা ধাক্কা যদি আসে সব কিছু চুরমার হয়ে যাবে। আপনার ব্যক্তিত্বের আসল পরীক্ষা হয় সমাজে আপনার আশেপাশের কজন লোক আপনাকে মানছে। এখানে জনপ্রিয়তা যে অর্থে বলা হয় সেই অর্থে বলা হচ্ছে না। আপনার মৃত্যুর পরেও দশটা লোক যেন আপনাকে মনে রাখে। চিন্তন জগতে, সমাজে আপনার কী অবদান আছে? চিন্তন জগতে, সমাজে অবদান রাখার জন্য ব্যক্তিত্বের দরকার। ব্যক্তিত্ব সব সময়ই আসে কঠোর পরিশ্রম আর বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের মাধ্যমে। আপনি কত দূর পড়াশোনা করছেন, কোন ভাষায় পড়ছেন সেটা কোন ব্যাপার নয়, আপনার চিন্তার জগতে আপনি কত পরিশ্রম করছেন সেটাই আপনাকে ঠিক করে দেবে আপনি কতটা ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছেন। সাথে সাথে আপনার আশেপাশে যারা আছে তাদের সঙ্গে উচ্চ ইতিবাচক ভাবগুলিকে আলোচনা করে তাদেরও অনুপ্রাণিত করতে হবে।

ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে যেখানে বলছে great people discuss ideas, mediocre people discuss personality and ordinary people discuss events। যখন ঘটনা নিয়ে কেউ আলোচনা করছে সে একজন অত্যন্ত সাধারণ, মাঝারি ধরণের লোকেরা ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আলোচনা করে আর যখন কেউ ভাব নিয়ে আলোচনা করে সে একজন মহৎ। এগুলোকে নিয়ে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন রকম কথা বলবে। আপনি যখন ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আলোচনা করছেন তখন আপনি একজন মাঝারি ব্যক্তিত্বের লোক, কিন্তু তাঁরা যে ভাবের মূর্ত রূপ, সেই ভাবকে নিয়ে যখন আপনি আলোচনা করছেন তখন আপনি একজন মহৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কিন্তু কেউ যখন আলোচনা করছে ঠাকুর কামারপুকুরে কার দোকানে জিলিপি খেতেন, একবারে কটা জিলিপি খেতেন, তখন বুঝে নিন সে অত্যন্ত সাধারণ মাপের লোক। ঠাকুর সেই একই ব্যক্তি কিন্তু তাঁকে নিয়ে আলোচনা করার সময় আমরা তিনটে স্তরে চলে যাচ্ছি। এতে দোষের কিছু নেই। কামারপুকুর, জয়রামবাটীতে সব জায়গায় লেখা আছে ঠাকুর মা এই জায়গায় এই করেছিলেন ইত্যাদি, এগুলোরও যে একটা মাহাত্ম্য আছে এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এগুলোর প্রতি যাদের বেশি আগ্রহ, বুঝে নিন তারা অতি সাধারণ মনের অধিকারী। ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব নিয়ে যখন আলোচনা করছেন তখন আপনি সাধারণের থেকে উপরে উঠে এসেছেন, কিন্তু যখন ঠাকুর যে ভাবের মূর্ত রূপ ছিলেন, সেই ভাবকে নিয়ে যখন আলোচনা করতে শুরু করছেন তখন আপনি মহতের দিকে পা বাড়ালেন। কিন্তু আমরা পারি না। যে জিনিষটা আমরা পারছি না, তাই বলে সেই আদর্শকে তো তুলে ফেলে দিতে পারিনা। ঠাকুর বলছেন শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশে আছে, চিনিটুকু নিয়ে বালিটুকু ছেড়ে দিতে হয়। ঠাকুরও ঠিক এই জিনিষটাকেই বোঝাচ্ছেন, চিনি হল যেখানে আইডিয়াগুলো চলছে আর বালিটা হল বাকি সব কাহিনী। শাস্ত্রেই যদি চিনিতে বালিতে মিশে থাকে তাহলে শাস্ত্র যাঁরা রচনা করছেন তাঁদের কী অবস্থা! তাঁরা তো আরও বালিই ঢেলে যাচ্ছেন, তাঁরা চিনি আর কোথা থেকে নিয়ে আসবেন। এই শাস্ত্র যখন আমাদের কাছে পাঁচ হাজার বছর পর আসছে তখন চিনির দানা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাচ্চা বয়সে টারজান, অরণ্যদেব পড়তে খুব ভালো লাগে, এর ফলে বাচ্চাদের জোশের মাত্রাটা অনেক উপরে চলে যায়, তাকে

আর সামলান যায় না। বাড়িতেই সবাইকে হিরোদের কায়দা দেখাতে শুরু করে দেয়। আমরা এখন যে বয়সে এসে গেছি এখানে আমাদের শরীর মনের জোশের মান নীচের দিকে। বয়স হয়ে গেলে মানুষকে চারিদিক থেকে নিরাশা ঘিরে ফেলে।

ক্যাসানোভা নামে একজন বিরাট পণ্ডিত লোক চার্চে প্রিস্ট হতে গিয়েছিল। প্রিস্ট হতে যাওয়ার আগে ইতালীতে প্রচুর মেয়েকে সে ফাঁসিয়ে বেরিয়েছিল। শেষে তাকে ওখান থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল। ক্যাসানোভার একটা আত্মজীবনী আছে, এটি এত অত্যন্ত উচ্চমানের সাহিত্য যে কল্পনাই করা যায় না। আত্মজীবনীর একটা জায়গায় তিনি লিখছেন, জীবনের প্রত্যেকটি জিনিষই একটা বইয়ের মত, মানুষ যত বইই পড়ে নিক তাও একটা নতুন বই দেখলে উল্টেপাল্টে দেখতে চায় বইটিতে কী আছে। জীবনে আমরাও এত লোকের সঙ্গে মিশেছি কিন্তু তাও নতুন কোন ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলে নেড়েচেড়ে দেখতে চাই। কিন্তু যখন বার্ধক্য এসে যায় তখন বলবে ওর সবটাই আমার জানা আছে, আর তখনই হতাশা এসে গ্রাস করে নেয়। যতক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখার ইচ্ছে থাকবে, আমাকে সব কিছু দেখতে হবে ততক্ষণ কিন্তু হতাশা আসবে না। বুড়োরা বইও পড়তে চায় না। রামায়ণ, ভাগবত কিছু একটা ধরে নিয়ে ওর মধ্যেই ঘুরপাক করতে থাকবে। ওতেই মনে করছে যে আমার সবই দেখা হয়ে গেছে, সব জানা হয়ে, নতুন করে আর কিছু জানার নেই। এই ধরণের মনোভাবই আমাদের নৈরাশ্যের দিকে নিয়ে যায়। অন্য দিকে বেঁচে থাকার ইচ্ছা প্রবল। তখন চণ্ডীর মত গ্রন্থ খুব কাজে দেয়।

শ্রীশ্রীচণ্ডী পুরো আধ্যাত্মিক শক্তিতে ভরপুর হয়ে আছে। চণ্ডী পাঠ করলে মায়ের যে আধ্যাত্মিক শক্তি যখন ভেতরে গিয়ে নাড়া দেয় তখন আমাদের ভেতরের সুপ্ত শক্তির জাগরণ হতে শুরু করে। চিতি শক্তির জাগরণ হলে তবেই চিন্তন শক্তি আসবে। সেদিক থেকে চণ্ডীর এত মাহাত্ম্য যে আমরা চিন্তাই করতে পারবো না। কিন্তু এর মধ্যে কথা ও কাহিনী আছে, তারও দরকার আছে, কারণ এই কাহিনীগুলোই আমাদের শক্তিটা সরবারহ করবে। ঐ শক্তি ভেতরে জাগ্রত হলে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পারব। কিন্তু কাহিনী শুধু পাঠ করলেই হবে না, কাহিনীর আড়ালে যে সারমর্মটা লুকিয়ে আছে চিন্তাশক্তি দিয়ে সেটাকে বার করে বুঝতে হবে। শুধু কাহিনীকে নিয়ে পড়ে থাকলেও গোলমাল হবে আবার কাহিনীকে বাদ দিয়ে বেরিয়ে গেলে তাতেও গোলমাল হয়ে যাবে। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী একবার তাঁর এক শিষ্যকে জিজ্ঞেস করছেন 'তুমি রোজ চণ্ডী পাঠ কর'? শিষ্য মহারাজকে বলছেন 'হ্যাঁ করি! তবে চণ্ডীর দেবীর স্তুতি গুলিই পাঠ করি'। 'শুধু কেন স্তুতি পাঠ কর? পুরোটা কেন করো না'? 'না মহারাজ! বাকিটা তো শুধু মারামারি কাটাকাটি, ওগুলো পড়তে ভালো লাগে না'। তখন রাজা মহারাজ বলছেন 'সে কী বলছ! রোজ পারায়ণ করে পুরোটাই করবে'। তারপর থেকে উনি পুরোটাই করতেন। চণ্ডীতে যা কিছু ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে তাতে জাগতিক কোন কিছু নেই, সবটারই পেছনে একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার আছে।

সন্ন্যাসীরা সংসারের সঙ্গে জড়িয়ে নেই বলে তাঁদের কোন পিছু টান নেই। পিছু টান নেই বলে সন্ন্যসীদের শক্তি পুরোটাই মজুত থাকে। কিন্তু গৃহস্থদের সবাই আছে, বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, তাই পিছু টান গৃহস্থদের টেনে রেখেছে। গৃহস্থের সবটাই সমস্যা। পকেটে একশ টাকা নিয়ে বাজারে যাচ্ছে, গিয়ে দেখছে বাজারে সব কিছুর দাম আগুন, যেটুকু কিনবে বলে এসেছিল তার পুরোটাও এই টাকায় কেনা যাচ্ছে না, এরপর মেজাজ কারুর আর ঠিক থাকে! তারপর, এর অসুখ, ওর বিয়ে, এর অন্নপ্রাশন, কারেন্ট নেই, ফ্রীজ খারাপ, ট্রেন টাইমে আসছে না, বাস তুলে নিয়েছে, কত রকমের সমস্যা, সমস্যার আর অন্ত নেই। এই সমস্যা মাথায় নিয়ে মানুষ ঈশ্বর-চিন্তন কী করে করবে! তখন তাদের দরকার শক্তি। চণ্ডী পাঠ করলে কী হয়, জগতের সামনে যে আপনাকে দাঁড়াতে হচ্ছে, দাঁড়াতে গেলে যে শক্তির দরকার, সেই শক্তিটা জাগ্রত হয়ে যায়। চণ্ডী পাঠ করলে পুরোটাই করতে হয়। চণ্ডীতে যে কটি মন্ত্র আছে তাতে শক্তি একেবারে ঠেসে ভরা আছে। এর সাথে প্রত্যেকটি মন্ত্রের অর্থটা মাথায় রেখে একটু চিন্তন করছেন, এরপর আপনার মানসিক শক্তি, শারীরিক বল সবটাই অন্য এক মাত্রায় চলে যাবে। আমরা এখন চণ্ডীর আধ্যাত্মিক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি।

ক্রৌষ্টিক মুনি মার্কণ্ডেয় ঋষিকে যে প্রশ্ন করেছিলেন মার্কণ্ডেয় মুনির সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শ্রীশ্রীচণ্ডী শুরু হয়। অনেক কিছু পর পর বলার পর তিনি বলছেন –

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ

(মেধা ঋষি কর্তৃক রাজা সুরথ ও সমাধিকে দেবী ভগবতীর
মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে মধুকৈটভ বধ সংবাদ)

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ওঁ ক্লীং মার্কণ্ডেয় উবাচ।।১

সাবর্ণিঃ সূর্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ।
নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদ্ গদতো মম।।২

মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ।
স বভূব মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনয়ো রবেঃ।।৩

যদিও এখন বৈবস্বত মনু অর্থাৎ সপ্তম মনু চলছে, অষ্টম মনুর কাল আসতে এখনো অনেক বাকি। কিন্তু মার্কণ্ডেয় ঋষি বলছেন আমি সেই অষ্টম মুনির কাহিনী বিস্তারে তোমাকে বলতে যাচ্ছি। সপ্তম মনু বৈবস্বত ছিলেন সূর্যপুত্র আবার অষ্টম মনু যিনি হবেন তিনিও সূর্যপুত্র। এসবের পেছনে আবার বিরাট পৌরাণিক কাহিনী আছে, সূর্য বিশ্বকর্মার এক কন্যা সন্ধ্যাকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যা আবার সূর্যের প্রচণ্ড তেজ থাকাতে নিজের স্বামীর দিকে তাকাতে চাইতো না। এই কারণে সূর্য সন্ধ্যার উপর খুব রেগে আছে। স্বামীর রাগ থেকে বাঁচার জন্য সন্ধ্যা আরেকটি মেয়েকে কায়দা করে সূর্যের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। এরপর খুব জটিল কাহিনী। শেষে বিশ্বকর্মা যখন জানতে পারলো আমার মেয়ের এই দুরবস্থা হয়েছে তখন সূর্যকে গিয়ে বললেন ‘এভাবে তুমি আমার মেয়েকে পেতে পারবে না, আমার মেয়েকে পেতে হলে তোমার তেজ কমাতে হবে’। তেজ কীভাবে কমানো যাবে? তখন ছুতারের র‍্যাঁদা দিয়ে সূর্যের দাড়ির উপর চালিয়ে দাড়ি ছেটে দেওয়া হল। এতে নাকি সূর্যের তেজ অনেক কমে গিয়েছিল। এরপর সন্ধ্যা সূর্যের সাথে শান্তিতে ছিলেন। যাই হোক এই সূর্যের পুত্র বৈবস্বত ছিলেন সপ্তম মন্বন্তরের রাজা। এবার অষ্টম মনু মহামায়ার কৃপাতে কীভাবে মনু হলেন তার কথা বিস্তার করে বলা হচ্ছে।

এখানে প্রথমেই মায়া শব্দ এসে গেছে। বারবার শাস্ত্র পড়তে পড়তে বোঝা যায় আমরা সবাই কোথায় যেন অজ্ঞান বা মায়ার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি। আমাদের মধ্যে মায়া কোথা থেকে আসে, কেন আসে, কীভাবে আসে, মায়া আসলে কী এগুলোকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। আচার্য শঙ্কর কোথাও মায়াকে অজ্ঞান বলছেন, কোথাও মায়াকে ঈশ্বরের প্রতীতি বলছেন আবার ঈশ্বরের শক্তি বলছেন। সেইজন্য বর্তমান কালে যে বেদান্ত প্রসিদ্ধ হয়েছে সেই বেদান্তে মায়াকে বলা হয় অনির্বচনীয়। অনির্বচনীয় মানে যাকে ব্যাখ্যা করে কিছু বলা যায় না। জিনিষটা আছে এই ব্যাপারে কারুরই সন্দেহ নেই, কিন্তু জিনিষটাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। যে জিনিষকে ব্যাখ্যা করা যায় না, তখন সেই জিনিষকে সবাই অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করে দিতে পারবে – মিথ্যা, মায়া, প্রকৃতি বা ঈশ্বরের শক্তি যেভাবে খুশী ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায়।

ঈশ্বরের ব্যাপারে বলা হয় তিনি নির্মল, ঈশ্বরের মধ্যে কোন রকম মল নেই। এতো খুবই সাধারণ ব্যাপার, যিনি সচ্চিদানন্দ তাঁর মধ্যে মল কোথা থেকে আসবে! আসার কোন প্রশ্নই নেই। ঈশ্বরের যে শক্তি সেই শক্তিকে মিথ্যা বলে কী করে উড়িয়ে দেওয়া যাবে! যিনি নির্মল তিনি দুষ্ট কি করে হবেন, তাঁর মধ্যে খলতা কি করে আসবে! সেইজন্য সাধকরা মায়াকে মিথ্যা, খল রূপে না নিয়ে মাতৃরূপে গ্রহণ করে। সাধকের কাছে মায়া বা প্রকৃতি ভগবানেরই শক্তি। মায়াকে পুরোপুরি শক্তি রূপে নিয়ে সাধনা করলে সেই সাধনা আবার তন্ত্রের দিকে চলে যায়। তন্ত্রের দিকে চলে গেলে তখন তন্ত্র ঘরানার সাধনাকে অবলম্বন করে চলতে হবে।

শ্রীশ্রীচণ্ডী পড়লে আমাদের অনেকেরই মনে হবে চণ্ডী যেন তন্ত্রেরই একটি অঙ্গ। চণ্ডীর প্রেক্ষাপট না জানা থাকলে সবার মধ্যে এই সংশয় আসতে বাধ্য। কারণ তন্ত্রশাস্ত্র ঠিক এভাবেই চলে। কিন্তু আসল ব্যাপার শ্রীশ্রীচণ্ডী হল পুরাণ। এখানেই বোঝা যায় পুরাণ, তন্ত্র, যোগ উপনিষদে কোন তফাৎ নেই, সব এক। সবাই সেই মায়ার

কথা বলছে, নাহলে প্রকৃতির কথা বলছে আর তা না বললে শক্তির কথা বলবে। সবটাই এক। যে যাই বলুক, কিন্তু বলার পর সেখান থেকে সাধক কীভাবে সাধনা করে মুক্তির পথে এগিয়ে যাবে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পাবে, তার ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন। ঠাকুর বলছেন যার পেটে যা সয় মা সেইভাবে রান্না করে দেন। কারুর জন্য মাছের ঝোল, কারুর জন্য মাছের ঝাল, কারুর জন্য মাছ ভাজা বা মাছের অম্বল করে দিচ্ছেন। মানুষের রুচি আলাদা, মনের ক্ষমতা আলাদা, ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও মানসিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে সাধকও সেইভাবে সব কিছু বিচার করে। তবে এইসব পুরাণাদিতে যুক্তি নির্ভরতাকে খুঁজতে গেলে কিন্তু অনেক গোলমাল লেগে যাবে।

এখানে বলছেন *মহামায়নুভাবেন*, মহামায়ার কৃপায় সাবর্ণি অষ্টম মনু হলেন বলা হচ্ছে। কিন্তু আসলে কার কৃপায় তিনি অষ্টম মনু হবেন? স্বামীজী বলছেন যখন কোন ঘটনা ঘটে তখন সেই ঘটনার ব্যাখ্যা সব সময় ওই বস্তুর মধ্যেই খুঁজতে হয়। ওই বস্তুর মধ্যে যদি আমি ব্যাখ্যা পেয়ে যাই, তখন ওই ব্যাখ্যাটাই সঠিক ব্যাখ্যা হবে। কিন্তু বস্তুর বাইরে থেকে যদি ব্যাখ্যা আনতে হয় তাহলে ব্যাখ্যাতে কিছু গোলমাল আছে ভাবতে হবে। স্বামীজী উদাহরণ দিয়ে বলছেন, যেমন গাছ থেকে আপেল পড়ল। এবার আপেলের মধ্যেই যদি গাছ থেকে আপেল পড়ার ব্যাখ্যা খুঁজি তাহলে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বেরিয়ে আসবে। আর যদি ভাবা হয় দৈত্যরা আপেলকে টেনে নীচের দিকে নিয়ে চলে যায়। স্বাভাবিক ভাবেই মনে হবে ব্যাখ্যার মধ্যে অনেক গোলমেলে ব্যাপার আছে। মহাকাশে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র যে পরস্পরকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করে চলেছে এর ব্যাখ্যাকে যদি মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয় তাহলে সব কিছুর ব্যাখ্যা সূর্য চন্দ্রের মধ্যেই চলে যাচ্ছে। কিন্তু যখন বলা হয় অসুর, দৈত্যগুলো ঘোড়ার পিঠে বসে দৌড়াচ্ছে আর সব গ্রহ নক্ষত্রকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তখন ব্যাখ্যাটা বাইরে থেকে এসে গেল। বাইরে থেকে যে ব্যাখ্যা করা হয় তা সব সময় অযৌক্তিক হবে। আধ্যাত্মিক জগতে বস্তুর ভেতরেই সমাধান করার ব্যাপারটা একমাত্র পাওয়া যাবে উপনিষদে আর যোগশাস্ত্রে। এই দুজন ছাড়া আর যারা আছে সবাই ব্যাখ্যা বাইরে থেকে নিয়ে আসে। এর মধ্যে সব থেকে নামকরা ব্যাখ্যা হল সব কিছুতে ঠাকুরের ইচ্ছা বলে চালিয়ে দেওয়া। সাধনা করছেন আপনি, খাটছেন আপনি, ঘাম ঝরাচ্ছেন আপনি আর বলছে ঠাকুরের কৃপা, ভগবানের ইচ্ছা। স্বামীজীর নিয়ম যদি মানতে হয় তাহলে ব্যাখ্যাটা ভেতরে খুঁজতে হবে। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা যখন বলা হচ্ছে তখন ভগবানকে তো বাইরে নিয়ে আসা হল। যদি বলেন অন্তর্যামী রূপে তিনি করাচ্ছেন তাহলে ঠিক আছে। বাড়ীতে অশান্তি হলে বউরা বলবে যত অশান্তি সব শাশুড়ি ননদের জন্য। শাশুড়ি ননদ যদি অশান্তির কারণ হয় তখন বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে, কারণ বাইরের ব্যাখ্যা এসে গেছে, অশান্তির কারণটা সে বাইরে খুঁজছে। যদি বলে অশান্তিটা আপনার ভেতরে তাহলে ব্যাখ্যাটা ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে বেশীর ভাগ ভক্তরাই কারণটা বাইরে খোঁজে। আমার হাঁচি কেন হল? মায়ের ইচ্ছায় আমি হাঁচি দিলাম। কিছু একটা ভালো হল, সেখানেও বলবে মায়ের ইচ্ছা, খারাপ হলেও বলবে মায়ের ইচ্ছা। এটাই ভক্তের লক্ষণ। ভক্ত মনে করে এইভাবে তার অহঙ্কারের নাশ হচ্ছে। কিন্তু জানে না এইভাবে করতে গিয়ে অন্য দিকে তার অহঙ্কারটাও বেড়ে যায়।

ভক্তিশাস্ত্রে এই 'আমি'কে মুছে ফেলার কথা বলা হয়। শ্রীরাধা যখন সব গোপীদের মাঝখানে শ্রীকৃষ্ণকেই আলিঙ্গন চুম্বন করছেন তখন তাঁর কোন লজ্জাই নেই, কারণ সবাইকে তিনি শ্রীকৃষ্ণ দেখছেন। শ্রীরাধার আমিটাই মুছে গেছে। কবির দাসের ভজনে আছে 'যব ম্যায় থা তব হরি নহি। যব হরি থা তব ম্যায় নহি'। আমি যখন ছিল তখন হরি ছিলেন না, এখন হরি আছেন আমি আর নেই। তারপর বলছেন 'প্রেমগলি অতি সঁকড়ি যাঁহে দো ন সমাহি'। প্রেমের গলি এতই সঙ্কীর্ণ যেখানে দুই অর্থাৎ আমি আর ভগবান একসাথে ঠাঁই পায় না। সবাই বলছে 'আমি'কে নাশ কর, কিন্তু 'আমি'কে নাশ করা হয় না, 'আমি' নাশ হয়ে যায়। কিন্তু ভক্তদের কাছে কোন উপায় নেই, ভক্ত কখন বলতে পারে না যে আমি এটা করেছি।

এখানে বলছেন *মহামায়ানুভাবেন*, মহামায়ার কৃপায় সাবর্ণি অষ্টম মনু হলেন। কিন্তু কারা কারা চৌদ্দজন মনু হবেন আগে থেকেই ঠিক করা আছে। এখন কেউ যদি অনেক তপস্যা করে মনুর পর্যায়ে চলে যান তাহলে তাঁকে অনেক কল্প ও মন্বন্তর পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হবে। কারণ চৌদ্দজন আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছেন, এক এক জন মনু কতদিন রাজত্ব করবেন, সেই মেয়াদও ঠিক হয়ে আছে। সেইজন্য মুক্তির পথ দেখাই ভালো, তা নাহলে কত কল্প, কত মন্বন্তর অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে কোন ঠিক নেই।

স্বারোচিষেহন্তরে পূর্বং চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ।
সুরথো নাম রাজাহভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে।।৪

তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্।
বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তদা।।৫

তস্য তৈরভবদ্ যুদ্ধমতিপ্রবলদণ্ডিনঃ।
নুন্যৈরপি স তৈর্যুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিভির্জিতঃ।।৬

ততঃ স্বপুরমায়াতো নিজদেশাধিপোহভবৎ।
আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈ স্তদা প্রবলারিভিঃ।।৭

অমাত্যৈর্বলিভির্দুষ্টৈর্দুর্বলস্য দুরাত্মভিঃ।
কোষো বলঞ্চাপহৃতং তত্রাপি স্বপুরে ততঃ।।৮

ততো মৃগয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্যঃ স ভূপতিঃ।
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্।।৯

স তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষীদ্ দ্বিজবর্যস্য মেধসঃ।
প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্।।১০

তস্থৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সৎকৃতঃ।
ইতশ্চেতশ্চ বিচরংস্তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে।।১১

সোহচিন্তয়ত্তদা তত্র মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ।
মৎপূর্বৈঃ পালিতং পূর্বং ময়া হীনং পুরং হি তৎ।।১২
মদ্ভৃত্যৈস্তৈরসদ্বৃত্তৈর্ধর্মতঃ পাল্যতে ন বা।
ন জানে স প্রধানো মে শূরহস্তী সদামদঃ।।১৩
মম বৈরিবশং যাতঃ কান্ ভোগানুপলপ্স্যতে।
যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদ-ধন-ভোজনৈঃ।।১৪
অনুবৃত্তিং ধ্রুবং তেহদ্য কুর্বন্ত্যন্যমহীভৃতাম্।
অসম্যগ্ব্যয়শীলৈস্তৈঃ কুর্বদ্ভিঃ সততং ব্যয়ম্।।১৫
সঞ্চিতঃ সোহতিদুঃখেন ক্ষয়ং কোষো গমিষ্যতি।
এতচ্চান্যচ্চ সততং চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ।।১৬
তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ।
স পৃষ্টস্তেন কস্ত্বম্ভো হেতুশ্চাগমনেহত্র কঃ।।১৭
সশোক ইব কস্মাত্ত্বং দুর্মনা ইব লক্ষ্যসে।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্।।১৮
প্রত্যুবাচ স তং বৈশ্যঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপম্।।১৯

এখানে চণ্ডীর প্রেক্ষাপটের কাহিনীকে নিয়ে আসা হয়েছে। স্বারোচিষ ছিলেন দ্বিতীয় মনু, তাঁর মন্বন্তরে পৃথিবীতে সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন। সুরথের কাহিনী সংক্ষেপে হল, তিনি প্রজাবৎসল রূপে রাজার ভূমিকা সফলতার সঙ্গে পালন করছিলেন। কোন এক সময় কোলাবিধ্বংসিরা সুরথের রাজ্যকে আক্রমণ করেছে। কোলাবিধ্বংসি দক্ষিণ ভারতের কোন এক জাতির রাজাদের কথা বলা হচ্ছে। পুরাণ রচনা করার সময় কিছু কিছু বাস্তবিক জিনিষ নিতে হয়, ওই বাস্তব জিনিষের উপর আখ্যায়িকা গুলোকে সাজিয়ে দেওয়া হয়। যাই হোক এই কোলাবিধ্বংসিরা সুরথকে পরাজিত করে তাঁর হাতি ঘোড়া সমস্ত কিছু কেড়ে নিয়েছে। সুরথ পরাজিত হয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে এসে দেখছেন সেখানে তাঁর মন্ত্রী, অমাত্য, আমলা, সেনাপতি সবাই সুরথের বিরুদ্ধে চলে গিয়ে

রাজ্যের কোষাগার থেকে শুরু করে সব কিছু দখল করে নিয়েছে। রাজা তখন খুব মনের দুঃখে মৃগয়া করার অজুহাতে নিজের প্রিয় ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে জঙ্গলে চলে গেলেন। জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে বনের ভেতরে এক মুনির আশ্রম দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। মুনির শিষ্যদের দ্বারা সৎকৃতাদির পর রাজা জঙ্গলের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর চোখের জল ফেলতে ফেলতে মনে মনে নিজের রাজ্যের কথা চিন্তা করছেন। ভাবছেন আমার যে প্রিয় হাতি ছিল সে আমাকে কত ভালোবাসত, এখন তাকে কে খেতে দিচ্ছে, কে আদর যত্ন করছে কে জানে! সুরথ এইভাবে ছোট ছোট কথা, ঘটনা চিন্তা করে চোখের জল ফেলছেন। রাজা এইভাবে চিন্তা করে ঘুরতে ঘুরতে সেখানে তাঁরই মত আরেকজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে, যার চোখে মুখেও শোকের ছায়া। স্বাভাবিক ভাবেই রাজা লোকটির পরিচয় জানতে চেয়েছেন। তোমার চোখে মুখে কেমন যেন বিমর্ষ ভাব, তুমি কোথা থেকে এসেছ, কেন এসেছ ইত্যাদি প্রশ্ন করার পর লোকটি তাঁর নিজের পরিচয় দিচ্ছেন।

বৈশ্য উবাচ।।২০
সমাধির্নাম বৈশ্যোহহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে।।২১
পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ।
বিহীনশ্চ ধনৈর্দারৈঃ পুত্রৈরাদায় মে ধনম্।।২২
বনমভ্যাগত দুঃখী নিরস্তশ্চাপ্তবন্ধুভিঃ।
সোহহং ন বেদ্মি পুত্রাণাং কুশলাকুশলাত্মিকাম্।।২৩
প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ দারানাঞ্চত্র সংস্থিতঃ।
কিন্নু তেষাং গৃহে ক্ষেমমক্ষেমং কিন্নু সাম্প্রতম্।।২৪
কথন্তে কিন্নু সদ্‌বৃত্তা দুর্বৃত্তাঃ কিন্নু মে সুতাঃ।।২৫

লোকটি নিজের পরিচয় দিয়ে বলছেন 'আমার নাম সমাধি, বৈশ্যদের ধনীকুলে আমার জন্ম'। একজন রাজা আর আরেকজন বৈশ্য, দুজনেই দুখী। রাজা শত্রুদের কাছে পরাজিত হওয়ার পর সব কিছু হারিয়েছেন আর বৈশ্য বলছেন আমার স্ত্রী আর পুত্র মিলে আমার সব ধন সম্পদ কেড়ে আমাকে মারধোর করে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে। এখানে আমরা দ্বিতীয় মনুর কাহিনী বলছি আর এখন চলছে সপ্তম মনুর রাজত্ব। চিন্তা করা যায় কত কোটি কোটি বছর আগে শাস্ত্রেই বর্ণনা করছে মেয়েরা কত নির্দয় আর লোভী হতে পারে। সমাধির বউ আর ছেলে মিলে অর্থাৎ স্ত্রী নিজের ছেলের সাথে একজোট হয়ে স্বামীর সব টাকা-পয়সা, সম্পদ কেড়ে মেরে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে। সমাধির বয়স হয়ে গেছে, আয় করার ক্ষমতা চলে গেছে। শাস্ত্র বর্ণনা করছে বুড়ো বয়সে লোকগুলোর কি দুরবস্থা হয়! স্ত্রীরা ক্ষমতা পেলে স্বামীকে যে মেরে তাড়িয়ে দেয় এগুলো নতুন কিছু না, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই এই অবস্থা কায়েম হয়ে আছে। সমাধি দ্বিতীয় মনুর সময়কার, তখন থেকেই সমাজে এই অবস্থা চলছে। তবে এটাও সত্যি, স্ত্রীর হাতে মার না খেলে বৈরাগ্যও আসবে না, আর বৈরাগ্য না এলে মুক্তির ইচ্ছাও জাগবে না। সমাধির মনেও তাই বৈরাগ্য এসেছে। বৈরাগ্য এলে মানুষ প্রথমেই সন্ধান করে কোথায় সাধুরা থাকেন, যেখানে গেলে সংসারের জ্বালা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সমাধিও জঙ্গলে এসে মেধা ঋষির আশ্রমে পৌঁছে গেছেন। সেখানে সুরথের সঙ্গে দেখা হতেই সুরথ সমাধির পরিচয় জানতে চাওয়ার পর নিজের পরিচয় দিয়ে বলছেন। 'হে রাজন্! আমার লোভী স্ত্রীপুত্রাদিরা ধনলোভে আমাকে বিতাড়িত করেছে। যাদের আমি নিজের খুব বিশ্বস্ত নিকট আত্মীয় মনে করতাম তারা আমার সব ধনসম্পদ আত্মসাৎ করে আমাকেই পরিত্যাগ করে দিয়েছে। আমি এখন সব কিছুই হারিয়েছি, নির্ধন হয়ে দুঃখিত মনে আমি তাই বনে চলে এসেছি। কিন্তু এখানে এসেও যারা আমার সব কিছু কেড়ে আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, আমার মন সেই স্ত্রীপুত্রের উপরই পড়ে আছে, বাড়িতে তারা এখন সবাই কুশলে আছে, নাকি কষ্টে আছে, তারা সদাচারী আছে নাকি দুরাচারী হয়ে গেছে কিছুই জানতে পারছি না'। তখন রাজা সুরথ বলছেন –

রাজোবাচ।।২৬
যৈর্নিরস্তো ভবাঁল্লুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ।।২৭
তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসম্।।২৮

বৈশ্য উবাচ।।২৯

এবমেতদ্ যথা প্রাহ ভবানস্মদ্গতং বচঃ।।৩০

কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ।
যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈর্নিরাকৃতঃ।।৩১

পতিস্বজনহার্দঞ্চ হার্দি তেষ্বেব মে মনঃ।
কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে।।৩২

যৎ প্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু।
তেষাং কৃতে মে নিঃশ্বাসো দৌর্মনস্যঞ্চ জায়তে।।৩৩

করোমি কিং যন্ন মনস্তেষ্বপ্রীতিষু নিষ্ঠুরম্।।৩৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।।৩৫

ততস্তৌ সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ।।৩৬
সমাধির্নাম বৈশ্যোঽহসৌ স চ পার্থিবসত্তমঃ।

কৃত্বা তু তৌ যথান্যায়ং যথার্হং তেন সংবিদম্।।৩৭
উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতুর্বৈশ্যপার্থিবৌ।।৩৮

রাজোবাচ।।৩৯

ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ।।৪০
দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা।

মমত্বং গতরাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষ্বপি।।৪১
জানতোঽপি যথাজ্ঞস্য কিমেতন্মুনিসত্তম।

অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্রৈর্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথোজ্ঝিতঃ।।৪২
স্বজনেন চ সন্ত্যক্তস্তেষু হার্দী তথাপ্যতি।

এবমেষ তথাঽহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ।।৪৩
দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ।

তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহ জ্ঞানিনোরপি।।৪৪
মমাস্য চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা।।৪৫

রাজা সুরথ সমাধি বৈশ্যের কাছে জানতে চাইছেন, যারা ধনসম্পদের লোভে পড়ে তোমাকে ঘর ছাড়া করেছে তাদের জন্য তোমার মন এত স্নেহাসক্ত হয়ে উতলা হচ্ছে কেন? বৈশ্য তখন বলছেন ‘আপনি ঠিকই বলছেন। কিন্তু কি করব, আমার মন তো তাদের প্রতি নিষ্ঠুর হতে পারছে না। এই পিতৃস্নেহহীন, পতিপ্রেমশূন্য স্ত্রীপুত্রাদির প্রতিই আমার মন কেন যে এখনও অনুরক্ত হচ্ছে বুঝতে পারছি না, এখনও তাদের প্রতি আমি নির্দয় হতে পারছি না’।

এরপর মার্কণ্ডেয় ঋষি তাঁর শিষ্যকে বলছেন ‘তখন রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য দুজনে মিলে মেধা ঋষির কাছে গিয়ে যথাযোগ্য বিনীত প্রণাম নিবেদন করে কিছু প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। রাজা মুনিকে বলছেন ‘হে ভগবন্! আমার মন আমার বশীভূত নয় বলে কতকগুলো প্রশ্ন আমাকে সব সময় দুঃখ দিচ্ছে। যেমন, রাজ্য আমার হাত থেকে চলে গেছে জানা সত্ত্বেও রাজ্যের প্রতি ও তার সব কিছুর প্রতি আমি কেন এখনও মমতা বদ্ধ হয়ে আছি বুঝতে পারছি না। এখানে এই বৈশ্যও নিজের স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা বাড়ী থেকে বিতাড়িত তবুও এদের প্রতি বৈশ্য ভীষণ ভাবে আসক্ত হয়ে আছে। আমরা দুজনেই অত্যন্ত দুঃখিত’। রাজা বলছেন ‘যাদের মধ্যে আমি প্রত্যক্ষ দোষ দেখতে পাচ্ছি তাদের প্রতিও আমার আকর্ষণ কমে যায়নি। আমরা দুজনেই বুদ্ধিমান তথাপি আমাদের মনে কেন এই মোহ উৎপন্ন হচ্ছে’?

এটাই মানুষের চিরন্তন সমস্যা। যেদিন থেকে মানুষ জাতির সৃষ্টি হয়েছে তবে থেকে এই সমস্যা, যে তাকে মারে সে তাকে ভুলতে পারে না, তার প্রতি মমতাকে সে ছাড়তে পারে না। রাজা সুরথ মেধা ঋষির কাছে এটাই জানতে চাইছেন, এই রকম কেন হয়? আমরা কেন অবিবেকী পুরুষদের মত আচরণ করে যাচ্ছি? এইসব প্রশ্ন শোনার পর ঋষি খুব সংক্ষেপ সুন্দর করে বলছেন –

ঋষিরুবাচ।।৪৬

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে।।৪৭
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্।
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে।।৪৮

কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ।
জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্।।৪৯

যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ।
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্।।৫০

মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যৎ তথোভয়োঃ।
জ্ঞানেহপি সতি পশ্যৈতান পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু।।৫১

কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা।
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।।৫২

লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেত কিং ন পশ্যসি।
তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ।।৫৩

মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণা।
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।।৫৪

মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ।
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।।৫৫

বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।।৫৬

সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।।৫৭

সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী।।৫৮

এটাই আশ্চর্যের যে, মানুষের যা স্বভাব, পশুপাখি সবার মধ্যে এই একই স্বভাব দেখা যায়। আর মোহও সবারই মধ্যে আছে। যার জন্য দেখা যায় পশুপাখিরা যখন বাচ্চার জন্ম দেয় তখন তারা নিজেরা না খেয়েও মুখে করে দানা এনে বাচ্চার মুখে দেয়। বিষয় জ্ঞান সব জীবের মধ্যেই আছে, তবে প্রত্যেকের বিষয়বস্তু আলাদা আলাদা। দেখা যায় কিছু প্রাণী দিনে দেখতে পায়, কিছু প্রাণী রাত্রে দেখতে পায় আবার কিছু প্রাণী দিনে-রাতে উভয় সময়ই দেখতে পারে। এই ধরণের তফাৎ সব প্রাণীর মধ্যেই অল্প বিস্তর থাকবে। মানুষ যদিও নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান মনে করে কিন্তু মানুষও সাধারণ প্রাণীর মত আচরণ করে।

সংসারের স্থিতির জন্য মোহ, মায়া ও মমতার দরকার। মোহ, মায়া ও মমতা না থাকলে সংসার থাকবে না। এই যে পাখি তার নিজের ছানার জন্য ঠোঁটে করে খাবারের দানা নিয়ে এসে খাওয়াচ্ছে, পশুরা শাবকদের খাওয়াচ্ছে, মানুষ কত কষ্ট করে নিজের সন্তানদের পরিপালন করে বড় করছে আর বৃদ্ধ বাবা-মাকেও তাদের সন্তানরা দেখাশোনা করছে, এই যে ভাব এটাই সংসার। এই সংসারকে ঠাকুর বলছেন বিশালক্ষ্মীর দ। এই বিশালক্ষ্মীর দয়ের মধ্যে হাতি পড়লে তাকেও তলিয়ে দেবে সেখানে মানুষ তো কোন ছাড়। এই যে মহামায়া এই

মহামায়া ভগবান বিষ্ণুকেও যোগনিদ্রায় ঘুম পাড়িয়ে রাখেন। ভগবান সচ্চিদানন্দ, তিনি আবার কি করে ঘুমোবেন, কিন্তু তিনিও যেন ঘুমিয়ে পড়েন। ব্রহ্মার যখন একশ বছর আয়ু পূর্ণ হয় তখন ভগবানও যেন ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমিয়ে পড়েন মানে, তখন আর ভগবানের লীলা চলছে না। কিন্তু লীলা যে চলছে না সেটা আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের দৃষ্টিতে বলছি, কিন্তু কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় কি হচ্ছে আমরা কি করে বলব! কিন্তু আমাদের এখানে বোঝার জন্য বলা হয়, যখন সৃষ্টিকার্য চলছে না, তখন বলা হচ্ছে ভগবান যেন ঘুমিয়ে পড়লেন। ভগবানের নিজেরই যে যোগশক্তি আছে, সেই যোগশক্তিই তাঁকে যেন ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। এই মহামায়ার এত ক্ষমতা যে ভগবানকেই ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছেন আর সেখানে মানুষ তো অতি নগণ্য। এই মহামায়াই জগতকে মোহিত করে রেখেছেন। মহামায়ার প্রভাবেই চরাচর জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি যখন প্রসন্না হন তখন মানুষকে মুক্তিলাভের জন্য বরদান করেন, তিনিই সংসারের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। পরা ও অপরা বিদ্যা তিনিই দেন, এই মহামায়াই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি সকল দেবতাদের ঈশ্বরী।

রাজোবাচ।।৫৯
ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যা ভবান্।।৬০
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ।

যৎস্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা।।৬১
তৎ সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর।।৬২

এইসব কথা শুনে রাজা ও বৈশ্যের মনে মহামায়ার ব্যাপারে আরও জানার আগ্রহ জন্মেছে। এই যে দেবীর কথা বললেন, এই দেবী কে? তিনি কি রূপে আবির্ভূতা হন? তাঁর চরিত্র কি রকম, সেই দেবীর স্বরূপ, তিনি যেভাবে উৎপন্না হন, দেবীর সব কথা আপনার মত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষুরের মুখে আমরা বিস্তারিত শুনতে চাই।

ঋষিরুবাচ।।৬৩
নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।।৬৪
তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম।

দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।।৬৫
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে।

যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে।।৬৬
আস্তীর্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ।

তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ।।৬৭
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মণমুদ্যতৌ।

স নাভিকমলে বিষ্ণোঃ স্থিতো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ।।৬৮
দৃষ্ট্বা তাবসুরৌ চোগ্রৌ প্রসুপ্তঞ্চ জনার্দনম্।

তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ।।৬৯
বিবোধানার্থায় হরের্হরিনেত্রকৃতালয়াম্।

(ওঁ ঐঁ) বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্।।৭০
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ।।৭১

নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিঃ, আসলে তিনি নিত্যস্বরূপা। এখান থেকেই ঠিক ঠিক শক্তির দর্শন শুরু হয়ে যায়, তন্ত্রেরও এই একই দর্শন। তিনি নিত্য মানে, ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত এই তিনটে কালে তিনিই আছেন। *জগৎ মূর্তিঃ*, এই যে জগৎ দেখা যাচ্ছে, এই জগৎ সেই মহামায়ারই মুর্তি। জগৎ বলে আলাদা কিছু নেই, তিনিই আছেন। আমরা যেভাবে এই কলম আর গ্লাশকে আলাদা দেখছি, দুটো যেন আলাদা মুর্তি, ঠিক তেমনি ভগবান আর জগৎ এই দুটো আলাদা মুর্তি নয়। ভগবান হলেন সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দের তো কোন মুর্তি হবে না। ভগবানের যে মায়া বা প্রকৃতি যাই বলি না কেন, এই প্রকৃতি নিত্য। ভগবান যেমন নিত্য তেমনি তাঁর প্রকৃতিও

নিত্য। ভগবানের মায়াকে ধরা যায় না। কীভাবে ধরা যায়? এই জগৎ দিয়ে ধরা যায়। কার্য দিয়ে কারণকে বোঝা যায়। কোন ঘরে ঢুকে যদি দেখা যায় ঘরটা গরম, তাহলে বুঝতে হবে ঘরে কেউ আগুন জ্বালিয়েছিল। ঠিক তেমনি এই জগৎকে দেখে বোঝা যায় শক্তি আছে। ভগবান সচ্চিদানন্দ, তিনি নির্গুণ নিরাকার, তিনি এগুলোতে কখন থাকবেন না। তাহলে এই জগৎ কোথা থেকে এল? ভগবানের যে শক্তি সেই শক্তি থেকে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। ভগবান ছাড়া তো কিছু নেই। জগৎকে যে সৃষ্টি করবে কি দিয়ে আর কোথা থেকে সৃষ্টি করবে? যখন ইঞ্জিনিয়ার কোন বাড়ি তৈরী করে তখন ইঞ্জিনিয়ার আলাদা, ইট, বালি, সিমেন্ট আলাদা আর যেখানে বাড়ি তৈরী হয়েছে সেই জায়গা আলাদা আর বাড়িটা আলাদা। ভগবান, শক্তি, জগৎ, তার মাটি, আমাদের শরীর এগুলো কি ইঞ্জিনিয়ার আর ইট, বালি, সিমেন্টের মত আলাদা? কখনই না, কারণ ভগবান ছাড়া তো কিছু নেই। ভগবানই যদি একমাত্র থাকেন তাহলে জগৎ তৈরী হবে কী করে, কি জিনিষ দিয়েই বা তৈরীটা হবে? কোন জিনিষ দিয়েই তৈরী হয় না।

খ্রিশ্চানরা বলে মাটি থেকে জন্মে ছিল মাটিতেই মিশে গেল। ভগবান মাটি দিয়ে মানুষ তৈরী করেছেন। মাটি কোথা থেকে ভগবান পাচ্ছেন? এগুলোকেই বলে পপুলার রিলিজিয়ান। যখন কয়েকটি অশিক্ষিত, মুর্খকে ধর্মের কথা বলা হয় তখন এই কথাগুলোই বলা হয়। এই ধরণের চিন্তা ভাবনা আমাদের দর্শনে এসে গেলে সমস্যা হয়ে যাবে। কারণ ভগবান মাটি আনবেন কোথা থেকে! আমাদের কাছে ভগবান ছাড়া কিছু নেই। সেইজন্য বলছেন *তয়া সর্বমিদং ততম্*, তিনি নিজেই এই জগৎ হয়েছেন। জড় রূপকে তৈরী করে তিনি এই জড়ের মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন। তাই প্রথমেই বলে দিলেন *জগৎ মূর্তিঃ*, এই জগৎ তাঁরই মুর্তি। অদ্বৈত বেদান্তে যেমন বলা হয় সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই, যা কিছু তুমি দেখছ এগুলো শুধু নাম আর রূপ, নাম রূপটাই মিথ্যা। নাম আর রূপকে সরিয়ে দিলে দেখবে সেই শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই। ঠাকুর বারবার ব্রহ্ম আর শক্তির কথা বলছেন, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। লীলাই শক্তি, শক্তিই জগৎ, এই দুটো ছাড়া কিছু নেই। ব্রহ্ম আছেন আর তাঁর শক্তি আছে, ব্রহ্ম আর শক্তি তো অভেদ। কিন্তু যখন ব্রহ্মের শক্তি নিজেকে manifest করে তখন সেটাকেই জগৎ রূপে দেখায়। সংহারের পর জগৎ যখন সুপ্ত অবস্থায় চলে যাচ্ছে তখন তিনিই আবার নির্গুণ নিরাকার হয়ে যাচ্ছেন। তিনি যখন আবার চঞ্চল হয়ে যাচ্ছেন তখন সগুণ সাকার হয়ে যাচ্ছেন। তাহলে জগৎ আসছে কোথায়? কিছুই আসছে না। তাঁকেই এই জগৎ রূপে দেখাচ্ছে। কে দেখছেন? তিনিই দেখছেন, তিনি ছাড়া তো আর দেখার জন্য দ্বিতীয় কেউ নেই, কারণ তিনিই তো শুধু আছেন। কাকে দেখছেন? নিজেকেই দেখছেন। কিন্তু ব্যক্তি ভাব ঢুকিয়ে দিচ্ছে বলে মনে করছি আমি দেখছি, এটাই বোকাম।

বলছেন *তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম*, যদিও তিনিই সব কিছু হয়েছেন কিন্তু তাও শোনা যায় তিনি বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূতা হন। এই যে তিনি বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূতা হচ্ছেন, এটাই মায়া। তিনি ছাড়া তো কিছু নেই, তাও তিনি অবতার হয়ে আসেন, তাও দেখা যায় ভগবতী আবির্ভূতা হন। কেন তিনি আবির্ভূতা হন? *দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা*, দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্যই তিনি আবির্ভূতা হন। দেবতা আর অসুর দুজনই ভাই ভাই, একই পিতার সন্তান। তাঁদের মায়েরা আপন বোন আবার দুই বোনের স্বামীও এক। তবে দেবতারা শুভ চিন্তন করেন, তাঁদের মধ্যে সত্ত্বগুণ বেশী আর আপদে বিপদে তাঁরা ভগবানকে স্মরণ মনন করেন, কিন্তু অসুররা তা করে না। ঋষি বলছেন, যদিও তিনি নিত্যা, অজন্মা তথাপি তিনি দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য আবির্ভূতা হন।

এখানে বর্তমান কল্পের কাহিনী বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে, ভগবান যখন যোগনিদ্রায় শায়িত হয়ে আছেন তখন তাঁর কর্ণমল থেকে দুজন দৈত্যের জন্ম হয়ে গেল। ভগবানের কানে ময়লা কি করে হয় আমাদের জানা নেই, সেই সময় ময়লা কোথা থেকে আসবে কারণ তখন কারণ সলিল ছাড়া তো আর কিছু নেই। আর ভগবানের শরীরটা কি পার্থিব শরীর যে তাঁর কানে ময়লা হবে! পুরাণের কাহিনী নিয়ে তাই বেশী প্রশ্ন করতে নেই। কবি নিজের মত অনেক রকম কল্পনা করে রচনা করে দিচ্ছেন, তাই সব কিছু আক্ষরিক অর্থে নিতে নেই। এগুলোকে নিয়ে বেশী প্রশ্ন যেমন করতে নেই আর বেশী মাথা ঘামাতেও নেই। আসল ব্যাপার হল, সৃষ্টির প্রথমে দুজন বড় অসুরের চরিত্র নিয়ে আসতে হবে। এদিকে বলা হয়, সৃষ্টির আদিতে ভগবান ছাড়া কোথাও কেউ নেই। তাহলে অসুররা আসবে কোথা থেকে? অসুর না আনলে কাহিনীও এগোবে না। এক উপায়ে অসুরদের নিয়ে আসা যায়,

ভগবান ঘুমিয়ে আছেন, তিনি পাশ ফিরতে কান থেকে ময়লা বেরিয়ে এল আর সেখান থেকে দুজন বিরাট অসুরের উৎপন্ন হয়ে গেল, যাদের নাম মধু আর কৈটভ। এই মধু দৈত্যকে বধ করেছিলেন বলে ভগবানের নাম হয়ে গেল মধুসূদন। বাল্মীকিও বিষ্ণুর কথা বলতে গিয়ে মধুসূদন নামটা ব্যবহার করেছেন, যদিও বাল্মীকি রামায়ণের বিষ্ণু আর পুরাণের বিষ্ণু এক নয়। এখানে যে বিষ্ণুর কথা বলা হচ্ছে তিনি হলেন সর্বব্যাপী ভগবান।

ভগবান তো এখন ঘুমিয়ে আছেন, অসুর দুজন জন্ম নিতেই নানা রকমের অত্যাচার করতে শুরু করে দিয়েছে, সবার ক্ষমতা কেড়ে নিচ্ছে। কিন্তু ভগবান তো ঘুমিয়ে আছেন, সৃষ্টি কি করে হবে? যুক্তিতে অনেক ফাঁক থেকে যাচ্ছে, তাই এগুলোকে নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করতে নেই। যাই হোক, ব্রহ্মা আছেন, দেবতারা আছেন। মধু আর কৈটভেকে নিয়ে ব্রহ্মার এখন মহা জ্বালা। ব্রহ্মা দেখছেন ভগবান ঘুমিয়ে আছেন, ভগবানের ঘুম না ভাঙালে মহা অনর্থক শুরু হয়ে যাবে। ভগবানকে কে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন? মহামায়া। ভগবানের ঘুম কে ভাঙাবেন? মহামায়া। এখানেই একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা দেখা যায়। পুরাণধর্মী শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল, সাধারণতঃ কোন সঙ্কট হলে ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছে গিয়ে স্তুতি করেন, কিন্তু এখানে বিষ্ণুর স্তুতি না করে ব্রহ্মা মহামায়ার স্তুতি করছেন। পনেরোটি মন্ত্রে ব্রহ্মা মহামায়ার স্তুতি করছেন, এই কটি মন্ত্র অত্যন্ত শক্তিদায়ক মন্ত্র। এখানে মায়ের অব্যক্ত রূপের স্তুতি করা হয়েছে। এর পরে যে স্তুতি আসবে সেখানেও মায়েরই স্তুতি করা হয়েছে কিন্তু সেখানে মা সামনে প্রকটিত হয়ে আছেন। এখানে মা সামনে নেই, তিনি অব্যক্ত হয়ে আছেন।

ব্রহ্মোবাচ।।৭২
ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কারঃ স্বরাত্মিকা।।৭৩
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা।

যজ্ঞাদির সময় যে আহুতি দেওয়া হয় তখন বিভিন্ন রকমের স্বর উচ্চারিত হয়। ওঁ স্বাহা, ওঁ স্বধা, ওঁ বষট্ ইত্যাদি বিভিন্ন রকম স্বর উচ্চারণ করে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি স্বরের আলাদা আলাদা অর্থ আছে। যেমন দেবতাদের উদ্দেশ্য যখন কোন আহুতি দেওয়া হয় তখন ওঁ স্বাহা এই স্বর উচ্চারণ করে আহুতি দেওয়া হয়। পিতৃদের উদ্দেশ্যে ওঁ স্বধা মন্ত্রে আহুতি দেওয়া হয়। অন্য কিছু কিছু পিতৃদের ক্ষেত্রে ওঁ বষট্ এই স্বর উচ্চারিত করে আহুতি দেওয়া হয়। এরও আবার অনেক নিয়ম আছে, যখন অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয় তখন স্বাহা মন্ত্রে, জলে দেওয়ার সময় স্বধা বলে অর্পণ করা হয়। যে মন্ত্রোচ্চারণ করে আহুতি দেওয়া হয় সেই মন্ত্রের শেষে এই স্বরগুলো সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। আবার হন্তা নামে একটি স্বর আছে, মানুষের নামে যখন কিছু আহুতি দেওয়া হয় তখন হন্তা বলে দেওয়া হয়। এরপর বৌদ্ধ ও তন্ত্রের প্রভাবের সাথে ফট্ মন্ত্রও এসে যোগ হয়েছে। দেবীর অস্ত্র সমূহের যখন স্তুতি করা হয় তখন বলা হয় ওঁ অস্ত্রায় ফট্।

বেদের সময়ে যজ্ঞে একজন হোতা থাকতেন, তাঁর কাজ ছিল যজ্ঞ চলাকালীন ঋকবেদ থেকে পাঠ করা, ঋকবেদ হল স্তুতির জন্য। যজ্ঞে যিনি আহুতি দিচ্ছেন তাঁকে বলা হত অদ্বর্জু, তাঁর কাজ হল মন্ত্রোচ্চারণ করে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া। আর যিনি সামবেদ থেকে সামগান করতেন তাঁকে বলা হয় উদ্গাতা। হোতা যে মন্ত্রোচ্চারণ করে যাচ্ছেন আর যিনি আহুতি দিয়ে যাচ্ছেন তিনি বুঝবেন কী করে যে মন্ত্রোচ্চারণের কোন জায়গায় এসে আহুতিটা দেওয়া হবে! তাই স্বাহা, স্বধা এই স্বর লাগিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হত। ব্রহ্মা বলছেন 'এই যে স্বাহা, স্বধা, বষট্ যা কিছু আছে, মা! এগুলো সবই তুমি'।

সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা, ত্রিধা মাত্রা মানে 'অ' 'উ' আর 'ম'। মন্ত্রের প্রথমে যে ওঁ আর শেষে যে স্বাহা উচ্চারিত হচ্ছে, এই দুটো শব্দ দিয়েই বোঝা যায় যে যজ্ঞ করা হচ্ছে। পুরাণাদি রচনার সময় যজ্ঞের একটা বিশেষ দাম ছিল, যদিও বেদের কালের তুলনায় যজ্ঞের গুরুত্ব কিছুটা কমে গেছে কিন্তু এখনও যজ্ঞের মূল্য আছে। এই ওঁ, স্বাহা, স্বধা ইত্যাদি সবই মা নিজেই। গীতাতেও যেখানে *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্* বলছেন সেখানেও এই কথাই বলতে চাইছেন, যজ্ঞের সব কিছুই ভগবান নিজে। গীতার নবম অধ্যায়ে ভগবান বলছেন *মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং* ভূতম্, যজ্ঞ যখন হয় আর যজ্ঞের যে মন্ত্র, সেই মন্ত্রও ভগবান, যেটা আহুতি দেওয়া হচ্ছে সেটাও তিনি, যজ্ঞের যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হচ্ছে সেই অগ্নিও তিনি।

আগেকার দিনে যাঁরা যজ্ঞ করতেন তাঁরা দেখতেন আমি আলাদা, যজ্ঞ আলাদা, যজ্ঞের মন্ত্র আলাদা আর যজ্ঞের ফলটাও আলাদা। কিন্তু বেদান্তের ভাবধারার প্রভাব যেদিন থেকে বিস্তার হতে শুরু হয়ে গেছে সেদিন থেকে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া আর কর্মের ফলকেও আলাদা করে দেখাটা বন্ধ হতে শুরু হয়েছে। এখন কর্মফল হল মায়ের কৃপা। মায়ের কৃপা আর যে মন্ত্র দিয়ে সাধনা করা হচ্ছে এই দুটো আলাদা কিছু নয়। ওঁ যা ভগবানও তাই, আর যিনি সাধনা করছেন তিনিও তাই। কিন্তু ভক্তরা এভাবে নিতে চাইবে না। ভক্ত সব সময় ভগবান আর তার নিজের মাঝখানে একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতে চায়। কিন্তু দূরত্ব যতই বজায় রাখুক না কেন, মন্ত্র আর মন্ত্রের যিনি প্রতীক দুটো এক। যেমন ওঁ অগ্নেয় স্বাহা বলে আহুতি দেওয়া হচ্ছে, এখানে মন্ত্র, অগ্নি, আহুতি, আহুতি দেওয়া সবটাই এক।

অগ্নিকে স্বাহা উচ্চারণ করে আহুতি দিয়ে যজ্ঞ করা হয়, এই যে আহুতি দেওয়া হল এরজন্য তার একটা সিদ্ধি হতে হবে। স্বাহা হল মন্ত্রের পুর্তি অর্থাৎ শেষ। প্রথমে যে ওঁ উচ্চারিত হচ্ছে, এই ওম্ই শক্তি দেয়। উচ্চারিত সব শব্দই তিনটে জিনিষের মধ্যে বাঁধা, প্রথম হল ‘অ’ যেটা কণ্ঠের নীচের থেকে উচ্চারিত হচ্ছে, সেখান থেকে ‘উ’ শব্দটা জিহ্বার মধ্যে গড়িয়ে আসছে আর ‘ম’ ওষ্ঠের শেষ প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে আসছে। যে কোন ভাষার যে কোন শব্দ যখন মুখ দিয়ে বেরোবে তখন এভাবেই বেরোবে – কণ্ঠ থেকে শুরু করে ঠোঁট পর্যন্ত, এর বাইরে কোন ভাবেই যেতে পারবে না। ইদানিং কালে সংস্কৃতে এই ব্যাপারটাকে খুব বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। কণ্ঠ থেকে সব থেকে যে হাল্কা স্বর বেরোয় সেটা হল ‘অ’, এই ‘অ’ থেকে ‘আ’ ‘ই’ আসতে আসতে স্বর হাল্কা থেকে ক্রমশ ভারী হতে থাকে। এরপর ‘ক’, ‘চ’ একটু একটু করে উপরের দিকে এগিয়ে আসে, ‘ত’ ‘ট’ আরও উপরে এসে শেষে ‘প’ ঠোঁটে চলে আসছে। ‘প’এর সব থেকে জোর পড়ে ‘ম’য়ে। শুরু হচ্ছে ‘অ’ থেকে আর শেষ হয় ‘ম’তে। ‘উ’ মাঝখানে রোলিং করে। সেইজন বিশ্বে যত রকমের শব্দ আছে, ভবিষ্যতে যত রকমের শব্দ আসবে আর যত রকমের শব্দ হারিয়ে গেছে, সব শব্দই ওঁ এর মধ্যে বাঁধা। ওঁ এর মধ্যেই সব শব্দ বাঁধা হয়ে আছে। জগতে যা কিছু বস্তু আছে সব বস্তুরই একটা নাম আছে, নাম আর নামী অভেদ। বস্তু আর বস্তুর নাম অভেদ। সব নাম ওঁ এর মধ্যে বাঁধা, সেইজন্য পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ওঁ এর মধ্যে আবদ্ধ। ওঁ এর ‘অ’ ‘উ’ আর ‘ম’য়ের পরে যে মৌনতার মাঝে একটা নৈঃশব্দ নেমে আসছে ওটাকেই বলা হয় নির্গুণ নিরাকারের প্রতীক, প্রতীক মানে ইঙ্গিত করে। সেইজন্য ওঁ হল ভগবানের প্রতীক। এখানে বলছেন *ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা*, অর্থাৎ এই যে ‘অ’,’উ’ আর ‘ম’ মা এটা তুমিই। জগতের পবিত্রতম শব্দ এই ওঁ মা নিজে।

অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ।।৭৪
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবজননী পরা।
ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।।৭৫
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা।
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।।৭৬
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোহস্য জগন্ময়ে।

শুধু তাই না, *অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ,* ওঁকারের যে বিন্দু এটাই অর্ধমাত্রা, এই অর্ধমাত্রাও মা তুমি। তার মানে, আমাদের সম্পূর্ণ বর্ণমালার যা কিছু মা নিজেই সব হয়েছেন। মায়ের গলায় যে মুণ্ডমালা, এগুলো আসলে মুণ্ড নয়, সংস্কৃত ভাষার স্বরব্যঞ্জন বর্ণমালায় যে কটি অক্ষর আছে সেই কটি মুণ্ডের মালা মায়ের গলায় পড়িয়ে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে মায়ের থেকেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এসেছে। মুণ্ডগুলো হল বর্ণমালার প্রতীক। নাম আর নামী অভেদ, বস্তু আর বস্তুর নাম দুটো সব সময়ই এক। মা হলে বিশ্বপ্রসবিনী। সমস্ত বিশ্বকে আমরা কি দিয়ে দেখাব? দেখাবোর কোন পথ নেই। কিন্তু একটা সহজ উপায় হল বর্ণমালার বর্ণগুলো মালা করে গলায় পড়িয়ে দিন, তাহলেই নাম নামী থেকে শুরু করে সব কিছু এসে যাচ্ছে। এর থেকে আরও সংক্ষেপে করতে হলে ‘অ’, ‘উ’ আর ‘ম’ দিয়ে দিলেই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখানো হয়ে যাবে। ওঁ এর আরও তাৎপর্য হল, ওঁ এর ‘ম’য়ের পর যে নৈঃশব্দ আসছে সেটাই নির্গুণ ব্রহ্মকে ইঙ্গিত করে। তাই বর্ণমালাকে নিয়ে এলে বিশ্বপ্রসবিনীকেও দেখানো হয়ে যাবে।

সেইজন্য বেদের সময় বর্ণের শুদ্ধ উচ্চারণের উপর খুব জোর দেওয়া হত। বেদের সময়কার শুদ্ধ উচ্চারণের বিজ্ঞানকে বলা হয় শিক্ষা। শিক্ষাতে বেদের ছাত্রদের শুধু উচ্চারণ বিধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। হিন্দুদের শাস্ত্র, সংস্কৃতি আর তার ভাষা সংস্কৃত, এই তিনটেকে পাঁচ ছয় হাজার বছর যাবৎ এক ভাবে বেঁধে রেখে দেওয়া হয়েছে। দশ বছর আগে রচিত বাংলা সাহিত্যের ভাষা আর এখনকার বাংলা সাহিত্যের ভাষা এক দশকের মধ্যেই প্রচুর পাল্টে গেছে। বিশ্বের সমস্ত ভাষাই প্রত্যেক দিন পাল্টে যাচ্ছে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার সাহিত্য, সংস্কৃতি পাঁচ হাজার বছর আগে যা ছিল এখনও তাই আছে, শুধু লেখাতেই না, তার উচ্চারণ বিধিতেও কোন পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু বাংলা, হিন্দী ভাষার উচ্চারণ ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে পাল্টে যাচ্ছে, পাড়া থেকে পাড়ায় পাল্টে যাচ্ছে, জেলা থেকে জেলায় তো আরও বেশি পাল্টে যাচ্ছে। পূর্ববঙ্গের বাঙালীর বাংলা ভাষা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীরা তো বুঝতেই পারে না, অথচ সবাই রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের রচনাবলী পড়ছে। বেদের সময় থেকে সংস্কৃত ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণের উপর যে জোর দেওয়া হত, এখনও একই ভাবে জোর দেওয়া হয়।

যজ্ঞ ছাড়াও অন্য ভাবে যত রকম পূজা করা হয় সেই সন্ধ্যা তুমি, তুমিই সাবিত্রী তথা পরম জননী। তুমিই এই জগতকে সৃষ্টি কর, সৃষ্টি করে এই জগতকে তুমিই ধারণ করে আছ, তুমিই এই জগতের পালন কর। জগতের পালন একমাত্র মায়ই করেন। পুরো বিশ্বকে তুমিই সৃষ্টি করছ, আবার যখন এই কল্প শেষ হয়ে যাবে তখন তুমিই এই বিশ্বকে নিজের মধ্যে গ্রাস করে নেবে। আর বলছেন –

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।।৭৭
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী।
প্রকৃতিস্ত্বং হি সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।।৭৮
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা।।

তুমিই মহাবিদ্যা, তুমিই মহামায়া, তুমিই মহামেধা ইত্যাদি, এইভাবে মহা যোগ করে মায়ের স্বরূপের বর্ণনা করা হচ্ছে, এটাই তোমার স্বরূপ। যত রকমের বিদ্যা, যত রকমের মায়া, আমাদের সমস্ত রকমের স্মৃতি, মোহ সবটাই মা নিজে। সাংখ্যে যে প্রকৃতির কথা বলা হয় সেই প্রকৃতি আর ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির যে তিনটে গুণ সত্ত্ব, রজো আর তমো, এই প্রকৃতি আর তার তিনটে গুণ মা! তুমি নিজে। সাংখ্য যাকে প্রকৃতি বলছে, তাকেই বেদান্ত মায়া বলছে কিন্তু মায়ের যারা সাধক তারা বলে এই প্রকৃতিই আমার মা। সচ্চিদানন্দ হলেন মন বুদ্ধির পারে, জগৎ আমাদের মন বুদ্ধির ভেতরে। সচ্চিদানন্দ আর মন বুদ্ধির জগতের এলাকার মাঝখানে যে একটা রেখা দুটোকে বিভাজন করে দিচ্ছে, মন বুদ্ধিকে অতিক্রম করে কখনই এই বিভাজন রেখাকে অতিক্রম করে যাওয়া যাবে না। আমি যখন ভাবছি আমি মন বুদ্ধির পারে চলে যাবে, সেটাও তখন আমি মন বুদ্ধি দিয়েই ভাবছি। তাই মন বুদ্ধির পারের ব্যাপারকে কখন কল্পনাও করা যাবে না। কারণ কল্পনা যে করছে সেতো মন দিয়েই কল্পনা করছে। তাই বলছেন যে জায়গাতে এই বিভাজন রেখা টেনে দেওয়া হয়েছে, এটা মায়েরই রূপ। তার সঙ্গে যত রকমের শক্তি, বিভিন্ন রূপের যে কথা বলা হয়েছে তার সব শক্তি, কালরাত্রি, মহারাত্রি, মোহরাত্রি সব রূপ মা নিজে হয়েছেন।

ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধালক্ষণা।।৭৯
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ।

মানুষের মধ্যে যে গুণের সমাবেশ দেখা যায়, যেমন লজ্জার ভাব, তুষ্টির ভাব, শান্ত ভাব, ক্ষমার ভাব, এই গুণগুলোকে ব্যাখ্যা করে বোঝান খুব মুশকিল হয় বলে আমাদের শাস্ত্র প্রত্যেকটি গুণকে পুরুষ বা নারীর একটা করে মুর্ত রূপ দিয়ে দেয়। নারী বা পুরুষ রূপে দেখানো হলে তাকে বিয়েও দিতে হবে। বলা হয়ে থাকে ধর্মের আটজন স্ত্রী আছেন, মানুষের মধ্যে যে আটটি গুণ দেখা যায় এঁরাই হলেন ধর্মের আটজন পত্নী, যেমন শ্রী, হ্রী, লজ্জা এই ধরণের সব নাম তাঁদের। একটি মানুষের মধ্যে একই সাথে এই আটটি গুণ থাকা অসম্ভব। বলা হয়, যে কোন একটি গুণ কোন মানুষের মধ্যে যদি দেখা যায় সেই মানুষ জগতে মহৎ হয়ে যায়। তাঁকেই আমরা বলি ধর্মমার্গী। কারুর মধ্যে যদি লজ্জার ভাব থাকে, তাহলে সে কখন ভুল কাজ করতে পারবে না। প্রথম দিন ঘুষ

নেওয়ার সময় মানুষ চারিদিকে তাকাতে থাকে কেউ দেখে ফেলছে কিনা। জীবনে প্রথম বার মিথ্যা কথা বলতে গিয়ে সবারই গলা কেঁপে উঠবে, মনে করে সবাই বুঝি জেনে গেল আমি মিথ্যা কথা বলছি, এই বুঝি আমি ধরা পরে গেলাম। প্রথম দিন হয়ত ধরা পড়ল না, এরপর কিছু দিন মিথ্যা কথা বলতে বলতে চক্ষুলজ্জাটা চলে যাবে, এবার সে অধর্ম করতে শুরু করে দেবে। যতক্ষণ ভেতরে লজ্জার ভাব থাকবে ততক্ষণ সে ধর্মপ্রাণ থাকবে। ঠাকুর বলছেন লজ্জা, ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়। ঠাকুর এখানে বলছেন ঈশ্বরের নাম করতে লজ্জা ঘৃণা ভয় থাকতে নেই। মেয়েদের যে লজ্জার ভাব, যেখানে নিজেকে শালীনতার আড়ালে আত্মগোপন করে রাখার ইচ্ছা থাকে, এগুলোই ধর্মের লক্ষণ। ইদানিং নারীদের স্বাধীনতা দিতে হবে, কিন্তু তার ফলে লজ্জা, ভয় এগুলো মেয়েদের ভেতর থেকে চলে যাচ্ছে, স্বাভাবিক ভাবে ধর্মেরও নাশ হয়ে যাচ্ছে। কোন কাজ করতে গিয়ে যখন ঘৃণা আসছে, কাজের প্রতি ঘৃণা নয়, পাপকে ঘৃণা করা হচ্ছে, যে কাজ করলে পাপ হবে সেই পাপের প্রতি ঘৃণা থাকলে মানুষ সেই কাজ কখনই করতে চাইবে না। পাপ কর্ম মানেই অধর্ম, অধর্মের প্রতি যদি ঘৃণা থাকে তখন সেই কাজ করতে গেলে ভেতরে একটা কুণ্ঠা বোধ আসে, এটাই লজ্জার ভাব। অনেক দিন ধরে কোন নোংরা কাজ করতে থাকলে এক সময় সেই কাজের প্রতি ঘৃণা ভাবটা চলে যায়। এটাই ধর্ম, বলছেন মা এগুলো তুমি নিজে। যাঁর মধ্যে এই ধরণের একটি কি দুটি গুণ যদি থাকে, তখন সেই ব্যক্তিকে ধার্মিক পুরুষ বলা হয়, বুঝতে হবে মায়ের শক্তি তাঁর মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রকাশ। এখানে বলছেন *ত্বং শ্রীঃ*, শ্রী মানে লক্ষ্মী। *ত্বং ঈশ্বরী*, ঈশ্বরীয় যে শক্তি, *ত্বং হ্রীঃ*, হ্রী মানে যার মধ্যে চক্ষুলজ্জা আছে। বলছেন, *ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা*, যে বুদ্ধি দিয়ে মানুষ সব কিছু বোঝে। লজ্জার ভাব, পুষ্টি, শান্তির ভাব মানে সন্তোষ আর শান্ত ভাব এবং ক্ষমার ভাব এগুলো সব মানবিক গুণ কিন্তু এই গুণগুলো মা নিজে। মানুষের মধ্যে যদি ঠিক ঠিক লজ্জার ভাব থাকে তাহলে দেখা যাবে সেই মানুষ কখন ভুল কাজ করবে না।

খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।।৮০
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুসণ্ডীপরিঘায়ুধা।
সৌম্যাসৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।।৮১
পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী।

মায়ের যে যুদ্ধের ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা যে যে জিনিষ থেকে বিচ্ছুরিত হয় সেই জিনিষগুলোর নাম করে বলছেন, খড়্গ, শূল, গদা, চক্র, শঙ্খ, ধনু, বাণ, ভূষণ্ডী ইত্যাদি। এগুলো হল বিভিন্ন রকমের আয়ুধ, এই আয়ুধ সমূহের প্রয়োগের যে বিশেষ ক্ষমতা তা একমাত্র মায়েরই আছে। একদিকে যুদ্ধে মায়ের যে বিশেষ ক্ষমতা অন্য দিকে মা তুমি হলে সৌম্যা, শুধু সৌম্যাই নয় তুমি সৌম্যতর, শুধু সৌম্যতরই না, জগতে যা কিছু সুন্দর আছে, যা কিছু বিশিষ্ট তুমি তার থেকেও বেশী। তোমার সৌন্দর্যের কাছে জগতের সমস্ত রকমের সুন্দর জিনিষের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যায়, অথচ তুমি আবার খড়্গ, শূল, গদা, চক্র, বাণ ধারণ করে আছ। একদিকে মা অত্যন্ত সৌম্য শান্ত আবার অন্য দিকে মা অত্যন্ত ঘোরা, ভয়ঙ্করী রূপ ধারণ করে নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। এই দুটো রূপ মায়ের একসাথেই বিরাজ করে। শাস্ত্র এভাবেই মায়ের দুটো রূপের বর্ণনা করছে। কিছু বছর আগেও আমাদের পরিবারগুলোতে দেখা যেত মায়েরা সংসারে সব কিছু সহ্য করে যেত। একেই বাপের বাড়ি থেকে চলে আসতে হয়েছে, কত ছোটবেলা থেকে শ্বশুড় বাড়িতে থাকতে হচ্ছে। মায়েদের উপর পরিবারের সবারই অল্প বিস্তর অত্যাচার নিপীড়ন চলত। শাশুড়ী অত্যাচার করছে, ননদরা গঞ্জনা দিচ্ছে, বড় জায়েরা সব সময় দাবিয়ে রাখছে। সকালে সবার আগে উঠতে হচ্ছে, উঠে রান্না থেকে শুরু করে ঘরদোর পরিষ্কার করা, বিছানা তোলা, জল আনা সব কাজ করে যাচ্ছে, একের পর এক চোখবুজে সব কিছু সহ্য করে সবারই সেবা করে যাচ্ছে। এটাই মায়ের রূপ। কিন্তু তার সন্তানের যদি কিছু হয়ে যায়, সন্তানকে যদি রক্ষা করতে হয় তখন কিন্তু এই মায়ই এক সিংহীর রূপ ধারণ করে নেবে। তখন তার সামনে শাশুড়িই আসুক, স্বামীই আসুক কিংবা অন্য যে কেউ আসুক সঙ্গে সঙ্গে সে এক ভয়ঙ্করী রূপ ধারণ করে নেবে। মায়ের যে এই দুটো রূপ, একদিকে ভীতা, সন্ত্রস্ত্রা অন্য দিকে পরাক্রমিণী ভয়ঙ্করী রূপ, এই দুটো রূপেরই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমা নরেন, রাখাল, বাবুরাম, লাটুদের খাওয়াচ্ছেন। ঠাকুর বলছেন ওদের বেশী বেশী করে খাওয়ালে ওরা জপ ধ্যান কখন করবে! শ্রীমা তখন বলছেন

'সে আমি দেখে নেব, ওর জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না। আমার ছেলেকে আমি পেট ভরে খাওয়াবো'। এটাই মায়ের ভাব, একদিকে তিনি খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা অন্য দিকে তিনি সৌম্যা থেকেও সৌম্যতরা। আবার বলছেন পর অপর যা কিছু আছে, পর মানে এই জগৎ আর অপর মানে এই জগতের পারে যা কিছু আছে, তুমি হলে সব কিছুর পারে পরমেশ্বরী। এরপর বলছেন –

যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্‌বস্তু সদসদ্ বাখিলাত্মিকে।।৮২
তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে ময়া।

এই জগতে যা কিছু আছে, সমস্ত কিছুর মধ্যে যে শক্তি, সেই শক্তি মা তুমি নিজে। ঠাকুর যখনই শক্তির কথা বলতেন তখন এই কথাই বলতেন - যাকে অনেকে গণে মানে বুঝতে হবে তার মধ্যে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে। যেখানে যা কিছু শক্তির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়, সেটা মা নিজে। এই যে পাখা ঘুরছে, পাখার পেছনে বিদ্যুৎ শক্তি আছে বলে পাখা ঘুরছে। বিদ্যুতের পেছনে যে শক্তি সেই শক্তি মা নিজে। একজন সুবক্তা তাঁর সুন্দর ভাষণের দ্বারা অনেকের মন জয় করে নিচ্ছেন, এই যে মন জয় করে নেওয়ার শক্তি সেই শক্তিও মা নিজে। এ্যাটম্ বোমার মধ্যে যে বিধ্বংসি শক্তি, সেই এ্যাটম বোমার শক্তিও মা নিজে। জগতের যে কোন বস্তু, তা সে জড়ই হোক আর চৈতন্যই হোক, তার পেছনে যে শক্তি বিরাজ করছে সেই শক্তি মা নিজে। সেই মায়ের কথা বলতে গিয়ে আবার বলছেন –

যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।।৮৩
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ।

মা! তোমার কথা আর কি বলব! যে ভগবান এই সমগ্র জগতকে চালাচ্ছেন, সেই ভগবানকেও মা তুমি ঘুম পাড়িয়ে রেখে দিয়েছ। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে অধর সেন মাঝে মাঝে অফিস থেকে সরাসরি চলে আসতেন। এসেই তিনি গায়ের চাপকান খুলে ঠাকুরের ঘরে মেঝেতে মাদুর পাতা থাকত, সেখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। ভক্তদের সাথে ঠাকুরের কথাবার্তা অধর সেন আদৌ শুনতেন কিনা সন্দেহ। অধর সেন তখনকার দিনের একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠে অধর সেন ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন 'আচ্ছা মশাই! আপনার কোন সিদ্ধাই-ফিদ্ধাই জানা আছে'। ঠাকুর তখন অধর সেনকে খুব সুন্দর বলছেন 'যার ভয়ে সবাই কাঁপে আমি সেই ডেপুটিকেও ঘুম পাড়িয়ে রাখি'। সেটাই এখানে ব্রহ্মা স্তুতি করে বলছেন – যে ঈশ্বর সমস্ত জগতকে চালাচ্ছেন সেই ঈশ্বরকেই মা ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন।

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।।৮৪
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ।

ব্রহ্মা স্তুতি করে বলছেন 'হে মা! তোমার জন্যই ভগবান বিষ্ণুর এই শরীর ধারণ, আমার ও শিবেরও এই শরীর ধারণ তোমার জন্যই সম্ভব হয়'। আসলে যিনি সচ্চিদানন্দ, যিনি শুদ্ধ ব্রহ্ম, তাঁর উপর যতক্ষণ মায়ার আবরণ না আসে ততক্ষণ ভগবানের সাকার রূপ আসে না। সাকার রূপ মানেই কোন শরীর ধারণ। যেমন সূর্যের আলোর উপর নানা রকম আকারের পেপার কাটিং যদি রাখা হয় তখন সূর্যের আলো ওই পেপার কাটিংএর আকার নিয়ে আসে, কিন্তু সূর্যের আলোর তো কোন আকার হয় না, কিন্তু এখানে একটা আবরণ এসে যাচ্ছে বলে নানা রকমের আকার বেরিয়ে আসছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও যেন পেপার কাটিংএর মত, কারণ সচ্চিদানন্দের উপর মায়ার আবরণ আছে। ব্রহ্মা তাই বলছেন তোমার শক্তিতে আমাদের তিনজনের শরীর ধারণ হচ্ছে, সেই তোমাকে আমি কী ভাষা দিয়ে স্তুতি করতে পারি!

সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্তুতা।।৮৫
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ।

প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুত লঘু।।৮৬
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ।।৮৭

এইভাবে স্তুতি করে ব্রহ্মা শেষে বলছেন ‘হে মা! তুমি তো ভগবান বিষ্ণুকে এইভাবে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছ, কিন্তু এদিকে মধু আর কৈটভ এই দুই দুর্জয় অসুর আমাকে বিনাশ করার জন্য এগিয়ে আসছে, তুমি কিছু একটা কর যাতে এদের বুদ্ধিটা ভ্রমিত হয়ে যায় আর এই দুই মহাসুরকে বধ করার জন্য বিষ্ণুর প্রবৃত্তি উৎপাদন কর’।

ঋষিরুবাচ।৮৮
এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা।। ৮৯
বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধুকৈটভৌ।
নেত্রাস্যনাসিকাবাহুহৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ।।৯০
নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
উত্তস্থৌ চ জগন্নাথস্তয়া মুক্তো জনার্দনঃ।।৯১
একার্ণবেঽহিশয়নাত্ততঃ স দদৃশে চ তৌ।
মধুকৈটভৌ দুরাত্মানাবতিবীর্যপরাক্রমৌ।।৯২
ক্রোধরক্তেক্ষণাবত্তুং ব্রহ্মাণং জনিতোদ্যমৌ।
সমুত্থায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ।।৯৩
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভুঃ।
তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ মহামায়াবিমোহিতৌ।। ৯৪
উক্তবন্তৌ বরোঽস্মত্তো ব্রিয়তামিতি কেশবম্।।৯৫
শ্রীভগবানুবাচ।।৯৬
ভবতেমদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি।।৯৭
কিমন্যেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম।।৯৮
ঋষিরুবাচ।।৯৯
বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্বমাপোময়ং জগৎ।।১০০
বিলোক্য তাভ্যাং গদিতো ভগবান্ কমলেক্ষণঃ।।
আবাং জহি ন যত্রোর্বী সলিলেন পরিপ্লুতা।।১০১
ঋষিরুবাচ।১০২
তথেত্যুক্ত্বা ভগবতা শঙ্খচক্রগদাভৃতা।
কৃত্বা চক্রেণ বৈ চ্ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ।।১০৩
এবমেষা সমুৎপন্না ব্রহ্মণা সংস্তুতা স্বয়ম্।
প্রভাবমস্য দেব্যাস্তু ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে।।১০৪
ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
মধুকৈটভবধো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।।

ব্রহ্মার স্তুতিতে মা সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মাকে কৃপা করলেন। ভগবান বিষ্ণুর উপর থেকে নিদ্রার আবরণ সরিয়ে নিতেই ভগবানও জাগ্রত হয়ে গেলেন। আসলে এখানে একটাই জিনিষ বোঝার জন্য আছে, মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কখনই ঈশ্বর দর্শন হবে না। তিনি তাঁর মায়াশক্তি দিয়ে সবাইকে নিজের বশে রেখে দিয়েছেন। এরপর মা নিদ্রার আবরণ সরিয়ে নিতেই ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রা থেকে উত্থিত হয়ে মধু আর কৈটভের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শুরু করেছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, বিষ্ণু দেবতা আর ভগবান বিষ্ণু এই দুজন আলাদা। কাহিনীকাররাও দেবতা বিষ্ণু আর ভগবান বিষ্ণুর মধ্যে গণ্ডগোল করে ফেলেন। যিনি ভগবান তাঁকে কেন পাঁচ হাজার বছর ধরে যুদ্ধ করতে হয়েছিল বোঝা মুশকিল। যাই হোক, ভগবান পাঁচ হাজার বছর ধরে মধু আর কৈটভের সঙ্গে বাহুযুদ্ধ করলেন। ইতিমধ্যে মা মহামায়া মধুকৈটভের ভেতরে ঢুকে দুজনের মস্তিষ্ককে ভ্রমিত করে দিয়েছেন। ভ্রমিত করে

দেওয়ার ফলে তারা দুজনেই অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে উঠেছে। অহঙ্কার মানেই অজ্ঞান, অজ্ঞানের জন্য তারা দুজনই বিমোহিত হয়ে গেছে। অহঙ্কারে বিমোহিত হয়ে ভগবান বিষ্ণুকে বলছে 'হে কেশব! তোমার যুদ্ধ করা দেখে আমরা খুব খুশী হয়েছি, বলো তুমি কী বর চাও'। অসুররা ভগবানকে বর দিতে চাইছে, এমনই মহামায়া এদের বিমোহিত করে দিয়েছেন। এই জগতে কাউকে যদি দেখেন অনেক অহঙ্কার হয়ে গেছে, তাহলে বুঝে নেবেন মহামায়া এদের মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়েছেন। ভগবানও তখন বলছেন 'আমার উপর তোমরা যদি এতই সন্তুষ্ট হয়ে থাকো তাহলে এই বর ছাড়া আমার তো আর কিছুই চাওয়ার নেই, তোমাদের মৃত্যু কীভাবে হবে আমাকে বলে দাও'। আসলে এত দিন ধরে যুদ্ধ চলছে, বাহু যুদ্ধই পাঁচ হাজার বছর ধরে চলছে। তাই ভগবান অসুরদ্বয়ের মৃত্যুর উপায়টা জেনে নিতে চাইছেন। বর দিতে গিয়ে অসুররা মুশকিলে পড়ে গেছে। সেইজন্য বাঁচার শেষ একটা চেষ্টা করে যাচ্ছে। চারিদিকে কারণ সলিল, শুকনো জায়গা কোথাও নেই। তাই বলল, শুকনো জায়গা ছাড়া আমাদের মারা যাবে না। পুরাণে যে কারণ সলিলের কথা বলা হয় তার অর্থ হল, সত্ত্ব, রজো আর তমো যে তিনটে গুণ, এই তিনটে গুণ থেকেই সমস্ত কিছুর সৃষ্টি হয়। ভগবান এই তিন গুণের পারে। সেইজন্য ভগবান যেখানে অবস্থান করে থাকেন তাকে বোঝাবার জন্য কারণ সলিল বলা হয়। এতক্ষণ সলিলের মধ্যেই লড়াই চলছিল। আর এদের মৃত্যু হবে শুকনো কোন জায়গায়। তখন ভগবান নিজের শরীরকে বিস্তার করে দিলেন। বিষ্ণু দেবতার একটা বৈশিষ্ট্য হল তিনি নিজেকে একদিকে যেমন সঙ্কুচিত করতে পারতেন অন্য দিকে বিস্তারও করে দিতে পারতেন। ভগবান এখন বিস্তার করতে করতে নিজেকে এত বিশাল করে নিয়েছেন যে তাঁর জঙ্ঘাটাই বিশাল ব্যপ্তি নিয়ে নিল আর সেটাই শুকনো জায়গা হয়ে গেল। ভগবান তখন মধু আর কৈটভকে নিজের জঙ্ঘার উপর রেখে চক্র দিয়ে দুজনের গলা কেটে দিলেন।

এখানে মার্কণ্ডেয় মুনি দেখাচ্ছেন মহামায়ার কী ক্ষমতা, যে অসুরদ্বয়কে ভগবানও কব্জা করতে পারছেন না, বর দিয়ে দেওয়ার পরেও যারা বাঁচার জন্য নিজেদের বুদ্ধির আশ্রয় নিচ্ছে, তাদেরকেও মহামায়া ভগবান বিষ্ণুকে দিয়ে বধ করিয়ে দিলেন। সেই মহামায়া আবার ভগবানকেও নিদ্রা দিয়ে বশ করে রাখেন। সেই নিদ্রাকে মহামায়া সরিয়ে নিতেই ভগবান আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। তবে এখানে আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে, সাধারণ মানুষ যেমন মায়াতে বিমোহিত হয়ে যায়, ভগবান কিন্তু সেইভাবে কখনই মহামায়ার মায়াতে মোহিত হন না। এগুলো উপমা, ভগবান যখন যোগনিদ্রায় থাকেন তখন তাঁকে কীভাবে যোগনিদ্রা থেকে জাগ্রত করা হয়, সেটাকেই একটা কাহিনীর মাধ্যমে দেখান হয়েছে। ভাগবতেও এই ধরণের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে যেখানে বেদ মূর্ত রূপ ধারণ করে ক্ষীরসাগরে গিয়ে ভগবানের স্তুতি করেন, স্তুতি করে বেদ ভগবানকে ঘুম থেকে তোলেন।

চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে মহামায়াকে অব্যক্তা রূপে দেখান হয়েছে। দেবীর আবির্ভাব বলতে যা বোঝায় সেটা পুরোপুরি ব্যক্তা রূপে আসবে তৃতীয় অধ্যায় থেকে। বেদান্তে মায়াকে যেভাবে বর্ণনা করা হয় অথবা তন্ত্রে যেখানে মায়াকে অরূপা রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে মায়ার স্বরূপকে সেইভাবে দেখানো হয়েছে। এরপর থেকে মহামায়া নানান রকম রূপ নিয়ে নেবেন। ভগবানের যে যোগনিদ্রা আসলে তা হল, মহামায়া এখন ভগবান বিষ্ণুকে আশ্রয় করে আছেন, বিষ্ণুকে মহামায়া ছেড়ে দিতেই বিষ্ণু জাগ্রত হয়ে গেছেন। অন্য দিকে মধু আর কৈটভের ভেতরে ঢুকে তাদের অহঙ্কারকে জাগিয়ে দিলেন। অহঙ্কার জেগে যেতেই তাদের বুদ্ধি বিভ্রম হয়ে গেল, বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি।

যাই হোক এরপর আমরা শ্রীশ্রীচণ্ডীর দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করছি। দ্বিতীয় অধ্যায়েও পুরো ব্যাপারটা উল্টে আমাদের সামনে রাখা হয়েছে, যার ফলে এই অধ্যায়টিও খুব মজার।

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

(দেবতাদের পুঞ্জীভূত তেজে দেবীর আবির্ভাব
এবং মহিষাসুরের সৈন্য সংহার)

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

'ওঁ হ্রীং' ঋষিরুবাচ।।১

দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।
মহিষেঽসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে।।২

তত্রাসুরৈর্মহাবীর্যৈর্দেবসৈন্যং পরাজিতম্।
জিত্বা চ সকলান্ দেবানিন্দ্রোঽভূন্মহিষাসুরঃ।।৩

দেবতা আর অসুরদের মধ্যে মারামারি সব সময় লেগেই থাকত। দুজনেই ভাই ভাই, কিন্তু ক্ষমতা কার হাতে থাকবে এই নিয়ে দু-পক্ষের লড়াই লেগেই আছে। অসুররা পাতাললোকে আছে, সেখানে সব রকম ঐশ্বর্য, ভোগ পরিপূর্ণ ভাবে আছে আবার দেবতারা স্বর্গে আছে সেখানেও সব রকম ভোগ ও ভোগ্যোপকরণ আছে। কিন্তু দুজনের মধ্যে তফাৎ হল অসুররা নিজেদের সুখ নিয়েই শান্ত থাকতে চায় না। তারা চায় দেবতাদের যে সুখভোগ আছে সেটাকেও লুটেপুটে নিয়ে ভোগ করব। ইদানিং যে বড় বড় কোম্পানিগুলো আছে এরা চাইছে ছোট মাঝারি যত কোম্পানি আছে সব কটাকে গিলে খেয়ে নেবে। আরে ভাই! তুমি তোমার জায়গায় করে খাচ্ছ, ওরাও ওদের জায়গায় করে খাচ্ছে। তোমাদের জন্যও জায়গা আছে ওদের জন্যও জায়গা আছে। কিন্তু আমি একাই খাবো ওদের খেতে দেবো না, অন্য যে কোম্পানি আছে ওটাকেও আমি গিলে খেয়ে নেব। বেঁচে থাকবে তো ষাট সত্তর বয়স পর্যন্ত, এক প্লেটের বেশি খাওয়া তো হজম করতে পারবে না, একটাই তো শরীর, এই শরীরে কত জামা কাপড় পড়বে! এগুলোই আসুরিক বৃত্তি। অসুরদের একটা অন্যতম বিশেষত্ব হল, অসুররা সব সময় কারিগরি বিদ্যাতে অনেক উন্নত হয়। কারিগরি বিদ্যাতে উন্নত হওয়ার জন্য জাগতিক ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্যে তারা সমৃদ্ধ হয়ে যায়। যার ফলে তারা সব সময় চাইছে পুরো বিশ্বে তাদের প্রভুত্ব কায়েম করতে। আমার কাছে যা আছে তা আছে কিন্তু তোমার কাছে যেন না থাকে। আমি না খাই না পড়ি, আমি মরে পড়ে যাব কিন্তু তোমাকে আমি বাঁচতে দেব না, তোমাকে আমি সুখে শান্তিতে থাকতে দেব না। দেবতাদের এই ধরণের মনোবৃত্তি নেই, অসুরদের পিটিয়ে দেওয়ার পর তারা পালিয়ে গেল, তাতেই দেবতারা খুশি।

সেটাই এখানে বলছেন, সেই সময় মহিষাসুর অসুরদের রাজা ছিল আর দেবতাদের রাজা ছিলেন পুরন্দর মানে ইন্দ্র। পুরন্দর শব্দের অর্থ যিনি অনেক কেল্লা জয় করেছেন। দেবতাদের যিনি রাজা হন তাঁর সব সময় নাম ইন্দ্রই হয়। দেবতাদের একই টিম সব সময় থাকে না, টিমের পরিবর্তন হতে থাকে। অসুরদের ক্ষেত্রেও টিম সব সময় পরিবর্তন হতে থাকে। টিমের পরিবর্তন হলেও দেবতাদের নাম পাল্টায় না, কিন্তু অসুরদের ক্ষেত্রে নাম পাল্টাতে থাকে। এখানে যেমন অসুরদের রাজার নাম মহিষাসুর, অন্য সময় অসুরদের রাজার নাম কখন বিরোচন, কখন হিরণ্যকশ্যপু, কখন বলি, কখন বৃত্রাসুর এই ভাবে অসুরদের রাজার নাম পাল্টাতে থাকবে। কিন্তু দেবতাদের যিনি রাজা হন সব সময় তাঁকে ইন্দ্র বলা হয়। আবার এদিকে ইন্দ্রের একটি মূল কাহিনী আছে যেখানে ইন্দ্র কাশ্যপ মুনির সন্তান, সেই ইন্দ্রকে দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে আমাদের অনেক রকম সংশয় দানা বাঁধে।

মহিষাসুরের সেনারা দেবতাদের এমন মার মেরেছে যে দেবতারা সব স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে গেছে। দেবতাদের আর খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। দেবতারাও ভোগী, অসুররাও ভোগী। তবে ইতিহাসে দেখা যায় লড়াই যখন হয় তখন যারা তুলনামূলক ভাবে বেশি হিংস্র ও ক্রুঢ় হয় তারাই যুদ্ধে জয়ী হয়। মগ দস্যুরা যখন ঢুকলো তখন সবাইকে নৃশংস ভাবে বধ করে সব শেষ করে দিয়েছিল। পরে মুসলমানরাও যখন এল তারাও বেশির ভাগ হিন্দুকে কচুকাটা করে মেরে শেষ করে রেখে দিয়েছে। বৃটিশরা আরও বেশি ক্রুঢ় স্বভাবের বলে মোঘলদেরও ঠাণ্ডা

করে দিল। বেশ কিছু দিন রাজ্য ভোগ করার পর এরা নরম হয়ে যায়। তখন এদের থেকে যারা হিংস্র তারা এসে এদের উপর আবার আক্রমণ করে। ভারতের ইতিহাসে একমাত্র গান্ধীজীর সময়ে শুভ শক্তির এমন প্রভাব হয়েছিল যে শক্তিকে শক্তি দিয়েই জয় করা হয়েছিল। তখনই দৈবী শক্তি দিয়ে আসুরিক শক্তিকে পরাজিত করা হয়েছিল। দেবতারা দুর্বল ছিল, অসুররা তাদের থেকে বলশালী ছিল বলে দেবতাদের এমন মার দিয়েছে যে সবাই প্রাণ ছেড়ে স্বর্গ থেকে পালিয়ে গেছে। পালিয়ে যাবে কোথায়! সাধারণতঃ কাহিনীতে আমরা যেমন পাই সেই ভাবে দেবতারা কখনই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের কাছে গিয়ে কখনই তাঁদের বিরক্ত করতেন না। কিন্তু কাহিনীতে আপনি যদি বানিয়েও দেন যে দেবতারা পালিয়ে সরাসরি বিষ্ণুর কাছে বা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তাঁদের সমস্যা সমাধানের জন্য পীড়াপীড়ি করছেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু তাঁদের এমনই শক্তি যে তাঁরা এমন কিছু করে দেন যে তাতেই অসুররা ফেঁসে যায়। যেমন ভস্মাসুরের কাহিনীতে শিবকে ভস্মাসুর নাশ করতে যাওয়ার সময় মোহিনী এসে ভস্মাসুরের শিবের কাছে যাওয়াটা বানচাল করে দিলেন। সাধারণতঃ দেবতারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশক দেবতারা গিয়ে বিরক্ত করতে পারবেন না। পরের শ্লোকে বলছেন –

ততঃ পরাজিতা দেবাঃ পদ্মযোনিং প্রজাপতিম্।
পুরস্কৃত্য গতাস্তত্র যত্রেশগরুড়ধ্বজৌ।।৪
যথাবৃত্তং তয়োস্তদ্বন্মহিষাসুরচেষ্টিতম্।
ত্রিদশাঃ কথয়ামাসুর্দেবাভিভববিস্তরম্।।৫

স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে দেবতারা ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করে ভগবান শিব ও বিষ্ণুর সমীপে গমন করলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সচরাচর এনারা এক সঙ্গে থাকেন না, কিন্তু বর্ণনাতে বলা হচ্ছে বিষ্ণু আর শিব যেন একসাথে বসে আছেন। সেখানে গিয়ে দেবতারা খুব দুঃখ করে নিজেদের দুরবস্থার কথা আর মহিষাসুরের পরাক্রমের বর্ণনা করে বলছেন –

সূর্যেন্দ্রাগ্ন্যনিলেন্দূনাং যমস্য বরুণস্য চ।
অন্যেষাঞ্চাধিকারান্ স স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি।।৬
স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্বে তেন দেবগণা ভুবি।
বিচরন্তি যথা মর্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা।।৭

অসুরদের রাজা মহিষাসুর সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, যম, বরুণ যত দেবতা আছেন সবারই অধিকার কেড়ে নিয়েছে। যজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে আহুতি দেওয়া হয় সেই আহুতিতেই দেবতারা বলীয়ান হন। যজ্ঞের আহুতিতে দেবতাদেরই অধিকার। দেবতারা সূক্ষ্ম শরীরে থাকেন, কিন্তু যখন যে যে দেবতার নামে আহুতি দেওয়া হয় সেই আহুতি সেই সেই দেবতা পেয়ে যান। দেবতাদের একটা নিজস্ব জগৎ আছে, সেই জগৎ সূক্ষ্ম জগৎ। স্বামীজী বিভিন্ন জগৎ বা লোকের বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন যেখানে পৃথিবী অংশ বেশি আছে সেখানেই স্থূল শরীরধারী প্রাণি বাস করে। পৃথিবী লোক থেকে যত সূক্ষ্ম জগতের দিকে যাওয়া যাবে তত সেখানকার অধিবাসীদের শরীর তত সূক্ষ্ম হতে থাকবে, যেমন বায়ুলোকের বাসিন্দাদের শরীর বায়ুর মত হাল্কা হবে। অগ্নিলোকের বাসিন্দারা অগ্নির মত দিব্য হবে। যে যত সূক্ষ্ম হবে সে তত তার থেকে স্থূলকে দেখতে পায়, স্থূল কখন সূক্ষ্মকে দেখতে পায় না। দেবতারা দেখছেন অসুররা তাদের সব অধিকার কেড়ে নিচ্ছে, যদিও অসুররাও সূক্ষ্ম জগতের। সূক্ষ্ম জগতের বাসিন্দা হওয়াতে অসুররা মানুষের থেকেও বেশি ক্ষমতাশালী, তাই তারা পৃথিবীলোকের বাসিন্দাদের উপরেও প্রচুর অত্যাচার করে। পুরাণের কাহিনীতে আবার সূক্ষ্ম লোকের বাসিন্দাদের সাথে পৃথিবীলোকের অধিবাসীদের মিলিয়ে দেওয়া হয়। যেমন বলছেন, দেবতারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে মর্ত্যলোকের মানুষের মত বিচরণ করতে থাকলেন। কিন্তু মূল ব্যাপারগুলো জানা থাকলে এগুলো বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না।

এতদ্ বঃ কথিতং সর্বমমরারিবিচেষ্টিতম্।
শরণঞ্চ প্রপন্নাঃ স্মো বধস্তস্য বিচিন্ত্যতাম্।।৮

দেবতারা নিজেদের দুরবস্থার কথা সব নিবেদন করে বলছেন 'হে প্রভু! আমরা আপনাদের শরণে এলাম। আমাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করুন আর এই মহিষাসুরের বধের ব্যবস্থা আপনারা করে দিন। আমরা আর কিছু করতে পারছি না, কিছু না করলে জগতের সব কিছু নাশ হয়ে যাবে'। এর আগে আমরা আলোচনা করলাম যে, দেবতা অসুর যা কিছু আছে সবাই জগতের একটা ভারসাম্যকে সব সময় রক্ষা করে যাচ্ছে। এখন অসুররা বেশি শক্তিমান হয়ে যাওয়াতে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভারসাম্যটা নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। দেবতাদের দ্বারা এখন কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না, তাই ভগবানকেই কিছু একটা করতে হবে।

ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রূকুটীকুটিলাননৌ।।৯

দেবতাদের কথা শোনার পর মধুসূদন, যিনি এর আগে মধু নামে দৈত্যকে বধ করেছিলেন, তিনি ও মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন। ক্রোধের লক্ষণ তাঁদের দুজনের চেহারায় প্রকটিত হলে, তাঁদের ভ্রূকুটি ভেঙ্গে গেল। পুরাণের এটাই বৈশিষ্ট্য, এই তাঁকে ঈশ্বরীয় শক্তিতে বর্ণনা করছে আর তারপরেই তাঁকে সাধারণ মানুষে নামিয়ে নিয়ে আসবে। সাধারণ মানুষের ভাব ভঙ্গিমা, মনের আবেগ সমূহকেও পুরাণ ঈশ্বরের উপরেও চাপিয়ে দেয়। সাধারণ লোকেদের পক্ষে সেইজন্য পুরাণের কাহিনী বুঝতে সহজ হয়। কিন্তু এগুলোকে নিয়ে যদি বেশি নাড়ানাড়ি করা হয়, ঈশ্বরের কেন ক্রোধ হবে ইত্যাদি, তখন অনেক কিছুই মেলানো যাবে না। সেইজন্য পুরাণের সব কিছু আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই। যদি আপনি মাথায় এই ব্যাপারটা ধরে রাখেন – একদিকে আধ্যাত্মিক শক্তি অন্য দিকে প্রাণশক্তি, এই দুটোর একটা যদি অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে যায় তখন জগতের স্থিতিশীলতা বিপন্ন হয়ে যাবে, তখন ভগবানকে জগতের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য হস্তক্ষেপ করতে হয় – তাহলে জিনিষগুলো বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না। কাহিনীতে দেখানো হচ্ছে দেবতারা ভগবানের কাছে তাঁর স্তুতি করছেন, অসুররা ভগবানের কাছে যাবে না। ভগবানের কাছে যে যাবে তিনি তার কথাই শুনবেন। যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্জুন আর দুর্যোধন দুজনেই গেছে, কিন্তু ভগবান অর্জুনকে আগে দেখেছেন। তাই অর্জুনকে বলছেন 'তোমার ইচ্ছানুসারে তোমার সারথি হয়ে তোমার কাছেই থাকব'। মহাপুরুষরা সব সময় নিরপেক্ষ থাকেন, কিন্তু তার মধ্যেও যারা তাঁর কাছে গিয়ে আবেদন নিবেদন করে তখন তিনি তাদের কথা শোনেন। কথা যখন শোনেন তখনও কিন্তু একই জিনিষ হচ্ছে – কোন ভাবেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভারসাম্য যেন বিগড়ে না যায়।

ততোহতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাৎ ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহৎ তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ।।১০
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহৎ তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত।।১১

মানুষ যখন রেগে যায় তখন তার মস্তিষ্ক থেকে এক ধরণের রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শরীরের রক্ত অনেক সময় উপরের দিকে উঠে আসে। রক্ত উপরের দিকে বেশি চলে এলে মস্তিষ্কের অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। মস্তিষ্ক বেশি রক্তচাপ ও উত্তাপ নিতে পারে না। সেইজন্য শরীর তাড়াতাড়ি ঘাম ছেড়ে দিয়ে শরীরটাকে ঠাণ্ডা করতে শুরু করে দেয়। মস্তিষ্ককে বাঁচানোর জন্য অন্য অর্গানকে ক্ষতি করে দিয়ে মস্তিষ্কের ক্ষতি হওয়াকে আটকে দেবে। রেগে গেলে, ক্রোধের মাত্রা বেড়ে গেলে শরীরে একটা তাপ সৃষ্টি হয়। যোগশাস্ত্রেও যেখানে ক্রোধবৃত্তির কথা বলা হচ্ছে সেখানেও ক্রোধবৃত্তির সাথে তাপের কথা বলা হয়েছে, ক্রোধবৃত্তিকে বলছে জ্বলন বৃত্তি। মহাভারতে একটা কাহিনীই আছে, সেখানে বলছে এমন ক্রোধ হয়েছে যে সেই ক্রোধকে প্রকাশ করার জন্য তার সামনে কিছু একটা চাই। সেই কাহিনীতে বলছে, এখন আমার এই ক্রোধকে যদি আমি প্রকাশ না করি তাহলে এই ক্রোধাগ্নি আমাকেই পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবে। উপমা দিয়ে বলছেন, অরণি কাঠ যখন মন্থন করা হয়, তাতে তখন যে অগ্নি সৃষ্টি হয়, সেই অগ্নি যদি তার ইন্ধন না পায় তখন যে কাঠ তাকে জন্ম দিয়েছে তাকেই পোড়াতে শুরু করে। সেইজন্য ইদানিং ডাক্তাররাও ভেতরে রাগ পুষে রাখতে নিষেধ করেন। ভেতরের ইমোশান গুলোকে যদি বাইরে প্রকাশ না করা হয় তখন নিজের ইমোশানই নিজেকে নাশ করে দেবে।

আমাদের শাস্ত্র বলছে নিজের তেজ দিয়ে তেজকে ধারণ করতে হবে। বাল্মীকি রামায়ণে আছে, ভগবান শিবের বিয়ে হয়েছে ঠিকই কিন্তু দেবতারা চাইছেন ভগবান শিবের এই মুহুর্তে যেন কোন সন্তানাদি না হয়। শিব সব শুনে বললেন ঠিক আছে আমার বীর্যকে আমার তেজ দিয়ে ধারণ করব। এটাই আমাদের পথ, আমাদের যে ক্রোধ, কাম এই জিনিষগুলিকে নিজের তেজ দিয়ে ধারণ করতে হয়। দুরন্ত ঘোড়া, কারুর বশে আসছে না, এই ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য তেজ দরকার। আমাদের ইমোশান গুলো হল এক একটা তেজ, এই তেজকে ধারণ করার জন্য আরও তেজ আনতে হবে। কিন্তু বাইরে কারুর উপর দিয়ে হিংসা, লোভ, ক্রোধ এই ধরণের মনের আবেগগুলোকে বার করে দিলেই যে এগুলো নাশ হয়ে যাবে তা নয়, বেরিয়ে গেলেও আবার ফিরে আসবে, ফিরে যখন আসবে তখন আরও তীব্র আকার নিয়ে ফিরে আসবে। মূল কথা হল যখন এই ধরণের মনের বৃত্তিগুলো আসে তখন এগুলো আমাদের মনের মধ্যে একটা ছাপ রেখে যায়। এর মধ্যে সব থেকে বিপজ্জনক হল ক্রোধ বৃত্তি। আমার সাথে বা অপরের সাথে কোন অন্যায় যদি হয়, আমি যদি অপরের সাথে এক করে রাখি তবেই তো আমার মধ্যে ক্রোধ হবে। এখন চীন আর জাপানের মধ্যে যদি লড়াই বাধে, তাতে আমার তো কিছু আসে যায় না। কিন্তু যে জায়গাতে আমি নিজেকে জুড়ে রেখেছি, ছেলে হোক, নাতি হোক যেই হোক, সেখানে তাদের সাথে যদি কিছু অন্যায় হয় তখন আমি রেগে যাচ্ছি। রেগে গেলেই রক্ত মস্তিষ্কে গিয়ে ধাক্কা মারবে। মুখ দেখলেই সবাই বুঝে যাবে আমি রেগে গেছি। আমার ভ্রূ কুঁচকে যাবে, চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে যাবে। রেগে গেলে কিছু কিছু লোকের চেহারা এমনই বিকৃত হয়ে যায় যে তার দিকে তাকালেই লোক আঁৎকে উঠবে। মূল কথা হল, রেগে গেলে শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়। ক্রোধের কিছু কিছু লক্ষণ আছে, এখানে সেই লক্ষণগুলোর বর্ণনা করছেন। কি বলছেন? *ততোঽতিকোপপূর্ণস্য*, ভগবান বিষ্ণু প্রচণ্ড রেগে গেছেন। প্রথমে বিষ্ণুর শরীর থেকে ওই তেজটা বেরিয়ে এসেছে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তিনজনই ভগবানের রূপ, তাঁদের দিব্য শরীর থেকে তেজ বেরিয়ে এসেছে। আর এদিকে ভগবানের দেখাদেখিতে দেবতাদের শরীর থেকেও তেজ নির্গত হতে শুরু হয়ে গেল। সবার তেজ বেরিয়ে এক সঙ্গে মিলে একটি তেজে পুঞ্জীভূত রূপ নিয়েছে। সেই তেজ যেন একটা আলোর মত আকার নিয়ে বড় স্তুপের মত হয়ে গেছে। এই তেজের বিশেষত্ব কি?

অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্।।১২

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ তার সাথে দেবতাদের সবার তেজ মিলে এক হয়ে একটা জ্বলন্ত পর্বতের মত দেখাচ্ছে। দেবতারা দেখছেন সেই সুদীপ্ত তেজঃপুঞ্জ দশ দিক ব্যাপ্ত করে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা।।১৩

দেবতাদের শরীর থেকে নিঃসৃত সেই তেজ জগতের কোন কিছুর সাথে তুলনা করা যাবে না। কারণ স্বয়ং ঈশ্বর কুপিত হয়ে গেছেন, তাঁর শরীর থেকে যে তেজ বেরোবে সেই তেজের তুলনা জগতের কোন কিছুর সাথেই করা যাবে না। ঈশ্বরের যা কিছু হবে তার সবটাই দিব্য হবে, তাঁর তেজও দিব্য হবে। পুরাণে বর্ণনা আছে, ভগবান বিষ্ণু তাঁর মোহিনী রূপ দিয়ে শিবকে মোহিত করলেন। ভগবান শিব এমনই মোহিত হয়ে গেলেন যে তিনি সেই মোহিনী নারীর পেছনে ধাবিত হলেন। ধাবিত হতে গিয়ে শিবের শরীর থেকে বীর্য পতন হয়ে গেছে। সেখান থেকে কোথাও সোনার খনি হয়ে গেল, কোথাও রূপোর খনি হয়ে গেল। ঈশ্বরের যা কিছু হয় সবটাই দিব্য, তাঁর কামও দিব্য আবার তাঁর ক্রোধও দিব্য। ভগবান যদি কখন লোভ করতে চান তখন সেই লোভও দিব্য হয়ে যাবে। সেইজন্য সাধারণ মানুষের মনের বৃত্তি দিয়ে ভগবানের কোন কিছুকেই তুলনা করা যায় না। এখানেও তাই হয়েছে, ভগবানের শরীর থেকে নির্গত যে তেজ এই তেজ আর কোন কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যাবে না।

কিন্তু এখানে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ওই তেজ একত্রিত হয়ে একটি নারী মূর্তি ধারণ করল। পুরাণে মায়া বা শক্তিকে বোঝানোর জন্য সব সময় নারীর রূপকে নিয়ে আসা হয়। এই সব কারণেই সাধারণ মানুষের একটা ধারণা হয়ে গেছে যে প্রকৃতি বা শক্তি মানেই নারী। কিন্তু শক্তি বা প্রকৃতি নারীও নয় পুরুষও নয়। সাধারণ মানুষ

এগুলো বুঝবে না, তাই বোঝাবার জন্য একটা নারীর রূপ দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু নারীর মধ্যে যে শক্তি সেই শক্তি যেমন ভগবানের আবার পুরুষের মধ্যে যে শক্তি সেই শক্তিও ভগবানেরই শক্তি। নারীর মধ্যে অজ্ঞান যেখান থেকে এসেছে, পুরুষের মধ্যে যে অজ্ঞান সেটাও সেখান থেকেই এসেছে। এই স্থূল শরীরের এক ধাপ উপরে সূক্ষ্ম শরীরে পুরুষ ও নারীর কোন প্রভেদ নেই। সূক্ষ্ম শরীরের উপরে গেলে তো কোন প্রশ্নই নেই। সেইজন্য পুনর্জন্মে পুরুষ মেয়েও হয়ে যেতে পার আবার নারীও পুরুষ হয়ে যেতে পারে। ইন্দ্রিয় সবারই এক, পুরুষের যা ইন্দ্রিয় মেয়েদেরও সেই একই ইন্দ্রিয়। কিন্তু বাইরের ইন্দ্রিয়ের যে গোলক সেখানে তফাৎ এসে যায়। পুরুষ আর নারীর বিভেদ শুধু স্থূল শরীরে। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে আবার স্থূল শরীরের কোন গুরুত্বই নেই, গুরুত্ব কেবল সূক্ষ্ম শরীরের। সূক্ষ্ম শরীরে গিয়ে পুরুষ আর নারীর কোন তফাৎ থাকে না। অন্য দিকে ভূতদের ক্ষেত্রে প্রেত বা প্রেতনী বলা হয়। কারণ ওদের শরীরটা বায়ুর শরীর, ভূতদের শরীরকে সূক্ষ্ম শরীর বলা যায় না। আমাদের শরীরে যেমন পৃথিবী অংশ বেশি তেমনি ভূতেদের শরীর বায়ুর অংশ বেশি। কিন্তু যে সূক্ষ্ম শরীরটা স্থূল শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সেখানে পুরুষ আর নারীর ভেদ হবে না। এখানে তেজরাশিকে নারীর মূর্তিতে দেখানো হয়েছে। কেনোপনিষদে বর্ণনা আছে, দেবী উমা হৈমবতী দেবতাদের সামনে আবির্ভূতা হলেন।

যদভূচ্ছাম্ভবং তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখম্।
যাম্যেন চাভবন্ কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা।।১৪

সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং মধ্যং চৈন্দ্রেণ চাভবৎ।
বারুণেন চ জঙ্ঘোরূ নিতম্বস্তেজসা ভুবঃ।।১৫

ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ তদঙ্গুল্যোঽর্কতেজসা।
বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা।।১৬

তস্যাস্তু দন্তাঃ সম্ভূতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা।
নয়নত্রিতয়ং জজ্ঞে তথা পাবকতেজসা।।১৭

ভ্রুবৌ চ সন্ধ্যয়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্য চ।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং সম্ভবস্তেজসাং শিবা।।১৮

ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাম্।
তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমরা মহিষার্দিতাঃ।।১৯

এবার বলছেন কোন কোন দেবতার তেজ থেকে সেই নারীর মূর্তির কোন কোন অঙ্গ তৈরী হল। বলছেন, মহাদেবের তেজে সেই নারী মূর্তির মুখ তৈরী হল, যমের তেজ দিয়ে তৈরী হল মাথার কেশরাশি। বিষ্ণুর তেজে তৈরী হল নারীর বাহু সকল। চন্দ্রের তেজে তাঁর স্তনযুগল আর ইন্দ্রের তেজে শরীরের মধ্যভাগ, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও ঊরুদ্বয় আর পৃথিবীর তেজে তাঁর নিতম্ব তৈরী হল। ব্রহ্মার তেজে নারীর পদযুগল আর সূর্যের তেজে পদযুগলের অঙ্গুলি সকল নির্মিত হল, অষ্টবসুদের তেজে নারীর হাতের আঙ্গুলগুলো আর কুবেরের তেজে তাঁর নাসিকা তৈরী হল। প্রজাপতিদের তেজে তাঁর দন্তপাটি এবং অগ্নির তেজে ত্রিনেত্র উৎপন্ন হল। সন্ধ্যাদেবীর তেজে দেবীর ভ্রূযুগল এবং বায়ুর তেজে কর্ণদ্বয় রচিত হল। এইভাবে অন্যান্য দেবতাদের তেজঃপুঞ্জ থেকেও দেবীর আবির্ভাব হল। সমস্ত দেবতাদের তেজরাশি থেকে আবির্ভূতা দেবীকে দেখে মহিষাসুরের দ্বারা পীড়িত দেবতারা অতিশয় আনন্দিত হলেন।

এই যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ আছেন আর তাঁদের সাথে বিভিন্ন দেবতারা আছেন, এনাদের যে তেজ, তাঁদের শরীরের যে সারতত্ত্ব, যার দ্বারা এনারা এই রূপে বিরাজ করে আছেন, এই জিনিষটা আমাদের একটু বোঝার দরকার। আমরা আমাদের সামনে যা কিছু দেখছি, এই দেখার অনেকগুলো পদ্ধতি আছে। আমরা সবাই হলাম three dimensional representation of an idea। কবিতা যেমন verbal representation of an idea। একটা সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্যকে যখন শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন সেটাই কবিতা হয়ে যাচ্ছে। ওটাকেই যখন three dimensional representation দেওয়া হয় ওটাই তখন কোন বাড়ি বা মূর্তি হয়ে

যায়। আমরা সবাই এক একটা আলাদা আলাদা আইডিয়ার প্রতিমূর্তি। আমরা সবাই বিভিন্ন আইডিয়ার সংমিশ্রণ। কিন্তু বিভিন্ন আইডিয়ার সংমিশ্রণে প্রত্যেকের একটা নিজস্ব স্বতন্ত্র আইডিয়া তৈরী হয়ে যায়। যেমন গান্ধীজী, গান্ধীজীর মধ্যে অনেক ভালো গুণ ছিল, অনেক দোষত্রুটিও ছিল, কিন্তু যতবার গান্ধীজীর কথা ভাববো ততবার আমাদের কাছে গান্ধীজী মানে সত্যাগ্রহ, অহিংসা, সত্য। যখন ভগবান বুদ্ধের কথা ভাবছি, তখন ভগবান বুদ্ধও হলেন একটি স্বতন্ত্র আইডিয়া আর তিনি এই আইডিয়ারই প্রতিমূর্তি। ঠিক তেমনি আমাদের সবারই ভেতরে একটা তেজ আছে। ঈশ্বরীয় শক্তি তেজ রূপে আমার আপনার সবারই ভেতরে আছে। যার জন্য কিছু লোকের মধ্যে তেজ বেশি, কিছু লোকের মধ্যে তেজ কম। কারুর তেজ এক দিকে যায়, কারুর তেজ অন্য দিকে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে তেজ একভাবে ছিল আবার আলেকজাণ্ডারের মধ্যে তেজ অন্য ভাবে ছিল। ঈশ্বরীয় শক্তি তেজ রূপে দেবতাদের মধ্যে বিরাজ করছে, সেই তেজ এবার দেবতাদের থেকে বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়ে এসে ওই তেজ দিয়ে মায়ের এক শরীর তৈরী হয়েছে। যখন তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল তখন জগতের যেখানে যা কিছু সৌন্দর্য আছে সব সৌন্দর্যকে তিল তিল করে সংগ্রহ করে তাই দিয়ে তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। মা দুর্গা কিন্তু তিলোত্তমার মত নন। এখানে মা দুর্গার সৃষ্টি হওয়ার বর্ণনা একেবারেই অন্য রকমের। এখানে ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে দিয়ে ঘুরিয়ে রাখা হয়েছে। ঈশ্বরীয় শক্তিরই মূর্তিমান রূপ হলাম আমি আপনি সবাই। আমার আপনার শক্তি দিয়ে ঈশ্বর কখন সৃষ্ট হন না, বরঞ্চ আমি আপনি এই মুহূর্তে যা হয়ে আছি, তাঁর শক্তিতেই হয়েছি। কিন্তু এখানে উল্টো দিক থেকে বোঝান হচ্ছে, দেবতাদের শরীর থেকে তেজ বেরিয়ে এসেছে। প্রথমের দিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশের ক্রোধের কথা যদিও বলা হয়েছে, কিন্তু তারপরেই বলছেন তাঁদের সবার ভেতর থেকে তেজ বেরিয়ে এসেছে, সেই তেজঃপুঞ্জ একত্র হয়ে সেখান থেকে মা দুর্গার আবির্ভাব হল। ঠাকুর অনেকবার এই কথা বলছেন – শক্তির প্রকাশ ও প্রকাশের তারতম্য। আমি আপনি সবাই শক্তির প্রকাশ। দেবতারাও শক্তির প্রকাশ কিন্তু আমাদের তুলনায় বড় শক্তির প্রকাশ। সেই রকম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্য একটি শক্তির প্রকাশ। ওই শক্তিই এবার যেন মূর্তিমান হয়ে বাইরে চলে আসছে। জগতে যা কিছু শক্তি সবার ভেতরে আছে, সব শক্তিকে যদি বাইরে বার করে একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায় তখন সেটাই মহামায়ার রূপ হয়ে যাবে। কারণ মহামায়া, যিনি আদ্যাশক্তি, তিনিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয়ে আছেন, তিনিই শক্তি রূপে সবারই ভেতরে ঢুকে আছেন। এই জিনিষটাই এখানে উল্টো করে দেখান হয়েছে।

শূলং শূলাদ্ বিনিষ্কৃষ্য দদৌ তস্যৈ পিনাকধৃক্।
চক্রঞ্চ দত্তবান্ কৃষ্ণঃ সমুৎপাদ্য স্বচক্রতঃ।।২০

শঙ্খঞ্চ বরুণঃ শক্তিং দদৌ তস্যৈ হুতাশনঃ।
মারুতো দত্তবাংশ্চাপং বাণপূর্ণে তথেষুধী।।২১

বজ্রমিন্দ্রঃ সমুৎপাদ্য কুলিশাদমরাধিপঃ।
দদৌ তস্যৈ সহস্রাক্ষো ঘন্টামৈরাবতাদ্ গজাৎ।।২২

কালদণ্ডাদ্ যমো দণ্ডং পাশঞ্চাম্বুপতির্দদৌ।
প্রজাপতিশ্চাক্ষমালাং দদৌ ব্রহ্মা কমণ্ডলুম্।।২৩

সমস্তরোমকূপেষু নিজরশ্মীন্ দিবাকরঃ।
কালশ্চ দত্তবান্ খড়্গং তস্যাশ্চর্ম চ নির্মলম্।।২৪

দেবীকে এখন অসুরদের সাথে ঘোরতর যুদ্ধে নামতে হবে। যুদ্ধ করার জন্য দেবীর প্রচুর অস্ত্রের দরকার, দেবতারা এবার তাঁদের অস্ত্র থেকে এক এক করে অস্ত্র দিতে শুরু করলেন। ভগবান শিব তাঁর নিজের অনেক অস্ত্র থেকে একটি শূল দেবীকে দিয়ে দিলেন। ভগবানের বিষ্ণুর যে চক্র রয়েছে, সেই চক্র থেকেই তিনি আরেকটি অনুরূপ চক্র দাঁড় করিয়ে দেবীর হাতে সমর্পণ করে দিলেন। বরুণ দেবতা দিলেন শঙ্খ, অগ্নি দিলেন শক্তি, পবনদেব একটি ধনু ও বাণপূর্ণ দুটি তূণ। সহস্রাক্ষ দেবরাজ ইন্দ্র নিজের বজ্র থেকে বজ্রান্তর এবং ঐরাবত হাতির গলা থেকে একটি ঘন্টা দিলেন। গাড়ির হর্ণ হাতি থেকেই এসেছে। হাতি এত বড় যে চলার পথে তার পায়ের চাপে যাতে পথচারী কেউ মারা না যায়, বা হাতির শূরের নাগালের মধ্যে যাতে কেউ না এসে পড়ে তার জন্য

হাতির গলায় ঘন্টা বাঁধা থাকত আর হাতি দুলে দুলে চলে বলে ঘন্টার আওয়াজ হয়। ঘন্টার আওয়াজ শুনে লোকেরা দূর থেকেই বুঝে নিত যে হাতি আসছে। যমরাজ তাঁর কালদণ্ড থেকে দণ্ডান্তর, জলদেবতা বরুণ নিজের পাশ থেকে একটি পাশ দিলেন। প্রজাপতি রুদ্রাক্ষের জপমালা এবং ব্রহ্মা একটি কমণ্ডলু দেবীকে দিলেন। সূর্য নিজের রশ্মীজাল দেবীর প্রত্যেকটি রোমকূপে ঢেলে দিলেন। মৃত্যুদেবতা কাল দেবীকে একটি প্রদীপ্ত ঢাল এবং উজ্জ্বল তরোয়াল দিলেন।

বর্ণনার মধ্যে খুব মজার ব্যাপার আছে। আসলে এখানে দুটো ব্যাপারকে লক্ষ্য করার আছে, মায়ের মূর্ত রূপ এসেছে বিভিন্ন দেবতাদের তেজ থেকে। দ্বিতীয় হল, দেবতাদের যা যা বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্টের পুরো কার্বনকপির একটি করে মায়ের কাছে চলে এসেছে। আমাদের ক্ষেত্রেও দুটো ব্যাপার হয়ে থাকে, একটা হল স্বরূপগত। আমাদের সবারই ভেতর একই চৈতন্য শক্তি, কিন্তু বিভিন্ন লোকের ক্ষেত্রে চৈতন্য শক্তির প্রকাশের তারতম্য রয়েছে। ঠাকুর বলছেন, জমিদার বাবু তার জমিদারির সব জায়গাতেই আছেন, কিন্তু বৈঠকখানায় তাঁকে বেশি পাওয়া যায়। ভগবানও সবারই মধ্যে বিদ্যমান কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে তাঁর প্রকাশ বেশি। সবটাই তিনি কিন্তু শক্তির তারতম্য থাকবে। এই শক্তির তারতম্য হল আমাদের অন্তর্নিহিত ব্যাপার। এই শক্তিরই আবার একটা বহিঃপ্রকাশ আছে। যেমন কেউ একজন বড় ক্রিকেট প্লেয়ার, কেউ বড় কবি, কেউ বড় বিজ্ঞানী, কেউ রাজনীতির বড় নেতা – এগুলোই শক্তির বহিঃপ্রকাশ। তাই আমাদের শক্তির দুটো প্রকাশ একটা অন্তঃ আরেকটি বহিঃ। যাঁরা উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক পুরুষ একমাত্র তাঁরাই আমাদের ভেতরে কতটা অন্তঃশক্তির প্রকাশ আছে পরিষ্কার দেখতে পান। ঠাকুর বলছেন কেশব সেনের মধ্যে যদি একটি পদ্ম থাকে তাহলে নরেনের মধ্যে ওই রকম আঠারোটি পদ্ম। এখানে ঠাকুর শক্তির বর্ণনা করছেন। নরেন ঠাকুরকে নিষেধ করছেন আপনি এসব উল্টোপাল্টা কথা বলবেন না। তখনকার দিনে কেশব সেনকে এক ইউনিট শক্তি আর সেদিনকার ছোকড়া নরেনকে যদি হাজার ইউনিট বলে লোকে বলবে আপনি মোহগ্রস্ত, নরেনকে ভালোবাসেন বলেন বলে এই রকম উদ্ভট কথা বলছেন। অথচ দেখুন, নরেনের বাবা কি কোন দিন ভেবেছিলেন আমার ছেলের মধ্যে এই শক্তি আছে? নরেনের মাও কি কখন ভেবেছিলেন আমার বিলের মধ্যে এত শক্তি আছে? নরেনের ভাইরাও কি কখন একবারও ভেবেছিলেন তাঁদের দাদার মধ্যে এই শক্তি আছে? এবার নরেনের গুরুভাইদের দিকে আসুন, গুরুভাইরা কি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁদের সর্দার নরেনের মধ্যে এই ক্ষমতা আছে? সবাই শুধু মানছেন যে ঠাকুর বলে গেছেন নরেন আমাদের নেতা, এর বাইরে নরেনের মধ্যে যে কী প্রচণ্ড ক্ষমতা, যে ক্ষমতা দিয়ে তিনি জগতকে দুমড়ে মুচড়ে দিতে পারেন, এই ক্ষমতাকে শেষ দিন পর্যন্ত একমাত্র ঠাকুর ছাড়া কেউ টের পাওয়া দূরে থাক কল্পনাই করতে পারলেন না। ঠাকুর যে কোন কল্পনা করে স্বামীজীর নামে বলেছেন, একেবারেই তা নয়। কারণ ঠাকুর যার নামে যেমনটি বলে গেছেন ঠিক তেমনটি ফলেছে। স্বামীজীও পরবর্তিকালে যাকে যেমনটি বলে গেছেন তার ঠিক তেমনটি হয়েছে। খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক পুরুষ না হলে এই ধরণের অন্তর্দৃষ্টি আসবে না। একটু সামান্য আভাস পাওয়া যায় যখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বলছেন 'তোমার চোখ যোগীর চোখ'। এই অন্তঃশক্তির আরেকটা দিক হল শক্তির বহিঃপ্রকাশ, যেমন আলেকজাণ্ডার বিরাট বড় কমাণ্ডার। সেই রকম নেপোলিয়ন, সুভাষচন্দ্র বোস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গান্ধীজী এঁদের মধ্যে শক্তির বহিঃপ্রকাশ হয়েছে।

এখানে মা দুর্গার ক্ষেত্রে দুটো শক্তিকে নিয়েই আলোচনা হচ্ছে – অন্তঃশক্তি দিয়ে মায়ের শরীর তৈরী হচ্ছে আর দেবতাদের যে বহিঃশক্তি তাই দিয়ে মাকে রণসাজে সজ্জিত করার কাজ চলছে। মজার ব্যাপার হল, এই যে শক্তি দেওয়া হচ্ছে এগুলো কিন্তু মায়ের উপর কৃপা করা হচ্ছে না, এগুলো দিয়ে মাকে রণসাজে সজ্জিত করা হচ্ছে, সবার মধ্যে যে শক্তির খেলা তা মায়ের শক্তিতেই চলে। মায়ের শক্তি আছে বলে সবার মধ্যে শক্তি কাজ করছে। হস্তিনাপুরে খবর গেছে শ্রীকৃষ্ণের শরীর চলে গেছে। দ্বারকাতে শুধু মেয়েরাই বেঁচে আছে। তাদের সবাইকে দ্বারকা থেকে নিয়ে আসার জন্য অর্জুন গেছেন। অর্জুন দ্বারকার সব মহিলাদের হস্তিনাপুরে নিয়ে আসছেন, পথে ডাকাতদের আক্রমণ হয়েছে। অর্জুন ডাকাতদের আক্রমণ থেকে মেয়েদের রক্ষা করতে পারলেন না। অর্জুন অসহায় হয়ে বসে বসে কাঁদছেন, আমার গাণ্ডীব আমাকে সহায়তা করল না। অর্জুন এতদিন শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমান ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের যে শক্তি, সেটাই মা দুর্গা। ইন্দ্রের বজ্র, হাতি, শ্রীকৃষ্ণের চক্র, দেবতাদের পাশ, খড়্গ,

শূল, সব তাঁর শক্তিতেই চলে। এটাকে এখানে এবার উল্টে বলা হচ্ছে। একদিকে আমাদের সামনে একটা তত্ত্বকে দাঁড় করান হচ্ছে অন্য দিকে তার সঙ্গে একটা কল্পনা দিচ্ছেন। যদি বলেন মা এটাতে বজ্র হয়ে গেলেন, এটাতে চক্র হয়ে গেলেন, এভাবেও করা যেত কিন্তু এর থেকে এই বর্ণনাটা আরও কাব্যিক রূপ পেয়েছে। এখানে সুরথ রাজার মূল প্রশ্ন ছিল দেবীর আবির্ভাব কীভাবে হয়। আবির্ভাব হতে হলে তাঁকে একটা শরীর দিতে হবে, তাঁকে অস্ত্র দিতে হবে। এটাকে এখানে উল্টো ভাবে বলছেন।

ক্ষীরোদশ্চামলং হারমজরে চ তথাম্বরে।
চূড়ামণিং তথা দিব্যং কুণ্ডলে কটকানি চ।।২৫
অর্ধচন্দ্রং তথা শুভ্রং কেয়ূরান্ সর্ববাহুষু।
নূপুরৌ বিমলৌ তদ্বদ্ গ্রৈবেয়কমনুত্তমম্।।২৬
অঙ্গুরীয়করত্নানি সমস্তাস্বঙ্গুলীষু চ।
বিশ্বকর্মা দদৌ তস্যৈ পরশুঞ্চাতিনির্মলম্।।২৭
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি তথাহভেদ্যঞ্চ দংশনম্।
অম্লানপঙ্কজাং মালাং শিরস্যুরসি চাপরাম্।।২৮
অদদজ্জলধিস্তস্যৈ পঙ্কজঞ্চাতিশোভনম্।
হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ।।২৯
দদাবশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং ধনাদিপঃ।
শেষশ্চ সর্বনাগেশো মহামণিবিভূষিতম্।।৩০
নাগহারং দদৌ তস্যৈ ধত্তে যঃ পৃথিবীমিমাম্।
অন্যৈরপি সুরৈর্দেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা।।৩১
সম্মানিতা ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ।
তস্যা নাদেন ঘোরেণ কৃৎস্নমাপূরিতং নভঃ।।৩২
অমায়তাতিমহতা প্রতিশব্দো মহানভূৎ।
চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে।।৩৩
চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ।
জয়েতি দেবাশ্চ মুদা তামূচুঃ সিংহবাহিনীম্।।৩৪
তুষ্টুবুর্মুনয়শ্চৈনাং ভক্তিনম্রাত্মমূর্তয়ঃ।
দৃষ্ট্বা সমস্তং সংক্ষুব্ধং ত্রৈলোক্যমমরারয়ঃ।।৩৫

ক্ষীরসমুদ্র, যে সমুদ্রে ভগবান বাস করেন, দেবীকে উজ্জ্বল হার ও একটি চিরনূতন দিব্য বস্ত্র দিলেন আর তার সাথে দিলেন দিব্য চূড়ামণি, দুটি কুন্তল, হাতের বালা, ললাটভূষণ উজ্জ্বল অর্দ্ধচন্দ্র, সব বাহুর জন্য কেয়ূর, দুটি চরণের জন্য নূপুর, গলার হার এবং সব আঙ্গুলের জন্য রত্নাঙ্গুরী। বিশ্বকর্মা দিলেন অতি নির্মল ধারাল কুঠার এবং তার সাথে আরও অনেক অস্ত্রশস্ত্র এবং অভেদ্য কবচ। এছাড়া বিশ্বকর্মা দেবীর মস্তক আর বক্ষে ধারণ করার জন্য অম্লান পদ্মের মালা দিলেন। সমুদ্র দেবীর হাতে একটি অতি সুন্দর পদ্মফুল দিলন। পর্বতাধিপতি হিমালয় দেবীকে একটা সিংহ দিলেন। ধনাধ্যক্ষ কুবের সদা সুরাপূর্ণ একটি পানপাত্র এবং নাগাধিপতি বাসুকি যিনি এই পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন তিনি দেবীকে বহুমূল্য রত্নে বিভূষিত নাগহার দিলেন।

এই সমস্ত অস্ত্র ও বহুমূল্যের অলঙ্কারাদিতে সজ্জিতা ও দেবতাদের দ্বারা সম্মানিতা হয়ে মা বারংবার জোরে অট্টহাস্য করে হুঙ্কার দিতে লাগলেন। ওই হুঙ্কারে সমস্ত আকাশ গুঞ্জরিত হয়ে উঠল। দেবীর সিংহনাদের প্রতিধ্বণি চতুর্দশ ভুবনকে সংক্ষুব্ধ করে তুলল, সপ্ত সমুদ্রের জলরাশি উত্তাল হয়ে উঠল। পৃথিবী বিচলিত হল এবং পর্বতসমূহ দুলতে শুরু করল। তখন দেবতারা আনন্দে দেবী দুর্গার জয়ধ্বণি দিয়ে বললেন ‘দেবী! তোমার জয় হোক’।

মুনিরাও ভক্তি বিনম্র ভাবে দেবীকে স্তব করতে লাগলেন। চারিদিকে এই চেঁচামেচি হৈচৈ শুনে মহিষাসুরের সৈন্যরা বুঝলো কিছু একটা গোলমাল হয়েছে।

সন্নদ্ধাখিলসৈন্যাস্তে সমুত্তস্থুরুদায়ুধাঃ।
আঃ কিমেতদিতি ক্রোধাদাভাষ্য মহিষাসুরঃ।।৩৬

অভ্যধাবত তং শব্দমশেষৈরসুরৈর্বৃতঃ।
স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্বিষা।।৩৭

পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্।
ক্ষোভিতাশেষপাতালাং ধনুর্জ্যানিঃস্বনেন তাম্।।৩৮

দিশো ভুজসহস্রেণ সমন্তাদ্‌ব্যাপ্য সংস্থিতাম্।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তথা দেব্যা সুরদ্বিষাম্।।৩৯

শস্ত্রাস্ত্রৈর্বহুধা মুক্তৈরাদীপিতদিগন্তরম্।
মহিষাসুরসেনানীশ্চিক্ষুরাখ্যো মহাসুরঃ।।৪০

অসুরদের যত সেনাপতিরা ছিল তারা নিজেদের সৈন্যদের সুসজ্জিত করে অস্ত্র-শস্ত্রাদি সহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। মহিষাসুর সেখানে এসে ক্রোধান্বিত হয়ে বলছে ‘আঃ! এসব কী হচ্ছে’! এই কথা বলে সে সেই সিংহনাদের প্রতি ধাবিত হল। সেখানে গিয়ে মহিষাসুর সেই দেবীকে দেখতে পেল যিনি তাঁর নিজের অঙ্গজ্যোতিতে ত্রিভুবন আলোকিত করে রেখেছেন। তাঁর পদভারে পৃথিবী টালমাটাল হয়ে গেছে। মাথার মুকুট আকাশ স্পর্শ করছে। দেবীর ধনুকের টঙ্কারে সমস্ত লোককে আকুলিত করে তুলেছে। তিনি তাঁর সহস্র বাহু দিয়ে দশদিক আচ্ছাদিত করে দাঁড়িয়ে আছেন। এরপর অসুরদের সাথে দেবীর যুদ্ধ আরম্ভ হল। নানা রকম নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের প্রভাবে দশদিক উদ্ভাসিত হতে লাগল। মহিষাসুরের সেনাপতির নাম মহাসুর চিক্ষুর, দেবীর সঙ্গে সে এখন যুদ্ধ করতে থাকল।

যুযুধে চামরশ্চান্যৈশ্চতুরঙ্গবলান্বিতঃ।
রথানামযুতৈঃ ষড়্‌ভিরুদগ্রাখ্যো মহাসুরঃ।।৪১

অযুধ্যতাযুতানাঞ্চ সহস্রেণ মহাহনুঃ।
পঞ্চাশদ্ভিশ্চ নিযুতৈরসিলোমা মহাসুরঃ।।৪২

অযুতানাং শতৈঃ ষড়্‌ভির্বাস্কলো যুযুধে রণে।
গজবাজিসহস্রৌঘৈরনেকৈঃ পরিবারিতঃ।।৪৩

বৃতো রথানাং কোট্যা চ যুদ্ধে তস্মিন্নযুধ্যত।
বিড়ালাখ্যোঽযুতানাঞ্চ পঞ্চাশদ্ভিরথাযুতৈঃ।।৪৪

যুযুধে সংযুগে তত্র রথানাং পরিবারিতঃ।
অন্যে চ তথাযুতশো রথনাগহয়ৈর্বৃতাঃ।।৪৫

যুযুধঃ সংযুগে দেব্যা সহ তত্র মহাসুরাঃ
কোটিকোটিসহস্রৈস্তু রাথানাং দন্তিনাং তথা।।৪৬

হয়ানাঞ্চ বৃতো যুদ্ধে তত্রাভূন্মহিষাসুরঃ।
তোমরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ শক্তিভির্মুসলৈস্তথা।।৪৭

যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা খড়্গৈঃ পরশুপট্টিশৈঃ।
কেচিচ্চ চিক্ষিপুঃ শক্তী কেচিৎ পাশাংস্তথাপরে।।৪৮

মহিষাসুরের আরেক সেনাপতি চামর চতুরঙ্গিণী বাহিনী ও অন্য অসুরদের সঙ্গে নিয়ে দেবীর সাথে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করল। ষাট হাজার রথীদের সাথে নিয়ে উদগ্র নামে মহাসুর যুদ্ধ করল। এক কোটি রথী নিয়ে

মহাহনু নামে এক অসুর সেনাপতি যুদ্ধ করতে এগিয়ে এল। অসিলোমা পাঁচ কোটি সৈন্য, বাস্কলো ষাট লাখ রথী নিয়ে যুদ্ধ করতে এল। এইভাবে বিড়ালাক্ষ পাঁচ অর্বুদ এবং পরিবারিত নামে এক মহাসুর সহস্র হাতি ও অশ্বারোহী এবং এক কোটি রথীর বিরাট বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছে। এরা ছাড়াও অন্যান্য অনেক মহাসুরেরা রথ, হাতী, ঘোড়া, সৈন্যসামন্ত নিয়ে দেবীর সাথে যুদ্ধ করতে লাগল। মহিষাসুর নিজে কোটি কোটি সহস্র রথ, হাতী ও অশ্বারোহী সেনাদের নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করল। সবাই তোমর, ভিন্দিপাল, শক্তি, মুষল, খড়্গ, পরশু এবং পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা দেবীর সাথে যুদ্ধ করতে লাগল।

দেবীং খড়্গপ্রহারৈস্তু তে তাং হন্তুং প্রচক্রমুঃ।
সাপি দেবী ততস্তানি শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চণ্ডিকা।।৪৯

লীলয়ৈব প্রচিচ্ছেদ নিজশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী।
অনায়স্তাননা দেবী স্তূয়মানা সুরর্ষিভিঃ।।৫০

মুমোচাসুরদেহেষু শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চণ্ডিকা।
সোঽপি ক্রুদ্ধো ধুতসটো দেব্যা বাহনকেশরী।।৫১

চচারাসুরসৈন্যেষু বনেষ্বিব হুতাশনঃ।
নিঃশ্বাসান্মুমুচে যাংশ্চ যুধ্যমানা রণেঽম্বিকা।।৫২

ত এব সদ্যঃ সম্ভূতা গণাঃ শতসহস্রশঃ।
যুযুধুস্তে পরশুভির্ভিন্দিপালাসিপট্টিশৈঃ।।৫৩

নাশয়ন্তোঽসুরগণান্ দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ।
অবাদয়ন্ত পটহান্ গণাঃ শঙ্খাংস্তথাপরে।।৫৪

মৃদাঙ্গাংশ্চ তথৈবান্যে তস্মিন্ যুদ্ধমহোৎসবে।
ততো দেবী ত্রিশূলেন গদয়া শক্তিবৃষ্টিভিঃ।।৫৫

খড়্গাদিভিশ্চ শতশো নিজঘান মহাসুরান্।
পাতয়ামাস চৈবান্যান্ ঘণ্টাস্বনবিমোহিতান্।।৫৬

অসুরান্ ভুবি পাশেন বদ্ধা চান্যানকর্ষয়ৎ।
কেচিদ্দ্বিধাকৃতাস্তীক্ষ্ণৈঃ খড়্গপাতৈস্তথাপরে।।৫৭

অসুরদের কেউ কেউ খড়্গ দিয়ে দেবীকে বধ করতে উদ্যত হলে দেবীও অনায়াসে নিজের অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করে অসুরদের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রকে ছেদন করলেন। দেবীর চোখে মুখে কোন ক্লান্তির চিহ্ন মাত্র ছিল না, একদিকে দেবতা ও ঋষিরা দেবীর স্তুতি করছেন অন্য দিকে ভগবতী পরমেশ্বরী অসুরদের শরীরে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে থাকলেন। দেবীর বাহন সিংহও ক্রোধে কেশর ফুলিয়ে দাবানলের মত অসুরদের মধ্যে বিচরণ করতে লাগল। যুদ্ধ করতে করতে অম্বিকা দেবী যত নিঃশ্বাস ফেললেন, সব নিঃশ্বাস থেকে সঙ্গে সঙ্গে শত শত সহস্র সহস্র দেবীর গণ অর্থাৎ দেবীর সৈন্যরা উৎপন্ন হয়ে বিভিন্ন অস্ত্র দ্বারা অসুরদের বধ করতে থাকলেন। দেবীর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে সেই দেবীসৈন্যরা কাড়ানাকাড়া, শঙ্খ, মৃদঙ্গ ইত্যাদি বাজাতে বাজাতে অসুরসৈন্য নিধন করতে লাগলেন। দেবীও তাঁর নিজের ত্রিশূল, গদা, শক্তি অস্ত্র বর্ষণ করে শত শত মহাসুর বিনাশ করতে থাকলেন। আবার তাঁর ঘণ্টার ভয়ঙ্কর ধ্বণি দিয়ে অনেক সৈন্যকে বিমোহিত করে বধ করলেন। কতকগুলি অসুরকে দেবী পাশবদ্ধ করে মাটিতে ফেলে বধ করলেন, তীক্ষ্ণ তরোয়ালের আঘাতে কত যে অসুরের শরীর দু টুকরো হয়ে প্রাণত্যাগ করল তার ইয়ত্তা নেই।

বিপোথিতা নিপাতেন গদয়া ভুবি শেরতে।
বেমুশ্চ কেচিদ্রুধিরং মুষলেন ভৃশং হতাঃ।।৫৮

কেচিন্নিপাতিতা ভূমৌ ভিন্নাঃ শূলেন বক্ষসি।
নিরন্তরাঃ শরৌঘেন কৃতাঃ কেচিদ্রণাজিরে।।৫৯

সেনানুকারিণঃ প্রাণান্ মুমুচুস্ত্রিদশার্দনাঃ।
কেষাঞ্চিদ্ বাহবশ্ছিন্নাশ্ছিন্নগ্রীবাস্তথাপরে।।৬০

শিরাংসি পেতুরন্যেষামন্যে মধ্যে বিদারিতাঃ।
বিচ্ছিন্নজঙ্ঘাস্ত্বপরে পেতুরুর্ব্যাং মহাসুরাঃ।।৬১

একবাহ্বক্ষিচরণাঃ কেচিদ্দেব্যা দ্বিধাকৃতাঃ।
ছিন্নেহপি চান্যে শিরসি পতিতাঃ পুনরুত্থিতাঃ।।৬২

কবন্ধা যুযুধুর্দেব্যা গৃহীতপরমায়ুধাঃ।
ননৃতুশ্চাপরে তত্র যুদ্ধে তূর্যলয়াশ্রিতাঃ।।৬৩

কিছু অসুর দেবীর গদাঘাতে চূর্ণ হয়ে যুদ্ধভূমিতেই পতিত হয়ে গেল। অনেক অসুর সৈন্য আবার মুষলাঘাতে আহত হয়ে রক্তবমন করতে শুরু করল। কোন কোন অসুর সর্বাঙ্গে বাণবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করল। কারও কারও বাহু ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল, কারুর ঘাড় ভেঙে গেল। কারুর কারুর মস্তক শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল, কারুর দেহের মধ্যভাগ বিদীর্ণ হয়ে গেল। কোন কোন অসুরের জঙ্ঘা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। দেবী অনেক অসুরের এক চক্ষু, এক বাহু, এক পা করে দ্বিখণ্ডিত করে মাটিতে লুটিয়ে দিলেন। তার মধ্যে কিছু অসুর মস্তকহীন হয়েও মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দেবীর সাথে যুদ্ধ করতে থাকল। অনেক কবন্ধ আবার যুদ্ধের বাজনার তালে তালে নৃত্য করতে থাকল।

কবন্ধাশ্ছিন্নশিরসঃ খড়্গশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তো দেবীমন্যে মহাসুরাঃ।।৬৪

পাতিতৈ রথনাগাশ্বৈরসুরৈশ্চ বসুন্ধরা।
অগম্যা সাহভবত্তত্র যত্রাভূৎ স মহারণঃ।।৬৫

শোণিতৌঘা মহানদ্যঃ সদ্যস্তত্র বিসুস্রুবঃ।
মধ্যে চাসুরসৈন্যস্য বারণাসুরবাজিনাম্।।৬৬

ক্ষণেন তন্মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকা।
নিন্যে ক্ষয়ং যথা বহ্নিস্তৃণদারুমহাচয়ম্।।৬৭

স চ সিংহো মহানাদমুৎসৃজন্ ধূতকেশরঃ।
শরীরেভ্যোহমরারীনামসূনিব বিচিন্বতি।।৬৮

দেব্যা গণৈশ্চ তৈস্তত্র কৃতং যুদ্ধং তথাসুরৈঃ।
যথৈষাং তুতুষুর্দেবাঃ পুষ্পবৃষ্টিমুচো দিবি।।৬৯

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
মহিষাসুরসৈন্যবধো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।।

কিছু কিছু কবন্ধ খড়্গ, শক্তি ও ঋষ্টি হাতে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল আর কোন কোন মহাসুররা ‘দাঁড়াও, দাঁড়াও’ বলে দেবীক যুদ্ধে আহ্বাণ করতে লাগল। যেখানে এই বিশাল মহাযুদ্ধ হয়েছিল, পৃথিবীর সেই জায়গাগুলো রথ, হাতী, ঘোড়া আর অসুরের মৃতদেহে এমন স্তূপীকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, সেখানে চলাফেরাও করা যাচ্ছিল না। অসুর সৈন্যদের হাতী, ঘোড়া ও মৃতদেহের রক্তে অল্প ক্ষণের মধ্যে সেখানে বড় বড় রক্ত নদী বইতে লাগল। অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ যেমন তৃণ ও কাঠের বিশাল বিশাল স্তূপকে মুহূর্তের মধ্যে ভস্মিভূত করে দেয়, ঠিক তেমনি জগদম্বা ক্ষণকাল মধ্যে অসুরদের বিশাল সৈন্যকে বিনাশ করে দিলেন। দেবীর বাহন সিংহও কেশর ফুলিয়ে ভয়ঙ্কর গর্জন করতে করতে অসুরদের দেহ থেকে প্রাণ নিংড়ে নিচ্ছিল। যুদ্ধে দেবীর সৈন্যরা সেই অসুরদের সাথে এমন ভীষণ যুদ্ধ করলেন যে আকাশ থেকে দেবতাগণ আনন্দিত হয়ে তাঁদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করছিলেন।

. . . .

শ্রীশ্রীচণ্ডীর তৃতীয় অধ্যায়ে প্রবেশ করার আগে মায়া আর শক্তি এই দুটোর মধ্যে তফাৎ কোথায় সেটাকে আরও একটু বিস্তৃত করে ব্যাখ্যা করা নেওয়ার প্রয়োজন আছে। মায়া আর শক্তিকে নিয়ে যে পৃথক দুটো দর্শন আমাদের পরম্পরাতে চলে আসছে, ভগবানের অস্তিত্বকে এই দুটো দর্শনই স্বীকার করে। যিনি বেদান্তী তিনিও ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানছেন আর যিনি শাক্ত বা ভক্তিমার্গের পথিক তিনিও ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মানেন। কিন্তু জগতের ব্যাপারে এসে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে যায়। জগৎ কি আদৌ বাস্তবিক নাকি এর কোন অস্তিত্ব নেই? জগৎ যদি বাস্তবিক হয়ে থাকে তাহলে জগৎ ভগবান থেকেই এসেছে। ভগবান থেকে যদি জগৎ এসে থাকে তাহলে এটাই ভগবানের শক্তি বা ভগবানের লীলা। আর জগৎ যদি বাস্তবিক না হয় তাহলে এটাই মায়া। বেদান্তী বলছে জগতের কোন অস্তিত্ব নেই। বেদান্তীরা বলবে – তুমি যে জগৎ দেখছ এর কোন অস্তিত্ব নেই। যদি বেদান্তীদের জিজ্ঞাসা করা হয় – আমি আমার সামনে যা কিছু দেখছি এগুলো তাহলে কী দেখছি? বেদান্তীরা এর উত্তরে বলবে, তুমি যা দেখছ ঠিকই দেখছ, তুমি ভগবানকেই দেখছ। তুমি যে বলছ এ পুরুষ, ও নারী, এরা মানুষ, ওরা পশু, এটাই মায়া। মায়াতে তুমি যা কিছু দেখছ সব ভুল দেখছ। আবার এও বলছে না যে সব শূন্য। এই ধরণের কথা একদিন দুদিন শুনলে ধারণা হয় না, শুনতে শুনতে, অনেক চিন্তা-ভাবনা করতে করতে এই কথাগুলো পরিষ্কার হবে। মরীচিকাতে জল দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে কোন বস্তুই নেই কিন্তু জল দেখা যাচ্ছে। এখানে মায়া কিন্তু মরীচিকার মত কিছুই নেই সেই অর্থে আসছে না। এখানে মায়া বলতে বোঝাচ্ছে, জিনিষটা আছে কিন্তু যে রকম আছে সেই রকম না দেখিয়ে অন্য রকম দেখাচ্ছে। মায়াকে বোঝাবার জন্য এনারা তাই জল আর ঢেউয়ের সহজ উপমা নেন। ঢেউ তো আসলে জল ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু জলের একটা রূপ এসে যাচ্ছে আর সেই রূপের নাম দেওয়া হল ঢেউ। ঢেউ একটা নাম আর রূপ। যদি বলা হয় ঢেউ জল থেকে আলাদা, তখন ঢেউ হয়ে যাবে জলের শক্তি। আবার যদি বলা হয় ঢেউ তো আসলে জলই, শুধু নাম আর রূপে জল থেকে আলাদা, তখন এটাই হয়ে যাবে মায়া। মায়া আর শক্তিতে এটাই তফাৎ - যে জিনিষটা সামনে এসে পড়েছে সেটা বাস্তবিক না অবাস্তবিক। বেদান্তীরা বলবে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। তাহলে আমরা সামনে যা কিছু দেখছি এগুলো কি? বেদান্তীরা বলবে এগুলো নাম আর রূপের খেলা। খেলা মানে মিথ্যা, মিথ্যা মানে মায়া। মায়া মানে মা+যা, 'মা' মানে নেই আর 'যা' মানে অস্তিত্ব, যার কোন অস্তিত্ব নেই সেটাই মায়া। কিন্তু ভক্ত বলবে, এই যা কিছু দেখছ এগুলো সব ভগবান নিজেই হয়েছেন বা জগৎ তাঁরই লীলা। তিনি নিজে হয়েছেন বা তাঁর লীলা বলা মানে ভগবানের শক্তি।

আমরা সবাই মানুষকে মানুষ রূপেই দেখছি। কিন্তু ঠাকুর মানুষকে কি রূপে দেখবেন? যখন তিনি অদ্বৈত ভাবে থাকবেন তখন বলবেন নাম-রূপের খেলা। ঠাকুর সবাইকে দেখছেন একটা খোলস মাত্র কিন্তু ভেতরে সেই সচ্চিদানন্দ। খোলস মানে আবরণ, আবরণ মানেই মায়া। আবার ঠাকুর বলছেন – দেখছি তিনিই সব কিছু হয়েছেন। তখন এটাই ভগবানের শক্তি। আপনার আমার দৃষ্টিভঙ্গীর তফাতে জগতের সৃষ্টিতে যা কিছু আছে হয় সবই মায়া আর নয়তো শক্তির বিলাস। ভক্ত বলবে এই জগৎ ভগবানের শক্তির বিলাস আর বেদান্তীরা বলবে জগৎ তাঁর মায়া। শুধু দৃষ্টিভঙ্গীতে এই তফাৎ কিন্তু তত্ত্বতঃ মায়া আর শক্তিতে কোন তফাৎ নেই। তত্ত্বতঃ কোন তফাৎ না থাকতে পারে কিন্তু দর্শনের দিক থেকে বিরাট তফাৎ হয়ে যায়। মায়াকে নিয়ে যখন কেউ চলে তখন দর্শন শাস্ত্র এক রকম চলবে আর শক্তিকে নিয়ে চললে দর্শন শাস্ত্র পুরো অন্য রকম চলবে।

তন্ত্র মতে সৃষ্টি, জীব, জগৎ পুরো শক্তির বিলাস। অন্য দিকে বেদান্ত মতে সবটাই মায়ার খেলা। আমরা যে চণ্ডীকে নিয়ে আলোচনা করছি, এই চণ্ডী আগাগোড়া বিশেষ কোন দর্শনকে কাটা কাটা ভাবে সামনে নিয়ে আসছে না। অন্য দিকে উপনিষদ পুরোপুরি একটা দর্শনকেই প্রথম থেকে কট্টর ভাবে ধরে নিয়ে এগিয়ে গেছে। ঠাকুরও একটা দর্শনকেই আঁকড়ে ধরে থাকছেন না, কিন্তু তিনি একটা আধ্যাত্মিক সত্যকে জগদ্বাসীর সামনে তুলে ধরছেন। আধ্যাত্মিক সত্যকে যখন দিচ্ছেন তখন যেটাই মায়া সেটাই শক্তি হয়ে যাবে। অধ্যাত্ম-রামায়ণেও যাকে মায়া বলছে তাকেই আবার শক্তি বলছে, যেটাই প্রকৃতি সেটাই শক্তি, যেটাই শক্তি সেটাই মা সীতা, সবই এক। কিন্তু যেখানে কট্টর বেদান্ত মতে চলবে মায়া আলাদা শক্তি আলাদা, যখন শক্তিকে নিয়ে চলছে তখন সেখানে শুধু শক্তিকে নিয়েই চলবে, যখন মায়া তখন সেখানে শুধু মায়াকে নিয়েই চলবে, এখানে দুটোই আলাদা। মায়ার ব্যাপারে যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তখন শুধু জল আর ঢেউয়ের উপমাটা নিয়ে ভাবলে মায়া ও শক্তির ব্যাপারটা

পরিষ্কার হয়ে যাবে। গঙ্গায় যে অনবরত ঢেউ উঠছে, এই ঢেউকে আপনি কি রূপে দেখছেন? যদি জল রূপে দেখেন তাহলে ঢেউটা মায়া, যদি ঢেউকে ঢেউ রূপে দেখেন তাহলে ঢেউ জলেরই শক্তি, শক্তির খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। যেটাই মায়া সেটাই শক্তি, আবার অনেকে বলবে যেটাই শক্তি সেটাই মায়া।

এখন যদি কেউ প্রশ্ন করেন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে কোন দর্শনকে শ্রেষ্ঠ মনে করব? মায়ার দর্শনকে বড় মনে করব নাকি শক্তির দর্শনকে বড় মনে করব? বলা খুব মুশকিল। বেদান্তীরা জল থেকে যে ঢেউয়ে পরিবর্তন হচ্ছে, এই পরিবর্তনকেও মানবে না, বেদান্তী বলবে ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। ভক্তরাও তাই বলে, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু ভক্ত পরিবর্তনটাকে সত্য মনে করে। এগুলো ভুল কিছু নয়, শুধু দৃষ্টিভঙ্গীতে তফাৎ, জগতকে আপনি কি ভাবে দেখছেন। চণ্ডীতে কখন তাঁকে বলছেন মহামায়া আবার কখন বলছেন শক্তি। চরম বিশ্লেষণে চলে যাওয়ার পর সেখানে আর কোন তফাৎ খুঁজে পাওয়া যাবে না। শেষে গিয়ে হয় দেখবেন ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, আর নয় তো দেখবেন ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। যাঁরা মায়ের ভক্ত তাঁরা বলবেন সব মায়ের শক্তি, মা ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু জ্ঞানীরা বলবেন ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, তুমি যা কিছু দেখছ এগুলো তোমার মনের ভুল আর এই মনের ভুলটাও সেই মহামায়া থেকেই এসেছে।

মায়া আর মহামায়া একই, মায়া বলা হয় ব্যষ্টিতে আর সমষ্টিতে মহামায়া বলছেন। দেবী রূপে যখন দেখছেন তখন মহামায়া রূপে দেখছেন, আর যখন ওটাকেই ছলনা রূপে দেখছেন তখন মায়া বলছেন। মা কালীকে তো মায়া বলা যাবে না, কারণ মায়া নিকৃষ্ট শব্দ, তাই বলছেন মহামায়া যিনি পুরো জগতকে ভুলিয়ে রেখেছেন – ভুবনমনমোহিনী, তিনি সমগ্র ভুবনের মনকে মোহিত করে রেখেছেন। এই যে মোহিত করে রেখেছেন, এটা তো কোন ছলনা নয়, এই মোহিত বাস্তবিক, তাই মহামায়া বলছেন। প্রচণ্ড গরমে দুপুরের রোদে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন, দূরে দেখছেন জল, এটাই মরীচিকা। মরীচিকা আরও নিকৃষ্ট, মায়া তার থেকে উপরে, আর মহামায়া সবার উপরে।

যাই হোক আমরা এখন চণ্ডীর মূল আলোচনায় চলে আসছি। তৃতীয় অধ্যায় মহিষাসুরের বধ কীভাবে হয়েছে তারই বর্ণনা করছে। মহিষাসুর একদিকে অসুরদের রাজা, অন্য দিকে সে প্রচণ্ড ক্ষমতাবান, যুদ্ধ কৌশল, অস্ত্রচালনায় সিদ্ধহস্ত, তার সঙ্গে মহিষাসুরের আরেকটি বড় ক্ষমতা ছিল, সে নিজের রূপ পরিবর্তন করতে পারত। রূপ পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। গ্রীকদের পৌরাণিক কাহিনীতে যে রূপ পরিবর্তনের ব্যাপারটা দেখা যায় তাতে একজন এমন কিছু খারাপ কাজ করেছে যার জন্য সে গাছ হয়ে গেছে, কিন্তু নিজের ইচ্ছে মত যখন তখন রূপ পরিবর্তন করাটা গ্রীক পৌরাণিকে নেই। আরব্য রজনীর কাহিনীতে রূপ পরিবর্তনের ধারণা পাওয়া যায়, সেখানেও কোন জাদুকর কারুকে ভেড়া বানিয়ে দিচ্ছে। আবার অন্য কোন জাদুকর এসে মন্ত্র দিয়ে ভেড়ার রূপটা সরিয়ে দিতে তার আসল রূপ চলে আসছে। হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনীতে ইন্দ্রের নামে সবচেয়ে বেশি রূপ পরিবর্তন করার কথা পাওয়া যায়। বেদেই ইন্দ্রের নামে বলছে ইন্দ্র মায়ার জোরে অনেক রূপ ধারণ করতে পারেন। ইন্দ্র যখন অহল্যার কাছে গেলেন তখন তিনি অহল্যার স্বামী গৌতম মুনির রূপ ধারণ করেছিলেন। দ্বিতীয় নাম আসে বিষ্ণুর নামে, ভগবান বিষ্ণুরও অনেক রূপ ধারণ করার ক্ষমতা ছিল, তিনি চাইলে যে কোন রূপ ধারণ করে নিতে পারতেন। পরের দিকে আস্তে আস্তে অন্যান্য দেবতা বা অসুরদের মধ্যেও এই ক্ষমতা দেখানো হয়েছে। হিন্দুদের দেবতা বা অসুরদের এই রূপ ধারণ করাটা কোন জাদুবিদ্যা নয়, এটাই একটা তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা ছিল। যোগশাস্ত্রে যেখানে অণিমা, লঘিমা, গরিমা ইত্যাদি এই ধরণের যোগসিদ্ধির কথা বলা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে যোগীদের মধ্যে এমন এমন যোগসিদ্ধি এসে যায় যার জন্য তাঁরা নিজের ইচ্ছে মত খুব হাল্কা তুলোর মত, কখন পাথরের মত ভারী করে নিতে পারেন। মানবিক চরিত্রের মধ্যে হনুমান নিজেকে কখন খুব ছোট্ট আবার কখন বিশাল আকার ধারণ করে নিতে পারতেন। এই ধরণের ক্ষমতা হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতে প্রথম থেকেই ছিল, তার মধ্যে মহিষাসুরেরও এই ক্ষমতা ছিল। পৌরাণিক কাহিনীর বাইরে অন্যান্য যেসব কাহিনী আমাদের সাহিত্যে পাওয়া যায়, বিশেষ করে বিক্রমাদিত্যের কাহিনীতে রূপ পরিবর্তনের অনেক বর্ণনা এসে গিয়েছিল। রূপ পরিবর্তনের এই ধারণাই পরে বহুরূপী হয়ে আমাদের মধ্যে চিরস্থায়ী হয়ে গেছে। যাই হোক, মহিষাসুরের এই বৈশিষ্ট্য ছিল, সে যে কোন রূপ ধারণ করে নিতে পারত। মহিষাসুর যে রূপ

ধারণ করে নিত তখন তার মতই তার আচার ব্যবহার করত। যেমন সে যদি সিংহের রূপ ধারণ করে নেয় তখন তার যে শক্তি সেটা সিংহের মত বেরিয়ে আসবে, যদি সাপের রূপ ধারণ করে নেয় তখন সে সাপের মত আচরণ করতে থাকবে। বেতালের কাহিনীতে এই ধরণের একটা বর্ণনা আছে যেখানে বিক্রমাদিত্য আর এক জাদুকরের লড়াই হচ্ছে। জাদুকর একটা সাপ হয়ে বিক্রমাদিত্যকে ছোবল দিতে যাচ্ছে, তখন বিক্রমাদিত্য সঙ্গে সঙ্গে একটা বাজপাখী হয়ে সাপকে পায়ের নখ দিয়ে ধরতে গেছে। জাদুকর আবার সাথে সাথে সাপের রূপ পাল্টে কুকুরের রূপে নিয়ে নিয়েছে। কুকুরের রূপ পাল্টে নিতেই বিক্রমাদিত্য সঙ্গে সঙ্গে সিংহের রূপ ধারণ করে জাদুকরকে আক্রমণ করছে। অনবরত দুজন রূপ পাল্টেই যাচ্ছে। এই রূপকে প্রতিহত করার জন্য আরেকটা রূপ দরকার। যে শরীর ধারণ করত তখন সেই শরীরের ধর্ম আর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীই সে সব কিছু করত। মহিষাসুরের এই ক্ষমতাটা ছিল। এই অধ্যায়ে বর্ণনা আছে মহিষাসুর কীভাবে একের পর এক রূপ পাল্টে যাচ্ছে। মহিষাসুর সাধারণত মানুষ রূপেই থাকত, কিন্তু যখন যেমন যেমন দরকার হত সেই অনুযায়ী সে রূপ পাল্টে নিত।

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

(সেনাপতিগণ সহ মহিষাসুর বধ)

ওঁ ঋষিরুবাচ।।১

নিহন্যমানং তৎ সৈন্যমবলোক্য মহাসুরঃ।
সেনানীশ্চিক্ষুরঃ কোপাদ্ যযৌ যোদ্ধুমথাম্বিকাম্।।২

স দেবীং শরবর্ষেণ ববর্ষ সমরেঽসুরঃ।
যথা মেরুগিরেঃ শৃঙ্গং তোয়বর্ষেণ তোয়দঃ।।৩

তস্য ছিত্ত্বা ততো দেবী লীলয়ৈব শরোৎকরান।
জঘান তুরগান্ বাণৈর্যন্তারঞ্চৈব বাজিনাম্।।৪

চিচ্ছেদ চ ধনুঃ সদ্যো ধ্বজঞ্চাতিসমুচ্ছ্রিতম্।
বিব্যাধ চৈব গাত্রেষু ছিন্নধন্বানমাশুগৈঃ।।৫

মহিষাসুর ছিল অসুরদের রাজা। মহিষাসুরের আবার অনেক সেনাপতি ছিল তারা সবাই মহাসুর। অসুর সৈন্যরা দেবী কর্তৃক নিহত হওয়াতে মহিষাসুর আর তার সেনাপতিরা সবাই ক্রোধে আরক্ত হয়ে গেছে। এক এক করে সব সেনাপতিরা দেবী অম্বিকার সাথে যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসছে। কিন্তু মা হলেন শক্তিস্বরূপিণী, সমস্ত শক্তির পুঞ্জীভূত রূপ হলে মা অম্বিকা। যিনি শক্তিস্বরূপিণী তাঁর সাথে কার সাধ্যি যুদ্ধ করবে! দাবানলে একটা জ্বলন্ত দেশলাই ফেললে দাবানলের কী আর হবে! প্রথমে সেনাপতি চিক্ষুর প্রচণ্ড ক্রোধে আরক্ত হয়ে দেবীর সাথে যুদ্ধ করতে এসেছে। এখানে উপমা দিয়ে কল্পনা করতে সাহায্য করা হচ্ছে কীভাবে চিক্ষুর দেবীকে তীর নিক্ষেপ করতে থাকল। বলছেন, মেঘ যেমন পাহাড়ের চূড়াকে বারিবর্ষণের দ্বারা আচ্ছাদিত করে দেয়, ঠিক তেমনি চিক্ষুরও দেবীর উপর এমন বাণ বর্ষণ করতে লাগল যে বাণের জালে দেবী যেন ঢাকার পড়ে গেছেন। কিন্তু দেবী তাঁর নিজের বাণ দ্বারা চিক্ষুরের সমস্ত বাণ বিনা আয়াসেই ছেদন করে তার রথের সারথি ও অশ্বগুলিকে বধ করে দিলেন। এর সাথে চিক্ষুরের ধনু ও রথের অতি উচ্চ ধ্বজাকেও কেটে দিলেন। চিক্ষুর এখন ধনুকহীন, এই সুযোগে দেবী তার সর্বাঙ্গ বাণ দিয়ে বিদ্ধ করে দিলেন।

স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
অভ্যাধাবত তাং দেবীং খড়্গচর্মধরোঽসুরঃ।।৬

সিংহমাহত্য খড়্গেন তীক্ষ্ণধারেণ মূর্ধনি।
আজঘান ভুজে সব্যে দেবীমপ্যতিবেগবান্।।৭

তস্যাঃ খড়্গো ভুজং প্রাপ্য পফাল নৃপনন্দন।
ততো জগ্রাহ শূলং স কোপাদরুণলোচনঃ।।৮

চিক্ষেপ চ ততস্তত্তু ভদ্রকাল্যাং মহাসুরঃ।
জাজ্জ্বল্যমানং তেজোভী রবিবিম্বমিবাম্বরাৎ।।৯

দৃষ্টা তদাপতচ্ছুলং দেবী শূলমমুঞ্চত।
তচ্ছূলং শতধা তেন নীতং স চ মহাসুরঃ।।১০

চিক্ষুরের এখন কিছুই নেই। কিন্তু তখনও সে ছাড়ছে না, সে এখন খড়্গ আর ঢাল নিয়ে দেবীকে আঘাত করার জন্য ধাবিত হল। প্রথমে ধারালো খড়্গ দিয়ে সিংহের মস্তকে আঘাত করল, সাথে সাথে দেবীর বাম হস্তেও খড়্গ দিয়ে খুব জোরে আঘাত করল। সূরথ রাজাকে মেধস ঋষি বলছেন, হে নৃপ! দেবীর বাহুতে লেগে চিক্ষুরের সেই খড়্গ টুকরো টুকরো হয়ে গেল। খড়্গ ভেঙে যেতেই চিক্ষুর একটা শূল নিয়ে ভদ্রকালীর প্রতি নিক্ষেপ করল। আকাশে উঠেই সেই শূলটি সূর্যের মত নিজের তেজে জ্বলে উঠল। সেই জ্বলন্ত শূলকে নিজের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে দেবীও তাঁর নিজের শূল নিক্ষেপ করলেন। দেবীর শূল চিক্ষুরের শূলকে শত টুকরো করে দিল আর সেই সাথে চিক্ষুরের শরীরটাও শত টুকরো হয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেল।

হতে তস্মিন্ মহাবীর্যে মহিষস্য চমূপতৌ।
আজগাম গজারূঢ়শ্চামরস্ত্রিদশার্দনঃ।।১১

সোঽপি শক্তিং মুমোচাথ দেব্যাস্তামম্বিকা দ্রুতম্।
হুঙ্কারাভিহতাং ভূমৌ পাতয়ামাস নিষ্প্রভাম্।।১২

ভগ্নাং শক্তিং নিপতিতাং দৃষ্টা ক্রোধসমন্বিতঃ।
চিক্ষেপ চামরঃ শূলং বাণৈস্তদপি সাচ্ছিনৎ।।১৩

ততঃ সিংহঃ সমুৎপত্য গজকুম্ভান্তরস্থিতঃ।
বাহুযুদ্ধেন যুযুধে তেনোচ্চৈস্ত্রিদশারিণা।।১৪

যুধ্যমানৌ ততস্তৌ তু তস্মান্নাগান্মহীঙ্গতৌ।
যুযুধাতেঽতিসংরব্ধৌ প্রহারৈরতিদারুণৈঃ।।১৫

মহাপরাক্রমশালী সেনাপতী চিক্ষুর নিহত হলে দেবতাদের আরেক শত্রু চামর হাতির পিঠে চেপে যুদ্ধ করতে এল। চামরও দেবীর প্রতি শক্তি অস্ত্র প্রয়োগ করতে থাকল। কিন্তু জগদম্বা এক হুঙ্কারেই সেই শক্তি অস্ত্রকে প্রতিহত এবং নিষ্প্রভ করে ভূতলে ফেলে দিলেন। শক্তি অস্ত্রকে ভগ্নাবস্থায় মাটিতে ধরাশায়ী হতে দেখে চামর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে গেছে, সে তখন ক্রোধভরে এক শূল নিক্ষেপ করল। কিন্তু দেবী সেই শূলকেও বাণ দিয়ে তৎক্ষণাৎ কেটে দিলেন। ইতিমধ্যে দেবীর বাহন সিংহ এক লাফে হাতীর মাথায় চেপে বসে চামরাসুরের সঙ্গে বাহুযুদ্ধ করতে লাগল। দুজনে যুদ্ধ করতে করতে হাতীর উপর থেকে মাটিতে নেমে এসে দুজনেই ক্রোধভরে বাহু দিয়ে এক অপরকে প্রচণ্ড আঘাত করতে লাগল।

ততো বেগাৎ খমুৎপাত্য নিপত্য চ মৃগারিণা।
করপ্রহারেণ শিরশ্চামরাস্য পৃথক্ কৃতম্।।১৬

উদগ্রশ্চ রণে দেব্যা শিলাবৃক্ষাদিভির্হতঃ।
দন্তমুষ্টিতলৈশ্চৈব করালশ্চ নিপাতিতঃ।।১৭

দেবী ক্রুদ্ধা গদাপাতৈশ্চূর্ণয়ামাস চোদ্ধতম্।
বাস্কলং ভিন্দিপালেন বাণৈস্তাম্রং তথান্ধকম্।।১৮

উগ্রাস্যমুগ্রবীর্যঞ্চ তথৈব চ মহাহনুম্।
ত্রিনেত্রা চ ত্রিশূলেন জঘান পরমেশ্বরী।।১৯

বিড়ালস্যাসিনা কায়াৎ পাতয়ামাস বৈ শিরঃ।
দুর্ধরং দুর্মুখঞ্চোভৌ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্।।২০

যুদ্ধ করতে করতে সিংহ হঠাৎ লাফিয়ে ভীষণ বেগে আকাশে উঠে গিয়ে আবার সবেগে নীচে নামার সময় করাঘাতে চামরের মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। দেবী যুদ্ধক্ষেত্রে এইভাবে উদগ্রাসুরকে শিলা ও বৃক্ষের আঘাতে নিহত করলেন, করালাসুরকে দন্ত, মুষ্টি ও চপেটাঘাতে ধরাশায়ী করলেন। ক্রুদ্ধা হয়ে দেবী গদাঘাতে উদ্ধতাসুরকে বধ করলেন, ভিন্দিপাল দিয়ে বাস্কলাসুরকে আর বাণ দ্বারা তাম্রাসুর ও অন্ধকাসুরকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন। ত্রিনয়না পরমেশ্বরী মা ত্রিশূল দ্বারা উগ্রাস্য, উগ্রবীর্য ও মহাহনু নামক অসুরদের বধ করলেন। তরোয়ালের আঘাতে বিড়ালাসুরের শরীর থেকে মস্তক ছিন্ন করে দিলেন। দুর্ধর আর দুর্মুখ এই দুই অসুরকেও দেবী বাণ দ্বারা যমালয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

এবং সংক্ষীয়মাণে তু স্বসৈন্যে মহিষাসুরঃ।
মাহিষেণ স্বরূপেণ ত্রাসয়ামাস তান্ গণান্।।২১

এর আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম রণক্ষেত্রে মা যখন যুদ্ধ করছিলেন তখন অম্বিকাদেবী যত নিঃশ্বাস ফেলছিলেন, সেই নিঃশ্বাস থেকে শত শত সহস্র সহস্র দেবীর সৈন্যের উৎপন্ন হয়েছিল। দেবীর সৈন্যরাও মায়ের শক্তিতে অত্যন্ত শক্তিমান। মহিষাসুর নিজের সেনাপতিদের নিহত হতে দেখে আর ক্রমশঃ অসুর সৈন্যের ক্ষয় হতে দেখে এবার সে নিজেই একটা মহিষের রূপ ধারণ করে দেবীর সৈন্যদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করতে শুরু করল। দেবী সৈন্যদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করার একটাই পথ, মহিষের রূপ ধারণ করে এদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া। প্রাচীন ভারতের যুদ্ধ কৌশলের উপর একটা বই আছে, তাতে একটা মজার ব্যাপার বলছে যে ভারতের পদাতিক বাহিনী বরাবরই খুব দুর্বল ছিল। সেইজন্য বিদেশ থেকে যত আক্রমণ ভারতের উপরে হয়েছে সব সময়ই ভারত মার খেয়ে এসেছে। পদাতিক বাহিনীর বাইরে অনেকে ছিল যারা সৈন্য, ঘোড়া, হাতিদের জন্য খাদ্য, জল সরবারহ করে যেত, এদেরকেও তারা সৈন্যের মধ্যে ধরে নিত। তাদের মধ্যেও কিছু সৈন্য থাকত যারা তীর ধনুক ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে যেত। যারা জাত যোদ্ধা তারা কখন সাধারণ লোকের উপর আক্রমণ করত না। মহাভারত যুদ্ধের আগে দু পক্ষ থেকে যুদ্ধের কিছু নিয়ম ঠিক করা হয়েছিল, যেখানে একটা নিয়ম ছিল রথে যারা আছে তারা রথীর সঙ্গে লড়াই করবে, হাতীর পিঠে যারা আছে তারা হাতীর সঙ্গেই লড়াই করবে, ঠিক তেমনি ঘোড়ার সঙ্গে ঘোড়ার, পদাতিক পদাতিকের সঙ্গে লড়াই করবে। এর মধ্যে আবার এই দৃশ্যও দেখা যেত, যখন দুজন বড় যোদ্ধা পরস্পর লড়াই করছে, মনে করুন অর্জুন আর দ্রোণের মধ্যে লড়াই চলছে আর দ্রোণ হয়ত হেরে পালিয়ে গেলেন বা মারা গেলেন, তখন নিয়ম হল দ্রোণের বাকি যত সৈন্যরা ছিল সবাইকে এবার প্রাণ ছেড়ে পালাতে হবে। এটাই নিয়ম ছিল। যদি না পালায় তাহলে তোমাদের সবাইকে মরতে হবে। দ্রোণ হেরে গিয়ে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছে, দ্রোণের সৈন্যরা যদি না পালিয়ে যায় তাহলে অর্জুন সবাইকে বাণ চালিয়ে মেরে দিত। দ্রোণাচার্যের পতন হওয়া মানে তার সৈন্যদেরো পতন হয়ে যাওয়া। এরপর এরা কেউ আর যুদ্ধ করবে না। যুদ্ধক্ষেত্র যদি পালিয়ে যায় তখন কেউ তাকে আর আক্রমণ করবে না। কিন্তু যদি না পালায় তখন যিনি জিতেছেন তিনি কয়েক'শ বাণ তাদের উপর চালিয়ে দেবেন। মহাভারতের যুদ্ধে এই নিয়মটা ছিল। পরবর্তি কালেও রাজা-রাজাদের যুদ্ধে এই নিয়মটা চলে আসছিল। ঠিক তেমনি কোন সেনাপতি যদি দেখে তার সৈন্যরা পালিয়ে গেছে তখন সে দুর্বল হয়ে যেত, কারণ তখন তার অস্ত্র ও রসদ সরবরাহের লাইনটাই ভেঙে যাবে।

মুসলমানরা যখন ভারতে আক্রমণ করল সেই সময় তাদের পদাতিক বাহিনী প্রচণ্ড বর্বর ও হিংস্র ছিল। ভারতের সৈন্যরা সেইজন্য এদের সামনে দাঁড়াতে পারল না। যার ফলে দেখা যেত মুসলমানরা হয়তো পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে এসেছে আর এরা হয়তো পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে এসেছে, কিন্তু এই পাঁচ হাজারই পঞ্চাশ হাজারকে পিটিয়ে শেষ করে দিত। এখানে মহিষাসুর ঠিক তাই করছে, মহিষাসুর এমন হিংস্রতার রূপ নিয়ে চারিদিকে তীব্র বেগে বিচরণ করতে শুরু করেছে যে, যাতে ওই দেখে দেবীর সৈন্যরা ভয়ে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়।

কাংশ্চিত্তুণ্ডপ্রহারেণ খুরক্ষেপৈস্তথাপরান্।
লাঙ্গুলতাড়িতাংশ্চান্যান্ শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ বিদারিতান্।।২২

মহিষাসুর এখন মাহিষের রূপ ধারণ করে তার পরাক্রম দেখাতে শুরু করেছে। মাহিষের বিশাল মুখ, বলিষ্ঠ পা, পায়ের ক্ষুর, শিং, লেজ এগুলোকে ব্যবহার করে দেবীর গণদের অর্থাৎ দেবীর নিঃশ্বাসের সাথে যত সৈন্যেরা বেরিয়ে এসেছিল, তাদের পীড়িত করতে লাগল। কাউকে মুখ দিয়ে আঘাত করে, কিছু সৈন্যকে খুর দিয়ে প্রহার করে ব্যাতিব্যস্ত করে তুলল। গরু তার লেজ দিয়ে যেমন মশা-মাছি তাড়ায় ঠিক তেমনি মহিষাসুর তার লেজ দিয়েই দেবীর সৈন্যদের বিদীর্ণ করে দিল। শুধু তাই না বলছেন –

বেগেন কাংশ্চিদপরান্ নাদেন ভ্রমণেন চ।
নিঃশ্বাসপবনেনান্যান্ পাতয়ামাস ভূতলে।।২৩

মহিষ তার প্রবল গতি দ্বারা কিছু সৈন্যকে, কিছুকে গর্জনের দ্বারা আবার কাউকে চক্রাকারে ছোটাছুটি করিয়ে তাড়িত করে দিল। মহিষাসুরের নিঃশ্বাসের এমন শক্তি যে তাতেই দেবীর সৈন্যরা ভূতলশায়ী হয়ে গেল।

নিপাত্য প্রমথানীকমভ্যধাবত সোহসুরঃ।
সিংহং হন্তুং মহাদেব্যাঃ কোপঞ্চক্রে ততোহম্বিকা।।২৪

দেবীর প্রমথ-সৈন্যদের এইভাবে নিপাতিত করে মহিষাসুর এবার দৌড়ে গেছে সিংহকে আক্রমণ করার জন্য। এমনিতে জঙ্গলে যখন মহিষরা দলবদ্ধ হয়ে থাকে আর সিংহ যদি একা থাকে তখন মহিষরা সিংহকে পাল্টা আক্রমণ করে দেয়। কিন্তু এখানে মহিষ একা, তাই আক্রমণ করার কথা নয়। কিন্তু এই মহিষ সাধারণ কোন মহিষ নয়, আসুরিক শক্তিতে তেজীয়ান হওয়াতে এর সাঙ্ঘাতিক ক্ষমতা। মায়ের বাহন সিংহকে মহিষ জোর আক্রমণ করেছে। মহিষাসুরের এই সব কাণ্ড দেখে মা জগদম্বা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন।

সোহপি কোপান্মহাবীর্যঃ খুরক্ষুণ্ণমহীতলঃ।
শৃঙ্গাভ্যাং পর্বতানুচ্চাংশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ।।২৫

একদিকে মা প্রচণ্ড ক্রুদ্ধা হয়ে গেছেন। মহিষাসুর হল অসুরদের রাজা, তার উপর আবার প্রচণ্ড পরাক্রমশালী, তার সেনাপতিদের মা মেরে শেষ করে দিয়েছেন, অসুরদের সব সৈন্যকে নাশ করে দিয়েছেন, সেও তাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পায়ের ক্ষুর দিয়ে মাটি বিদীর্ণ করতে লাগল। শিং দিয়ে বড় বড় পর্বতশৃঙ্গ দেবীর দিকে নিক্ষেপ করতে থাকল আর তার সাথে প্রচণ্ড গর্জন করতে লাগল।

বেগভ্রমণবিক্ষুণ্ণা মহী তস্য ব্যশীর্যত।
লাঙ্গুলেনাহতশ্চাব্ধিঃ প্লাবয়ামাস সর্বতঃ।।২৬

প্রবল পরাক্রমে মহিষাসুর এমন বেগে দৌড় ঝাঁপ শুরু করেছে যে সমস্ত পৃথিবী কম্পিতা হয়ে অতি কাতর হয়ে গেল। আর তার লেজের তাড়নায় সমুদ্রে জলোচ্ছাস সৃষ্টি হয়ে সমস্ত কিছুকে প্লাবিত করে দিল। মহিষাসুর তো আর সাধারণ লোক নয়, ইন্দ্রাদি দেবতাদের পরাস্ত করে তাদের সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল।

ধুতশৃঙ্গবিভিন্নাশ্চ খণ্ডখণ্ডং যযুর্ঘনাঃ।
শ্বাসানিলাস্তাঃ শতশো নিপেতুর্নভসোহচলাঃ।।২৭

বলছেন, তার শৃঙ্গের আঘাতে আকাশের মেঘগুলো সব খণ্ড বিখণ্ড হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মহিষাসুরের নিঃশ্বাসের এমনই প্রবল বেগ যে বিশাল পাহাড় পর্বতগুলো আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়তে শুরু হয়ে গেল। একদিকে এই বর্ণনার যেমন কাহিনীর জন্য গুরুত্ব আছে, অন্য দিকে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে যার ভেতর প্রচণ্ড আসুরিক শক্তি আছে, সেই শক্তিতে সে কী না করতে পারে! সাইক্লোন প্রকৃতির শক্তিরই একটা ছোট্ট অংশ কিন্তু তাতেই ঘরবাড়ি সব উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। মহিষাসুরের নিঃশ্বাস বেরোচ্ছে, নিঃশ্বাসের এমন প্রবল বেগ যে সাথে সাথে সব কিছুকে উপড়ে ফেলে দিচ্ছে। তখন বলছেন –

ইতি ক্রোধসমাধ্মাতমাপতন্তং মহাসুরম্।
দৃষ্ট্বা সা চণ্ডিকা কোপং তদ্বধায় তদাকরোৎ।।২৮

মা দেখছেন মহিষাসুর কি ভয়ঙ্কর উৎপাত সৃষ্টি করেছে। দেবতাদের কাছে দেবী মহিষাসুরের উৎপাতের কীর্তিকাণ্ড শুনেছেন আর এখন তিনি নিজের চোখে দেখছেন। মহিষাসুরের মধ্যে এতদিন যেন সব ক্রোধ পুঞ্জিভূত হয়ে ছিল এখন সব ক্রোধ বেরিয়ে এসেছে। মহাক্রুদ্ধ মহিষাসুরকে নিজের দিকে ধাবিত হতে দেখে দেবী ঠিক করলেন এক্ষুণি একে বধ না করে দিলে এর উৎপাতে জগতের অনেক কিছু বিনষ্ট হয়ে যাবে। এর আগেও আমরা আসুরিক শক্তি আর দৈবী শক্তি নিয়ে আলোচনা করেছি। এখানে দৈবী শক্তি মানে ভগবান বিষ্ণুর শক্তি। জগতে যখন আসুরিক শক্তি প্রবলাকার ধারণ করে দৈবী শক্তিকে দাবিয়ে দেয়, এই মুহুর্তে যেমন মহিষাসুরের আসুরিক শক্তির প্রভাবে দেবতাদের শক্তি দমে গিয়ে জগতের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে, ভগবান তখন নিজে এসে দুটো শক্তির মধ্যেকার সামঞ্জস্যটা ফিরিয়ে আনেন।

চীনদেশেও দুটো বিপরীত শক্তির ধারণা পাওয়া যায়, সেখানেও দুটো শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে দুটোকে সমান করে দেওয়ার জন্য অন্য একটা শক্তিকে নিয়ে আসতে হয়। এখানেও প্রাণশক্তি আর আধ্যাত্মিক শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে, দুটোর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে ভগবান নিজে এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করে দুটো শক্তিকে সমান করে দেন। কেউ যদি বিরাট তপস্যা করতে শুরু করে দেয় তখনও জগতের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা দেখা দেবে। পৌরাণিক কাহিনীতে দেখা যায় অমুক ঋষি এমন তপস্যা করছিলেন আর তাঁর তপস্যার জোরে পৃথিবী কাঁপতে শুরু করেছে, পাহাড় টলতে শুরু করেছে। ইন্দ্রের তখন দুশ্চিন্তা হয়ে গেল। তখন দেবরাজ পাঠিয়ে দিলেন এক অপ্সরাকে। সেই অপ্সরার পাল্লায় পড়ে ঋষির তপস্যা ভঙ্গ হয়ে গেল।

সাংখ্য মতে প্রকৃতি মানে তিনটে গুণ – সত্ত্ব, রজো আর তমো। এই তিনটে গুণ সব সময় সাম্য অবস্থায় থাকে। কিন্তু যখনই এই তিনটে গুণের সাম্য অবস্থাটা ভঙ্গ হয়ে যায় তখনই সৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। সৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়ার পর সৃষ্টি যেমন একদিকে বিস্তৃত হতে থাকে তেমনি সৃষ্টি আবার সব সময় নিজের মূল অবস্থায় ফেরতও যেতে চাইছে। যেমন একটা বলকে রাবার ব্যাণ্ডের সঙ্গে বেঁধে যখন ছুড়ে দেওয়া হয় তখন বল যেমন সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাইবে তেমনি রাবার ব্যাণ্ডের সঙ্গে বাঁধা আছে বলে তাকে পেছনের দিকেও টেনে রাখছে। একটা জায়গায় গিয়ে রাবারের টানে আবার বলটা ফেরত চলে আসবে। সৃষ্টিও ঠিক তাই। তিনটে গুণের মধ্যে চাঞ্চল্য এসে গেছে, চাঞ্চল্য এসে যেতেই সব কিছু বিগড়ে গিয়ে সৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু একটা সময় আবার এই সৃষ্টিকেই টেনে তার আগের স্থিতাবস্থায় নিয়ে আসবে। সাম্য অবস্থায় চলে যাওয়া মানে সৃষ্টির সব কিছু লয় হয়ে মূল অবস্থায় চলে যাওয়া। Centrifugal force তাকে একদিকে বাইরে ছুঁড়ছে তেমনি Centripetal force তাকে ভেতরের দিকে টানছে। একটা সময় আসবে যখন দুটো ফোর্স সমান অবস্থায় চলে আসবে, সমান অবস্থায় চলে আসার পর centripetal force centrifugal forceকে টানতে শুরু করবে। এইভাবে টানতে টানতে যখন সাম্য অবস্থায় চলে যাবে তখন শুধু ঈশ্বরই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই, সৃষ্টিও নেই। সাম্য অবস্থা আর সাম্য অবস্থা নষ্ট হওয়া এটাই সৃষ্টি খেলা।

আমরা ভালোই আছি, খাচ্ছি, দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ করে একটা চাঞ্চল্য এসে গেল। কিসের চাঞ্চল্য? আমার অমুক জিনিষ চাই, আমাকে অমুক কাজ করতে হবে কিংবা এই বোধ আসা – আমার অনেক কর্তব্য আছে, আমাকে অনেক কাজ করতে হবে। যেটা চাইছিলাম সেটা পেয়ে গেলাম, যে কাজ করার ছিল করে দিলাম, আবার একটা সাম্য অবস্থা চলে এল। সাম্য অবস্থা মানে আমি এখন সব দিক থেকে নিশ্চিন্ত। অবধূতের কাহিনীতে আছে চিল কোথা থেকে একটা মাছ পেয়েছে, মনে করছে মাছটাকে মুখে করে নিয়ে একটা জায়গায় গিয়ে নিশ্চিন্তে বসে খাবে। কিন্তু কোথায় নিশ্চিন্ত হবে! মাছ মুখে নিতেই হাজার হাজার কাক কা কা করে চিৎকার করতে করতে চিলের পেছনে ধাওয়া করেছে। চিল যেদিকে যায় কাকেরা সেদিকে যাচ্ছে। এক সময় চিলের মুখ থেকে মাছটা পড়ে যায়। মাছ পড়ে যেতেই সব কাক চিলকে ছেড়ে দিয়ে মাছের দিকে উড়ে গেল। চিল এখন হাঁফ ছেড়ে নিশ্চিন্তে গাছের ডালে গিয়ে বসেছে। ঠাকুর কথামৃতে অবধূতের চব্বিশ গুরুর একজন গুরু চিলের কথা বলতে গিয়ে বলছেন মানুষের মনের মধ্যে যত বাসনা, সব বাসনা হল মাছ আর বাসনাজনিত সব কর্মগুলো হল কাক। মনে বাসনা থাকলেই কর্ম হবে। আমরা যে কাজ করছি, মনে বাসনা আছে বলেই কাজ করছি। তবে বাসনার আবার রকমফের আছে। শাস্ত্র কথা শোনার বাসনা নিয়ে এই যে আমরা এখানে আসছি, এই বাসনা

বাসনার মধ্যে পড়ে না। আমি ভালো হব, একজন আধ্যাত্মিক পুরুষ হব, একে বাসনা বলা যাবে না। কিন্তু এর বাইরে যা কিছু বাসনা, আমার প্রমোশন চাই, আমার ভালো বাড়ি চাই, গাড়ি চাই, ভালোবাসা চাই, আদর চাই, সম্মান চাই যত চাই চাই আছে সব হল চিলের মুখে মাছ।

মানুষ বুড়ো হয়ে যাচ্ছে তবুও তার চাওয়ার শেষ নেই, তাই কর্মও ছাড়তে পারছে না। আমাদের শাস্ত্র পরিষ্কার বলে দিচ্ছে – তোমার চুল সাদা হয়ে গেছে, নাতির মুখ দেখে নিয়েছ এবার তুমি তোমার ধর্মপত্নীকে গিয়ে বল আমি বাণপ্রস্থে চললাম, তুমি কি আমার সাথে যেতে রাজী আছ? পত্নী বলল আমি আমার নাতি-পোতাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না। এবার তুমি পত্নীর গ্রাসাচ্ছদনের একটা ব্যবস্থা করে বাণপ্রস্থে বেরিয়ে যাও। বাণপ্রস্থে তুমি সহজ সরল জীবন যাপন করবে। যেদিন বুঝবে তোমার শরীরকে আর টানতে পারছ না বা কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে গেছ তখন সোজা উঠে দক্ষিণ মুখে হাঁটতে থাক। হাঁটতে হাঁটতে যেখানে পড়ে গেলে তো সেখানেই পড়ে তোমার খেলা শেষ। কিন্তু বুড়োরা বাড়ি ছাড়তেই চায় না। মহাভারতে যুধিষ্ঠিররাও শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে হিমালয়ের পথে বেরিয়ে পড়লেন। আমাদের বয়স হয়ে গেছে, অভিমন্যুর ছেলে বড় হয়ে গেছে, এবার ওর হাতে রাজ্য শাসনের ভার অর্পণ করে আমরা হিমালয়ের দিকে হাঁটতে থাকব। হাঁটতে হাঁটতে যে যেখানে মরে পড়ে যাওয়ার যাবে, বাকিরা এগিয়ে যাবে। আমরা কি কখন এই পন্থা অবলম্বন করতে পারব? কখনই পারব না।

মৃত্যুর প্রতি আগে আমাদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী আনতে হবে, মৃত্যুর প্রতি একটা অযথা কাল্পনিক ভয় সব সময় আমাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। মৃত্যুর এই কাল্পনিক ভয় থেকে আগে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। Dignified Death এর প্রস্তুতি নেওয়ার প্রক্রিয়া ছোটবেলা থেকেই শুরু করতে হবে। তার থেকেও বড় ব্যাপার হল আমাদের সমাজের পুরো ভারসাম্যটাই এখন নষ্ট হয়ে গেছে। যাঁরা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন নিয়ে আছেন তাঁদের মন অনেক উচ্চস্তরে চলে গেছে। এখানে তাঁদের কথা বলা হচ্ছে না। অথচ এনারাই যখন তাঁদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছেন, সেখানে দেখছেন সারাটা দিন এরা সবাই শুধু নিজের কথা আর তা নাহলে রাজনীতির আলোচনা করছে নয়তো পরনিন্দা-পরচর্চা করে যাচ্ছে। এরা সব সময় দেহবোধের মধ্যে মারাত্মক ভাবে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে। দেহবোধ প্রবল হওয়াতে নিজের সুখ-সুবিধার চিন্তাটাও সাঙ্ঘাতিক। কিন্তু শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করলে মন অনেক উচ্চস্তরে চলে যায়। মন উচ্চস্তরে চলে গেলে দেহবোধটাও বেশি মাথাচাড়া দিতে পারে না। দেহবোধ থেকে একটু একটু করে যত বেরিয়ে আসে তত সে নিজেকে বিস্তার করতে শুরু করে। এভাবেই সংসার ও সমাজের সব কিছুতে একটা সাম্য ভাবে চলে আসে। এটাই এখানে আলোচনা চলছে, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করার অভ্যাস যদি না করা হয়, উচ্চ আদর্শের প্রতি অনীহাকে যদি জীইয়ে রাখা হয় তখনই সমাজের সংস্কৃতি, রীতিনীতি সব কিছু উড়ে গিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার চরম অবস্থায় চলে যায়। পুরো সমাজ ব্যবস্থাটাই বিগড়ে গিয়ে বিশৃঙ্খলতার নাগপাশে বদ্ধ হয়ে যায়। সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে এমন কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয় যাতে সমাজের সাম্য ভাবটা বজায় থাকে। ঠিক তেমনি সাংখ্য দর্শনের মতে প্রকৃতির তিনটে গুণের ভারসাম্য যখন পুরো নষ্ট হয়ে গেল তখন সৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, তখন তারই মধ্যে চেষ্টা চলে আধ্যাত্মিক উত্থান হয়ে সবাই কীভাবে আবার মুক্তির দিয়ে এগিয়ে সেই আগের সাম্য অবস্থায় ফেরত যেতে পারে। কিন্তু যেখানে দেবতারা আছেন, অসুররা আছে, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরা আছে, সেখানে যদি ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় তখন ভগবান নিজে সেখানে হস্তক্ষেপ করে আবার সাম্য অবস্থায় নিয়ে আসেন।

এখানে এমন ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে যে সেখানে দেবতারাও কিছু করতে পারছে না। মহিষাসুরের এমনই শক্তি যে দেবতাদের সম্মিলিত শক্তিকেও সে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মহিষাসুরের যে আসুরিক শক্তি ও ক্ষমতা, সেই শক্তি ও ক্ষমতাকে আমরা যাতে ধারণা করতে পারি তার জন্যে এখানে এত কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে। মহিষাসুর পাহাড় উপড়ে মা অম্বিকার প্রতি ছুঁড়ে মেরেছিল কিনা আমাদের জানা নেই। কিন্তু তার শক্তি কোন স্তরের ছিল তার একটা ধারণা আমরা করতে পারছি। শুধু স্বর্গ বা মর্ত্য নয়, পুরো সৃষ্টির ভারসাম্যকে মহিষাসুর ভঙ্গ করে দিচ্ছে। পুরো সৃষ্টির ভারসাম্য নষ্টের বর্ণনা যদি আমাদের সামনে করতে হয় তাহলে এই ধরণের বর্ণনা ছাড়া আমরা ধারণা করতে পারব না।

আটাশ নম্বর মন্ত্রে এটাই বলছেন মহিষাসুর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে গেছে, দেবতারা আমার কাছে পরাস্ত হয়ে গেছে আর সেখানে একটা নারী এসে আমার সব সৈন্য ও সেনাপতিদের বধ করে আমার শক্তি ও ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করছে! মহিষাসুর এখন ক্রুদ্ধ হয়ে দেবীর দিকে ধাবমান হয়েছে। দেবী দেখছেন মহিষাসুর ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকেই বধ করবার জন্য এগিয়ে আসছে। তখন বলছেন –

সা ক্ষিপ্ত্বা তস্য বৈ পাশং তং ববন্ধ মহাসুরম্।
তত্যাজ মাহিষং রূপং সোঽপি বদ্ধো মহামৃধে।।

মহিষাসুর মাহিষ রূপ ধারণ করে মাকে আক্রমণ করতে গিয়ে মায়ের একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছে। তাই দেখে মা একটা পাশ নিক্ষেপ করে মহিষাসুরকে বেঁধে ফেললেন। গ্রাম দেশে গরু মোষ যখন খেপে যায় তখন লোকেরা দড়ির ফাঁস গরু বা মোষের শিংএ ছুড়ে দেয়। গরুর শিংএ একবার ফাঁস পড়ে গেলে গরুর আর কিছুই করার থাকে না। এরপর তাকে টেনে বেঁধে ফেলতে কোন অসুবিধা হয় না। গরু মোষের শরীরে এমনিতেই প্রচণ্ড জোর থাকে কিন্তু মাথায় শিংএর অংশে বেশি জোর থাকে না। মা ঠিক তাই করলেন, পাশ নিক্ষেপ করে মহিষের শিংএ ফাঁসিয়ে টেনে নিয়ে এসেছেন। মহিষাসুর তখন বাঁচার জন্য সঙ্গে সঙ্গে মহিষের রূপ পরিত্যাগ করে সিংহের রূপ ধারণ করে নিল। সিংহের মাথায় শিং নেই, তাই মায়ের পাশাস্ত্রটা বিফল হয়ে গেল। এখানে যে শুধু শক্তি লড়াই চলছে তা নয়, লড়াই যখন চলে তখন বুদ্ধিরও লড়াই চলতে থাকে। বুদ্ধির লড়াই করে মহিষ সিংহের রূপ ধারণ করে নিতেই পাশ আলগা হয়ে যেতে মহিষাসুর ছাড়া পেয়ে গেল। তখন দেবী কী করলেন?

ততঃ সিংহোঽভবৎ সদ্যো যাবত্তস্যাম্বিকা শিরঃ।
ছিনত্তি তাবৎ পুরুষঃ খড়্গপাণিরদৃশ্যত।।৩০
তত এবাশু পুরুষং দেবী চিচ্ছেদ সায়কৈঃ।
তং খড়্গচর্মণা সার্ধং ততঃ সোঽভূন্মহাগজঃ।।৩১
করেণ চ মহাসিংহং তং চকর্ষ জগর্জ চ।
কর্ষতস্তু করং দেবী খড়্গেন নিরকৃন্তত।।৩২
ততো মহাসুরো ভূয়ো মাহিষং বপুরাশ্রিতঃ।
তথৈব ক্ষোভয়ামাস ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।।৩৩

সিংহের রূপ ধারণ করতেই মা সিংহের মুণ্ডুটা কেটে দেওয়ার জন্য অস্ত্র উদ্যত করেছেন। মহিষাসুর সঙ্গে সঙ্গে তখন সিংহের রূপ পাল্টে এক খড়্গ ও ঢালধারী মানুষের রূপ ধারণ করে নিয়েছে। মা তৎক্ষণাৎ সেই ঢাল ও খড়্গধারী মানুষরূপী মহিষাসুরকে আক্রমণ করে দিয়েছেন। ওই মানুষকে ছেদন করতেই মহিষাসুর বিশাল এক হাতীর রূপ ধারণ করে নিয়েছেন। হাতী আর সিংহের খুব পুরনো লড়াই। হাতীর রূপ ধারণ করে মহিষাসুর এবার দেবীর বাহন সিংহকে শুঁড় দিয়ে ভয়ঙ্কর গর্জন করতে করতে টানতে শুরু করেছে। সিংহকে মহিষাসুর শুঁড় দিয়ে টানছে দেখে দেবী খড়্গ দিয়ে সিংহের শুঁড়টাই কেটে দিলেন। হাতীর শুঁড় কেটে দিতেই মহিষাসুর আবার মহিষের রূপ ধারণ করে আগের মতই সমস্ত ত্রিভুবনকে বিক্ষুব্ধ করে চারিদিকে প্রচণ্ড ত্রাসের সৃষ্টি করল।

ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্।
পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা।।৩৪

জগন্মাতা চণ্ডিকা তখন প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে, কুবের মাকে যে পানপাত্র দিয়েছিলেন, সেই পানপাত্র থেকে পুনঃ পুনঃ উত্তম মধু পান করতে লাগলেন। এখানে দুটো শব্দের খুব গভীর তাৎপর্য আছে – ক্রুদ্ধা আর জগন্মাতা। একদিকে তিনি জগন্মাতা অন্য দিকে তিনি ক্রুদ্ধা। আমরাও শ্রীমাকে জগন্মাতা রূপেই দেখি। তিনিও সবাইকে বার বার বলতেন আমি সকলেরই মা। জয়রামবাটীতে মায়ের আশেপাশে অনেক বেড়াল ছিল। একবার ভক্তদের জন্য মায়ের বাড়ির বারান্দায় পাতা আর জল দেওয়া হয়েছে। একটা বেড়াল এসে জলে মুখ দিয়েছে। বাধ্য হয়ে জলটা ফেলে দিতে হল। নতুন করে জল দিতে বেড়াল আবার এসে মুখ দিয়েছে। আবার জল পাল্টানো হল। তৃতীয়বার মুখ দিতে আসতেই একজন বেড়ালটাকে মারতে গেছে। মা দেখতে পেয়ে খুব মিষ্টি করে

বলছেন 'আহা! বেড়ালটার জলতেষ্টা পেয়েছে ওকে মেরো না'। রাধুর মা পাগলী মামী এসে মাকে বলছে 'মা! তোমার যত ভালোবাসা এই বেড়ালের প্রতিই, মানুষের প্রতি একটুও ভালোবাসা নেই'। মা তখন বলছেন 'যার প্রতি আমার ভালোবাসা নেই সে তো অভাগা। তবে এই সৃষ্টিতে এমন কাউকে দেখছি না যে যার প্রতি আমার ভালোবাসা নেই'। মায়ের জীবনে এই জিনিষগুলো পরিষ্কার দেখা যায়, তিনি সবাইকেই গ্রহণ করছেন, কারুর প্রতি কোন রাগ বা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন না। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও যদি রেগে যান, যেমন একদিন পাগলী মামী রেগেমেগে একটা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে মাকে মারতে গেছে। মা পাগলীমামীর ওপর সেদিন প্রচণ্ড রেগে গেলেন। রেগে গিয়ে মা বলছেন 'ঠাকুর! একদিনের জন্যও আমাকে একটি কঠোর বাক্য বলেননি আর তুই আমাকে আঘাত করলি! তোর এই হাত একদিন খসে পড়ে যাবে'। এই কথা বলেই সঙ্গে সঙ্গে মা জিভ কেটে বলছেন 'হে ঠাকুর! এ কি হয়ে গেল, আমার মুখ দিয়ে অভিসম্পাৎ বেরিয়ে গেল, ক্ষমা কর ঠাকুর'! এদিকে পাগলীমামীও ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। কী করে আমি মাকে জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে আঘাত করতে গেলাম! পরক্ষণেই মায়ের অভিসম্পাৎ শুনে ভয়ে অধীর হয়ে গেছে। শেষে তাই হল, একটা হাত কুষ্ঠ রোগে বাদ চলে যেতে হল। মা সাক্ষাৎ জগজ্জননী, তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরিয়ে গেছে, বাঁচার আর কোন পথ নেই। জগন্মাতা আর ক্রুদ্ধা এই দুটো শব্দই বিপরীতার্থ। তিনি জগন্মাতা, সবারই প্রতি তাঁর সমান স্নেহ, কারুর প্রতি তিনি ক্রোধ করবেনই না। কিন্তু কোন কারণে কারুর প্রতি যদি তিনি ক্রুদ্ধা হয়ে যান, ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বররও কোন ক্ষমতা নেই যে তাকে বাঁচাবে। ঠাকুর ঠিক এই কথাই হৃদয়রামকে বলছেন – ওরে হৃদু! আমি রাগলে তাও রক্ষা পেয়ে যাবি কিন্তু ও (শ্রীমা) যদি একবার রেগে যায় তাহলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ কেউ তোকে রক্ষা করতে পারবে না। জগন্মাতার রাগ বলে কথা, তাঁর স্নেহ যেমন বিশাল তাঁর রাগটাও বিশাল হবে। এখানেও বলছেন *ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা*, মায়ের ক্রোধ এসে গেছে, মহিষাসুরকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। মহিষাসুর যদি মায়ের পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে নেয় তাহলে হয়ত বেঁচে যেতে পারবে। আমি আপনি অন্য কারুর কাছ থেকে ক্ষমা নাও পেতে পারি, অন্যের ক্রোধকে আমি ভয় নাও করতে পারি। কিন্তু জগন্মাতা হলেন জগৎ প্রসবিনী, তিনি সবারই মা, আমার আপনার মায়েরও তিনি মা। জগন্মাতা কখনই ক্রুদ্ধা হবেন না, কিন্তু একটা সীমাকে যদি কেউ ছাড়িয়ে যায় তখন তাঁকে বাধ্য হয়ে ক্রুদ্ধা হতে হয়। রাধু একবার একটা বড় বেগুন দিয়ে মায়ের পিঠে অনবরত মেরেই যাচ্ছিল, মায়ের পিঠ ফুলে গেল। কিন্তু মা বার বার শুধু ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন 'হে ঠাকুর! এর অপরাধ তুমি ক্ষমা করে দাও'। মা সবারই অপরাধ ক্ষমা করে দেন, কিন্তু ওই যে বলা হল কোন কারণে একটা সীমাকে যদি কেউ ছাড়িয়ে যায় তখন তিনি যদি একবার রেগে যান, আর কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না।

সেটাই এখানে বলছেন, জগন্মাতা চণ্ডিকা এত রেগে গেছেন যে তিনি এখন নিজের ভারসাম্যকেও ঠিক মত ধরে রাখতে পারছেন না। রাগে মা এখন পুনঃপুনঃ মধু পান করতে লাগলেন। পান করতে করতে মায়ের চোখ দুটো আরক্তিম হয়ে গেছে। ওই রক্তিম নয়নে তিনি হাসতে শুরু করেছেন। মায়ের এই হাসি কিন্তু মিষ্টি হাসি নয়, এই হাসি যেন একটা ইঙ্গিত বহন করছে, এবার তুমি আমার খেলা দেখ। আমার খেলা দেখা মানে তোমার সব খেলা শেষ। অন্য দিকে মহিষাসুর কী করছে?

ননর্দ চাসুরঃ সোঽপি বলবীর্যমদোদ্ধতঃ।
বিষাণাভ্যাঞ্চ চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ভূধরান্।।৩৫

সা চ তান্ প্রহিতাংস্তেন চূর্ণয়ন্তী শরোৎকরৈঃ।
উবাচ তং মদোদ্ধূতমুখরাগাকুলাক্ষরম্।।৩৬

ওদিকে মহিষাসুর পুনরায় মহিষ রূপ ধারণ করে নিয়েছিল, সেও তখন দৈহিক বল ও পরাক্রমে মত্ত হয়ে ভীষণ গর্জন করতে লাগল আর নিজের শিং দিয়ে মা চণ্ডীকার প্রতি বড় বড় পাহাড় ছুঁড়তে লাগল। এদিকে মা পানোন্মত্ত হয়ে আছেন বলে তাঁর কথাগুলো এক রকম, অন্য দিকে মহিষাসুরের মনেও অন্য রকম চিন্তা-ভাবনা। কিন্তু সে এখন *বলবীর্যমদোদ্ধতঃ* হয়ে আছে। বল আর বীর্য, শক্তি আর সেই শক্তির যে প্রকাশ এই দুটোর সম্মিলনে মহিষাসুরের মন পুরো মত্ত হয়ে আছে। মহিষাসুরের কার্য গর্ব প্রসূত। কিন্তু মা হলেন শক্তি স্বরূপিনী,

তিনি আবার একেই ক্রুদ্ধা তার উপর আবার মধুপানে মত্ত হওয়াতে অন্য রকম কথা বেরোচ্ছে। মা তখন তাঁর বাণ দিয়ে নিক্ষিপ্ত সব পর্বতসমূহকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে মাদকতায় জড়িত কণ্ঠে বলছেন –

দেব্যুবাচ।।৩৭
গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্।
ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ।।৩৮

ওরে মুর্খ! যত পারিস গর্জন করে যা, কতক্ষণ আর গর্জন করবি? যতক্ষণ আমি মধু পান করছি ততক্ষণই গর্জন করে যা। আর এক্ষুণি আমার হাতে যখন তোর মৃত্যু হবে তখন দেবতারাই আনন্দে কোলাহল করবে। তাই এখন যত পারিস গর্জন করে নে।

ঋষিরুবাচ।।৩৯
এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারূঢ়া তং মহাসুরম্।
পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমাতাড়য়ৎ।।৪০

ততঃ সোঽপি পদাক্রান্তস্তয়া নিজমুখাত্ততঃ।
অর্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসীৎ দেব্যা বীর্যেণ সংবৃতঃ।।৪১

অর্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুধ্যমানো মহাসুরঃ।
তয়া মহাঽসিনা দেব্যা শিরশ্ছিত্ত্বা নিপাতিতঃ।।৪২

ততো হাহাকৃতং সর্বং দৈত্যসৈন্যং ননাশ তৎ।
প্রহর্ষঞ্চ পরং জগ্মুঃ সকলা দেবতাগণাঃ।।৪৩

তুষ্টুবুস্তাং সুরা দেবীং সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভিঃ।
জগুর্গন্ধর্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।।৪৪

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুরবধো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

এই কথা বলেই মা লাফ দিয়ে মহিষাসুরের উপর চড়ে বসলেন। তারপর পা দিয়ে তাকে চেপে ধরে শিব তাঁকে যে শূল দিয়েছিলেন, সেই শূল দিয়ে কণ্ঠে আঘাত করলেন। দেবীর পায়ের তলায় পিষ্ট অবস্থায় মহিষাসুর নিজের মহিষ রূপ ছেড়ে মানুষ রূপে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল। কিন্তু মহিষের ভেতর থেকে শুধু নিজের অর্দ্ধেক শরীরটাই বেরিয়ে এসেছিল, মা তখন নিজের তেজের প্রভাবে শরীরের বাকী অংশটা আটকে দিয়ে, মহিষের ভেতরেই স্তম্ভিত করে দিয়েছেন। মহিষাসুর এখন মাঝখানে আটকে গেল, অর্দ্ধেক শরীরটা বেরিয়ে এসেছে আর বাকি অংশটা বার করতেই পারলো না। কিন্তু শরীরের ওই অর্ধেক অংশ দিয়েই সে তার রণকৌশল আর পরাক্রম দেখাতে লাগল। কিন্তু মহাশক্তির সামনে কতক্ষণ আর তার পরাক্রম দেখাতে পারবে! ওই অবস্থায় মা এক বিশাল খড়্গ দিয়ে মহিষাসুরের গলাটা কেটে দিলেন। আগেকার দিনে কমাণ্ডার হেরে গেলে তার সব সৈন্যরা পালিয়ে যেত। আধুনিক যুদ্ধে এই কৌশল আর চলবে না। অসুরদের চিফ কমাণ্ডার মহিষাসুরই মারা গেছে, চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেছে। সমস্ত অসুর সৈন্যরা যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। অন্য দিকে মহাশত্রু মহিষাসুরের পতন হতেই দেবতাদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার এসে গেছে। দেবতারা দিব্য মহর্ষিদের সাথে একসাথে দুর্গাদেবীর স্তুতি করতে থাকলেন আর স্বর্গের যত গন্ধর্ব, অপ্সরা, কিন্নরগণ আনন্দে নৃত্যগীতাদি করতে শুরু করলেন।

চতুর্থ অধ্যায় হল দেবীর স্তুতি। এর আগেও আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি যে, এই জগৎ দাঁড়িয়ে আছে ভারসাম্যের উপর। ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে পুরো জগৎটাই বেসামাল হয়ে যাবে। দেবতাদের শক্তির যেমন ভারসাম্য আছে, তেমনি অসুরদের শক্তির একটা ভারসাম্য বজায় রেখে তাদেরও জগতে স্থান দিতে হবে। ঠিক তেমনি মানুষ, পশু, পাখি এদেরও শক্তির ভারসাম্য বজায় রেখে জগতে স্থান দেওয়া আছে। এরমধ্যে মানুষ হল সব থেকে বদমাইশ জাতি। পরিবেশ বিজ্ঞানীরাও বলেন, জগতে যত প্রানী আছে তাদের যদি মেরে ফেলা হয় তাহলে মানুষ জাতি জগৎ থেকে অবলুপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু জগতের সব মানুষকে যদি মেরে ফেলা হয় তাতে জগতের কিছুই নাশ হয়ে যাবে না, জগৎ যেমন চলছিল তেমনই আরামসে চলতে থাকবে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, জগতে যখনই কোন প্রজাতি প্রচুর ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে, ওই ক্ষমতাই সেই প্রজাতির নাশের কারণ হয়। মানুষের মধ্যেও যার ক্ষমতা বেশী হয়ে যায়, তার কিন্তু নাশ হবেই। প্রকৃতির এটাই বিধান, কাউকে সে একটা সীমার বাইরে যেতে দেবে না। দৈত্য, অসুর মানে যারা সব কিছু নিজের হাতে রাখতে চায়। আধ্যাত্মিক ভাব এদের মধ্যে থাকে না। আধ্যাত্মিক ভাব না থাকার জন্য এরা ঈশ্বর চিন্তনও করে না। অসুর মানে আবার হয় যারা প্রাণশক্তির উপর বেশী বিশ্বাস করে। প্রাণশক্তি মানে ইন্দ্রিয়ের শক্তি, মনের শক্তি, বুদ্ধির শক্তি। এগুলোকে যারা বিশ্বাস করে তারাই অসুর। অসুরদের ধর্মই হল যারা ভালো মানুষ, তাদের সব কিছু লুটেপুটে নেওয়া। প্রথমের দিকে এরা যখন লুটেপুটে খায় তখন টের পাওয়া যায় না, কিন্তু একটা সীমাকে যখন ছাড়িয়ে যায়, তখন অসুরদের বিনাশ করার জন্য প্রকৃতি কিছু না কিছু একটা উপায় বার করে নেয়। প্রকৃতির নিয়মে যে ধরণের বিপর্যয় প্রকৃতিতে হয় সেগুলোকে আমরা মানিনা। আমরা বিশ্বাস করি ভগবানই কোন একটা ব্যবস্থা করে দেন, তিনিই অবতার হয়ে এসে কিছু একটা করে দেন। দ্বাদশ অধ্যায়েই আছে, যেখানে দেবী বলছেন অসংখ্য ভ্রামরী হয়ে এসে আমি সব কটা অসুরকে শেষ করে দেব। আমরা বলি কল্কি অবতারই শেষ অবতার, কিন্তু চণ্ডীতে মা এমন এমন অনেক অবতারের কথা বলে গেছেন, যে অবতার এখনও হয়নি।

মহিষাসুরের শক্তি বৃদ্ধিতে চারিদিকে ত্রাস রচিত হয়ে গেছে, জগতের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। তখন দেবতারা মাকে স্মরণ করেছেন। মা আবার শক্তিরূপিণী, মায়ের শক্তিকে একটা আকৃতি দিতে হবে। তখন দেবতারা তাদের মধ্যে যে বিশেষ বিশেষ শক্তি আছে সেই শক্তিকে বাইরে নিয়ে এসেছেন। দেবতাদের সেই সম্মিলিত শক্তি দিয়ে মায়ের একটা রূপ তৈরী হয়ে গেল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এর বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। দেবতাদের সম্মিলিত শক্তিতে দেবী আবির্ভূতা হয়ে তিনি সেই মহিষাসুরকে বধ করে জগতে শান্তি নিয়ে এলেন। মহিষাসুরকে বধ করে দেবতাদের স্বর্গরাজ্যের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার পর ঋষি ও দেবতারা কৃতজ্ঞ ও ভক্তি নম্র চিত্তে মায়ের স্তুতি করছেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর চতুর্থ অধ্যায়ের দেবীস্তুতি অত্যন্ত উচ্চমানের স্তুতি। এখানে একদিকে যেমন কৃতজ্ঞতার প্রকাশ আছে তেমনি অন্য দিকে আধ্যাত্মিক শক্তির যেমন অতি উচ্চ বর্ণনা করা হচ্ছে সাথে সাথে তাঁর প্রতি অবিচল ভক্তি ও আস্থার কথা নিবেদন করা হচ্ছে। মানুষ কখনই একটা pattern ছাড়া কোন কিছুই নিতে পারে না। রাস্থা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ যদি আমরা কোন উদ্ভট জিনিষ দেখে ফেলি আমাদের মস্তিষ্ক ওই জিনিষ কখনই চট করে নিতে পারবে না। আগে থেকে আমার মধ্যে যে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার আছে, নতুন কিছুকে নেওয়ার আগে তার মধ্যে সব কিছুকে ফেলতে হবে। নতুন জিনিষকে পুরনো অভিজ্ঞতা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হয়। যখনই এর বাইরে কিছু করতে যাবে অন্যরা কেউ মানতে চাইবে না। যেমন ঠাকুর, তিনি যখন ঈশ্বরের কথা বলছেন তখন লোকেরা বুঝতে পারছে না, মানতে পারছে না। কারণ আমাদের যে সাধারণ ধারণা, সেখানে ঈশ্বর বলে কোন কিছু নেই। ঈশ্বরীয় কথা শুনলে আমাদের গাজাখুঁড়ির গল্প মনে হয়। শৈশবকাল থেকে আমরা যেভাবে প্রশিক্ষণ পেয়ে বড় হয়েছি, সেই প্রশিক্ষণের বাইরে আমরা কোন কিছুই মেনে নিতে পারি না। মানুষও যে স্তরে থাকে সেই স্তরের বাইরে কিছু দেখতে পারে না, মস্তিষ্কই নিতে পারবে না। দেহবোধের স্তরে যে পড়ে আছে সে সব কিছুকে ইন্দ্রিয়ের শক্তি দিয়ে দেখে, যারা বুদ্ধির স্তরে আছে তারা সব কিছু বুদ্ধি দিয়ে দেখে। কিন্তু যাঁরা আধ্যাত্মিক স্তরে বিচরণ করেন তাঁরা সব কিছুর মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখেন। এই টিউব লাইট জ্বলছে, আমরা বলছি বিদ্যুতের শক্তিতে আলো জ্বলছে। ঠাকুর বলবেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় জ্বলছে। কে ঠিক? দুজনেই ঠিক। ঠাকুর অধর সেনকে বলছেন, তুমি যে ডেপুটি

হয়েছে সেটা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হয়েছ, কেশবের যে এত নাম হয়েছে তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছে। ঠাকুরের এই যে কথাগুলো বলছেন তার কারণ তিনি ঈশ্বরেই প্রতিষ্ঠিত, ঈশ্বরের বাইরে তিনি আর কিছুই দেখছেন না। আমরা অতি সাধারণ লোক, কামিনী-কাঞ্চনের বাইরে আমরা কিছুই দেখতে পাই না। সেইজন্য আমরা মনে করছি আমার টাকা-পয়সা হলে, ভালো স্ত্রী বা স্বামী পেলে আমি খুশি হয়ে যাব, ছেলের একটা চাকরী হয়ে গেলে ছেলের বিয়ে দিতে পারব, বিয়ে দিলে নাতি-নাতনীর মুখ দেখতে পেলে খুশি হয়ে যাব। কামিনী-কাঞ্চনের বাইরে আমরা কিছুই চিন্তা করতে পারি না। যে যেই স্তরে আছে তার সমাধান সেই স্তর থেকেই নিয়ে আসতে হয়। কিন্তু সংস্কৃতির অনুশীলন বাইরেই করতে হয়। বড়রা যেমন যেমন বলেন ছোটদের তেমনই অনুশীলন করতে হয়। সিদ্ধ পুরুষরা যেখানে সত্যিকারের দেখেন যাবতীয় যা কিছু আছে সব তাঁরই প্রকাশ, সেখানে সাধক যারা তাদের সব কিছুতে ঈশ্বরের প্রকাশকে দেখার অনুশীলন করতে হয়। অনুশীলন করতে করতে একটা তাত্ত্বিক স্তরে পৌঁছে গিয়ে যখন মনে হবে সব কিছু তাঁরই প্রকাশ, এরপর একদিন যখন তার ঈশ্বরে পুরোপুরি মন নিবষ্ট হয়ে যাবে তখন সে দেখবে – তাইতো সব কিছু তো তাঁরই প্রকাশ। ঠিক এই ভাব নিয়েই শ্রীশ্রীচণ্ডীর চতুর্থ অধ্যায়ে দেবীস্তুতির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

(ইন্দ্রাদিদেবতাদের দ্বারা কৃত দেবীর স্তুতি)

ঋষিরুবাচ।।১

শক্রাদয়ঃ সুরগণা নিহতেঽতিবীর্যে
তস্মিন্ দুরাত্মনি সুরারিবলে চ দেব্যা।
তাং তুষ্টুবুঃ প্রণতিনম্রশিরোধরাংসা
বাগ্‌ভিঃ প্রহর্ষপুলকোদ্‌গমচারুদেহাঃ।।২

অতি পরাক্রামশালী মহিষাসুর ও তার সৈন্যরা দেবী কর্তৃক নিহত হওয়ার পর দেবতা আর ঋষিরা মায়ের সন্নিকটে উপস্থিত হয়ে তাঁর স্তুতি করতে শুরু করলেন। নিজেদের ভেতরে যে একটা কৃতজ্ঞতা বোধ, দেবী আমাদের রক্ষা করবেন, এই ভাবনা নিয়ে দেবীর স্তবন করা হচ্ছে। স্তবন দু ভাবেই হয়, একটা হয় আমি কিছু কামনা করছি, সেই কামনা পূরণের জন্য স্তবন করে তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়। আরেক ধরণের স্তবন হয়, আমার কিছু প্রার্থনা পূরণ হয়ে গেছে, তখন আমি স্তব করে নিজের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ভগবান আমার প্রার্থনায় সারা দিয়ে আমার কিছু কামনা পূরণ করেছেন। আমি নিজেকে ভগবানের কাছে ঋণী মনে করতে পারি। কিন্তু তিনি ভগবান, ভগবানের ঋণ কখন শোধ করা যাবে না। ভগবানকে ধন্যবাদও দেওয়া যায় না। তবে স্তব ও প্রণামাদির দ্বারা আমরা তাঁকে প্রসন্ন করতে পারি। জাগতিক ক্ষেত্রেও যেখানে আধ্যাত্মিক ভাব থাকে সেখানে কোন উচ্চমানের সাধুর দ্বারা উপকৃত হওয়ার পর তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া বা আমি তাঁর কাছে ঋণী হয়ে গেলাম এই ভাবগুলো চলে না। উপকৃত হওয়ার পর সাধুকে ভালো করে একটা প্রণাম করে দিলেই সব মিটে যায়। এত বড় পরাক্রমশালী অসুর, যে কিনা এত দিন ধরে ত্রিলোকে ত্রাসের সৃষ্টি করে রেখেছিল, সেই অসুরকে মা বধ করে চারিদিকে একটা শান্তির বাতাবরণ ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন তাই দেবতারাও মায়ের স্তব করে তাঁকে প্রসন্ন করছেন।

দেবতারা যে স্তব করছেন, স্তবের এই মন্ত্রগুলির একটা নিজস্ব শক্তি থাকে। স্তব দুই রকমের হয়, একটা হয় বৈদিক কাল থেকে যে মন্ত্রগুলো পরম্পরায় চলে আসছে, সেই মন্ত্রগুলো বারংবার আবৃত্তি করে ভগবানের স্তুতি করা। আরেকটা হয়, নিজের ভেতরে একটা আধ্যাত্মিক ভাবের পরিপূর্ণতা যখন আসে তখন আপনা থেকেই ভেতর থেকে শব্দগুলো বেরিয়ে আসে। দুটো ক্ষেত্রেই ভাবের পরিপূর্ণতা থাকে, ওই পরিপূর্ণতা থেকেই একটা আনন্দের সুর নির্গত হতে শুরু হয়ে যায়। ভক্ত যখন কোন গান বা স্তব করেন তখন তাঁর দু চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসতে দেখা যায়, কখন কখন শরীরের রোমকূপ গুলো শজারুর কাঁটার মত সোজা হয়ে যায়। শরীরের সমস্ত রোমকূপ দাঁড়িয়ে যাওয়াকেই বলে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তিতে ভক্তের রোমহর্ষণ হয়ে যাওয়া। ভাবে যখন গদগদ হয়ে যায় তখনই এই বাহ্যিক অভিব্যক্তি গুলি ফুটে ওঠে। বেদের মন্ত্র, চণ্ডীর মন্ত্র বা গীতার প্রত্যেকটি শ্লোকের একটা অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। শাস্ত্রের যে কোন মন্ত্র বা শ্লোককে বাংলা বা হিন্দীতে তর্জমা করার পর শব্দের এই

শক্তি আর থাকবে না। গায়ত্রী মন্ত্রকে বাংলা বা হিন্দীতে অনুবাদ করে পাঠ করলে একই ফল কখনই হবে না। ধ্যানের ফল এক হবে কিন্তু সিদ্ধ মন্ত্রের ভাষান্তর করার পর সেই মন্ত্রোচ্চারণের ফল কখনই এক হবে না। একজন সিদ্ধ পুরুষ ধ্যানের গভীরে গিয়ে সিদ্ধ অবস্থায় এই সিদ্ধ মন্ত্রগুলো পেয়েছেন। যখনই এই সিদ্ধ মন্ত্রের অনুবাদ করে দেওয়া হল তখনই এর মূল প্রাণশক্তিটাই বেরিয়ে চলে যাবে। যেমন খণ্ডন ভববন্ধন ঠাকুরের আরাত্রিক স্তব হল ঋষিবাক্য। এর বাংলা অনুবাদ করে যদি সন্ধ্যারতির সময় একই সুরে গাওয়া হয় তখন সেই স্তবের কোন প্রভাব থাকবে না। একবার কেরলের এক সেন্টারের কোন এক মহারাজের মনে হল ঠাকুরের এই আরাত্রিক ভজন খণ্ডন ভববন্ধন কেরলের লোকেরা কিছু বুঝতে পারে না, তাই তিনি মালয়ালাম ভাষায় এর খুব সুন্দর তর্জমা করে ঠাকুরের সন্ধ্যারতির সময় সবাইকে দিয়ে গাওয়াতে শুরু করে দিলেন। প্রভু মহারাজ (স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী) জানতে পেরে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বন্ধ করে দিলেন। জাপান, ব্রাজিল, আমেরিকা, সিঙ্গাপুর যেখানেই রামকৃষ্ণ মিশনের সেন্টার আছে সব জায়গাতে সন্ধ্যারতির সময় খণ্ডন ভববন্ধনের মূল স্তবকেই গান করা হয়।

কথামৃতে ঠাকুর বলছেন ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়। ওই অবস্থায় প্রণব উচ্চারণ করতে গিয়ে যদি চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে তাহলে বুঝতে হবে তার ভাব গাঢ় হয়েছে। আর শুধু একদিনের জন্য চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে নিজের প্রিয়জনের জন্য চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে। কথামৃতে ঠাকুর আরেক জায়গায় বলছেন, প্রথমে গান করছে নিতাই আমার মাতা হাতি, ভাব যত গাঢ় হতে থাকে তখন শুধু হাতি হাতি বেরিয়ে আসে, শেষে শুধু হা হা বলে, তখন হা বলতেই ভাবে হারিয়ে যাচ্ছে। এই যে ভাবের কথা বলা হচ্ছে, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা যে মন্ত্র দিয়েছেন তার কোন একটা মন্ত্রকে নিয়ে স্তব করতে করতে গভীরে যাচ্ছেন তখন তার মধ্যে একটা ভাব এসে যায়। ঠাকুরও অনেক জায়গায় বলছেন, ব্রাহ্মণরা যখন স্তব করছেন তখন তার দুচোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে, কিংবা বুকটা জবা ফুলের মত লাল হয়ে গেছে। তোতাপুরীও যখন মন্দিরে মায়ের স্তব করতেন তখন পুরো মন্দিরটা গম্ গম্ করত। সিদ্ধ মন্ত্রের এটাই বৈশিষ্ট্য, এই সব মন্ত্র পাঠ করতে করতে একটা সময় এমন আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে যে তখন তারও চোখ দিয়ে জল পড়া শুরু হয়ে যাবে, শরীরে রোমাঞ্চ হতে থাকবে। এখানেও দেবতাদের মধ্যে তাই হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে একটা আনন্দের ভাব, এত বড় মহাশত্রুর নাশ হয়ে গেছে, এতে যেমন আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু তার সাথে সত্যিকারের আধ্যাত্মিক একটা ভাব, সেই ভাবে বিহ্বল হয়ে তাঁদের মুখ দিয়ে যেন বাক্য স্ফুরিত হচ্ছে না, তাই বলছেন *বাগ্‌ভিঃ প্রহর্ষপুলকোদ্‌গমচারুদেহাঃ,* তাঁদের মুখনিসৃত শব্দগুলো ভাবে গদগদ হয়ে গেছে, আনন্দের আতিশয্যে তাঁদের শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছে। সবারই ভেতরে এত আনন্দ হচ্ছে যে নিজেদের ভাবকে আর সংবরণ করে রাখতে পারছেন না। পরের মন্ত্রে বলছেন –

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ।।৩

এখানে আমাদের একটা জিনিষ বোঝা দরকার। যদিও বলা হচ্ছে দেবতারা মায়ের স্তুতি করছেন, কিন্তু এর কথাগুলো হল ঋষিবাক্য, যিনি এই স্তবগুলো রচনা করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের মাহাত্ম্য হল, এই অধ্যায়ের প্রত্যেকটি দেবীস্তুতি হল ঋষিদের কথা। দেবতারা তখন আদৌ ছিলেন কিনা, যদি থেকে থাকেন তাহলে তখন ঠিক কি বলেছিলেন আমাদের জানার কথা নয়। কিন্তু আমরা জানি এই স্তব ঋষি নিজের ধ্যানের গভীরে গিয়ে রচনা করেছিলেন। সেইজন্য এই অধ্যায়ের প্রত্যেকটি মন্ত্র ঋষির অন্তর্নিহিত শক্তিতে একেবারে ঘনীভূত হয়ে আছে। তাই এই অধ্যায় শ্রদ্ধা সহকারে নিয়মিত পাঠ করলে পাঠের ফল হতে বাধ্য।

দেবতারা বলছেন, আমরা সেই দেবীকে প্রণাম করছি, *বিদধাতু শুভানি সা নঃ,* আমাদের যেন মঙ্গল হয়, আমাদের সব কিছু যেন শুভ হয়। চণ্ডীর এই সব মন্ত্র পাঠ করার সময় বেশি অর্থের দিকে দৃষ্টি দেওয়াটাও ঠিক নয়। শ্রদ্ধা ভক্তি সহ পাঠ করতে করতে মন্ত্রের সঙ্গে মন এক হয়ে যাবে, তখন বিভিন্ন রকম ভাব আসতে শুরু করবে। যে দেবীকে দেবতা ঋষিরা এক সঙ্গে প্রণাম করছেন, সেই দেবীর কি কি বৈশিষ্ট্য তাঁর স্বরূপ কি রকম,

তারই বর্ণনা এই তিন নম্বর মন্ত্রে করা হচ্ছে। যত দেবতারা আছেন, তাঁদের প্রত্যেকের যে আলাদা আলাদা শক্তি, তাঁদের সমস্ত শক্তি সমূহ যেটা সেটাই মায়ের রূপ। এর আগে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছিল ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশের মধ্যে যে কোপের সঞ্চার হয়েছিল সেই কোপ থেকে তাঁদের ভেতর থেকে যে তেজ বা শক্তি বেরিয়ে এসেছিল, তার সাথে বাকি যত দেবতারা আছেন তাঁদেরও ভেতর থেকে তেজ বেরিয়ে এক জায়গায় জড়ো হয়ে স্তুপাকার ধারণ করেছিল। সেই সম্মিলিত তেজঃপুঞ্জই এই ভুবনমনমোহিনী সাকার মাতৃরূপ ধারণ করেছে। কিন্তু মা হলেন অজন্মা এবং অব্যক্তা অর্থাৎ মাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় না।

চণ্ডীতে সুরথ রাজার মূল প্রশ্ন ছিল এই মহামায়ার জন্ম কোথা থেকে আর কীভাবে হয়। প্রথম জন্ম দেখাচ্ছেন, ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রাকে অবলম্বন করে ক্ষীরসাগরে অনন্তনাগের উপর শায়িত ছিলেন। ব্রহ্মা স্তুতি করাতে যোগিনিদ্রার যে শক্তি সেই শক্তি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু মা তখন অরূপা ছিলেন, তাঁর কোন রূপ ছিল না। ভগবানও যোগনিদ্রা থেকে জাগ্রত হলেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে মায়ের রূপ প্রকটিত। কীভাবে এই রূপ এল? এখানে উল্টো দিক দিয়ে দেখান হচ্ছে। দেবতাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তাঁর শক্তি বাইরে বেরিয়ে স্তুপাকার হয়ে মায়ের রূপ প্রকটিত হয়েছে। এখানে জিনিষটা ঠিক উল্টো, মা শক্তিস্বরূপিণী, মায়ের শক্তিতেই সব দেবতা, অসুর, মানুষ সবাই শক্তিমান। তাঁর শক্তির একটু সামান্য অংশ থেকে দেবতারা এত শক্তিমান। তন্ত্রেরও ঠিক এই ভাব, যেখানে শিব শক্তিকে বলছেন – হে দেবী! তুমি আছ বলেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও আমার জন্ম। মা হলেন সেই আবরণ, যেখান থেকে সচ্চিদানন্দ বেরিয়ে আসছেন, বেরিয়ে আসছেন মানে সচ্চিদানন্দকে সাকার রূপে দেখা যাচ্ছে। সেই সচ্চিদানন্দকে যখন সৃষ্টিকর্তা রূপে দেখা হচ্ছে তখন তিনি ব্রহ্মা, পালন কর্তা রূপে যখন দেখছি তখন তিনি বিষ্ণু আর যখন সংহার কর্তা রূপে দেখছি তখন সেই সচ্চিদানন্দকেই শিব রূপে দেখছি। কিন্তু তিনটের মধ্যেই তিনজনই আছেন। শিবও সৃষ্টি করছেন, শিবও পালন করছেন আর শিব সংহারও করছেন। এই যে শক্তির সমষ্টি রূপ এটাই মা। এই সমষ্টি শক্তিকে বোঝানর জন্য বলা হচ্ছে, প্রত্যেকটি দেবতাদের শক্তির যে সার, সবার ভেতরে শক্তির সেই সারটুকু বেরিয়ে একত্রিত হয়ে মা আবির্ভূতা হয়েছেন। আসলে সেই মহাজাগতিক শক্তি, যাকে সমষ্টি শক্তি বলছেন তিনিই হলেন মা। সমষ্টি শক্তিকে বোঝানর জন্য বলা হচ্ছে প্রত্যেক দেবতাদের যে শক্তির সার, সেই সারটুকু বেরিয়ে স্তুপীকৃত হয়ে মায়ের একটা সাকার রূপ এসেছে। কিন্তু মূল ব্যাপারটা অন্য রকম। মহাজাগতিক যে শক্তি, সেই শক্তির সামান্য একটু অংশও যদি কারুর ভেতরে এসে যায় তার তখন অনেক কিছু হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন, সরস্বতীর জ্ঞানের সামান্য একটু কিরণ যদি কেউ পেয়ে যায় সে তখন জগতপূজ্য হয়ে যায়। এই জিনিষটাকেই এখানে উল্টো ভাবে দেখান হচ্ছে। দেবতাদের শক্তি দিয়ে মায়ের যেন সাকার রূপ নির্মিত হয়েছে।

সেটাকেই আবার ঘুরিয়ে বলছেন, *দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা*, যে দেবতাদের শক্তিপুঞ্জের ঘনীভূত মূর্তি মায়ের সাকার রূপ পরিগ্রহ করেছে, সেই মায়েরই শক্তি সমগ্র জগতে ব্যপ্ত হয়ে আছে। এই জগতে যেখানে যত রকমের শক্তি আছে, সুপ্ত শক্তিই হোক, জাগ্রত শক্তিই হোক, ব্যক্ত শক্তিই হোক আর অব্যক্ত শক্তিই হোক সবটাই মা স্বয়ং। শক্তির বাইরে তো কিছু থাকতেই পারে না, শক্তিই জগতের সব কিছু। যখন একজন লোক দশ জনকে হারিয়ে দিচ্ছে, সেটাও তখন শক্তির খেলা। একজন ব্যক্তির কাছে যখন দশ জন মাথা নত করছে, সেটাও শক্তির খেলা। অনু থেকে ব্রহ্মা পর্যন্ত মায়ের শক্তিতে সব কিছু তন্তুর মত ছেয়ে রয়েছে। এটাই মায়ের প্রকৃত স্বরূপ। অথচ যিনি সমস্ত জগতে ব্যপ্ত হয়ে আছেন, দেবতাদের সম্মিলিত শক্তিতে তিনিই এখন সাকার রূপ ধারণ করে দেবতাদের সামনে আবির্ভূতা হয়ে আছেন। যিনি নিরাকার তিনি এখন সাকার হয়েছেন। তাঁর নিরাকার বা অরূপ ভাব সমস্ত জগতেই ব্যপ্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু তাঁর যে সাকার রূপ, যে রূপে মাকে এখন প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে, এই সাকার রূপ এসেছে দেবতাদের ভেতর থেকে। তিনিই দেবতাদের মধ্যে নিরাকার হয়ে বিরাজ করছিলেন, সেই নিরাকারের অরূপকেই সাকার রূপে এখন সামনে নিয়ে আসা হয়েছে।

হ্যারি পটারের কাহিনীতে কিছু যাদুকর আছে যারা নিজেদের মেমরিকে ম্যাজিক দিয়ে বোতলে বন্ধ করে রাখতে পারে। মেমরিকে কি কখন বাইরে রাখা যেতে পারে? আমাদের কাছে আজগুবী মনে হবে। তাহলে কম্প্যুটারের এক্সটার্নাল হার্ডডিস্ককে আপনি কি বলবেন? হ্যারি পটারের ম্যাজিকাল স্টোরি কম্প্যুটারের এক্সটার্নাল হার্ডডিস্কের ব্যাপারটাই গল্পের মধ্যে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই তো সাহিত্যের creativityর দৌড়!

Creativity মানে আপনি নতুন কিছু করছেন। কিন্তু এখানে নতুন কিছুই তো হচ্ছে না। ভগবানেরই একমাত্র creativity হয়, ভগবানের বাইরে আর কারও creativity হয় না। আমাদের creativity কি রকম? একটা আইডিয়া ওখানে আছে আরেকটা disjoining আইডিয়া অন্য এক জায়গায় আছে। এই দুটো আইডিয়াকে লেখক মিলিয়ে দিচ্ছে, মিলিয়ে দিতেই পুরো নতুন একটা জিনিষ বেরিয়ে আসছে। হ্যারি পটারের লেখিকা জে কে রাউলিংএর এটাই বৈশিষ্ট্য। যে জিনিষটা কখন হতে পারে না, যেমন কম্প্যুটারের হার্ডডিস্ক আর আমাদের মেমরি এই দুটোর সঙ্গে কোন মিল নেই, কিন্তু এই দুটো অমিল জিনিষকে মিলিয়ে একটা নতুন জিনিষ নিয়ে এসেছেন।

সাহিত্যে নাটকে এই ধরণের অনেক আইডিয়া আছে যেখানে ভেতর থেকে শক্তি বাইরে বার করার কথা বলা হয়েছে। মহাভারতেও ঔর্ব মুনির কাহিনীতেও এই ধরণের আইডিয়াকে নিয়ে আসা হয়েছে। ঔর্ব মুনির বাবাকে নৃশংস ভাবে মারা হয়েছিল বলে তিনি প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন। এত রেগে গেছেন যে তিনি সমস্ত জগৎকে পুড়িয়ে নাশ করে দিতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় তাঁর পূর্বপুরুষরা এসে মুনিকে আটকে দিয়ে বলছেন 'বাপু! তুমি এসব বন্ধ কর, আমরা স্বর্গে সুখে আছি'। তখন ঔর্ব মুনি বলছেন আমি যদি এখন সৃষ্টিকে না পুড়িয়ে দিই তাহলে এই ব্রাহ্মণ সন্তানের কথা যে মিথ্যা হয়ে যাবে, তার কি হবে? তখন তাঁর পূর্বপুরুষরা একটা উপায় বলে দিলেন। বেদে জলকেও সৃষ্টি বলা হয়, কারণ জল থেকেই সৃষ্টি এসেছে। সেইজন্য তাঁরা ঔর্ব মুনিকে বললেন 'তোমার ক্রোধাগ্নিকে জলে যদি স্থাপন করে দেওয়া হয় তাতেও সৃষ্টিকে পুড়িয়ে দেওয়া হবে'। তখন তিনি যোগবলে নিজের ক্রোধকে অগ্নি রূপে বাইরে বার করে জলে স্থাপিত করে দিলেন। সেই থেকে জলের অগ্নির নাম হয়ে গেল বড়ানল। দুটো অগ্নি, একটা দাবানল আর বড়ানল। আমাদের পৌরাণিক কাহিনীতে এই ধরণের অনেক কাহিনী পাওয়া যাবে, যেখানে নিজের ক্রোধ বা কামকে বাইরে বার করে দিতেন। যোগীদের এই ধরণের ক্ষমতা থাকে। সাহিত্যেও কাহিনীর মাধ্যমে এই জিনিষগুলিকে অনেক জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে। সত্যি কি মিথ্যে আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, কিন্তু যোগীরা অনেক কিছুই করতে পারতেন। যে কোন জিনিষের যেটা সার, সেটাকে দরকার হলে যোগীরা যোগশক্তিতে বাইরে বার করে নিয়ে আসতে পারেন। এখানেও একই পদ্ধতিতে দেবতারা তাঁদের শক্তির মূলটাকে বার করে আনছেন। সব দেবতারা নিজের নিজের শক্তিকে বার করছেন, বার করার পর সব শক্তি একটা স্তূপাকারে পুঞ্জিভূত হয়ে গেল। এর আগে পর্যন্ত ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ একা একা পাঁচজন মিলে যা করতে পারতেন, এখন পুরো শক্তিটা এক জায়গায় জমা হয়ে গেছে। অথচ তাঁরই শক্তির একটা ছোট্ট অংশ ভেতরে আছে বলে ইন্দ্র ইন্দ্র হয়েছেন। তাঁরই ছোট্ট একটু অংশ বরণ মিত্র, সূর্যের মধ্যে আছে বলে তাঁদের মধ্যে এই ক্ষমতা হয়েছে। দেবতাদের সেই শক্তি এখন বাইরে চলে এসেছে। তখন যদি দেবতাদের আক্রমণ করত তাহলে তাঁদের কিছুই করার ক্ষমতা থাকত না, কারণ তাঁদের শক্তির সারটুকু বাইরে চলে এসেছে।

যেখানেই সৃষ্টি সেখানেই রজোগুণ। রজোগুণ মানেই শক্তি, শক্তি ছাড়া সৃষ্টিই হবে না। শক্তি মানেই মা, যেখানেই জগৎ সেখানেই সৃষ্টি, যেখানেই সৃষ্টির কার্য সেখানেই শক্তির খেলা। যেখানেই শক্তির খেলা সেখানেই মা, মা ছাড়া শক্তি হবে না। হিন্দু মতে ভগবান হলেন সর্বব্যাপী। সর্বব্যাপী যিনি তিনি তাঁর শক্তিকে কোথায় লাগাবেন? কারণ ভগবানের তো কোথাও যাবার জায়গা নেই। কোথাও ফাঁকা জায়গা যদি থাকে তবেই তো সেখানে তিনি যাবেন। তিনিই সব জায়গাতে ব্যপ্ত, তাই শক্তির খেলাতে ভগবান নামতে পারেন না। সেইজন্য সৃষ্টির কার্যকে শক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। শক্তি যেন একটা আবরণ এসে গেল, যেই আবরণ এসে গেল, তখন অসীমের যেন একটা সীমা এসে গেল। সসীম হয়ে গেলেই জগৎ আর জগতের নানা রকম বৈচিত্র্যকে যেন দেখা যেতে থাকে। এটাই শক্তির খেলা। স্তবে এটাকেই দেবতারা স্তুতি করে বলছেন – হে মা! তোমার বাস্তবিক রূপ হল তুমি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যপ্ত হয়ে আছ। জগতে যেখানে যা কিছু শক্তি দেখা যাচ্ছে সেটা তুমিই। আর তোমার এই যে সাকার মূর্তি দেখা যাচ্ছে, সেটা দেবতাদের শক্তি সমূহ বাইরে এসে পুঞ্জিভূত হয়ে এই রূপ নিয়েছে। এই যে দেবী, এই দেবীর সামনে আমরা মস্তক অবনত করছি। ব্রাহ্মদের বিচিত্র সব ধারণা ছিল, ব্রাহ্মদের ভগবান নিরাকার অথচ তাঁরা সেই নিরাকার ভগবানের চরণে মাথা নত করছেন। যিনি নিরাকার তাঁর আবার চরণ আসবে কোথা থেকে! রাধারানী শ্রীকৃষ্ণের ছবি এঁকেছেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের চরণ আঁকলেন না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতির এত গভীর ভালোবাসা যে শ্রীকৃষ্ণের চরণ আঁকলেন না যাতে শ্রীকৃষ্ণ কোথাও পালিয়ে যেতে না পারেন। ব্রাহ্মদের

ক্ষেত্রে উল্টো ভগবানের চরণ বানিয়ে বাকিটা নিরাকার করে দিলেন। ঠাকুর বলছেন সব ধর্মই আসবে যাবে কিন্তু ঋষিদের ধর্মই থাকবে। ঠিক তাই হল, ব্রাহ্মদের ধর্ম ঋষিদের ধর্ম ছিল না বলে থাকল না। নিরাকার আর সাকারে কোন তফাৎ নেই, কিন্তু পূজো তখনই হবে যখন সাকার রূপ হবে। নিরাকারের পূজো কখনই হতে পারে না। ব্রাহ্মরা নিরাকারকে নিয়ে এলেন কিন্তু সাকারের চরণদুটি রেখে দিলেন। ধর্মীয় আন্দোলন আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে যদি না হয়ে থাকে, সেই ধর্মীয় আন্দোলন বেশি দিন চলতে পারবে না। ব্রাহ্মদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাই হয়েছিল।

শ্রীশ্রীমাকে যদি আমরা খুব যুক্তিবাদী বলে মনে করি, তাহলে শ্রীমায়ের জীবনের কোন্ কোন্ ঘটনাগুলোকে আধার করে আমরা শ্রীমাকে খুব যুক্তিবাদী বলে মনে করতে পারি? আসলে এই ধরণের কোন প্রশ্নই হতে পারে না। কারণ যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ হন তাঁদের কিছু জিনিষ খুব যৌক্তিক হবে আর কিছু জিনিষ অযৌক্তিক হবে, এই ধরণের কোন ব্যাপারই হতে পারে না। কিন্তু এখানে অযৌক্তিক বলে তো কিছু হবে না, অযৌক্তিক না বলে ভাবাবেগ হতে পারে। যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ হন, তাঁদের প্রথম বৈশিষ্ট্যই হবে যে তাঁরা সব সময় খুব গভীর ভাবে যৌক্তিক হবেন। একটি কোন ব্যতিক্রম হবে না যে তিনি একটা সময় যৌক্তিক থাকবেন আরেকটা সময় অযৌক্তিক থাকবেন। আপনি যদি বলেন – কেন ঠাকুর তো হাঁচি, টিকটিকি মানতেন। এই জায়গাতে এসে আপনি আমাদের শাস্ত্রের নিমিত্তের ধারণাটাকে বাদ দিয়ে গেলেন। গীতাতেই আছে *নিমিত্তানি চ পশ্যামি*। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন *অনপেক্ষ শুচির্দক্ষ*, ভক্ত যে হবে তাকে খুব দক্ষ হতে হবে। আচার্য দক্ষের ব্যাখ্যা করছেন, দক্ষ হল অনেকগুলো কাজ এসে গেছে, এর মধ্যে কোনটা আগে কোনটা পরে করতে হবে এই ব্যাপারে দক্ষ হতে হবে। তার মানে privatise করা, privatise করা মানেই ম্যানেজমেন্টের উচ্চতায় চলে যাওয়া। ম্যানেজমেন্টের উচ্চতায় তখন যাওয়া যাবে যখন intensive practical হবে। Intensive practical কখন হবে? যখন আপনি intensive rational হবেন। আধ্যাত্মিক পুরুষের প্রথম লক্ষণই হল তিনি intensive rational। আপনি অবতার পুরুষদের কথা ছেড়েই দিন, আমাদের স্তরেই যদি আমরা যদি rational না হই, তাহলে আমরা ভক্তই নই। আর এখানে rationalityর উল্টো irrational কখনই হবে না, irrationalএর তো আমরা কল্পনাই করতে পারি না, emotional হতে পারে। যে emotional সে কখন ভক্তই হতে পারবে না। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলছেন *যোগঃ কর্মসু কৌশলম্*। যোগী কারা হয়? যাঁরা কাজে কর্মে অত্যন্ত কুশল। কাজে কারা কুশল হন? আচার্য বলছেন কর্মে যাঁদের involvement থাকে না, যাঁরা নিঃস্বার্থ কর্ম করেন, কর্ম থেকে যিনি নিজেকে আলাদা রাখেন। কারা নিঃস্বার্থ কর্ম করতে পারেন? যারা আবেগের দ্বারা তাড়িত হয় না, emotionally involved নয়।

শ্রীমায়ের জীবনের ছোট্ট একটি ঘটনা। বিকেলের দিকে একজন ভক্ত মহিলা সরলাবালা দেবী এসেছেন মায়ের সাথে দেখা করতে। মা খুব খুশী। মা তাঁকে বলছেন 'তুমি একটু বসো মা, আমার কাপড়গুলো কেচে আসি'। এখানে শ্রীমায়ের কোন স্তরের detachment আমরা কল্পনাই করতে পারি না, একজন ভক্ত প্রথমবার আসছেন, মা তখনও জগদ্বিখ্যাত কেউ হননি। কোন সম্মানিত অতিথি এলে আমরা কি করতাম? সব কাজ ফেলে রেখে অতিথিকে আপ্যায়ন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়তাম। এই হচ্ছে *যোগঃ কর্মসু কৌশলম্*, এটাই দক্ষ, privatize করছেন, কোন কাজ আগে কোন কাজ পরে করতে হবে। লাটু মহারাজ মশলার বেটুয়া সঙ্গে নিতে ভুলে গেছেন, ঠাকুর লাটুকে বলছেন – আমি সব সময় সমাধিতে থাকি, আমিই এত দূর যাই না আর তুই এই সামান্য কাজটুকু ভুলে যাচ্ছিলি। গীতায় বার বার বলছেন যাঁরা ভক্ত হবেন তাঁর সব কাজে কর্মে কুশল হবেন, কর্মে দক্ষ হবেন। কর্মে তখনই কুশলতা ও দক্ষতা আসবে যখন আপনি পুরোপুরি যৌক্তিক হবেন।

কি করে rational হয়? কারণ তাঁরা সত্যকে সত্য রূপেই দেখেন। মা কীভাবে সত্যকে দেখছেন? জগৎকে তিনি বিশ্বজনীন রূপে দেখছেন, জগতে ব্যষ্টি বলে কিছু নেই, যা কিছু আছে সব বিশ্বজনীন। বিশ্বজনীনটা কী? *মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*, জগতের যা কিছু আছে সব আমার থেকেই বেরিয়েছে। ফলে মায়ের rationality কোথায় গিয়ে বেরোচ্ছে? বেড়ালও আমার সন্তান, আমজাদও আমার সন্তান, শরৎও আমার সন্তান। কোন আধ্যাত্মিক পুরুষের যুক্তিতে কোথাও কক্ষণ কোন ফাঁক পাওয়া যাবে না। যে কোন আধ্যাত্মিক পুরুষের কাছে যেটা

মৌলিক সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, এরপর সেখান থেকে বাকি যা কিছু পর পর আসবে সবটাই প্রচণ্ড যৌক্তিক হবে। লোকেরা মনে করে আধ্যাত্মিকতা মানে irrational, আধ্যাত্মিকতা মানে emotional। আধ্যাত্মিকতার সংজ্ঞাতেই এই জিনিষ কখন দাঁড়ায় না। গীতাতে পদে পদে বলছেন আমাদের rational হতে হবে, আমাদের expert হতে হবে, কাজে আমাদের ধুরন্ধর হতে হবে।

একজন আধ্যাত্মিক পুরুষের যদি rationality না থাকে, আর emotionএর জন্য তার যদি বিচ্যুতি হয়ে যায়, তাহলে ভাই তিনি আর যাই হয়ে থাকুন কোন ভাবেই আধ্যাত্মিক পুরুষ নন। আধ্যাত্মিক পুরুষ মাত্রই প্রচণ্ড rational। আমি যদি যুক্তি দিয়ে দেখাতে যাই শ্রীশ্রীমা খুব rational ছিলেন, তাহলে আমি বোঝাতে চাইছি কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা rational নন, আমি তো তাহলে মূলেই ভুল করে বসে আছি। এটাই হল ঠাকুরের ভাষায় আমার মামার গোয়ালে অনেক ঘোড়া আছে। যারা নিজের মত অনুযায়ী ধর্মকে দাঁড় করায় তারাই ডান দিক বাম দিক করে ফেলে। কিন্তু যাঁরা ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁরা কক্ষণ কোথাও এই ধরণের ভুল করবেন না। নারীর মধ্যে মাতৃদর্শন প্রত্যেক আধ্যাত্মিক পুরুষের মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে, যদি সব নারীর মধ্যে মাতৃত্বের প্রকাশ না দেখেন তাহলে বুঝতে হবে তাঁর আধ্যাত্মিকতায় নিশ্চয়ই কিছু ভুল আছে। সাধু, মহাত্মাদের যদি পতন হয়, তাহলে বুঝতে হবে তাঁরা emotionএর উপর চলছেন। বিশ্বামিত্রের একমাত্র লক্ষ্য বশিষ্ঠকে ছোট করতে হবে, এখানেই তো বিশ্বামিত্র পুরোপুরি emotionএর উপর নিজেকে ছেড়ে দিয়েছেন, rationalityর দিকে গেলেনই না।

মায়ের একটা রূপ হল তিনি নিরাকার রূপে সমস্ত জগতে ব্যপ্ত হয়ে আছেন, একদিকে তিনি বিভু রূপে সমস্ত জগতে ছেয়ে আছেন আর এখন তিনি সাকার রূপে যে আবির্ভূতা হয়েছেন সেই রূপ এসেছে দেবতাদের সম্মিলিত তেজ থেকে। গীতার একাদশ অধ্যায়ে ঈশ্বরের যে বিরাট রূপ বা বিশ্বরূপ দেখান হয়েছে, সেখানে যেন দেখান হচ্ছে তিনিই সব কিছু হয়েছেন। কিন্তু একটা ব্যাপার থেকে যায়, যখনই আমরা মানুষ রূপে তাঁকে দেখি তখন আমাদের দৃষ্টিটা সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। গীতার বিশ্বরূপে বর্ণনা করা হচ্ছে ভগবানের অনন্ত বাহু, অনন্ত পাদ, তাঁর সব কিছুই অনন্ত। যখন এই দৃষ্টিতে দেখা হয় তখন এটাই ঠিক ঠিক ভগবানের সাকার রূপ। চর্মচক্ষু দিয়ে যদি ভগবানের সাকার রূপ দেখতে হয় তখন এই দৃশ্যই তো দেখার কথা। শ্রীমাও বলছেন – এই চর্মচক্ষু দিয়ে কে আর ভগবানকে দেখেছে। বলেই আবার বলছেন – নরেন দেখেছে। কী অর্থে বলছেন আমাদের পক্ষে বলা অসম্ভব। ঠাকুর চেতন সমাধির কথা বলতে গিয়ে বলছেন – যখন মানুষ সাক্ষাৎ চোখ খুলেই সব কিছু দেখছে। আবার বলছেন – চোখ বুজে থাকলে তিনি আছেন আর চোখ খুললে কি তিনি নেই? ঠাকুর চোখ খুলেও সেই সচ্চিদানন্দকে দেখছেন। আমরা মনে করি চোখ বুজলেই সব শেষ, অর্থাৎ মরে গেলেই বা ঘুমিয়ে পড়লেই সব শেষ, কিন্তু ধ্যানের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটা হয়। চোখ বন্ধ করে ঠাকুরকে দেখে যাচ্ছে, চোখ খুললেই আর ঠাকুর নেই, সব শেষ। এটাই জড় সমাধি। কিন্তু চেতন সমাধিতে চোখ বন্ধ করলেও তাঁকেই দেখে আর চোখ খুললেও তাঁকেই দেখে। তবে এই চেতন সমাধি খুব মুষ্টিমেয় কয়েকজনেরই হয়। ঠাকুর এই কথা বলেই আবার বলছেন, শুকদেবের হয়েছিল। মা, যিনি জগদ্ধাত্রী, জগতকে ধারণ করে আছেন, সেই মাকে সাকার রূপে দেখতে হলে ধ্যানের গভীরে ছাড়া চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা যাবে না। কিন্তু মা এতক্ষণ সাকার রূপ ধারণ করে অসুরদের সঙ্গে লড়াই করেছেন, অসুর নিধন করে এবার দেবতাদের সামনে এসেছেন। এই সাকার রূপ কি করে হচ্ছে? দেবতাদের যে শক্তি, সব শক্তি মিলিত হয়ে একটা সাকার রূপে মা সামনে প্রকট হয়েছেন। স্বামীজী যে বিরাটের পূজার কথা বলছেন, গীতায় যে বিশ্বরূপ দর্শনের কথা বলছেন আর চণ্ডীতে যে মায়ের বর্ণনা করা হচ্ছে, একদিকে এই তিনটের মধ্যে কিছুটা মিল আছে আবার কিছু কিছু অমিলও আছে। অমিল মানে, এখানে দেবীকে দেবী রূপেই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তাঁর উৎপত্তি দেবতাদের সম্মিলিত শক্তি থেকে। কিন্তু অন্য দিকে মায়ের শক্তিতেই দেবতারা শক্তিমান, এখানে ঘুরিয়ে অন্য ভাবে নিয়ে আসা হয়েছে। মায়ের শক্তিতে দেবতারা শক্তিমান যখন বলা হচ্ছে তখন সেটা মায়ের নিরাকার রূপ। আর যখন বলছেন দেবতাদের সম্মিলিত শক্তিতে তাঁর এই রূপ প্রকট হয়েছে তখন এটাই তাঁর সাকার রূপ। পরের মন্ত্রে স্তুতি করে বলছেন –

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু।।৪

কারুর স্তুতি যখন করা হয় তখন যাঁর স্তুতি করা হচ্ছে তাঁর গুণের বর্ণনা দিয়েই স্তুতি করা হয়। সংসারে কিছু কার্যসিদ্ধির জন্য কোন ক্ষমতাবান লোকের যখন স্তুতি করা হয় তখন যে গুণ তার মধ্যে নেই সেই গুণই তার উপর আরোপ করে কার্যসিদ্ধি করতে হয়। কিন্তু স্তুতি না করেও উপায় নেই, তা নাহলে সংসারে অনেক ঝামেলা হয়ে যাবে। মায়ের ক্ষেত্রে সমস্যা হল মায়ের যা যা গুণের বর্ণনা করা হচ্ছে তার কোনটাকেই মাপা যাবে না। এইসব স্তুতি যে সব সময় অর্থবাদ রূপে আসবে বা শুধু মাত্র যে প্রশংসার জন্য বলা হচ্ছে তা নয়, এর মধ্যে অনেক গভীর তত্ত্ব লুকিয়ে আছে। ঈশ্বর বা ঈশ্বরের শক্তিকে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি দিয়ে কখনই জানা যাবে না। দেবতারা হলেন সৃষ্ট জগতের বাসিন্দা, তাঁদেরও বুদ্ধি আছে। যিনি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, যিনি বুদ্ধির পারে তাঁর স্তুতি করছেন দেবতারা। দেবতারা তাই তাঁর বর্ণনা কী আর করবেন! সীমিতকে দিয়ে অনন্তের বর্ণনা কী করে হবে!

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং, প্রভাব মানে বিস্তার, যাঁর বিস্তার ও শক্তি অনন্ত তাঁর বর্ণনা *ভগবাননন্তো*, অনন্ত মানে শেষনাগের উপর যিনি শয়ন করে আছেন সেই বিষ্ণু এবং শিব ও ব্রহ্মাও করতে অক্ষম। আমাদের মনে প্রশ্ন উদয় হতে পারে, এখানে বিষ্ণু, শিব আর ব্রহ্মা এই তিনজনের নামই শুধু কেন নেওয়া হয়েছে? এখানেই বোঝা যায়, যদিও পুরাণ, মনে হতে পারে সব আজগুবি গল্প, কিন্তু পুরাণও খুব যুক্তি দিয়ে চলে। এখানে দেবীর স্তুতি হচ্ছে, দেবী হলেন বিষ্ণুর শক্তি। এই বিষ্ণুর শক্তির ব্যাপারে কে জানতে পারবে? বিষ্ণুর সব থেকে কাছের লোক যাঁরা তাঁরাও বিষ্ণুর শক্তির ব্যাপারে জানতে পারবেন না। বিষ্ণুর শক্তির কাছের লোক কারা? অনন্ত, যাঁর উপর ভগবান বিষ্ণু শুয়ে আছেন, ব্রহ্মা তাঁর প্রথম সৃষ্টি আর শিব যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণুর সাথে মহেশ এক সঙ্গে উচ্চারতি হন। এই কজন ছাড়া বিষ্ণুর কাছে আর কেউ তো যেতে পারবেন না। আপনার ব্যাপারে সব থেকে বেশী কে জানবেন? আপনার স্ত্রীই জানবেন, আপনার বাবা-মা জানবেন, আপনার ভাই বোনেরা জানবেন। এরাই যদি আপনাকে না জানেন তাহলে আমি আর আপনার ব্যাপারে কী জানতে পারব! এখানে ঠিক এই কথাই বলছেন, অনন্ত যাঁর উপর ভগবান শয়ন করে আছেন, বিষ্ণুর নাম করছেন না, কারণ যেহেতু বিষ্ণুর শক্তির কথাই এখানে বলা হচ্ছে। বিষ্ণু তো জানবেনই। আর যদি বলা হয় বিষ্ণুও জানেন না তখন এই কথাই বলা হবে যে, ঈশ্বর অনন্ত এবং তাঁর শক্তিও অনন্ত, সেইজন্য ভগবান নিজেও তাঁর শক্তির কথা জানেন না। কিন্তু এই কথা যদিও বা ভক্তিতে বলা যেতে পারে, ভক্তির বাইরে বললে অযৌক্তিক কথা হয়ে যাবে। কারণ ভগবান হলেন সর্বজ্ঞ, সেইজন্য এই কথা তাঁর উপর লাগালে অযৌক্তিক হয়ে যাবে। সেইজন্য বিষ্ণুর নাম এখানে নেই, ব্রহ্মার নাম আছে আর শিবের নাম আছে। আর অনন্তের নাম এই কারণে আছে কারণ অনন্তের উপর তিনি শয়ন করে আছেন। যিনি নিরাকার, সর্বব্যাপী তিনি যে জায়গাতে নিজেকে সাকার রূপে ব্যক্ত করছেন, সেই জায়গা থেকে পর পর সব নামগুলো বলা হচ্ছে – ব্রহ্মা, শিব আর অনন্ত। ঠিক এই ধরণের বর্ণনা গীতাতেও আছে যেখানে অর্জুন স্তব করে বলছেন *আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা। অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে।।* গীতাতে পৌরাণিক কোন নাম বলছেন না, মহাভারতের ঐতিহ্যে দেবর্ষিরা হলেন শ্রেষ্ঠতম। অর্জুন সেই শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধ মহর্ষিদের নাম নিয়ে বলছেন হে ভগবান! যাঁরা শ্রেষ্ঠতম তাঁরাও আপনার বর্ণনা করতে পারেন না। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনীতে শ্রেষ্ঠতম হলেন অনন্ত, ব্রহ্মা ও শিব। আমাদের যদি ঠাকুরের বর্ণনা করতে বলা হয় তখন আমরা বলব – হে ঠাকুর! আপনার বর্ণনা আমি আর কি করব যেখানে শ্রীশ্রীমাও আপনার বর্ণনা করতে পারেন না, স্বামীজী বলছেন শিব গড়তে বানর গড়ে ফেলব, যেখানে স্বামীজী আপনার কোন বর্ণনা করতে পারলেন না, শ্রীমা বর্ণনা করতে পারলেন না সেখানে আমি আর আপনার কি বর্ণনা করব! এর সঙ্গে আরও যদি যোগ করে দেওয়া হয় তাহলে বলা হবে, স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর যত গুরুভাইরা ছিলেন তাঁরাই আপনার বর্ণনা করতে পারলেন না। এই যে এখানে অনন্ত ভগবান, ব্রহ্মা ও শিবের নাম বলছেন আর যখন আমি বলব স্বামীজী, স্বামীজীর গুরুভাইরাই যাঁর স্তুতি করতে পারলেন না, সেখানে আমরা আর আপনার কি করে স্তুতি করতে পারি! দুটো একই কথা হয়ে যাবে। এখানে

ব্যাপারটা হল, যাঁর বর্ণনা করা হচ্ছে তাঁর সব থেকে কাছে যাঁরা আছেন তাঁদেরকে দিয়েই দেখান হচ্ছে। যিনি সব থেকে আপনার কাছের তিনিও আপনাকে বর্ণনা করতে পারছেন না। ঠাকুরের সবচেয়ে কাছের জন হলেন স্বামীজী, আর ঠাকুরকে সব থেকে ভালো বুঝেছিলেন স্বামীজী, সেই স্বামীজীও বলছেন আমি আর তাঁর কী বর্ণনা করব! স্তুতিতে দেবতারাও একই কথা বলছেন। গীতাতেও ঠিক একই কথা বলছে, নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস এনারা হলেন তখনকার সময়ের সব নামকরা ঋষি, তাঁরাই আপনার বর্ণনা করতে পারছেন না। মহাভারতের ঐতিহ্যে ঋষিরাই সর্বশ্রেষ্ঠ কিন্তু পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ এনারাই শ্রেষ্ঠ। আর আমাদের ঐতিহ্যে শ্রীমা, স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাইরা হলে সর্বশ্রেষ্ঠ।

প্রথমে মা আদ্যাশক্তির বর্ণনা কেউ করতে পারবে না বলা হল। তারপরেই সেই আদ্যাশক্তিকে প্রার্থনা করে বলছেন *সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়*, সেই ভগবতী চণ্ডিকা যেন সমগ্র জগতের পরিপালন করেন আর তার সাথে *নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতি*, মা ভগবতী আমাদের বুদ্ধিকে যেন এমন করে দেন, যাতে সমস্ত ধরণের অশুভ ভয় নাশ হয়ে যায়। *অশুভভয়স্য*, অশুভ আর ভয় এই দুটো শব্দের দুটো ভাব হতে পারে। একটা হল, যে কোন ভয়ই অশুভ, ভয় মাত্রই অশুভ। আর অন্য ভাব হল যে ভয়গুলো অশুভ ভয়, এখানে অশুভটা ভয়ের বিশেষণ। ভয় তাহলে দুই রকম হয়ে যাচ্ছে, শুভ ভয় আর অশুভ ভয়। তাহলে শুভ ভয় কোনগুলো হবে? মহাভারতে যুধিষ্ঠির এক জায়গায় বলছেন – আমার পাপকর্ম করতে খুব ভয় করে। সাধারণ মানুষের জন্য জীবনের যে আদর্শ সেই আদর্শচ্যুতি যেন না হয়, এটা হল শুভ ভয়। আর অশুভ ভয় হল, নানা রকমের উৎপাত, ভবিষ্যতে আমার কী হবে এই ভেবে ভয়, বিভিন্ন ধরণের কাল্পনিক ভয়, বড়লোকদের থেকে ভয়, অশান্তির ভয় ইত্যাদি। আমাদের মত লোকেদের জন্য ভয় দুই প্রকার – শুভ ভয় আর অশুভ ভয়। এখানে বলছেন মা যেন আমার অশুভ ভয়গুলোকে নাশ করে দেন। দুটোর মধ্যে একটা, হয় তিনি আমার মন থেকে সব অশুভ ভয়গুলোকে নাশ করে দেন, নয়তো এগুলো যেন না হয়। আর শুভ ভয় হল, পাপকর্ম করা থেকে আমার যেন ভয় থাকে। পাপকর্ম থেকে যার ভয় নেই সেতো পাপের ভারেই নাশ হয়ে যাবে। সেইজন্য প্রার্থনা করছেন, মা আমার বুদ্ধিকে এমন করে দিন যাতে আমার অশুভ ভয়গুলো দূর হয়ে যায়। যদিও এখানে শুভ ভয়কে নিয়ে না বলে অশুভ ভয়কে নিয়েই বলা হচ্ছে, যাতে কোন রকম উৎপাত, বিপত্তি না হয় বা এগুলো থেকে যেন কোন ভয় না আসে।

এই নিয়ে এক মজার কাহিনী আছে। ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দীতে ইবনবতুতা এক সময় সমস্ত বিশ্ব ভ্রমণ করেছিলেন। যেখানে যেখানে তিনি গেছেন সেখানকার অনেক মজার বর্ণনা, সেখানকার লোকেদের মুখে প্রচুর মজার কাহিনী, আজগুবী কাহিনী শুনেছেন, তার মধ্যে যেগুলো তাঁর বিশ্বাস হয়েছে সেগুলো তিনি তাঁর বইতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই অশুভ ভয় আর শুভ ভয় নিয়ে তাঁর একটা মজার ঘটনার বর্ণনা আছে। এক জায়গায় এক শেখ ছিলেন, শেখ হলেন যাঁরা নিজেদের আল্লার প্রতি পুরোপুরি সমর্পিত করে দিয়েছেন। শেখদের অনেক রকম সিদ্ধাই থাকে। এই শেখ কোন শহরে গিয়ে দেখল সেখানকার স্থানীয় ধর্মের যত অনুগামীরা আছে তাদের কারুরই চুল, দাড়ি নেই এমনকি ভ্রুটাও কামানো। পরের দিকে ভারতেও এই ধরণের কিছু সম্প্রদায় ছিল যারা সব কিছু কামিয়ে দিতেন। এরা যখন যুদ্ধ করতে নামত তখন এদের দেখতে খুব বিভৎস লাগতো আর খালি গায়ে যুদ্ধ করতে নামত। এই শেখ দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন, চুল দাড়ি খুব পরিপাট করা ছিল। তাকে দেখে সেই শহরের এক মহিলা তার পেছনে পড়ে গেছে। মহিলাটি তাকে চিঠি পাঠায়, রাস্থায় শেখের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। শেখ যেখানেই মহিলার সাথে দেখা হয় সেখানেই গালাগাল দিয়ে ভাগিয়ে দেয়। মহিলাটি একটা ফন্দি আঁটলো। মহিলাটি এক বৃদ্ধার হাতে একটা চিঠি দিয়ে শেখের সঙ্গে দেখা করতে বলে দিয়েছে। বুড়িটি রাস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। সেই সময় শেখের সাথে দেখা হতেই বুড়িটি শেখকে বলছে 'শেখজী আপনি পড়াশোনা জানেন'? শেখ বলেছে হ্যাঁ জানি। তখন বুড়িটি শেখের হাতে চিঠিটা দিয়ে বলছে 'আমার ছেলে বিদেশে থাকে, আপনি ছেলের এই চিঠিটা আমাকে পড়ে দেবেন'? চিঠিটা হাতে নিয়ে শেখ পড়ে শোনাবেন। তখন বুড়ি মহিলা বলছে 'আমার ছেলে বিয়ে করেছিল, বৌমা আমার পাশের বাড়িতেই আছে। যদি আপনি দয়া করে চলেন, বৌমা তো আর বাইরে আসবে না, দরজার বাইরে থেকে আপনি যদি চিঠিটা পড়ে শুনিয়ে দেন তাহলে বৌমার প্রাণে শান্তি হবে'। শেখ বলল 'ঠিক আছে চলুন'। বাড়িতে গেছে, বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই বৃদ্ধাটি বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে।

আর মাঝের দরজাটা খুলে পাঁচ-ছজন ষণ্ডামার্কা লোক দৌড়ে এসেছে। আসলে এই বাড়িটা ওই মেয়েটির বাড়ি। পালোয়নগুলো শেখকে ধরে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেছে। মেয়েটি এতদিন ধরে শেখকে ধরতেই পারছিল না। শেখ দেখল আর বাঁচার পথ নেই। মেয়েটি এখন শেখের পোশাক ধরে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে। শেখ বলছে 'ঠিক আছে, আমি তোমার ইচ্ছা পূরণ করব কিন্তু তার আগে গোসলখানাতে আমাকে একটু হাত মুখ পরিষ্কার করে নিতে দাও'। মেয়েটি খুশি হয়ে গোসলখানায় নিয়ে গেছে। গোসলখানায় ঢুকে শেখ এবার কি করল, তার কাছে সব সময় একটা ছুরি থাকত, সেই ছুরি দিয়ে শেখ নিজের চুল কামিয়ে দিয়েছে, দাড়ি কামিয়ে দিয়েছে আর ভ্রুটাও কামিয়ে দিয়েছে। গোসলখানা থেকে বেরিয়ে আসতেই ওই বিভৎস চেহারা দেখতেই মেয়েটি চিৎকার করে উঠেছে। মেয়েটি নিজের লোকজনদের দিয়ে শেখকে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। শেখ তখন দেখল এই যে শুভ ভয়ের যে বুদ্ধি আমার মধ্যে এসেছে আল্লার দৌলতেই এসেছে। শেখ তখন ঠিক করে নিল সারা জীবন আমি এভাবেই থাকব। শেখের চেলারাও ওই ভাবেই সব কামিয়ে থাকতে শুরু করে দিল।

কিন্তু যাঁরা বেদান্তী, যাঁরা উপলব্ধির একটা উচ্চ অবস্থায় চলে গেছেন তাঁদের কাছে শুভ অশুভ বলে কিছু থাকে না, তাঁদের কোন কিছু থেকেই ভয় থাকে না। ঠাকুরকে যখন কলকাতায় নর্তকীদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল, সেখানে ঠাকুর নর্তকীদের দেখেই মা মা বলতে বলতে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। যে কোন ব্রহ্মজ্ঞানী বা আত্মজ্ঞানীর কাছে শুভ অশুভ নিয়ে কোন সমস্যা হয় না। সাধারণ মানুষের সমস্যা হয়। অনেকের আবার শুভ অশুভের বোধটাই চলে যায়। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে পাপবোধ বলে কিছু নেই, আমি মেয়েটিকে ভালোবেসেছি তাতে পাপ আবার কোত্থেকে আসবে, তার জন্য আমি যা খুশি করে দিতে পারি। এখানে শুভ ভয়টাই চলে গেছে। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরের নাম করতে লজ্জা-ঘৃণা-ভয় তিন থাকতে নয়। ঠাকুর ঈশ্বরের নাম করতে গিয়ে লজ্জা, ঘৃণা ও ভয়কে ছাড়তে বলছেন। কিন্তু সংসারে চলতে গেলে লজ্জা থাকা অত্যন্ত দরকার, পাপকর্মের প্রতি তীব্র ঘৃণা অবশ্যই থাকতে হবে। ঠাকুরও বলছেন পাপ করতে করতে পাপের প্রতি ঘৃণাটাও চলে যায়, কারণ পাপের ভারে কতটা যে নীচে নেমে যায় সে নিজেও বুঝতে পারে না। সেইজন্য পাপকর্ম থেকে সব সময় ঘৃণা থাকা দরকার। আর ভয়। আমার যে পথ, যে আদর্শ ও ভাব আমি অনুসরণ করছি, এই পথ ও ভাবের বাইরে যা কিছু আছে সেটা থেকে ভয় থাকা দরকার। কিন্তু এখানে দেবতারা প্রার্থনা করছেন, আমাদের অশুভ ভয়কে যেন মা নাশ করে দেন। অশুভ ভয়ই আমাদের সব সময় চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। আমার ছেলের কী হবে, টাকা যদি না পাই তাহলে আমার কী করে চলবে, বৃষ্টিতে আমার ছাদ দিয়ে যদি জল পড়ে, এই ধরণের যত আলতু-ফালতু ভয় এগুলোই অশুভ ভয়। এই অশুভ ভয়গুলো যেন নাশ হয়ে যায়। মূল কথা হল আমাদের মন-বুদ্ধি যেন ঈশ্বরের প্রতি সমাহিত থাকে। তবে দেবতারা প্রার্থনা করছেন, এখানে দেবতারা আধ্যাত্মিক ভাব নিয়ে বলছেন না, দেবতারা নিজেদের অভ্যুদয়ের জন্য, যাতে আরও সুখ শান্তি পাওয়া যায় তার জন্য দেবতারা এই প্রার্থনা করছেন। পরের মন্ত্রে আরও সুন্দর কথা বলছেন –

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মানাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্।।৫

দেবী দুর্গাকে প্রণাম করে বলছেন, হে মা! তুমি জগতের পরিপালন কর, জগৎকে রক্ষা কর। এবার দেবীর বৈশিষ্ট্যকে অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করছেন। *সুকৃতিনাং*, যাঁরা শুভ কর্ম করেছেন, যাঁরা পূণ্যাত্মা তাঁদের গৃহে মা শ্রী রূপে বিরাজ করেন। আমাদের শাস্ত্রে 'শ্রী' শব্দটি খুব গূঢ় অর্থবোধক। শ্রী বলতে সাধারণতঃ লক্ষ্মীকে বোঝান হয়, কিন্তু শ্রীর ঠিক ঠিক অর্থ হল, একজনের শোভা দেখে অপরের উৎফুল্ল হওয়া। উৎফুল্লতার ভাব যদি না থাকে তাহলে তার শ্রী নেই। ঠাকুর মল্লিক মশাইকে বলছেন, রাখালদের গ্রামে খুব জলের কষ্ট তোমার তো অনেক টাকা তুমি যদি কূপ, পুকুর খনন করে দাও তাহলে অনেকের উপকার হয়। বলেই বলছেন তবে তুমি আবার তেলি কিনা। মল্লিক মশাই তাতে আপত্তি করে বলছেন – পুকুর কাটার কথা বললেই হয় আবার তেলি-ফেলি বলা কেন। একজনের কাছে অনেক টাকা থাকতে পারে, সেই টাকা সে নাও খরচ করতে পারে। কারুর দামী পোশাক দিয়ে

শ্রী বোঝায় না, তার চোখ-মুখ দেখেই শ্রী আছে কিনা বোঝা যাবে। আপনার মাথার চুল, আপনার পায়ের জুতো দেখে বোঝা যাবে, আপনার ঘরে জিনিষপত্র কীভাবে রেখেছেন তাতে বোঝা যাবে আপনার মধ্যে শ্রী আছে কিনা। যখন কারুর মধ্যে কিছু গোলমাল হয় তখন প্রথমেই তার শ্রী চলে যায়। যদিও ইদানিং আমরা vitality, life force এই শব্দগুলো ব্যবহার করছি কিন্তু আমাদের কাছে ঠিক ঠিক শব্দ হল শ্রী। প্রত্যেকটি জিনিষের একটা নিজস্ব শ্রী থাকে, শ্রীর সাথে তন্মাত্রার ব্যাপারটাও পুরোপুরি জড়িয়ে আছে। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় তার শ্রী আছে কিনা। চেহারা জ্বলজ্বল করছে, জামা-কাপড় ঝকঝক করছে, তার মানে শ্রী আছে। এবার বাড়ির ভেতরে আসুন, টাকা-পয়সা নাও থাকতে পারে কিন্তু ঘরের সব কিছু পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা আছে, আর সব কিছুই ঝকঝক করছে। সুকৃতি না হলে এই শ্রী হবে না। অনেকের হয়ত প্রচুর অর্থ আছে কিন্তু তার সব কিছুই যেন শ্রীহীন। শ্রী যদি না থাকে তাহলে বুঝতে হবে তার সুকৃতি নেই, সুকৃতি যদি না থাকে তাহলে তার কিছুই থাকবে না। যেটা আসছে সেটা কালকেই বেরিয়ে যাবে। লক্ষ্মী এসে গেলেও আপনার মধ্যে যে শ্রী থাকবে তার কোন মানে নেই, শ্রী পুরোপুরি নির্ভর করে সুকৃতির উপর। সুকৃতি না থাকলে শ্রী থাকবে না। আর শ্রী যদি না থাকে তাহলে লক্ষ্মীও আর বেশি দিন থাকবেন না। এখানে এটাই বলছেন, *যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং*, এই যে মায়ের কথা বলা হচ্ছে, তিনি নিজেই হলেন শ্রী।

দরিদ্র আর অভাব এই দুটোর একটা বড় তফাৎ আছে। আগেকার দিনে পণ্ডিত ব্রাহ্মণরা খুব দরিদ্র ছিল। ঠাকুরের বাবা ক্ষুদিরাম চট্টোপধ্যায়কে আমরা বলি তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু তাঁর পরিবারের দারিদ্রতা ছিল না। দারিদ্রতা দরিদ্রেরই বিশেষণ। কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আকিঞ্চন ব্রাহ্মণ আর দারিদ্রতা দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। দারিদ্রতা বললেই বোঝাবে সেখানে একটা চাহিদা আছে, চাহিদা থাকার জন্য মনের মধ্যে সব সময় একটা ছটফটানি থাকে। মনের মধ্যে ছটফটানি থাকার জন্য সুযোগ পেলেই সে একটু ডানদিক বামদিক করে নিতে পারে। কিন্তু সৎ ব্রাহ্মণ কখনই তা করবে না। দারিদ্রতা তাদের কাছে আভূষণ। যেমন শিব, তিনি কপর্দক শূন্য, তাঁর কাছে কিছুই নেই, এটাই শিবের আভূষণ। শিবের কাছে কিছু নেই তাই বলে তিনি কখন চোখের জল ফেলবেন না। নিজের অভাবের জন্য যখন চোখ থেকে জল বেরোয় সেটাই তখন দারিদ্রতা। দারিদ্রতা যেখানে সেখানে খাই খাই ব্যাপারটা থাকে, নিজেকে সব সময় মনে করে, আমি অভাগা, আমার মত অভাগা আর কেউ নেই। দারিদ্রতা আবার দুই রকমের হয় – একটা হয় by choice আরেকটা হয় by compulsion। By choice যাঁরা তাঁরা কিন্তু সন্ন্যাসী বা খুব উচ্চমানের ব্রাহ্মণ। কিন্তু যারা by compulsion এখানে তাদের কথা বলছেন, সে চাইছে কিন্তু পাচ্ছে না। জগতে সব কিছুই by option আর by compulsion হয়। যেমন শিক্ষকতা, অনেকেই by option শিক্ষকতার পেশায় আসেন, আবার অনেক কোথাও কোন চাকরি জোটাতে পারছে না, কোন কাজ পাচ্ছে না, বাধ্য হয়ে শিক্ষকতার লাইনে চলে আসে। এই ধরণের শিক্ষকরাই স্কুলের বারোটা বাজায়। সন্ন্যাসীও যদি by compulsion হয়ে থাকে সেও সমাজকে ডুবিয়ে ছাড়বে। ঠিক তেমনি দারিদ্রতা যখন by compulsion হয়, সেটাকেই দারিদ্র বলে। By option যখন হয় তখন সেটাই তার আভূষণ। সন্ন্যাসী চাইলেই অনেক কিছু সংগ্রহ করে নিতে পারে কিন্তু সে কিছুই চাইছে না। যাদের প্রচুর চাহিদা আছে আর চাহিদা পূরণেরর জন্য প্রচুর লড়াই করে যাচ্ছে কিন্তু চাহিদার পূরণ করতে পারছে না, সব সময় ছটফট করে যাচ্ছে, এরাই পাপাত্মা।

অলক্ষ্মী পাপাত্মানাং, যারা পাপী তাদের বাড়িতে অলক্ষ্মী এসে বাসা করে। সেই মা দুর্গা, যিনি মাতৃশক্তি, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যিনি ব্যপ্ত, তিনিই যাদের সুকৃতি আছে তাদের বাড়িতে শ্রী রূপে বিরাজ করেন আর যারা পাপী তাদের বাড়িতে তিনিই দারিদ্র রূপে বাস করেন। ঠাকুরও বলছেন, এই জন্মে দান পূণ্য করা থাকলে পরের জন্মে টাকা-পয়সা ঐশ্বর্য হয়। এই ধরণের শ্লোক বা মন্ত্র আবার অনেক রকম জটিলতার সৃষ্টি করে। হিন্দুদের মধ্যে একটা বিশ্বাস হয়ে আছে যে, যারা পাপ করে তারা পরে গরীব হয়ে জন্মায়। সেইজন্য ভারতীয়দের কাছে দারিদ্রতা হল একটা অভিশাপ। কুষ্ঠ রোগ হওয়া, শূদ্রের ঘরে জন্ম নেওয়া, এসবের পেছনে এই ধরণের একটা বিশ্বাস কাজ করে। এই বিশ্বাসের পেছনে কি যৌক্তিকতা আছে এই নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারব না। তাঁরা মনে করতেন আজকে তোমার যা অবস্থা সেটা তোমার নিজের জন্য। যারা ভৌতিকবাদী, এর মধ্যে

বিজ্ঞানীরাও আছেন, তাদের কাছে জীবন হল একটা chance। আপনার কেন এত ভালো বংশে জন্ম হয়েছে, আপনার চেহারা এত সুন্দর কেন, শচীন তেণ্ডুলকারের মত আপনার চারিদিকে এত নাম-যশ কেন, এদের মতে এগুলো সব chanceএর ব্যাপার। অন্য দিকে ইসলাম ধর্মে বলবে আল্লার মর্জি তাই তোমার এই রকম হয়েছে, খ্রিশ্চান ধর্মেও বলবে ভগবানের ইচ্ছা হয়েছে তাই তোমাকে তিনি এভাবে দিয়েছেন।

কিন্তু হিন্দু ধর্মে, বিশেষ করে ঠিক ঠিক বেদান্তী যাঁরা, তাঁরা বলবেন তুমি আগের আগের জন্মে যেমন যেমন কর্ম করেছ এখন সেই রকম ফল তুমি পাচ্ছ। আর এখন তুমি যা যা কর্ম করছ তার কিছু কর্মের ফল এই জন্মে পাবে আর বাকি কিছু কর্মের ফল আগামী জন্মে পাবে। যেমন কিছু জিনিষের চাষ করলে তিন মাসের মধ্যেই ফসল পেয়ে যাবে, আবার তালগাছ লাগালে কবে ফল পাবে কোন ঠিক নেই। সেই রকম কিছু কর্ম সাথে সাথে ফল দেয় আবার কিছু কর্ম অনেক দেরীতে ফল দেয়। সেটাকে মাথায় রেখে এনারা বলছেন, দেখো ভাই তোমার যে এই দারিদ্রতা এর জন্য তুমি নিজে দায়ী। তুমি আগের আগের জন্মে সেই রকম চেষ্টা করনি বলে আজ তোমার এই দুরবস্থা। চেষ্টার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল সুকৃতি, তুমি আগে শুভ কাজ করে সুকৃতি অর্জন কর। কর্মবাদের এই তত্ত্ব ঠিকও হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে, আমরা ঠিক ভুলের মধ্যে যাচ্ছি না। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত যে, একটা সমাজ যখন অনেক দিন ধরে বারবার এই কথাগুলো বলে যাচ্ছে, তুমি সুকৃতি করলে তোমার সব কিছু ভালো হবে তখন সমাজের সবার সাধারণ ভাবেই ভালো হবে। আগেকার দিনে চোরও ছিল ডাকাতও ছিল, সব রকম বদমাইশিই ছিল, কিন্তু তাই বলে যে কেউ অপরের সুখে দুঃখে এগিয়ে আসত না, যে যেখান থেকে পারছে লুটেপুটে নিত, এই জিনিষগুলো তখন ছিল না। কারণ এই ভয়টা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিল, আমি যদি সুকৃতি না করি তাহলে তার ফল ঘুরে আমার ঘাড়েই আসবে, আমার পাপকর্ম ঘুরে দারিদ্র হয়ে আমার কাছেই ফিরে আসবে। এখানে তাই বলছেন, যারা পাপকর্ম করেছে তাদের গৃহে অলক্ষ্মী এসে বাস করবে।

তিনিই আছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কারুর ভালো কিছু হলে আমরা বলি তার উপর ভগবানের কৃপা আছে। ভগবানই কারুর বাড়িতে লক্ষ্মী রূপে থাকেন আবার কারুর বাড়িতে অলক্ষ্মী রূপে থাকেন, এখানে ভগবানের কৃপার কিছু নেই। লক্ষ্মীর রূপটাও ভগবানের আর অলক্ষ্মীর রূপটাও তাঁর। আপনি বলুন আপনি ভগবানের কোন রূপটা চাইছেন। আপনি যদি ভগবানের লক্ষ্মী রূপ চান তাহলে আপনাকে সুকৃতি করতে হবে। যদি অলক্ষ্মী রূপ চান তাহলে পাপকর্ম করতে থাকুন। মায়ের এটাই ক্ষমতা যে, তিনি আপনার কর্ম আপনার কাছেই নিয়ে যান আর আমার কর্ম আমার কাছেই নিয়ে আসেন। এই জায়গাতে কখনই গোলমাল হবে না। মা আছেন বলে যার যেটা প্রাপ্য সে সেটা সুনিশ্চিত ভাবে পেয়ে যায়। আর শেষ কথায় যদি চলে যান, আপনি আর মা তো আলাদা নন। আপনার ভেতরে যে চৈতন্য সত্তা রয়েছেন তিনি তো মা ছাড়া আর কেউ নন। তাহলে আপনি আর মা কি কখন আলাদা হতে পারেন! শ্রীমা বলছেন আমি আর ঠাকুর কি আলাদা নাকি! তিনিই আমাদের সবার ভেতরে চৈতন্য রূপে বিরাজ করছেন। কিন্তু তাও আমরা কত তারতম্য দেখছি। এই তারতম্য কোথা থেকে এল? আপনি গত জন্মে হয়ত কোন গরুকে ঘাস খাইয়েছিলেন তাই আপনার অনেক কিছু ভালো হচ্ছে আবার আরেকজন হয়ত গরুকে ডাণ্ডা মেরেছিল তাই তার হয়তো কষ্টের শেষ নেই। একজনের ভালো কিছু হওয়া আর অন্য জনের খারাপ হওয়ার কোন একটা কারণ তো থাকতে হবে। কেউ বলবে এগুলো chance, chance বললে মনের মধ্যে একটা ভয় ভয় লেগে থাকবে, chance আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে জানা নেই। আর ঈশ্বরের ইচ্ছা বললে তো আরও জঘন্য ব্যাপার হয়ে যাবে, আপনি এমন কি আহামরি করেছেন যে ঈশ্বর আপনাকেই বাছলেন আর আমাকে বাছলেন না।

খুব ভালো করে বিচার করলে দেখা যাবে ঠিক ঠিক যুক্তিযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী হল আমাদের নিজ নিজ কর্ম দিয়েই আমরা আমাদের যার যার ভাগ্যকে তৈরী করেছি। কিন্তু দেওয়ার মালিক হলেন তিনি, যার কাছে শ্রী আসছে, লক্ষ্মী আসছে সেটা তিনিই তাকে দিচ্ছেন, অলক্ষ্মীটাও তিনিই দেন। লক্ষ্মী রূপেও তিনি আবার অলক্ষ্মী রূপেও তিনি। এখানেই মধ্য-প্রাচ্য এশিয়ার ধর্ম, বিশেষ করে পার্সিদের ধর্ম, মুসলমান, খ্রিশ্চান, জহুদির ধর্ম থেকে আমরা আলাদা হয়ে যাই। এইসব ধর্মের কাছে যা কিছু ভালো সেটাই ভগবান, মন্দ বলতে হয় মানুষের দোষ

নয়তো শয়তানের কাজ। আমাদের কাছে ভালোটাও ভগবান মন্দটাও ভগবান। দুঃখটাও ভগবানের রূপ আবার সুখটাও ভগবানের রূপ। সুকৃতি করলে ভগবান লক্ষ্মী রূপে আসেন, পাপ যখন করছে ভগবান তখন অলক্ষ্মী রূপে আসেন। শ্রীমাকে একজন এসে বলছেন, মা! আশীর্বাদ করুন যাতে তাঁর নাম করতে করতে পাগল হয়ে যেতে পারি। শ্রীমা শুনে বলছেন 'সে কি বাবা! কত পাপ করলে পরে মানুষ পাগল হয়'। আজকালকার দিনে আমরা কি বিশ্বাস করব পাপ করলে মানুষ পাগল হয়? কিন্তু এটাই সত্য। সেইজন্য আমাদের এখানে সব কিছুতে আধ্যাত্মিকার ভালো জিনিষটুকুকেই নেওয়া হয়। বৌদ্ধদের পরম্পরাতে কারুর হাতে, পায়ে বা শরীরে যদি কোন কিছু হয়ে যায় তখন তারা চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে, আমার এই রকম কেন হল। চিন্তা-ভাবনা করে যদি পরিষ্কার বুঝতে পারে এটা বর্তমান কোন কর্মের ফলে হয়েছে, তখনই তারা চিকিৎসা করে। কিন্তু যদি দেখে এটা আমার কোন অতীত কর্মের ফল, তখন তারা আর চিকিৎসা করায় না।

বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এটা আমাদের কাছে খুব দৃঢ় হয়ে গেছে যে, যাদের দেখছি একটা জিনিষ তার কাছে নেই সেটাকে জোর করে পাওয়ার জন্য যদি উঠে পড়ে লাগে, হয়ে যায় না যে তা নয়, হয়েও যায়, কিন্তু তারপর তাকে এমন ভয়ঙ্কর এক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে দেখি যে, আমরা অবাক হয়ে যাই। ইদানিং লিঙ্গ পরিবর্তনের অনেক ঘটনাই শোনা যায়। একজন সাংবাদিক এর উপর অনেক গবেষণা করেছেন। অনেক খোঁজ খবর নিয়ে তিনি দেখাচ্ছেন যারাই লিঙ্গ পরিবর্তন করেছে, পরিবর্তি জীবনে তারা পুরোপুরি মানসিক রোগীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, কত রকমের সমস্যা এসে গেছে। কর্মকে নিয়ে নাড়ানাড়ি করে কিছু একটা করে দেওয়ার পর মনে হবে আমরা কিছু একটা করে দিলাম। এতে কর্ম তো পাল্টায় না উপরন্ত অনেক ক্ষতি করে দেয়। কর্মকে তাই চোখ বুজে মেনে নেওয়া ছাড়া কোন রাস্থা নেই। এক ভদ্রমহিলার কোন সন্তান ছিল না, ডাক্তারও বলে দিয়েছে তার সন্তান হবে না। ডাক্তারের কাছে শেষ কথা শোনার পর ভদ্রমহিলা ও তার স্বামী সব খোঁজ-খবর নিয়ে কোন এক অনাথ আশ্রম থেকে একটি বাচ্চাকে দত্তক নেয়। দত্তক নেওয়ার এক মাসের মধ্যে বাচ্চাটির শারীরিক কিছু একটা সমস্যা হওয়াতে তারা এক ডাক্তারের পরামর্শ নিতে গেল। ডাক্তার অনেক পরীক্ষা করে দেখছে বাচ্চাটির শরীরে এমন একটা কঠিন জেনেটিক সমস্যা আছে যার জন্য সারা জীবন তাকে পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আবার সেই অনাথ আশ্রমে ফেরত গেছে যাতে বাচ্চাটিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। অনাথ আশ্রম থেকে বলে দেওয়া হল, একবার দত্তক নিয়ে নিলে আমরা আর ফেরত নিতে পারি না। ভদ্রমহিলা এখন চোখের জল ফেলছেন। কোথাও কর্মে তার এমন একটা হয়ে আছে যে তাকে নিঃসন্তান হয়েই থাকতে হবে। কিন্তু সে জোর করে সেই কর্মকে পাল্টাতে গেছে, সেই কর্মই এবার আরও জোর ধাক্কা দিয়েছে। চেষ্টা অবশ্যই করে যেতে হবে। সন্তান হচ্ছে না ঠিক আছে, তুমি ডাক্তার দেখাও, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর। কিন্তু একবার যখন পরিষ্কার হয়ে গেল নিঃসন্তান থাকাটাই আমার কর্মে ঠিক হয়ে আছে। এরপর যদি জোরাজুরি করতে যায় তাহলে আজ হোক কাল হোক কর্ম আরও জোর ধাক্কা মারবে। কারণ সে এবার কর্মকে নিয়ে নাড়ানাড়ি করতে শুরু করেছে। কর্মের সঙ্গে নাড়ানাড়ি করতে গেলে একদিন আগে বা দুদিন পরে কর্ম তাকে আরও এমন জোর বিপাকে ফেলবে যে, আর তাকে সামলাতে পারবে না। এই কথাই বলছেন, আমাদের জীবনে বিভিন্ন রকম কর্মের ফল আসে, এই ফল রূপে ভগবানই আসেন, কারুর বাড়িতে লক্ষ্মী হয়ে আসেন আবার কারুর বাড়িতে অলক্ষ্মী হয়ে আসেন।

শুধু তাই নয়, *কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ*, যাঁরা কৃতধী, কৃতধী মানে যাঁর হৃদয় একেবারে পরিষ্কার। কৃত মানে শুভ আর ধী মানে বুদ্ধি, যাঁর মধ্যে শুভ বুদ্ধির উদয় হয় সেই শুভ বুদ্ধিও তিনিই দেন। বুদ্ধি মানে, যার দ্বারা মানুষ সৎ অসৎ বিচার করতে পারে। যাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ নয় তাদের বুদ্ধিও পরিষ্কার থাকে না। বলা হয় হৃদয় আর বুদ্ধির মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব বাঁধে তখন তুমি কার কথা শুনবে? তখন বলে যে, হৃদয়ের কথাই শুনতে হয়, কিন্ত সেই হৃদয়কে শুদ্ধ হতে হবে। অনেক তপস্যা করলে তবে গিয়ে হৃদয় শুদ্ধ হয়। তিনটে শ্রেনী হয়ে গেল – যাঁরা সুকৃতি করেছেন তাঁদের বাড়িতে লক্ষ্মী বিরাজ করেন, যারা দুষ্কৃতি করে বেড়ায় তাদের বাড়িতে দারিদ্র্য, যাঁরা কৃতধী অর্থাৎ যাঁরা শুদ্ধাত্মা তাঁদের বুদ্ধি থাকে। বুদ্ধি কাদের মধ্যে থাকে? শুদ্ধাত্মা ছাড়া বুদ্ধি কারুর মধ্যে থাকে না। ঠাকুর বলছেন – গ্রামে কোন বিবাদ হলে বিশ ক্রোশ দূর থেকে পালকি করে একটা রোগা প্যাটকা ব্রাহ্মণকে নিয়ে আসে। গ্রামে কত বড় বড় গোঁফওয়ালা পালোয়ান আছে তাদের কেউ ডাকে না। কারণ যাঁর শুদ্ধ মন নেই

সে কী করে ন্যায় বিচার দেবে! শুদ্ধ চরিত্র থাকলেই হবে না, সব দিক তীক্ষ্ণ ভাবে দেখে বিচার বিশ্লেষণ করে ন্যায় বিচার করার ক্ষমতা তাঁর থাকা চাই। বাচ্চা ছেলে, সে তো কত শুদ্ধ চরিত্রের, সে কোন মিথ্যা কথা বলেনি, কোন দুষ্কর্ম করেনি কিন্তু ওর দ্বারা কোন মহৎ কাজ হবে না। বাচ্চা ছেলেকে কোন বিবাদের বিচার করে দিতে বললে কিছুই বিচার করতে পারবে না। কেন পারবে না? ওর বুদ্ধি এখনও বিকশিত হয়নি। একটা বাচ্চা ছেলের যেমন বুদ্ধি বিকশিত থাকে না, ঠিক তেমনি যার অন্তঃকরণ শুদ্ধ পবিত্র নয় তারও বুদ্ধির বিকাশ হয় না। শাস্ত্র অধ্যয়ন করে আমরা শাস্ত্রের কথা চটপট ধারণা করতে পারি না, শাস্ত্রের একটা কথা মনে রাখতে পারি না। কারণ আমাদের শুদ্ধ অন্তঃকরণ নয়। সবারই মন কামিনী-কাঞ্চনে লিপ্ত হয়ে আছে। যাদের বয়স হয়ে গেছে তারা বলবে, এই বয়সে আর কামিনী-কাঞ্চনে মন যায় না। কিন্তু বয়স হয়েছে তো কি হয়েছে, সে তো আপনার হাড়-চামড়া-মাংসযুক্ত শরীরটা বুড়ো হয়েছে কিন্তু মন তো এখনও বুড়ো হয়নি। মন এখনও কামিনী-কাঞ্চনে পড়ে আছে। মনের যে একটা পরিপক্কতা আসবে সেটা আসছে না। আসছে না কেন? কারণ সে এখন কৃতধী হয়নি, কৃতধী হওয়ার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। কামিনী-কাঞ্চন, নাম-যশ এগুলো থেকে মন যতক্ষণ না বেরিয়ে আসছে, তপস্যা যতক্ষণ না করছে, প্রচুর জপ-ধ্যান যতক্ষণ না করা হচ্ছে ততক্ষণ সে কৃতধী হবে না। কৃতধী যাঁরা তাঁদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকে, একটা কিছু শুনলে বা দেখলে চট করে বুঝে নেন জিনিষটা কি, বিচার করার ক্ষমতা, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল এই ক্ষমতাটা এসে যায়। মহাভারতে আছে, যুধিষ্ঠিরের এত ধর্মবুদ্ধি ছিল কিন্তু তাঁকেও কোন ধর্ম সঙ্কটে শ্রীকৃষ্ণের কাছে পরামর্শ নিতে দেখা যেত। তার মানে, যদিও যুধিষ্ঠিরকে ধর্মরাজ বলা হয় কিন্তু তিনিও শ্রীকৃষ্ণের কাছে কিছু না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ ধর্মে সম্পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যুধিষ্ঠিরও কৃতধী এতে কোন সন্দেহ নেই, তাঁর বুদ্ধিও একেবারে শুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁরও ওপরে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ ভাবে অনাসক্ত ছিলেন, কোন কিছুতেই তাঁর কিছু আসে যায় না। এই যে বুদ্ধি, এই বুদ্ধিও মায়েরই শক্তি।

শ্রদ্ধা সতং, সৎ পুরুষের মধ্যে শ্রদ্ধার ভাব থাকে। শ্রদ্ধার ভাবকে দেখতে হলে আগে অশ্রদ্ধার ভাব কাকে বলে বোঝা দরকার। ভারতে এমন এমন কয়েকটি রাজ্য আছে যেখানে সামান্য কিছু হয়ে গেলে এমন সব কাণ্ড ঘটতে থাকে যে আমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাবে। কারুর প্রতি কারুর কোন শ্রদ্ধা নেই। ওই রাজ্যের কোন সেন্টারে একজন সন্ন্যাসীকে মহন্ত করে পাঠানো হয়েছিল। স্টেশন থেকে সন্ন্যাসী গাড়ি করে সেন্টারে যাচ্ছেন। যেতে যেতে গাড়ির ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করছেন 'আমি তো মঠে নতুন যাচ্ছি, ওখানে প্রথমে কি ধরণের কাজ করলে ভালো হয়'? ড্রাইভার খুব সুন্দর কথা বলল 'মহারাজ! আপনি আগে গিয়ে এখানকার লোকেদের ভদ্রতাটুকু শেখান, কিভাবে কথা বলতে হয়, কি করে অপরকে শ্রদ্ধা করতে হয়, যেখানে সেখানে থুতু ফেলতে নেই কেন, কিভাবে অপরকে সম্মান দিয়ে কথা বলতে হয়, এই জিনিষগুলো এদেরকে শেখান'। সত্যিই তাই, যারা অপরকে শ্রদ্ধা করতে পারে না তারা নিজেকেও শ্রদ্ধা করতে পারে না। যে নিজেকে শ্রদ্ধা করে না সে তো বিনাশের পথে চলে গেল। যিনি আত্মজ্ঞানের দিকে এগোতে চাইছেন, প্রথমে তাঁর দরকার আত্মশ্রদ্ধা। কঠোপনিষদে বলছেন নচিকেতার মধ্যে আত্মশ্রদ্ধা এসেছে। আত্মশ্রদ্ধা আসার জন্য প্রথমে দরকার অপরকে শ্রদ্ধা করা। রিক্সাওয়ালা, টাঙ্গাওয়ালা থেকে শুরু করে মেথর, মুচি সবার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে আসতে হবে। কোন কারণে আপনি যদি অসন্তুষ্ট হয়ে যান, দু-তিন মিনিটের জন্য অসন্তুষ্ট হয়েছেন ঠিক আছে, কিন্তু তার প্রতি শ্রদ্ধার ভাবটুকু কখনই চলে যাবে না। যাঁদের মধ্যে সবার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব আছে তাঁরাই সৎ পুরুষ, অসৎ পুরুষের মধ্যে শ্রদ্ধার ভাব থাকে না। যদি দেখেন অপরকে সম্মান দিয়ে কথা বলছে, ড্রাইভারকে সম্মান দিয়ে কথা বলছে, রিক্সাওয়ালা, অটোওয়ালা সবাইকে সম্মান দিয়ে কথা বলছে, বুঝে নিন তিনি একজন সৎ পুরুষ। আমরা মনে করি সৎ পুরুষ মানে যার চুরি করার ক্ষমতা নেই, মিথ্যা কথা বলার ক্ষমতা নেই। যাদের চুরি করার ক্ষমতা নেই, কামিনী-কাঞ্চনে লিপ্ত হওয়ার ক্ষমতা নেই, এরা তো অপদার্থ, ঢ্যামনা সাপ। এদের দিয়ে কিছুই হবে না। কিন্তু ক্ষমতা আছে, তা সত্ত্বেও সবার সামনে সে মাথা নত করে থাকে, এনারাই ঠিক ঠিক সৎ পুরুষ।

মন্ত্রের তৃতীয় লাইনের দ্বিতীয় অংশে বলছেন *কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা*, যাঁরা কুলিন পুরুষ তাঁদের মধ্যে যে লজ্জা বোধ এই লজ্জা বোধটা মা নিজেই। মা তাহলে কি কি? মা লক্ষ্মী, মা অলক্ষ্মী, মা বুদ্ধি, মা শ্রদ্ধা ও মা লজ্জা। পঞ্চম অধ্যায়েই আবার বলবেন, লক্ষ্মী রূপেণ সংস্থিতা, বুদ্ধি রূপেণ সংস্থিতা, শ্রদ্ধা রূপেন সংস্থিতা, লজ্জা

রূপেন সংস্থিতা। এখানে ব্যাখ্যা করে বলছেন, সৎ পুরুষের মধ্যে যে শ্রদ্ধা আর কুলিন পুরুষের মধ্যে যে লজ্জা বোধ এই দুটো মা নিজেই। আগেকার দিনে কুলিন ব্রাহ্মণরা নিজের গলা দিয়ে দেবেন কিন্তু মুসলমান কোন ভাবেই হবেন না। ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার জন্য একটা কায়দা করেছিল। হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর চাপিয়ে দেওয়া হল। গরীব, মধ্যবিত্ত আর উচ্চবিত্ত এই তিন শ্রেনীর হিন্দুদের জিজিয়া কর একটা অনুপাতে ধার্য করা হল। মনে করুন গরীবদের জন্য বছরে পাঁচ টাকা, মধ্যবিত্তদের জন্য দশ টাকা আর উচ্চবিত্তদের পনের টাকা বছরে দিতে হবে। দেখে মনে খুব গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। কিন্তু এর মধ্যেও একটা ভয়ঙ্কর ছল আছে। সারা বছরে পাঁচ টাকা আয়ের লোকের সংখ্যাই ছিল পঞ্চাশ থেকে ষাট শতাংশ লোক। গরীবরা সারা বছরে পাঁচ টাকাই বাঁচাতে পারত না। মধ্যবিত্তরা আর বড়লোকেরা কোন রকমে দশ টাকা আর পনের টাকা বাঁচিয়ে নিত। গরীবের বাড়িতে যদি চারজন লোক থাকত তাহলে পাঁচ গুণ চার কুড়ি টাকা বছরে কর দিতে হত, যেটা তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। অন্য দিকে সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা গরীবদের উপর নানা রকমের উৎপীড়ন নিপীড়ন চালিয়ে যেত। তখন এরা বাধ্য হয়ে মুসলমান হয়ে যেত। যেমনি মুসলমান হয়ে গেল জিজিয়া কর থেকে বেঁচে গেল। গরীবরা মুসলমান হয়ে সব হিন্দুদের উপর রাজা হয়ে বসে গেল, আর কেউ তাদের উপর কোন অত্যাচার করতে পারবে না। ফলে মধ্যবিত্ত আর উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কেউ আর মুসলমান হল না। কিন্তু সমাজের যত নিম্ন বর্ণের লোক ছিল তারা সবাই দলে দলে মুসলমান হয়ে যেতে লাগল। ভালো লোকও যে মুসলমান হয়নি তা নয়। কাশ্মীরে অনেক বড় বড় শেখ, দরবেশ, ফকিরদের প্রভাবে অনেক ব্রাহ্মণও মুসলমান হয়েছিল। তবে বেশির ভাগই নিম্ন বর্ণ থেকে মুসলমান হয়েছে। এদের মধ্যে লজ্জা ভাবটা ছিল না। কিন্তু উচ্চবর্ণের কোন ব্রাহ্মণকে জোর করে যদি কখন মুসলমান করতে চাইত তখন তাঁরা বলেই দিতেন 'আমার গলা কেটে দাও তাও ভালো কিন্তু মুসলমান আমি হচ্ছি না'। এটাই হল লজ্জার ভাব। এরাই কুলিন, নিজে থেকে কখনই এমন জিনিষ করতে যাবে না যেখানে তার লজ্জা ভেঙে যাবে। এটাই এখানে বলছেন, যাঁদের মধ্যে চক্ষুলজ্জা আছে এটাও মায়ের কৃপা। যাদের উপর মায়ের কৃপা নেই তাদের দেখলেই বোঝা যায়, এদের মধ্যে লজ্জা নেই, এদের বুদ্ধি নেই, এদের শ্রদ্ধা নেই আর এদের মধ্যে শ্রীও নেই। এখানে কখন দরিদ্র কথাটা বলা হত না, আমাদের ব্রাহ্মণরা বরাবরই দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু তাঁরা কখনই শ্রীহীন হতেন না। এখানে লক্ষ্মী ধন-সম্পদের অর্থে বলা হচ্ছে না, শ্রী অর্থেই বলা হচ্ছে। যেমন ঠাকুরের বাবা ক্ষুদিরাম দরিদ্র ছিলেন কিন্তু পরিবারে শ্রী ছিল। এখানে এই শ্রীকে নিয়েই বলা হচ্ছে।

এখানে চারটে গুণ নিয়ে বলা হচ্ছে। প্রথমে সুকৃতি, যাঁরা শুভ কর্ম করেছেন। দ্বিতীয় কৃতধী, কৃতধী মানে যাঁদের শুদ্ধ অন্তঃকরণ। তৃতীয় সৎ পুরুষ আর চতুর্থ কুলিন। প্রথমটা কর্মের দিক থেকে বলা হচ্ছে। দ্বিতীয় মনের দিক থেকে বলছেন। তৃতীয় বুদ্ধির দিক থেকে আর চতুর্থ সামাজিক আচরণের দিক থেকে বলছেন। এই চারটে জিনিষের কি কি ফল হয়? শুভকর্মে লক্ষ্মী, কৃতধীতে বুদ্ধি, সৎ পুরুষে লজ্জা আর কুলিনে লজ্জা। ঠাকুর বলছেন লজ্জা-ঘৃণা-ভয় তিনি থাকতে নয়। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরের নামে লজ্জা, ঘৃণা আর ভয় থাকতে নেই। লজ্জা কিসের? আমি একজন বড় অফিসার, ঈশ্বরের নাম করলে আমাকে দেখে লোকে হাসবে। ঘৃণা মানে, ঈশ্বরের নামে ঘৃণা থাকতে নেই। আর ভয়, ঈশ্বরের নাম করলে বাড়ির লোকেরা যদি আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়, বিধর্মীরা যদি আমার গলা কেটে দেয়! ঈশ্বরের নাম করতে গিয়ে এই তিনটে জিনিষ থাকতে নেই। ঠিক তেমনি কুল, শীল এই বোধগুলো থাকতে নেই। এগুলোই অষ্টপাশ, এগুলো থাকলে আর ঈশ্বরের নাম করা যায় না। কিন্তু এখানে বলছেন নোংরা কাজ করার সময় যেন লজ্জা থাকে। ঘৃণা করার সময় পাপকর্মকে ঘৃণা করবে, ঈশ্বরের নামে ঘৃণা করতে নিষেধ করা হচ্ছে। পাপকর্মের প্রতি যার ঘৃণা বোধ আছে, তার মধ্যে ঈশ্বরীয় প্রকাশ আছে। *তাং ত্বাং নতাঃ স্ম*, আমরা সেই ভগবতীকে প্রণাম করছি, *পরিপালয় দেবি বিশ্বম্*, হে মা! তুমি সমস্ত বিশ্বের পরিপালন কর।

কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ
কিঞ্চাতিবীর্যমসুরক্ষয়কারি ভুরি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি
সর্বেষু দেব্যসুরদেবগণাদিকেষু।।৬

দেবতারা বলছেন, অসুরদের বিনাশের সময় আপনার যে মহাবীর্য আর রূপ আমরা দেখেছি, যেভাবে আপনি নিমেষের মধ্যে সমস্ত অসুরকুলকে নাশ করলেন আর এখন আমাদের সামনে আপনার যে এই অচিন্ত্য রূপ দর্শন করছি, আপনার এই রূপ আর আপনার অত্যদ্ভুত আচরণ সমূহের কী বর্ণনা করব! অর্থাৎ আপনার রূপের বর্ণনা করা আমাদের কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। মানুষের মন যে বস্তুকে ধারণা করতে পারে, যে সকল শব্দের অর্থ বুঝতে পারে, সেটাকেই মানুষ শুধু বর্ণনা করতে পারে। কিন্তু কোন কিছু মানুষের ধারণাকে যখন অতিক্রম করে যায়, অতীত অভিজ্ঞতার বহির্ভূত কোন কিছু যখন তার সামনে চলে আসে, তখন সে আর তার বর্ণনা করতে পারে না। আমরা যখনই নতুন কিছুকে বর্ণনা করি তখন আমাদের আগের আগের অভিজ্ঞতার সাথে তুলনা করে করে বর্ণনা করি। কিন্তু যদি গুণগত ভাবে বিরাট তফাৎ এসে যায় তখন আর তার বর্ণনা করা যায় না। কেন সম্ভব নয় তার কারণ পরের মন্ত্রে বলছেন।

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ-
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা।।৭

মা! আপনি হলেন আদ্যাশক্তি, মূলা প্রকৃতি। আমরা অনেক সময় বলি অমুক মোহ মায়াতে পড়ে গেছে। হিন্দীতে টাকা পয়সাকেও মোহ মায়া বলে। এখানে মোহ মায়া অর্থে কখনই বলা হচ্ছে না। এই সংশয় যাতে না হয় সেইজন্য অনেক সময় বলা হয় আদ্যা প্রকৃতি বা ভগবানের মূলা প্রকৃতি। অনেক সময় আমরা ব্যক্তি স্তরেও এই মায়া, প্রকৃতি শব্দগুলো ব্যবহার করি। স্বভাবকেও আমরা প্রকৃতি বলি। মায়া, প্রকৃতি, শক্তি, মোহ এই শব্দগুলি ব্যক্তিস্তরেও ব্যবহার করা হয় আবার সমষ্টির ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। দর্শন শাস্ত্রে যখন এই শব্দগুলো আসে তখন সব সময়ই এর অর্থ সমষ্টির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে যখনই এই শব্দগুলো আসে তখন সব সময় ব্যষ্টি স্তরে নিতে হবে। সাধারণ ভাবে কোন কিছু লেখা বা বলার সময় যাতে আমাদের সংশয় না হয় তাই এনারা শব্দের আগে আদ্যা বা মহা লাগিয়ে দেন, মায়া না বলে বলবেন মহামায়া, প্রকৃতি না বলে বলবেন আদ্যা প্রকৃতি, এই রকম মহামোহ, আদ্যাশক্তি ইত্যাদি। আসলে সবটাই সমষ্টি, যেমন মায়া মানেই আদিশক্তি। কিন্তু সব জায়গায় মায়া শব্দের এত ব্যবহার করা হয় যে, করতে করতে আসল মায়া শব্দের সাথে সাধারণ মায়াকে মিশিয়ে ফেলেছি। এখানে মাকে বলছেন, আপনি হলেন আদ্যা প্রকৃতি, আপনি মূলা প্রকৃতি। ভগবান বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা এঁরাও কেউ আপনার কাছ থেকে পার পান না। কারণ আপনি হলেন সবারই আশ্রয়।

এখানে সাকার বিষ্ণুর কথা বলা হচ্ছে। বিষ্ণুর দুটি রূপ, তাঁর একটি রূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। শক্তি আর শক্তিমান এক। মন্ত্রে যে মায়ের কথা বলা হচ্ছে, এই মা হলেন শক্তি। শক্তিমান যিনি সেই ভগবান আর যে শক্তিকে আমরা মা বলছি, এই দুজন এক। কিন্তু বিষ্ণুর আরেকটি রূপ হলে তিনি পালন করেন, ব্রহ্মা আর শিবের সঙ্গে বিষ্ণুরও নাম নেওয়া হয়। যখন বিষ্ণুকে এই রূপে দেখি তখন ব্রহ্মা হলেন স্রষ্টাকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা আর শিব সংহারকর্তা। একই ভগবানের তিনটে রূপ। সেইজন্য অনেক জায়গায় মহাবিষ্ণু এই শব্দটাও ব্যবহার করা হয় যাতে এই সংশয় না এসে যায়। এখানে যখন বলছেন হরি অর্থাৎ বিষ্ণু আপনার পার পান না, তখন ছোট্ট দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। চণ্ডী হল পুরাণের অংশ। পৌরাণিক সাহিত্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের স্তুতি বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন ভাবে হয়। শেষ পর্যন্ত বিষ্ণুর তিনটে রূপে এসে যাচ্ছে। একটা রূপ বিষ্ণু দেবতা যিনি জগতকে পরিপালন করছেন, দ্বিতীয় রূপ বিষ্ণু যিনি সাকার ভগবান আর তৃতীয় হল বিষ্ণু যিনি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, নির্গুণ নিরাকার। পৌরাণিক সাহিত্যের একটা বড় সমস্যা হল, যেখানে বিষ্ণুর যে যে গুণের বর্ণনা করা হচ্ছে অন্য জায়গায় সেই গুণগুলোই শিবের বা ব্রহ্মার উপর আরোপ করে দেওয়া হয়, আবার যেখানে শিবের কিছু গুণের কথা বলছে সেই গুণই অন্য জায়গায় ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর নামে চাপিয়ে দেয়, এই কারণে আমাদের মধ্যে অনেক সংশয় হয়ে যায়। যুক্তি দিয়ে জিনিষটাকে দাঁড় করাতে হলে এছাড়া দাঁড়াবে না। কারণ শক্তি আর শক্তিমান অভেদ। তাই মায়া যে শক্তি, তিনি বিষ্ণুরই শক্তি। তাহলে ভগবান বিষ্ণু তো তাঁকে জানবেন। কিন্তু এখানে বলছেন *হরিহরাদিভিরপ্যপারা*, হরি

আর হর এঁরা কেউ মায়ের পার পান না। তার অর্থ এটাই হবে, পালনকর্তা রূপে যিনি বিষ্ণু, যাঁর ক্ষমতা সীমিত হয়ে আছে, এখানে তাঁর কথা বলছেন।

ইদানিং অনেক বড় বড় বক্তারা ভাষণে বলেন – মা হলেন ঠাকুরের অনেক উপরে, এমনকি ঠাকুরের থেকে মায়ের ছবিও অনেক বেশি। তাছাড়া ঠাকুর হৃদয়রামকে বলছেন 'আমি রেগে গেলে তাও রক্ষা পেয়ে যাবি কিন্তু ও (শ্রীমা) যদি একবারে রেগে যায় তাহলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ কেউ রক্ষা করতে পারবে না'। তাই মা বড়। লীলাপ্রসঙ্গে এই কথা আছে, তাই এই কথাকে অস্বীকার করা যাবে না। এবার সবাই এটাকেই আক্ষরিক সত্য বলে মাথায় বসিয়ে নিয়েছে। এই তর্ককে আধার করেই এখানে বলছেন হরি ও হর আপনার পার পাবে না। স্তুতি করতে গিয়ে ভক্ত অনেক রকম কথা বলে। মায়ের ভক্ত এক রকম দেখছে, শিব ভক্ত এক রকম দেখছে, বিষ্ণু ভক্ত অন্য রকম দেখছে সেইজন্য আমাদের সব কিছু গুলিয়ে যায়। সেইজন্য এগুলো নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাটি করতে নেই। কিছু দিন পরে লেখা হবে ঠাকুরেরও ক্ষমতা নেই মার পারে যাওয়ার। ঠাকুরও বলেছেন অবতারও শক্তির আণ্ডারে। মা শক্তি আর ঠাকুর অবতার তাই ঠাকুর মায়ের আণ্ডারে। এগুলো শুনে যেতে হয় বেশি বাদবিতণ্ডাতে না যাওয়াই ভালো। স্তুতি করতে গিয়ে কাকে বড় করে দেবে আর কাকে ছোট করে দেবে এর কোন মাথামুণ্ডু নেই। আমাদের এইটুকু তো বুদ্ধি, এইটুকু বুদ্ধির মধ্যে বেশি বিচার ঢুকে পড়লে ডোবাতে হাতি নামার মত অবস্থা হয়ে বুদ্ধিকে তোলপাড় করে দেবে।

মা হলেন আদি প্রকৃতি, মূলা প্রকৃতি। সচ্চিদানন্দের উপর প্রথম যে আবরণটা পড়ে, যে আবরণ হল গুণমাত্র – সত্ত্ব, রজো আর তমো। এই যে জগৎ, এই জগতটাই প্রথম সচ্চিদানন্দের সীমিত রূপ। ঈশ্বরকে যখন দেখা যায়, এই আবরণ আছে বলেই ঈশ্বরকে দেখা যায়। এরও অনেক নীচে থেকে সৃষ্টি শুরু হয়। যিনি ঈশ্বরকে সগুণ সাকার দেখছেন, তখন তিনি অবশ্যই আবরণের এই দিকে আছেন, সেইজন্য তাঁর সচ্চিদানন্দের আসল রূপকে জানার কথা নয়। যদি বিচার করে দেখা হয় তখন এটা দাঁড়াবে না। বিচার করলে এটাই দাঁড়াবে, তিনিই সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দ যিনি তাঁর নিরাকার সাকারে কোন বিভেদ নেই। সেইজন্য জগতে এমন কিছু নেই যেটাকে ভগবান জানবেন না। কিন্তু স্তুতি করতে গিয়ে এই বিচারকে সামলে রাখা যায় না। ভগবান শিবের কী আর আছে! আচার্য শঙ্কর তাঁর স্তোত্রেই বলছেন – *চিতাভস্মালেপো গরলমশনং দিক্‌পটধরো জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারঃ পশুপতিঃ। কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং ভবানি ত্বৎপাণিগ্রহণপরিপাটীফলমিদম্।।* যিনি বিষ ভক্ষণ করেন, শশ্মানের চিতাভস্ম যাঁর অঙ্গের ভূষণ, সর্বদা দিগম্বর, মাথায় যাঁর জটাচূড়া, গলে সর্পমালা, কপালী, ভূতদের সর্দার যিনি, সেই শিবকে ভক্তরা জগদীশ বলে সম্বোধন করেন, জগদীশ মানে তিনি ঈশ্বর। যাঁর কপালে আগুন, ভূতপ্রেত যাঁর সঙ্গী তাঁকে জগদীশ বলছেন। কারণ, হে মা ভবানী! তুমি যে তাঁর হাত ধরেছ বা তিনি যে তোমার হাত ধরেছেন তাতেই তিনি মহৎ হয়ে গেছেন। অথচ এই শিবকে পাওয়ার জন্য মা পার্বতী কী কঠোর তপস্যা করেছেন। শিব যদি সাধারণ কেউ হতেন তাহলে কি পার্বতী তপস্যা করতেন। তাহলে কী বলতে চাইছেন? অথচ এই স্তোত্র আচার্য শঙ্করের লেখা। তাহলে কোনটা ঠিক? সবটাই ঠিক, শিব যে জগদীশ সেটাও ঠিক, শিব যে পার্বতীর পাণিগ্রহণ করেছেন সেটাও ঠিক, আবার মা অন্নপূর্ণার জন্য শিবের মহিমা বড় হয়ে গেছে সেটাও ঠিক।

কোন এক সময় একজন অল্প বয়সী সন্ন্যাসীকে তাঁর পরিচিত একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী বলছেন 'মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করবে আর মায়ের মন্দিরে মার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করবে'। বলার পর বলছেন 'ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে কিছু হবে না, তিনি সমাধিতে নিমগ্ন, তাই যদি কিছু চাইতে হয় তাহলে মার কাছে গিয়ে চাও'। যদিও এই কথা শোনার পর যুবক সন্ন্যাসী মনে মনে একটু হেসেছিলেন কিন্তু পরে এই নিয়ে অনেক গভীর ভাবে চিন্তা করলেন। চিন্তা করে দেখছেন, আমরা যাকে গভীর ভাবে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি ধীরে ধীরে তার গুণগুলিও আমাদের মধ্যে চলে আসে। যারা ঠাকুরকে গভীর ভাবে ভালোবাসছে তার মধ্যে ঠাকুরের গুণ চলে আসবে। ঠাকুর হলেন সমাধিবান পুরুষ। সমাধিবান পুরুষের নিজের শরীরের কোন হুঁশ থাকে না, তাঁর খাওয়া-দাওয়া, জামা-কাপড় কি জুটছে, কি জুটছে না সেই ব্যাপারে কোন হুঁশ নেই। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে ঠাকুর হলেন, মা বলছেন 'ঠাকুর হলেন ত্যাগের বাদশা'। অন্য দিকে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক জ্ঞান আর সেই জ্ঞানের অনুভূতির যে অবস্থায় তিনি সব সময় প্রতিষ্ঠিত তার তো কোন কল্পনাই করা যাবে না। শ্রীমাও অনুভূতি সম্পন্না, ঠাকুরও উপলব্ধিবান,

কিন্তু দুটোতে তফাৎ আছে। ঠাকুর হলেন ত্যাগের বাদশা আর শ্রীমা পুরো সংসারকে ধরে আছেন। যাঁরাই বেলুড় মঠে আসছেন সেখানে মেনেই নেওয়া হচ্ছে যে তাঁরা আধ্যাত্মিকতার জন্যই বেলুড় মঠে এসেছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা নেওয়ার পর দেখতে হবে আপনি আধ্যাত্মিকতার ত্যাগের দিকটা নেবেন, না সংসারকে নেবেন। যদি সংসারকে রাখতে চান তাহলে আপনি মায়ের মন্দিরে মাথা ঠুকে ঠুকে প্রণাম করে প্রার্থনা করতে থাকুন। ঠাকুরের কাছে যদি যান তাহলে বুঝতে হবে ত্যাগ তপস্যার দিকে আপনি বেশি জোর দিতে চাইছেন। আপনি যদি শিবকে ভালোবাসতে থাকেন তখন তাঁর গুণগুলো আপনার মধ্যে চলে আসবে। এরপর যদি কোন গোলমাল হয়, টাকা-পয়সা যদি না হয় তখন আপনার দুঃখ হবে না, কারণ আপনার শিবও তো ওই ভাবেই থাকেন।

মহাপ্রভুর শিষ্য রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে থাকতেন। সেখানে ভিক্ষা করে দুটো শুকনো রুটি পেতেন, সেখান থেকে তিনি নিজেও খেতেন আর ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণকেও অর্পণ করতেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নে এসে রূপ গোস্বামীকে বলছেন – এই শুকনো রুটি খেতে পারি না, একটু লবণ যদি থাকতো তাহলেও খাওয়া যেত। পরের দিন তিনি ভিক্ষায় গিয়ে একই বাড়ি থেকে নেবেন না, তাই আরেক গৃহস্থের বাড়ি থেকে লবণ ভিক্ষা করে নিয়ে আসতে শুরু করলেন। ভগবান এবার লবণ দিয়ে রুটি খেতে শুরু করেছেন। কিছু দিন পর আবার শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নে এসেছেন। এসে বলছেন – আর কত শুকনো রুটি খাব, রুটিতে যদি একটু ঘি লাগান থাকত। রূপ গোস্বামী বলছেন – এর বেশি আমার দ্বারা হবে না। আপনার ঘি মাখানো রুটি খেতে যদি হয় তাহলে বড়লোক ভক্ত জোগার করুন। তখন ভগবান কোথাকার এক রাজাকে স্বপ্ন দিয়ে ব্যবস্থা করলেন। রূপ গোস্বামীর মধ্যে ঈশ্বরের ওই ত্যাগ বৈরাগ্যের ভাব এমন গভীর ভাবে ঢুকে আছে যে, ভগবানের সেবা, তাঁর ইষ্টের সেবার জন্যও তিনি ত্যাগ বৈরাগ্যের সঙ্গে আপোষ করতে পারছেন না। ঠিক তাই হল, রূপ গোস্বামীর কাছে ভগবান সেই ভাবেই থাকলেন। আবার অন্য দিকে যে রাজাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, সেখানে অন্য একটা দিক, যার জন্য বৃন্দাবনের রঙ্গনাথানন্দের মন্দিরে ভগবানের ভোগের এলাহি আয়োজন।

এখানে আমরা শিবের কথা আলোচনা করছিলাম। পার্বতী যদি না থাকেন তাহলে শিব কোথায় থাকবেন? শিব তো ধ্যানে মগ্ন। ভগবান শিব হলেন নির্বিকল্প, নির্বিকার, এটাই তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা। তিনি যদি ধ্যানেই মগ্ন হয়ে থাকেন, যেখানে কেউ পৌঁছাতে পারবে না, সেই শিবকে নিয়ে আমাদের কী হবে! কে তাঁর আরাধনা করতে যাবে! নির্গুণ নিরাকারের কী আরাধনা করবে আর কীই বা আরাধনা করবে! নির্গুণ নিরাকারের কেউ আরাধনা করে না। সগুণ সাকার ঈশ্বরের আরাধনাই সবাই করে। ঠাকুর বলছেন যে বাবুর বাগান নেই, বাড়ি নেই সেই বাবু কিসের বাবু! যে ভগবানের ঐশ্বর্য নেই সেই ভগবান কিসের ভগবান। তাই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের পূজা কেউ করে না, পূজা কি করেই বা হবে! তেমনি শিব, তিনি নিরাকার রূপে যদি হারিয়ে থাকেন তাঁর মহিমা কে জানবে! তাঁর মহিমা জানা গেল কী করে? পার্বতী যখন তপস্যা করে করে শিবের মনকে ওই নির্বিকল্প, নির্বিকার অবস্থা থেকে নামিয়ে আনলেন। কিসের জন্য নামালেন? শিবকে বিয়ে করার জন্য। বিয়ে যখন করেছেন তখন শিবের এই রূপ এসে গেছে, সাকার নিরাকার দুটোই আছে। শিবের নিরাকার রূপের পূজা কেউ করে না, আমরা তাঁর সাকার রূপের পূজাই করি। সাকার রূপ কেন আছে? পার্বতীর জন্যই আছে। আচার্য শঙ্কর তাই ভুল কিছু বলছেন না – *ভবানি ত্বৎপাণিগ্রহণপরিপাটীফলমিদম্*, মা তুমি শিবের হাত ধরেছ বল শিব শিব হয়েছেন। স্তুতি যখন হয় তখন এভাবেই স্তুতি হয়।

ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা, ঠিকই বলছেন হরি ও হর এরা কেউই তোমার পার পাবে না। যেমন ওখানে বলছেন মা পাণিগ্রহণ করার জন্য শিবের হাত ধরেছিলেন বলেই শিবের এত মাহাত্ম্য। ঠিক তেমনি এখানে বলছেন, মা! তুমি আছ বলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশের অস্তিত্ব। একই কথা বলা হচ্ছে। এই ধরণের স্তুতিকে বেশি যুক্তি দিয়ে না দেখে ভাবের দৃষ্টিতে দেখতে হয়। যদি এটাকে মায়া রূপে দেখা হয় তাহলে কিন্তু গোলমাল হয়ে যাবে, প্রকৃতির রূপে দেখলেও গোলমাল লেগে যাবে, শক্তি রূপে দেখলেও গোলমাল লেগে যাবে। মা বিশ্বজননী, আদিকর্ত্রী, এই রূপে দেখলে ভাবটা ঠিক থাকে। কারণ বিশ্ব প্রসব হচ্ছে। কোথা থেকে বিশ্ব প্রসব হয়? মা কালী থেকে। মা কালীকে এবার আপনি যেটাই বলুন, মায়া বলুন, শক্তি বলুন, প্রকৃতি বলুন, যেটাই বলুন একই জিনিষ। এখানে যে ভাবটা নেওয়া হয়েছে সেটাই এই মায়ের ভাব। হে মা! তোমার থেকেই সব কিছু প্রসব হচ্ছে। কি কি

প্রসব হচ্ছে? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ সব তোমার থেকেই প্রসব হচ্ছে। ঠিকই বলছেন, কারণ ওই আবরণ যদি না থাকে তাহলে সচ্চিদানন্দকে দেখা যাবে না।

সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূতমব্যকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা, মা! তুমি সেই আদ্যাপ্রকৃতি, তুমিই জগতের সব কিছুর আশ্রয় কিন্তু তুমি কোন কিছুতেই লিপ্ত হও না। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটে গুণ দিয়েই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। এই তিনটে গুণের সমাহারকেই মায়া বলা হয়, এই মায়াকে তন্ত্রে বলে কালী, এই মায়াকেই সাংখ্যে বলে প্রকৃতি। আমরা সবাই সত্ত্ব, রজঃ ও তমের যে এই বিশাল সমুদ্র, এর মধ্যে ভাসছি। এই পৃথিবী, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সব এই তিনটে গুণের বিশাল সমুদ্রে ভাসছে। এই তিনটে গুণই মূল, এটাই মায়া। তাহলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে এত দোষ বা সত্ত্ব, রজঃ ও তমের যে এত দোষ, এই দোষ কোথায় আছে? মাকে আশ্রয় করে আছে। কিন্তু মাকে কোন কিছুই স্পর্শ করতে পারে না। ঠাকুর যেমন উপমা দিচ্ছেন, সাপের মুখে বিষ আছে কিন্তু সাপের তাতে কিছু আসে যায় না। আমার আপনার মধ্যে যদি তমো গুণ অনেক বেড়ে যায় তখন আমি নিদ্রাগ্রস্ত হয়ে যাব, কামী হয়ে যাব, লোভী হয়ে যাব। কিন্তু মায়ের এই সমস্যা হয় না। সেইজন্য আমরা যে অর্থে মায়া শব্দ, মোহ শব্দকে বুঝি এখানে ঠিক সেই অর্থে হয় না, এখানে অন্য অর্থে হয়।

শুধু তাই না, *ইদং জগদংশভূতম্*, এই যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এটা তোমার একটা ছোট্ট অংশ। গীতায় ভগবান বলছেন *একাংশেন স্থিতো জগৎ*, আমার একটা ছোট্ট অংশে পুরো সংসার দাঁড়িয়ে আছে। ভগবান আর এই সৃষ্টিকে দেখার অনেকগুলো মডেল আছে। একটা মডেল হল লীলা। ভগবান লীলাতে এই সৃষ্টি করেন, সৃষ্টিটাই তাঁর লীলা। ভগবান যদি লীলাতে সৃষ্টি করেন তাহলে সৃষ্টির উপাদানগুলো তিনি কোথা থেকে আনছেন? যদি বাইরে থেকে আনতে হয় তাহলে ভগবানের বাইরেও কিছু আছে। ভগবানের বাইরে তো কিছু থাকা সম্ভব নয়। তাহলে বলতে হয় ভগবানই এই জগৎ হয়েছেন। ভগবান যদি জগৎ হয়ে থাকেন তাহলে ভগবান কখন বাড়ছেন আর কখন কমছেন। তাহলে তো বিশাল সমস্যা হয়ে যাবে। যেদিক থেকেই যাওয়া হবে ভগবান ফেঁসে যাবেন। সেইজন্য দ্বৈতবাদীরা বলে দেন তাঁর লীলা। যেমনি আপনি লীলা শব্দটা বলে দিলেন তার মানে গিয়ে দাঁড়াল, আপনি বলতে চাইছেন যে আপনি ব্যাখ্যা করতে পারছেন না জিনিষটা ঠিক কি। কিন্তু লীলাতেও এই জগতটা কী রকম হবে? তখন বলছেন ভগবানের পায়ের বুড়ো আঙুলের ডাগায় যে একটা ছোট্ট দাগ দেখছ, এটাই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। একটা সাদা কাগজে যদি পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটা ছবি নেওয়া হয় তাহলে সেই ছবিতে আমাদের এই সৌরমণ্ডলকে খুঁজেই পাওয়া যাবে না। সেই সৌরমণ্ডলকে খুঁজে বার করে যদি বড় করা হয় তাহলে সেখানে পৃথিবীকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। পৃথিবীর ছবিকে যদি বড় করে দেখা হয় তখন আবার কলকাতা শহরকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার মধ্যে বেলুড় মঠ, সেই বেলুড় মঠে এই বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, তার মধ্যে আমরা শাস্ত্রের কথা শুনছি, অথচ আমরা সবাই নিজেদের কত বড় মনে করছি। শুধু তাই নয়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা দুটো নয়, এই রকম কোটি কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সেটা কিনা ভগবানের পায়ের নখাগ্রের ছোট্ট একটু অংশ। এই ভাবে বলার উদ্দেশ্য বিশালত্বকে বোঝান। প্রকৃতির তুলনায় ঈশ্বরের বিশালত্ব কত সেটাকে বোঝানোর জন্য এইভাবে বলা হয়। প্রকৃতিও ঈশ্বরের সামনে অতি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র। কিন্তু এখানে মায়ের স্তুতি চলছে, স্তুতি করতে গিয়ে এই কথা বলা যাবে না যে মা তুমি ভগবানের সামনে নখাগ্র। তাই বলছেন, মা! এই জগৎ তোমার একটা ছোট্ট অংশ। ঠিকই বলছেন, কারণ ভগবান যখন সৃষ্টি কার্যে নেমে পড়েন, তিনি যখন লীলা করতে ইচ্ছে করলেন তখন মা না থাকলে তো লীলা হবে না। সেইজন্য সৃষ্টিটা মায়েরই কার্য।

যত ব্রহ্মাণ্ড আছে, multiverse আছে, parallel universe আছে, যা কিছু আছে সব যদি একত্র করে দেওয়া হয়, তাও সেটা আদ্যাশক্তি মায়ের নখাগ্রের কণা মাত্রও হবে না। সেইজন্য মাঝখানে ফিজিক্স নিয়ে এল ডার্ক ম্যাটার। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এত পরিমাণ ওজন হওয়ার কথা। কিন্তু মজার ব্যাপার হল এই ওজন হওয়ার জন্য যত ম্যাটার থাকার কথা তার শতকরা নব্বুই ভাগ ম্যাটারকে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না, মাত্র দশ শতাংশ পাওয়া গেছে। সেইজন্য যে ম্যাটারের কোন হদিশ পাওয়া গেল না, সেই ম্যাটারগুলোকে বলে দিলেন ডার্ক ম্যাটার, যেগুলোকে কোন ভাবে পাওয়া যাবে না। আসলে আমাদের যে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো আছে সেগুলো দিয়ে অনেক ম্যাটারের হদিশ পাওয়া যায় না। সেখান থেকে হিগস্ বসন এই গড্ পার্টিকেলসকে নিয়ে

এলেন। এটাকেই অনেকে বলতে শুরু করে দিলেন ডার্ক মানে অন্ধকার, তাই এটাই কালী। কিন্তু এখানে মূল কথা হল এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এটা হল মায়ের একটা ছোট্ট অংশ।

যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রয়াতি সকেলেষু মখেষু দেবি।
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু-
রুচ্চার্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ।।৮

চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত। মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনেক প্রাচীন যুগের রচনা। তখনকার দিনে মানব জীবনের উদ্দেশ্য ছিল স্বর্গে যাওয়া। যাঁরা স্বর্গে যাবেন না বা যেতে পারবেন না, তাঁরা পিতৃলোকে যেতেন। তার মানে দুটো পথ – উত্তরায়ণ আর দক্ষিণায়ন। গীতার অষ্টম অধ্যায়েও এই দুটো মার্গের কথা বলা হয়েছে। উত্তরায়ণ পথে যাঁরা গমন করেন তাঁরা দেবলোকে যান। দক্ষিণায়ন পথে যারা যান তাঁরা পিতৃলোকে যান। পিতৃলোক খারাপ কিছু নয়, আসলে পিতৃলোক হল স্বল্পমেয়াদী কাল আর দেবলোক হল আরও দীর্ঘমেয়াদী কাল। পিতৃলোকের সুখের তুলনায় দেবলোকের সুখ অনেক বেশি। মানুষ যাকে ভালোবাসে মৃত্যুর পরেও সে তার সাথেই থাকতে চায়। আমরা বাবা, মা, স্ত্রী, পুত্রদের ভালোবাসি, আমরা চাই মৃত্যুর পর নিজের কাছের লোকেদের সঙ্গে থাকব। মৃত্যুর পর এরাও তো দিব্য শরীর নিয়েই আছে। সন্ন্যাসীদের কাছে আত্মীয়-স্বজনদের কাল সাপ মনে হয়, সে মনে করে মৃত্যুর পর আমি যেন রামকৃষ্ণলোকে থাকতে পারি, যেখানে রাজা মহারাজ, স্বামীজীর মত ঠাকুরের পার্ষদরা আছেন। এই ধারণাগুলো ইদানিং কালের। কিন্তু আগেকার দিনে ধারণা ছিল, মৃত্যুর পর সঙ্গে সঙ্গে জন্ম হবে না, সুকৃতি থাকলে হয় সে পিতৃলোকে যাবে নয়তো দেবলোকে যাবে। দেবলোকে সুখ বেশি আর দেবলোকে অনেক বেশি দিন থাকা যায় তাই দেবলোক থেকে পতন হলে কষ্টটাও বেশি হয়। পিতৃলোকে সুখ কম, পিতৃলোকে বাসের মেয়াদটাও কম, তাই পিতৃলোক থেকে পতন হলে দুঃখটাও কম হবে। এগুলো হল তখনকার দৃষ্টিভঙ্গী। যজ্ঞের ক্ষেত্রেও বলা হত, এই এই যজ্ঞ করলে পিতৃলোকে যাবে, এই যজ্ঞ করলে স্বর্গলোকে যাবে। দেবলোকে যাওয়ার জন্য যে যজ্ঞগুলো হত সেই যজ্ঞে যে মন্ত্র দিয়ে আহুতি দেওয়া হত, সেই মন্ত্রগুলো সব স্বাহা দিয়ে শেষ হয়। পিতৃলোকের যজ্ঞে মন্ত্রগুলো স্বধা দিয়ে শেষ হত। যখন পিতৃদের নামে আহুতি দিচ্ছে তখন বলবে ওঁ অগ্নেয় স্বধা, এই মন্ত্রই যখন দেবলোকে যাওয়ার যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হত তখন বলত ওঁ অগ্নেয় স্বাহা। দেবলোকে যাওয়ার যজ্ঞে দেবতাদের নামে সঙ্কল্প নিতে হত। ভগবানের নামে যখন আহুতি দেওয়া হয় তখনও শেষে স্বাহা বলেই আহুতি দেওয়া হয়। কিছু যজ্ঞে দাঁড়িয়ে আহুতি দেওয়া হয়, সেখানে বৌষট্ মন্ত্রে আহুতি দেওয়া হয়। অনেক ইতর প্রাণীদের নামে যখন আহুতি দেওয়া হয় তখন হন্তা বলে আহুতি দেওয়া হয়। আমাদের পূর্বজদের কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল দেবলোক আর পিতৃলোক। স্বাহা বললে বোঝায় স্বর্গলোকের জন্য যজ্ঞ হচ্ছে আর স্বধা বললে বোঝাবে পিতৃলোকের জন্য যজ্ঞ হচ্ছে।

তন্ত্র দর্শনে মন্ত্রশক্তির উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। আমরাও বিশ্বাস করি যে, আমরা যে মন্ত্র জপ করছি এই মন্ত্র জপের একটা ফল আছে। আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে যজ্ঞে স্বাহা স্বধা বলে যে আহুতি দেওয়া হচ্ছে, সেই আহুতি যে দেবতার উদ্দেশ্য অর্পণ করা হচ্ছে, সেটা সেই দেবতার কাছে পৌঁছে যায়। কি করে পৌঁছে যায়? মন্ত্র শক্তিতে যায়। স্বাহা, স্বধা এগুলোই মন্ত্রশক্তিকে পূর্ণ করে। বলছেন, হে দেবী! যাঁর উচ্চারণে সব রকম যজ্ঞে সমস্ত দেবতারা তৃপ্তি লাভ করেন, সেই স্বাহামন্ত্র তুমি। আবার পিতৃলোকের পিতৃগণদের তুষ্টির জন্য যে স্বধামন্ত্র উচ্চারণ করা হয় সেই স্বধাও তুমিই। স্বাহাও তুমি স্বধাও তুমি। আসলে এই স্বাহা যেমন দেবলোকে নিয়ে যায়, স্বধা পিতৃলোকে নিয়ে যায়, ওঁ মুক্তির পথে নিয়ে যায়, এই স্বাহা, স্বধা, ওঁ আর বেদ সবই মা নিজে।

দর্শন জগতে দুটো মত প্রথম থেকে চলে আসছে, একটাকে বলে Subjectivism আর আরেকটাকে বলে Objectivism। পাশ্চাত্য জগতের দর্শনের আলোচনা চলে দুজন দার্শনিককে কেন্দ্র করে, প্লেটো ও এ্যারিস্টটল। মজা করে বলা হয় সমগ্র পাশ্চাত্য দর্শনে যা কিছু আছে তা হল A big foot-note on Pleto। কারণ প্লেটো যা বলে দিয়েছেন তারপরে আর কিছু নেই, এরপর বাকি যা কিছু আছে সব ফুটনোট। ফুটনোট মানে এক লাইন কি দু লাইন। পুরো পাশ্চাত্য দর্শন, কান্ট, হেগেল যাঁদের নামই বলুন না কেন, এঁরা সবাই ছিলেন

একটা ফুটনোট। তার মানে মূল বইটা খুব ছোট কিন্তু তার ব্যাখ্যাটা বিরাট বড়। কিন্তু প্লেটোর বাইরে এনারা কেউ যেতে পারেন না। দুটো অর্থেই যেতে পারে না, হয় প্লেটোর পক্ষে বলছে আর তা নাহলে প্লেটোর বিপক্ষে বলছে। প্লেটো হলেন পুরোপুরি Subjectivism। আর তাঁর শিষ্য এ্যরিস্টটল ছিলেন পুরোপুরি Objectivism। এই Subjectivism আর Objectivismকে নিয়ে প্রচুর বই লেখা হয়েছে। একজন আমেরিকান লেখিকা Ayn Rand, তাঁর দুটি বই খুব নামকরা The Fountainhead আর Atlas Shrugged। লেখিকা Objectivismএর খুব বিরাট মতাবলম্বী ছিলেন, এই দুটো বই লিখে তিনি বিশ্ব বিখ্যাত হয়ে গেলেন। আজ থেকে ষাট বছর আগে এই বই তিনি লিখেছিলেন, কিন্তু এখনও এই বই দুটি বেস্ট সেলার।

এই Subjectivism আর Objectivismএর তফাৎ হল, টেবিলের উপর এই যে গ্লাশ আছে, এই গ্লাশ আদৌ এখানে আছে, নাকি আদপে কোন গ্লাশই নেই? দর্শনের কাছে এটি একটি বড় সমস্যা। আমাদের কাছে মনে হবে এই ধরণের জিনিষ কী কখন আলোচনার বিষয় বস্তু হতে পারে! কিন্তু দর্শনের যত গভীরে যাওয়া হবে তখন এটাই বিরাট বড় সমস্যা নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এই গ্লাশটা বাইরে আছে, নাকি আমার মাথার ভেতরে আছে? Subjectivismএর প্রবক্তরা মনের ভাব ও বিচারের উপর খুব জোর দেন। অন্য দিকে Objectivistরা বলে জগৎ বাইরে আছে বলে আমরা জগতকে দেখতে পাচ্ছি। পাশ্চাত্যের যত দার্শনিক এই দুটোর মধ্যে না হলে Subjective-objectivismএর মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছেন। ভারতে এই দুটোকে নিয়ে খুব বেশি আলোড়ন হয় না, কারণ আমরা পরম্পরাগত ভাবে মূলতঃ Subjectivists। তার মানে আমরা বলি, আমি গ্লাশকে দেখছি বলে গ্লাশটা এখানে আছে। এই দুটো মতবাদকে নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া। চায়নার একজন জেন্ দার্শনিক একজনকে প্রশ্ন করেছেন 'এই পাথরটা কোথায়, বাইরে না তোমার মাথায়'? লোকটি বলেছে মাথায়। তখন জেন্ দার্শনিক বলছেন 'তাহলে তোমার মাথাটা তো একটা বিরাট বড় পাথর'। এটা জোক হিসাবে খুব ভালো জোক। কিন্তু যখন একটার পর একটা বিশ্লেষণ করতে করতে যত এগোতে থাকবেন তখন দেখবেন Subjectivism ছাড়া কিছু হতে পারে না। আর যদি বেদান্তের দর্শনকে পুরো মেনে চলেন তাহলে শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই। তাই বেদান্ত হয়ে গেল ঘোর Subjectivism, চৈতন্য আছে বলে জগৎ আছে। যদি নিজেকে সরিয়ে নেওয়া হয় তখন জগৎ যেটা দেখছে সেটাও চৈতন্য। কয়েকদিন আগে আমেরিকার একজন বিজ্ঞানী, তিনি আমেরিকার কোন বিশ্বাবিদ্যালয়ে বায়োলজির ডিপার্টমেন্টে অধ্যাপনা করেন। তাঁর নামে ইন্টারনেটে একটা খবর আসার কিছুক্ষণের মধ্যে সেই খবরটা চেপে দেওয়া হয়। তিনি বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণিত করেছেন যে মৃত্যুর পরেও জীবনের অস্তিত্ব আছে। এটাকে প্রমাণ করার জন্য তিনি কোয়ান্টাম ফিজিক্সকে লাগিয়েছেন। খবরে যতটুকু এসেছিল তার মধ্যে তিনি যে যুক্তিগুলো দেখিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে খুব একটা সারবত্তা নেই। আসলে উনি Subjectivist Philosophyকে আধার করে দেখাচ্ছেন যে সবটাই মনের ব্যাপার। জগতটাও মনের ব্যাপার, মৃত্যুটাও মনের ব্যাপার।

আমরা কিন্তু সবাই Subjectivists। অথচ আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে আমরা সবাই হলাম Objectivists। যাজ্ঞবল্ক্য যতই বলে থাকুন মানুষ নিজেকেই ভালোবাসে কিন্তু আমরা সবাই ব্যবহারিক জীবনে এসে দেখাচ্ছি আমি অপরকে ভালোবাসছি। আমি নিজেকে ভালোবাসছি এই বোধটা যদি আমার স্ত্রীকে, সন্তানকে ভালোবাসার সময় মাথায় ধরে রাখতে পারি তাহলে তো আমি যাজ্ঞবল্ক্যের মত একজন মহৎ ব্যক্তিত্ব হয়ে গেলাম। এটাই তো এখানে বলা হচ্ছে, জগতকে জগৎ রূপে ভালোবাসছেন তাহলে আপনি Objectivist হয়ে গেলেন। জগতকে আত্মরূপে ভালোবাসছেন তখন আপনি Subjectivist হয়ে গেলেন। যাঁরাই আধ্যাত্মিক পুরুষ হয়েছেন, যিশু, মহম্মাদ, বুদ্ধ, ঠাকুর যেই হোন এনারা সবাই কিন্তু Subjectivist। আর যারা ঘোর বিষয়ী চোখকান বুজে তারা সবাই Objectivists। আমরাও ঘোর বিষয়ী, মুখে যতই বলি আমরা ঠাকুরের ভক্ত, যতই গীতা উপনিষদ পড়ি না কেন, যখন কেউ আমাকে বিরক্ত করে তখন বলছি আমাকে জ্বালাতন করিস না। কে কাকে জ্বালাতন করছে? আপনাকে কি কেউ জ্বালাতন করছে? নাকি আপনি নিজেই জ্বলছেন? সব সময় জানছি অপর কেউ আমাকে জ্বালাতন করছে। আপনি যখন সন্তানকে ভালোবাসছেন তখন কি আপনি নিজেকে ভালোবাসছেন নাকি সন্তানকে ভালোবাসছেন? আমরা সবাই বলছি আমি সন্তানকে ভালোবাসছি, আমি নাতিকে ছাড়া থাকতে পারি না।

একবারও বলি না সন্তান, নাতিকে ভালোবাসছি মানে আমি নিজেই নিজেকে ভালোবাসছি। এসব কথা বেশি শুনলে আমাদের মাথা গুলিয়ে যাবে, আর যারা এই ধরণের কথা বলে তাদের আমরা পাগল ঠাওরাই, কিন্তু এটাই বাস্তব।

আমরা যে বিজ্ঞানীর কথা বলছিলাম, উনি খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন – আকাশকে আমরা দেখছি নীল। এখন কোন কারণে আমাদের মস্তিষ্কে নিউরো সেলগুলোর সংযোগ যদি অন্য রকম হয়ে যায় আমরা আকাশকে নীল না দেখে সবুজ দেখব। তাহলে আকাশ নীল না সবুজ? যেমনটি আপনার কাছে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু আকাশের আসল রঙ কি? আকাশের আসল স্বরূপকে তো জানা যাবে না। যে কোন ব্যাপারে দেখা বা জানার ক্ষেত্রে একই জিনিষ হবে। যেমন আমাদের চোখের দৃষ্টি একটা ওয়েভ লেংথ পর্যন্ত যায়, ওই ওয়েভ লেংথ পর্যন্তই আমরা দেখতে পারি। ওয়েভ লেংথ একটু যদি বাড়িয়ে দেওয়া যেত তাহলে আমরা তাপকেও দেখতে পারতাম। আমাদের যে আল্ট্রা সাউণ্ড দেওয়া হয়, কানের ক্ষমতা যদি বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমরা আল্ট্রা সাউণ্ডের ঘর্‌ঘর্‌ আওয়াজ শুনতে পারব, কিন্তু এখন শুনতে পাই না। আগুনে যখন কিছু গরম করা হয় তখন প্রথমের দিকে আমরা কিছু বুঝতে পারি না, কিন্তু ইনফ্রা রে আছে, তার মানে সেখানে তাপ তৈরী হচ্ছে। রাত্রিবেলা যুদ্ধের সময় সৈন্যরা একটা বিশেষ ধরণের চশমা পড়ে নেয়, তাতে ইনফ্রা রে অর্থাৎ যে তাপ ছাড়ছে ওটা পরিষ্কার দেখা যায়। তাতে তারা বিভিন্ন বস্তুর আকারটা বুঝতে পারে। আপনি অফিস থেকে কোন কারণে দৌড়ে বাড়ি এসেছেন। আপনার শরীর গরম হয়ে গেছে, আপনার স্ত্রী তাড়াতাড়ি আপনাকে ঠাণ্ডা জল দিলেন। আপনার শরীর গরম হয়ে গেছে, শরীর থেকে তাপ ছাড়ছে, আপনার স্ত্রী যদি ইনফ্রা রে দেখতে পেতেন তাহলে দেখতেন যে আপনার শরীরটা বড় হয়ে গেছে। স্ত্রী পাখা চালিয়ে দিল, এসি চালিয়ে দিল, আপনার শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, স্ত্রী যদি ইনফ্রা রে দেখতে পারতেন তাহলে দেখতেন আপনার শরীরের সাইজটা ছোট হয়ে গেছে। এবার বলুন, আপনার শরীর কি ছোট বড় হচ্ছে নাকি একই রকম আছে? মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করবে, ব্রেনের ওয়ারিংএর উপর নির্ভর করবে আপনাকে কেমন দেখাবে। তাহলে জগতটা কি Subjective নাকি জগৎটা Objective? এতো অতি সাধারণ ব্যাপার, আমার আপনার চোখ কানের ক্ষমতা একটু যদি এদিক সেদিক হয়ে যায় জগতকে অন্য রকম দেখব। হ্যারি পটারের কাহিনীতে এই কল্পনাকেই কাজে লাগিয়েছে, আপনার চোখের বা কানের এই ক্ষমতা একটু যদি অন্য রকম হয়ে যায় তাহলে জগতকে অন্য রকম দেখবেন। একটা কাহিনীতে দেখাচ্ছে কতকগুলো ছবি আছে, সেই ছবিগুলোই একটা জগৎ, ছবির কোন কিছুই ফ্রেমে থাকে না। যেমন মনে করুন ঠাকুরের ছবি এই দেওয়ালে আছে আর ওই দেওয়ালে শ্রীমার ছবি আছে। হঠাৎ দেখা গেল ঠাকুরের ছবি থেকে ঠাকুর বেরিয়ে মায়ের ছবিতে চলে এসেছেন। মাও নিজের ছবি পাল্টে ঠাকুরের ছবিতে চলে গেছেন। ছবিগুলো কখন এক জায়গায় থাকে না। ওরা অন্য জায়গায় যাবে না, ছবি ছবির মধ্যেই ঘুরতে থাকবে।

তাহলে জিনিষটা কেমন? আপনার বিচারে জিনিষটাকে আপনি যেমন দেখছেন। বানরের কাছে বানরের সন্তান হল জগতের সব থেকে সুন্দর দেখতে। কেন সুন্দর? কারণ তার দৃষ্টিটাই সেই রকম। বিয়ের পর সব পুরুষের কাছে তার স্ত্রী বিশ্বসুন্দরী আবার সব স্ত্রীর কাছ সব স্বামীই ফিল্মের হিরো। এগুলো কি করে হয়? সব কিছুর পেছনে একটাই আইডিয়া - Subjectivity। আমরা যখন বলি see the thing objectively, অর্থাৎ তখন বলতে চাইছি জিনিষটাকে বিচার করে, নিষ্পক্ষ ভাবে দেখ। নিষ্পক্ষ বলে কি কিছু হয়? কোন পরিস্থিতিতেই নিরপেক্ষ বলে কখনই কিছু হয় না। বিচারকদের ক্ষেত্রে ওদের নিউট্রাল বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আপনি এই মামলার মধ্যে কোন ভাবেই জড়িয়ে নেই। এখনও সারা বিশ্বে নিয়ম আছে, কোন ভাবে, কোন কারণে বিচারক যদি মামলার কোন কিছুতে জড়িয়ে থাকে উনি নিজেকে রেকিউজ করে নেন, রেকিউজ করা মানে বলে দেওয়া যে আমি এই বেঞ্চে থাকব না, আমি এতে জড়িয়ে আছি। তাই বলে কি সবাই এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন? কখনই বেরোতে পারবেন না, যতই আপনি নিউট্রালের কথা বলুন না কেন ইমোশান থাকবেই। একজন মূর্তিকারের মুর্তি তৈরী করা নিয়ে যদি বলা হয় তাহলে আরও ভালো ভাবে বোঝা যাবে। প্রথমে তার মনে একটা বিচার আসছে, এবার ছোটবেলা থেকে সে একটা প্রশিক্ষণ পেয়ে এসেছে, এই বিচার আর সেই প্রশিক্ষণ অনুযায়ী একটা আকার তৈরী করছে। এই আকারটাই ধীরে ধীরে একটা শব্দের আকার নিয়ে নেয়। আমরা যখন পরস্পর কথা বলি তখন আমার মনে একটা ভাব আসছে, সেই ভাবকে আমি শব্দে রূপান্তরিত করে দিচ্ছি। যখন বলছি

'বইটা দিন', তখন আমার মনের মধ্যে বইএর ভাব আসছে, আপনার মনেও বইয়ের একটা বিচার আছে, সেই বিচার দিয়ে বুঝে নিলেন আপনাকে কি করতে হবে। কিন্তু আপনার কাছে বই মানে যদি অন্য কিছু হয় তখন ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে? এই নিয়ে প্রায়ই আমাদের অনেক গোলমাল হয়ে যায়। এক এক সমাজে এক একটা শব্দের এক এক রকম অর্থ। যেমন কোন এক রাজ্যে জোকার শব্দের মানে যিনি প্রচুর জোকস্ বলেন আর মজা করেন। কিন্তু বাংলায় কাউকে জোকার বলা মানে তাকে ছোট করা। সেই রাজ্যের কেউ যদি কোন বাঙালী ভদ্রলোককে যিনি খুব মজা করতে পারেন, তাকে যদি সম্মান দিয়ে বলে 'আপনি তো খুব ভালো একজন জোকার', সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী ভদ্রলোক প্রচণ্ড রেগে যাবেন। এর মনে একটা আইডিয়া আছে, সেই আইডিয়া রূপান্তরিত হল একটা শব্দে, সেই শব্দটা অন্য একজনের কাছে সম্প্রচারিত হয়ে গেল, তার কাছে সেই শব্দটা আবার রূপান্তরিত হল একটা আইডিয়াতে। কিন্তু মাঝখানে শব্দটা মিসম্যাচ হয়ে গেছে। একজন শিল্পী যখন কোন ছবি আকছেন বা মুর্তি তৈরী করছেন তখন কি কি হচ্ছে? প্রথমে বিচার, বিচার থেকে শব্দ, শব্দের একটা আকার। শব্দ আর ছবি বা মুর্তি দুটো একই জিনিষ, মূল জিনিষটা তো মাথায়। শব্দের ক্ষেত্রে এয়ার ভাইব্রেশেনে একটা বিশেষ আকৃতি যখন নিচ্ছে তখন সেটাকে আমরা শব্দ বলছি। আর এয়ার প্রেসারে একটা অবজেক্ট তৈরী হচ্ছে, মাটি রাখা আছে, সেই মাটিকে আপনি প্রেসার দিচ্ছেন তখন সেই মাটি একটা আকার নিচ্ছে। সব একই জিনিষ হচ্ছে। আমি যখন বলছি বই, তখন আমার ঠোঁট প্রেসার তৈরী করে বাতাসকে একভাবে পাঠাচ্ছে। যখন বই এর একটা মডেল আঁকলাম বা মাটি দিয়ে বই এর একটা আকৃতি তৈরী করছি তখনও একটা জিনিষকে প্রেসার দিয়ে ওই আকৃতি দিচ্ছি।

আমাদের সবার ক্ষেত্রে সব সময় তিনটে জিনিষ একই সঙ্গে চলতে থাকে, আমার মাথায় বই, হাতে বই আর মুখে বই, তিনটেই আলাদা। কিন্তু বিচার করলে দেখা যাবে খুব একটা আলাদা থাকে না। যেমন আপনাকে কেউ যদি বলে দেয় 'আপনি একটা গাধা', তখন বিচারে বলতে চাইছে আপনি একটা অপদার্থ, শব্দে বলছে তুমি একটা অপদার্থ, ওই শব্দ যখন আপনার কাছে যাচ্ছে তখন আপনি একটা গাধার ইমেজ ধরে নিচ্ছেন। সেই 'গাধা' শব্দ হয়ে বিচার যাচ্ছে। এ যে অপদার্থ বলছে আর এ যে অপদার্থ মনে করছে, এখানে দুটো পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে। যখন খুব গভীর ভাবে বিচার করতে যাবেন তখন দেখবেন বিচার, শব্দ ও বস্তু এই তিনটের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তিনটে একই জিনিষ। গুরুজনকে আপনি এক চড় মারলেন, মুখে যদি বলেন এক চড় দেব আর মনে যদি ভাবেন এক চড় মারব – এই তিনটেই সমান। ঠাকুর গৃহস্থদের বলছেন কলিতে মনের পাপ পাপ নয়। কিন্তু সন্ন্যাসীদের জন্য মনের পাপ পাপ। মনের পাপ কি করে পাপ হতে পারে? কারণ বাহ্যিক পাপ আর ভেতরের পাপে কোন পার্থক্য নেই। তাহলে বাইরের পূণ্য আর ভেতরের পূণ্যে কি হবে? একই হবে। মনে মনে আপনি যে ঠাকুরকে ভক্তি করছেন আর বাইরে যিনি ঠাকুরকে মন্দিরে গিয়ে ভক্তি করছেন, দুটো একই জিনিষ। আপনি মনে মনে আমাকে ভালোবাসছেন আরেকজন বাইরে ভালোবাসা দেখাচ্ছেন, দুটো একই জিনিষ। মনে মনে কাউকে গালাগাল দিচ্ছেন আবার আরেকজন মুখে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে, দুটোতে কোন পার্থক্য নেই। কারণ বাইরের আচরণের দ্বারা আপনার ভেতরে যে ব্যক্তিত্ব তৈরী হচ্ছে মনে মনে সেই একই জিনিষ চিন্তন করলে আপনার ওই একই ব্যক্তিত্ব তৈরী হবে। স্বামীজী তাই বার বার বলছেন সব সময় মহৎ চিন্তা করতে। সৎ চিন্তা করলেই আপনার ব্যক্তিত্ব পাল্টে যাবে। আপনি যদি সৎ কাজ করেন তাতেও হবে। সৎ কাজ করে তারাই ভালো হয় যারা ঘোর বিষয়ী। আর শুভ চিন্তন করে, উচ্চ চিন্তন করে যাঁরা মহৎ হয়ছেন তাঁরাই পরে আধ্যাত্মিক পুরুষ হয়ে যান। বাহ্যিক আচরণ আর ভেতরের চিন্তাতে কোন তফাৎ নেই।

কিন্তু এটাই যখন ঈশ্বরের স্তরে যাবে তখন কি হবে? ঈশ্বরের কাছে বাহ্যিক আর অন্তর বলে কিছু নেই। সচ্চিদানন্দের স্তরে অন্তর্জগত আর বহির্জগত বলে কিছু নেই, কারণ সচ্চিদানন্দ ছাড়া তো কিছু নেই। সচ্চিদানন্দের চিন্তাও যা, তাঁর শব্দও তাই। আর শব্দও যা সৃষ্টিও তাই। সচ্চিদানন্দের কাছে সৃষ্টি, শব্দ আর চিন্তন বা বিচার এই তিনটের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। বস্তুও যা শব্দও তাই, বিচারও তাই। সেইজন্য বেদ বলছে শব্দ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, শব্দব্রহ্ম থেকে, ওঁ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কারণ ভগবান যখন ভাবলেন 'সৃষ্টি হোক' সৃষ্টি হয়ে গেল। তিনি তো আমাদের মত স্থূল নন যে তাঁকে কাঠ, মাটি, রঙ এইসব জোগাড় করতে হবে। আমাদের কিছু তৈরী করতে

গেলে সব কিছু আগে জোগাড় করতে হবে, কারণ আমরা অত্যন্ত স্থূল অবস্থায় আছি। বাইবেলে বলছে ভগবান বললেন let there be light সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়ে গেল। আমাদের স্তরেই আমি যদি কাউকে মনে মনেই ভালোবাসছি, তার মানে আমার মুখ থেকে শব্দটাও সেই রকমই বেরোবে। তার সাথে আমার হাত-পা সেই অনুসারে ব্যবহার করতে থাকবে। আমার মধ্যে যদি ক্রোধবৃত্তি এসে পড়ে তাহলে আমার মুখ থেকে সেই রকম শব্দই বেরোবে আর ব্যবহারও সেই অনুসারেই চলতে থাকবে। ব্যবহার, শব্দ ও চিন্তন এই তিনটেতে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু আমরা তিনটেকে আলাদা দেখছি, কখনই তিনটেকে আমাদের এক মনে হয় না। তার কারণ আমরা এতই স্থূল যে চিন্তাও করা যায় না। মায়েরা সন্তানকে এত ভালোবাসে কিন্তু কই একবারও তো সন্তানকে গিয়ে বলে না যে আমি তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু তাও সন্তান জানে মা তাকে ভালোবাসে। আর একটা ইয়ং ছেলে আর একটা ইয়ং মেয়ের মধ্যে যখন ভালোবাসা হয় তখন দুজন দুজনকে সারা দিন আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ বলেই যাচ্ছে। কারণ তারা জানে এক অপরকে ভালোবাসে না। তাহলে আপনি বলতে পারেন চিন্তন আর শব্দ কি আলাদা হতে পারে? ওখানেও আলাদা হয় না কিন্তু এদের চিন্তনটাই গোলমেলে।

এক সময় পাশ্চাত্যের মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা খুব গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন যে, মানুষ যখন মিথ্যা কথা বলে তখন কিভাবে বলে। একবার কয়েকজন মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীর গবেষক একজন নামকরা জার্নালিস্টকে ডেকে প্রশ্ন করেছিলেন আপনার প্রিয় সিনেমা কি। দু মিনিট সময়ে বলবেন আপনার প্রিয় সিনেমা কেন আর দু মিনিট বলতে হবে আপনার যেটা প্রিয় সিনেমা নয় কিন্তু বলতে হবে ওটা আপনার প্রিয় সিনেমা। সেই জার্নালিস্ট তখনকার দিনের আমেরিকার দুটো নামকরা সিনেমার উপর দু মিনিট করে বলতে শুরু করলেন। একটা হল Gone with the wind আর অন্যটি হল Some like it hot। পুরো ব্যাপারটা টেলিভিশনে লাইভ টেলিকাস্ট হয়েছিল আর দর্শকদের ধরতে বলে দেওয়া হয়েছিল উনি কোন সিনেমার ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলছেন। এরপর দর্শকদের মধ্য থেকে শতকরা চুয়ান্ন জন বলে দিল Gone with the wind এর ব্যাপারে উনি যা বলেছেন ঠিক বলছেন আর শতকরা চৌত্রিশ ভাগ দর্শক বলল Some like it hotএর ব্যাপারে তিনি ঠিক বলছেন না। তার মানে দর্শকরা ধরতে পারছে না কোন সিনেমার ব্যাপারে উনি মিথ্যে কথা বলছেন। তারপর যিনি ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন তিনি সেই জার্নালিস্টকে জিজ্ঞেস করলেন 'এবারে বলুন তো আসলটা কি'? তখন উনি বললেন 'Gone with the wind' একটা থার্ড গ্রেড সিনেমা, যখনই আমি সিনেমাটা দেখবার চেষ্টা করেছি তখনই আমি ঘুমিয়ে পড়েছি আর Some like it hot হল ঠিক ঠিক সিনেমা। এরপর মনস্তাত্ত্বিকরা জার্নালিস্টের স্ক্রিপ্টের উপর যখন কাজ করতে শুরু করলেন তখন তাঁরা পয়েন্ট আউট করে দেখাচ্ছেন মানুষ যখন মিথ্যে কথা বলে তখন শব্দগুলো কীভাবে পাল্টে যায় আর সত্যি কথা বললে শব্দগুলো অন্য রকম হয়ে যায়। যাঁরা এইসব ব্যাপারে ইনভেস্টিগেশান করেন তাঁরা ঠিক এগুলোকেই লক্ষ্য রাখেন। এখন সাধারণ লোক যদি আপনার সামনে এসে মিথ্যে কথা বলে আপনি তার হাবভাব, চেহারা ভঙ্গিমা দেখে ধরে নেবেন লোকটি মিথ্যা কথা বলছে। কিন্তু যারা প্রফেশনাল লায়ার, যেমন ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতারা সারাটা দিন মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছে অথচ সারা দেশের লোকেরা কেউ ধরতে পারছে না। সিনেমার অভিনেতাদের অভিনয়কেও কেউ ধরতে পারছে না, অভিনয় মানেই তো মিথ্যে। যে যত ভালো মিথ্যে কথা বলতে পারছে সে তত বড় অভিনেতা। কিন্তু তাতেও মনস্তাত্ত্বিকরা বার করেছেন কিভাবে ধরা যায়। বলছেন যে জিনিষকে তারা ভালোবাসে সেটাকে বার বার করে repeat করবে, কিন্তু বিভিন্ন ভাবে বলবে। কিন্তু যে জিনিষকে ভালোবাসে না অথচ বলছে ভালোবাসি সেটাকে একটি বাক্যে বলে বেরিয়ে চলে যাবে। তবে পাশ্চাত্যের মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদের উপর খুব বেশি আস্থা রাখা যায় না, কারণ ওদের সবটাই effect আর causeএর মধ্যে ঘোরাঘুরি করবে। Effect দেখার পর আপনাকে cause দেখিয়ে দেবে। একটা কাজ হয়ে গেছে, কাজ হয়ে যাওয়ার পর বিশ্লেষণ করে বলে দেবে জিনিষটা এই। Resultটা যখন জানা হয়ে যায় তখন সুন্দর analysis দিয়ে দেবে। কিন্তু কাজ হওয়ার আগে analysis করলে সবটাই ভুল হয়। আমেরিকান সেন্টারে বম্বিং করে দিয়ে গেল জানতেই পারল না, অথচ বিশ্বের সব থেকে ধুরন্ধর গোয়েন্দা বিভাগ সিআইএ ওখানে কাজ করছে।

মূল কথা হল বস্তু, ভাব ও শব্দে কোন তফাৎ নেই। আরও উচ্চ স্তরে, যেখানে পবিত্র হৃদয়ের মুনি ঋষিরা ধ্যানের খুব গভীরে যান তখন তাঁদের কাছে ভাব ও বস্তুর কোন পার্থক্য থাকে না। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, কোন লোক এলে, কাঁচের আলমারিতে সব জিনিষ যেমন পরিষ্কার দেখা যায়, সেই রকম লোকটির ভেতরের সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাই। প্রত্যেকটি মানুষ হল এক গুচ্ছ ভাবের সমাহার। আপনার যা ভাব আপনি তাই হয়েছেন। এখন যজ্ঞ যখন হচ্ছে সেটাও একটা আইডিয়া। যজ্ঞে যখন দেবতাদের স্তুতি করা হচ্ছে, আমরা যখন ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণায় স্বাহা বলে অগ্নিতে একটা বেলপাতা দিলাম, তার মানে আমি শব্দ বললাম তার সঙ্গে এই বিচার চলছে যে, আমি ঠাকুরকে চিন্তন করছি, চিন্তন করে আমি বেলপাতা অর্পণ করলাম। এই তিনটের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বলা হচ্ছে যে, বস্তু, শব্দ আর বিচার তিনটে এক। সেইজন্য যজ্ঞ, যজ্ঞের যে মন্ত্র আর যজ্ঞের ভাব তিনটে একই জিনিষ। এই তিনটে জিনিষই বিচারের সঙ্গে এক। আর এই বিচার একমাত্র সচ্চিদানন্দের মনেই উদয় হয়। সচ্চিদানন্দের চিন্তনে যখন আসছে, তখন যিনি ক্রিয়াহীন তিনি ক্রিয়াশীল হয়ে যান। ক্রিয়াহীন ক্রিয়াশীল হয়ে যাওয়া মানেই শক্তির খেলা।

একমাত্র শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ছাড়া কেউ চিন্তা করতে পারবে না। শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ যখন পুরো নির্বিকার নির্বিকল্পে থাকেন তখন তো তাঁর কোন চিন্তাও হচ্ছে না। যখনই তিনি চিন্তা করতে শুরু করেন তখনই সৃষ্টি হয়ে যায়। আর যখনই তিনি চিন্তা করছেন, তার মানে তখনই তাঁর শক্তি এসে গেছে। তাহলে যেখানেই কোন চিন্তা আছে সেখানে মা দুর্গাও আছেন। তাহলে যজ্ঞ যেটা হচ্ছে সেটাও মা দুর্গা। যখন পিতৃদের উদ্দেশ্য অর্পণ করা হচ্ছে সেটাও মা দুর্গা। যখন আমি ওঁ উচ্চারণ করছি সেটাও মা দুর্গা। যেখানেই কোন শব্দের খেলা সেটাই মা দুর্গা। যেখানেই কোন বিচারের খেলা বা চিন্তনের খেলা সেটাই মা দুর্গা। যেখানেই কোন বস্তুর খেলা সেটাই মা দুর্গা। কিন্তু যখনই ইসলাম বা খ্রিশ্চান ধর্মে যাব সেখানে শুভ মানে ভগবানের আর অশুভ হল শয়তানের। আমাদের কাছে তা হয় না, আমাদের কাছে শুভটাও তাঁর অশুভটাও তাঁর। তবে যজ্ঞে এই দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ, স্বাহা আর স্বধা – আর দুটোই মা নিজে। এটাই সিদ্ধান্ত, বস্তু যা শব্দও তাই আর বিচারও তাই, এই তিনটের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। রাজযোগে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের উপর স্বামীজীর খুব সুন্দর আলোচনা আছে। এই আলোচনার সাথে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের সম্পর্ক আছে। যাঁরা উচ্চ চিন্তন করতে পারেন, উচ্চ চিন্তা করার ক্ষমতা যাঁদের আছে তাঁরা বুঝতে পারেন শব্দ যা, বস্তুও তাই আর বিচারও তাই। দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন অবস্থায় আমরাও এই জিনিষটা বুঝতে পারি। যখন কেউ বলে 'আমি তোমাকে ভালোবাসি', ওর মনে ওই ভাব আছে, তখন আমাদের ভালো লাগে।

যারা objectকে object রূপে দেখে তারাই বিষয়ী, তারাই সংসারী। আর যাঁরা objectকে subject রূপে দেখছে তাঁরা হলেন আধ্যাত্মিক পুরুষ। এই যে ঠাকুর বলছেন – টাকা দিয়ে কি হয়, খাওয়া হয় থাকার জায়গায় হয় আর সাধুর সেবা হয়। কিন্তু টাকা দিয়ে তো আর কত কিছুই হয়, কই ঠাকুর তো সেই ব্যাপারে কিছু বলছেন না। লাট সাহেবের বাড়ি দেখে ঠাকুর বলছেন ইটের ঢিপি, কিন্তু বিষয়ীরা দেখছে লাট সাহেবের বাড়ি। বিষয়ী আর আধ্যাত্মিক পুরুষের মধ্যে এটাই তফাৎ, আধ্যাত্মিক পুরুষ বিষয়ের পেছনে যে আইডিয়া, সেটাকে দেখেন। বিষয়ীরা আইডিয়ার সামনে যে বস্তু সেটাকে দেখে। এখানে আধ্যাত্মিক ভাবকে নিয়ে বলা হচ্ছে, যজ্ঞের দু রকমের ভাব – দেবতাদের যজ্ঞ আর পিতৃদের যজ্ঞ। এই দুটো যজ্ঞে মূল যে শব্দ ব্যবহার হয় তা হল স্বাহা আর স্বধা, সেটা হলেন মা দুর্গা। এর আগেও বলেছিলেন *ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কারা স্বরাত্মিকা*। আসলে বলতে চাইছেন 'মা তোমা ছাড়া জগতে আর কিছু নেই'। এই ভাবটা আমাদের মনে ঢুকবে না বলে একটা একটা আলাদা আলাদা করে বলে দিচ্ছেন। এতক্ষণ যজ্ঞের কথা নিয়ে বললেন এবার যজ্ঞের অন্য দিক নিয়ে বলছেন –

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ-
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি।।৯

ঈশ্বর দর্শন বলতে ঠিক কি বোঝায়, এই ব্যাপারটা আমাদের কিছুতেই পরিষ্কার হতে চায় না। আমাদের মাথায় বসে আছে যে, জপ-ধ্যান করলে, যোগ করলে আমাদের ঈশ্বর দর্শন হয়ে যায়। জপে না হলেও ধ্যান করলে নিশ্চয়ই ঈশ্বর দর্শন হবে। আমাদের খুব ভালো করে মাথায় বসিয়ে নিতে হবে যে, ঈশ্বর জ্ঞান, ঈশ্বর দর্শন বা আত্মজ্ঞান কখনই কোন ক্রিয়ার ফল নয়। যতই আমরা বলি না কেন, এই ব্যাপারটা কিছুতেই আমাদের মাথায় বসতে চায় না। অনেক জপ-ধ্যান করে করে মন যখন শুদ্ধ হবে তখন একটা সময় ব্যাপারটা আপনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমাদের ধারণা যে, জপ-ধ্যান, পূজা-পাঠ এগুলো দিয়ে ফল হবে। শুধু যে কোন ক্রিয়ার ফল তা নয়, কোন বিদ্যারও ফল নয়। অথচ শাস্ত্রে এটাকেই বলছে পরা বিদ্যা, যে বিদ্যা দিয়ে আত্মজ্ঞান বা মুক্তি হয়। তাহলে বিদ্যা কি আত্মজ্ঞানে নিয়ে যায়? না, বিদ্যাও নিয়ে যায় না। যে জ্ঞানটা হয় সেই জ্ঞানকে বলছেন পরা বিদ্যা। এইজন্যই বিদ্যা বলা হয়, আত্মজ্ঞানের জন্য প্রস্তুতি লাগে। সেই প্রস্তুতিটা হল নাকারাত্মক। নাকারাত্মক মানে, মন যেন কোন কিছুতে রূপ ধারণ না করে, কোন কিছুর দিকে মন যেন না যায়। যখন আমরা কোন ক্রিয়া করি তখন মনকে একটা রূপ দেওয়া হয়। এখানে মনের যে কোন ক্রিয়াকে আটকানো হচ্ছে। যদি আটকে দেওয়া হয় তখন কি হবে? যেটা যেমনটি আছে সেটাকে তেমনটি দেখাবে। সেইজন্য একে পরা বিদ্যা বলছেন। আমরা যতই এই নিয়ে আলোচনা করি না কেন, যতক্ষণ না নিজের ভেতর থেকে একটা অনুভূতি না আসছে ততক্ষণ কিন্তু কোন দিন পরিষ্কার হবে না যে, এনারা ঠিক কি বলতে চাইছেন। কর্মের দ্বারা কখনই আত্মজ্ঞান হয় না, কর্ম হল মনের শুদ্ধির জন্য। মন শুদ্ধ হলে জিনিষটি যেমন ঠিক তেমনটি বোঝা যায়।

এখানে তিন রকম জীবনকে নিয়ে আসা হয়েছে। একটা সাংসারিক জীবন, দ্বিতীয় স্বর্গের জীবন আর তৃতীয় মুক্তি। মুণ্ডকোপনিষদে দুই রকম বিদ্যার কথা বলছেন, অপরা বিদ্যা আর পরা বিদ্যা। জাগতিক যে বিদ্যা, যে বিদ্যা দিয়ে জগৎ সংসার চলে আর যে বিদ্যা দিয়ে স্বর্গ পাওয়া যায়, সবটাই অপরা বিদ্যা। কিন্তু আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমরা তিনটে ভাগ করে নিচ্ছি। প্রথমটা হল জাগতিক বিদ্যা, যে বিদ্যা দিয়ে কৌশল চলে, এর থেকে উপরে হল বেদের বিদ্যা, যে বিদ্যা জানলে আপনি স্বর্গে যেতে পারছেন। তৃতীয় বিদ্যা হল পরা বিদ্যা। পরা বিদ্যা আমাদের অজ্ঞানকে নাশ করে। তাহলে তিনটে বিদ্যা হয়ে গেল – জগৎ বিদ্যা, বেদ বিদ্যা আর পরা বিদ্যা। জাগতিক বিদ্যা আর বেদ বিদ্যা যে দুটিকে মিলিয়ে অপরা বিদ্যা বলা হয়, এই বিদ্যা দিয়ে কিছু পাওয়া যায়, অপ্রাপ্ত বস্তুকে প্রাপ্ত করছে। পরা বিদ্যাতে কোন কিছু পাওয়া হয় না। পরা বিদ্যা অজ্ঞানকে নাশ করে, কিন্তু যেটা ছিল আপনি সেটাই পাচ্ছেন। পরা বিদ্যা আর অপরা বিদ্যার মধ্যে এটাই মৌলিক পার্থক্য। পরা বিদ্যা দিয়ে অক্ষরকে জানা যায়। অপরা বিদ্যা দিয়ে জগৎকে পাওয়া যায়। স্বর্গটাও জগৎ, কিন্তু স্বর্গকে জানার জন্য বেদ বিদ্যা লাগে। আর সংসারের সুখ পাওয়ার জন্য দরকার জাগতিক বিদ্যা। ওনারা বলেন বেদ জানলে জাগতিক সুখও পাওয়া যায় আর স্বর্গও পাওয়া যায়, কারণ সব বিদ্যাই বেদে ছিল। আমরা যদি এইভাবে বিদ্যাকে শ্রেণী বিভাগ করি, কলা, বিজ্ঞান এগুলো হল জাগতিক বিদ্যা, বেদ বিদ্যা হল যে বিদ্যা দিয়ে স্বর্গ পাওয়া যায়। আর এই দুটো বিদ্যা থেকে আলাদা হল পরা বিদ্যা, যে বিদ্যা দিয়ে আত্মজ্ঞান পাওয়া যায়। বিদ্যার দিকে থেকে পরা বিদ্যার পার্থক্য কোথায়? যে কোন বিদ্যাতে অপ্রাপ্ত বস্তুকে প্রাপ্ত করা হয়। যেমন সঙ্গীত বিদ্যা, আমি গানের ব্যাপারে জানিনা, সঙ্গীত বিদ্যা চর্চা করে আমি গান করা শিখে নিলাম। যজ্ঞাদির বিদ্যা যদি জেনে যাই তাহলে আমার স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। আমি অর্থনীতির বিদ্যা চর্চা করলাম, আমার টাকা-পয়সা ছিল না, আমার হাতে টাকা-পয়সা এসে গেল। পরা বিদ্যা সাধন করলে কী হবে? আত্মজ্ঞান ছিল না, আত্মজ্ঞান এসে যাবে। তাহলে অপরা বিদ্যা আর পরা বিদ্যায় তফাৎ কোথায় থাকল? এভাবে হয় না। পরা বিদ্যাতে কোন কিছু পাওয়া হয় না। পরা বিদ্যা একটা জিনিষকে নাশ করে, একটা আবরণ এসে গিয়েছিল, পরা বিদ্যা সেই আবরণকে নাশ করে। সেইজন্য বলা হয় পরা বিদ্যাতে কোন কিছু প্রাপ্ত হয় না। ষড়্ বিকারের মধ্যে পরা বিদ্যা পড়ে না। কোন কাজ করতে গেলে আপ্য, সংস্কার্য, কার্য ইত্যাদি এই ধরণের কোন কাজ পরা বিদ্যাতে হয় না। একটা কাল্পনিক আবরণ পড়ে গিয়েছিল পরা বিদ্যা সেই আবরণকে নাশ করে। আবরণ নাশ হয়ে গেলে কী পাচ্ছি? কিছুই পাচ্ছি না, যেটা ছিল সেটাই আছে। আপনার হাতে সোনার বালা আছে। কোন কারণে আপনি ভুলে গেছেন, আপনি এখন চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছেন আমার বালা কোথায় গেল বলে। বালা তো আপনার হাতেই আছে। তাহলে যখন দেখলেন বালা আপনার হাতেই আছে

তাতে কি আপনার কিছু পাওয়া হল? বালা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। পরা বিদ্যার কোন উপমা দিতে হলে এটাই সব থেকে কাছের উপমা। জিনিষটা আছে কিন্তু আপনি ভুলে গেছেন। এই যে ভুলে আছেন, এই ভুলকে পরা বিদ্যা সরিয়ে দিল। যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে।

প্রথমে বেদ বিদ্যার কথা বলে দেওয়া হয়েছে। এবারে পরা বিদ্যার কথা বলছেন। যার সাধন ওঁ দিয়ে করা হয় আর যা দিয়ে মানুষ মুক্তি পায়। আমরা যে বারবার বলছি মুক্তি পাওয়া, মোক্ষ লাভ, ঈশ্বর দর্শন, এই কথাগুলো বলা হয় সাধারণ মানুষকে বোঝানর জন্য। আসলে মুক্তি পাওয়া, মোক্ষ লাভ বলে কিছু হয় না। লাভ বলতে সাধারণত আমরা বুঝি কিছু একটা পাওয়া। মুক্তিতে সেভাবে কিছু পাওয়া হয় না, একটা অজ্ঞান আবরণ আছে সেটাকে সরিয়ে দেওয়া হল। আবরণটা বাস্তবিক, নাকি কল্পনা? আবরণটা আসলে কল্পনা, বাস্তবিক হলে তো আমাদের কাজে লাগত। এগুলো বোঝা খুব দুষ্কর। অনেক দিন শুনতে শুনতে হঠাৎ করে একদিন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। আসলে বেদান্ত মতে সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই। তাহলে আমরা এত কিছু যে দেখছি এগুলো কী দেখছি? যা কিছু দেখছি এটাই অজ্ঞান। এখন এই অজ্ঞান কি বাস্তব না কাল্পনিক? অজ্ঞান যদি বাস্তব হয় তাহলে একবার সরিয়ে দিলে আবার অজ্ঞান এসে যাবে। দুটোই যদি বাস্তব হয় তাহলে একটা চলে গেলে আবার ওটাই ফিরে আসবে। আর অজ্ঞান যদি কাল্পনিক হয় তাহলে একবার সরে গেলে আর কোন দিন আসবে না। আমাদের বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রের যে দর্শন, সেগুলোকে নিয়ে আচার্য একটা coherent philosophy দাঁড় করিয়ে দেখাচ্ছেন অজ্ঞান একবার নাশ হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার অজ্ঞান আর আসতে পারে না, আসেও না। তাই অজ্ঞানকে অবশ্যই কাল্পনিক হতে হবে। অজ্ঞান যদি কাল্পনিক হয় তাহলে জিনিষটাতো সব সময়ই আছে। জিনিষটা যদি সব সময়ই আছে তাহলে তাকে পাওয়ার জন্য আমাকে কী করতে হবে? কিছুই করার দরকার নেই যে অজ্ঞান আবরণটা আছে সেটাকে সরিয়ে দিলেই হল। অজ্ঞান আবরণকে সরিয়ে দিলে আমি কি কিছু পাচ্ছি? পাওয়া-পায়ির কী আছে, ওটাতো আমার সঙ্গে সব সময়ই আছে। হিন্দীতে খুব সুন্দর একটা প্রবাদ আছে – গোদমে বাচ্চা নগরমে ঢিঁঢোড়া। কোলে বাচ্চা নিয়ে বলছে আমার বাচ্চা হারিয়ে গেছে। এখন সারা শহরে গিয়ে ঢাক পেটাচ্ছে অমুকের বাচ্চা হারিয়ে গেছে। তারপর একজন এসে মনে করিয়ে দিল বাচ্চা তো তোমার কোলেই আছে। তাহলে বাচ্চাকে পাওয়ার জন্য যে এত ঢাকঢোল পেটান হল, তার কি হল? কিছুই হয়নি, বাচ্চা তো সব সময় কোলেই ছিল। আপনি এখন কি বলবেন, ঢাকঢোল পেটান হলে বলে কি বাচ্চা পাওয়া গেল? আপনার উপলব্ধি হয়েছে। তাহলে উপলব্ধি হওয়ার জন্য আপনার নতুন করে কোন বস্তু লাভ হল? না, বস্তু সব সময়ই ছিল। এই যে বস্তুটি সব সময়ই আছে, নিরন্তর ভাবে আছে অথচ দেখতে পাচ্ছি না, এটাই আমার অজ্ঞান। এই অজ্ঞান সরে যাওয়াটাই পরা বিদ্যা। বিদ্যা এখানেও জড়িয়ে আছে, কারণ অজ্ঞানকে সরাচ্ছে। কিন্তু অন্য বিদ্যাতে কোন কিছুকে পাওয়া হয়, কিন্তু এই বিদ্যা দিয়ে আমরা নতুন কিছু পাচ্ছি না, ওটা ওখানেই ছিল। এটাই পরা বিদ্যা আর অপরা বিদ্যার মৌলিক তফাৎ। অপরা বিদ্যার আবার দুটো ভাগ – একটা ইহলোকের বিদ্যা আরেকটা পরলোকের বিদ্যা। ইহলোকের বিদ্যার জন্য আমাদের বিজ্ঞান পড়তে হবে, পরলোক বিদ্যার জন্য আমাদের বেদ অধ্যয়ন করতে হবে। আর নিজের স্বরূপ জানার জন্য আমাদের পরা বিদ্যা জানতে হবে।

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যামহাব্রতা, যাঁরা পরা বিদ্যার সাধনা করেন, এই পরা বিদ্যা অচিন্ত্য, কল্পনাই করা যাবে না। কারণ পরা বিদ্যা বুদ্ধির এলাকার নয়। আর বলছেন মহাব্রত, কারণ সব কিছু আপনাকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে, কামিনী-কাঞ্চন ছেড়ে দিতে হচ্ছে, ইন্দ্রিয়ের সমস্ত রকমের সুখভোগ ছেড়ে দিচ্ছেন, আর আপনার শরীর যে এত প্রিয় সেই শরীরকেও ছেড়ে দিতে হচ্ছে আর আপনার শেষ সম্বল যে বুদ্ধি, তাকেও ছেড়ে দিতে হচ্ছে। এখানে বুদ্ধি মানে অহঙ্কার, মন সব মিলিয়ে বলা হচ্ছে। বুদ্ধি ছিল বলে ঠাকুর মা কালীকে অতিক্রম করে নির্বিকল্পে যেতে পারছিলেন না। মা কালীকে যখন জ্ঞান খড়্গ দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন, তার মানে বুদ্ধি অহঙ্কারকে ছেড়ে দিলেন, বুদ্ধির এলাকাকে ছেড়ে দেওয়া মানেই অহঙ্কারটাও খসে গেল। এটাই বলছেন মহাব্রত স্বরূপ, মহাব্রত মানে সব কিছু আপনাকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। কামিনী-কাঞ্চন, সন্তান, পতি, পত্নী এগুলো তো কোন কিছুই নয়, নিজের শরীর যে এত প্রিয় বস্তু সেই শরীরের ভুল হয়ে যাচ্ছে। আর মন, সাধারণ অবস্থায় আমরা যেটাকে মনে করি আমি মন, সেই মনকেও শেষে নাশ করে দিচ্ছেন।

বলছেন *অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ*, অভ্যাস করে করে ইন্দ্রিয় সমুদয়কে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। যিনি মনকেই নিয়ন্ত্রণ করে নিয়েছেন তাঁর ইন্দ্রিয়তো নিয়ন্ত্রণে থাকবেই। ইন্দ্রিয় একেবারে নিয়ন্ত্রণে, মানে তাঁর কাছে আর ভালো মন্দ বলে কিছু নেই যার দিকে তিনি দৃষ্টি দেবেন। ভালো-মন্দ বলে এমন কিছু নেই যে, সেদিকে তাঁর কান যাবে। এই ধরণের লোকেরা যে বিদ্যার সাধন করেন সেই বিদ্যাই পরা বিদ্যা। তাঁরা যে বেদ, উপনিষাদি শাস্ত্র পড়ছেন তা নয়, পড়েন কিন্তু শুধু এক চিন্তন, ঈশ্বর চিন্তন দিয়ে বাকি সব চিন্তনকে আটকে দেওয়া হয়েছে। এই যে বাকি জিনিষকে আটকে দেওয়া হচ্ছে এটাই পরা বিদ্যা।

যাঁরা মোক্ষের অভিলাষি তাঁরাই এই পরা বিদ্যার সাধন করেন। কঠোপনিষদে এর খুব সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে। ওঁ কে জানার জন্য মানুষ সব কিছুকে ছেড়ে দিচ্ছে। *যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি*, যেটাকে পাওয়ার জন্য মানুষ সব কিছুকে ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিসের জন্য ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে? পরা বিদ্যা বা কঠোপনিষদে বলছে ওঁ সাধনার জন্য, *তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ওমিতি*। মানুষ যে ব্রহ্মপদ পাওয়ার জন্য সাধনা করে তাকে সংক্ষেপে বলছেন ওমিতি, অর্থাৎ ওঁ এর সাধনা। ছান্দোগ্য উপনিষদে একে বলছেন দহরবিদ্যা বা পরা বিদ্যা, একই জিনিষ। দেবতারা স্তুতিতে এটাই বলছেন, হে মা! তুমি যে শুধু বেদ বিদ্যা, যেটা দিয়ে স্বর্গ পাওয়া যায়, তা নয়, পরা বিদ্যাও তুমি। সর্বোচ্চ জ্ঞান হল ঈশ্বরকে জানা। মুণ্ডকোপনিষদে ঋষি বলছেন, *অথ পরা – যয়াতদক্ষরমধিগম্যতে*। পরা বিদ্যা হল, যেটা দিয়ে অক্ষরকে জানা যায়। যে বিদ্যা দিয়ে ঈশ্বরকে বোধে বোধ করা হয়, সেই বিদ্যাই পরা বিদ্যা। এটাকেই তাই খুব সহজ ভাবে বলা হয়, মা কৃপা না করলে মোক্ষ লাভ হয় না। আমরা কথাগুলো খুব সহজ ভাষায় বলে দিই – মা সারদার কৃপা না করলে মুক্তি পাবে না। শাস্ত্রে বলছে যেখানেই শক্তির প্রকাশ, তা যে শক্তিই হোক না কেন সেটাই মা। পরা বিদ্যা হল শক্তির সর্বোচ্চ প্রকাশ, যাঁদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয়ে গেছে আমরা তাঁদের মধ্যে সেই শক্তির প্রকাশ দেখতে পাই, তিনি স্বামী বিবেকানন্দই হন আর যিশু খ্রিষ্টই হন আর মহম্মদই হন। তাঁরা কোথাও পরা বিদ্যার চর্চা করেছিলেন বলে এই জ্ঞানটা পেয়েছেন। তাই বলছেন এই পরা বিদ্যা মা স্বয়ং। পরা বিদ্যা দিয়ে যাঁকে জানছি এখানে সেটার কথা বলছেন না। তবে পরা বিদ্যা দিয়ে ঈশ্বরকে জানা যায়, যেটা দিয়ে জানা যায় সেটাও তিনি আর যাঁকে জানা যায় তিনিও তাই। সেইজন্য বলা হয় *জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং*, তিনটেই তিনি। জানার যোগ্য যেটা, যাঁকে জানা হচ্ছে আর জ্ঞান সবটাই এক। যেমন ধ্যাতা, ধ্যেয়, ধ্যান এক, ঠিক তেমনি বিদ্যা, সেই বিদ্যা দিয়ে যাঁকে জানা যাচ্ছে সব এক।

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধান-
মুদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্তা চ সর্বজগতাং পরমার্তিহন্ত্রী।।১০

মা হলেন শব্দ স্বরূপা। এখানে শব্দ মানে ওঁ, ওঁ একদিকে বাচক ঈশ্বরের দিকে নির্দেশ করে, অন্য দিকে জগতে ঈশ্বরের যে প্রকাশ সেটাকে শব্দ রূপে প্রকাশ করে। কারণ এই সংসারে যত রকমের শব্দ বা ধ্বণি জানি, সব কিছুর মূলে ওঁ। শব্দ স্বরূপা কেন? যেখানেই চিন্তন আছে, যেখানে চিতি শক্তি, এই চিতি শক্তিই শব্দে রূপান্তরিত হয়। মা তো সেই চিৎ শক্তি। তাই মা শব্দাত্মিকা, মা শব্দ স্বরূপিণী আর বস্তু স্বরূপিণীও তিনি। তিনটে একসাথে চলে চিৎ, শব্দ আর বস্তু, তিনটেই তিনি। কারণ মা ছাড়া চিতি হবে না, যেটা চিৎ হবে না সেটা শব্দ হবে না, যেটা শব্দ হবে না সেটা বস্তু হবে না। সামবেদের যে গান করা হয়, উদ্গীতরা যে সুন্দর সাম গান করেন, আর তার সঙ্গে যে ঋক, যজুর্বেদের যে মন্ত্রোচ্চারণ হয়, এই তিনটে বেদ ঋক, সাম ও যজু মা আপনি। বেদ দিয়েই মানুষ যা কিছু পায়, বলছেন এই বেদ আপনারই স্বরূপ। এই শব্দাত্মিকা শব্দটি প্রচণ্ড অর্থবহ শব্দ। ভগবানকে বলা হয় অক্ষর, অক্ষর এই দুটো অর্থেই হয় – যার কোন ক্ষয় হয় না, আবার অক্ষর মানে বর্ণমালার অক্ষর। বর্ণমালার অক্ষরও তিনি আর ক্ষয় না হওয়াটাও তিনি। এই জগতের সব কিছু নাশ হয়ে যাওয়ার পর শুধু অক্ষর অর্থাৎ শব্দটুকুই থেকে যাবে। কারণ এখনও চিন্তা আছে, চিন্তা থাকলেই শব্দ থাকবে। আর যখন চিন্তাও চলে যাবে তখনও অক্ষরই থাকবেন। কোন অক্ষর থাকবেন? যাঁর কখন কোন ধরণের ক্ষয় হয় না। ওই অক্ষর আর এই অক্ষরে এটাই তফাৎ। কিন্তু বোঝানর জন্য বলা হয় যিনি নিরাকার তিনিই অক্ষর আর যখন তিনি সাকার হন

তখনও তিনি অক্ষর। তবে দুটো অক্ষরে পার্থক্য এসে যায়। তাহলে অক্ষর যখন হয়ে গেলেন তখন সেটাই বেদ হয়ে গেল। বলছেন এই তিনটে বেদ মা আপনি। খ্রিশ্চান ধর্মে লোগোসের যে কথা বলা হয় তাও এই একই জিনিষ। খ্রিশ্চানরাও বলছে In the beginning there was word, word was with God and word was God, একই কথা খ্রিশ্চান ধর্মও বলছে।

দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়, এই যে তিনটে বেদ আপনি। আর ভগবতী, আপনি হলেন ভগবতী। ভগবাতী মানে, যাঁর ভগ আছে। ভগ মানে ঐশ্বর্য। ভগবান শব্দও এখান থেকেই এসেছে। ভগবানের সাথে সব সময় ছয়টি ঐশ্বর্য থাকে। জ্ঞান, শক্তি, বল, বীর্য এগুলোই ঐশ্বর্য। ভগবানকেই যখন নারী রূপে দেখা হয় তখন বলছেন ভগবতী। ছয়টি ঐশ্বর্য যে ভগবতীকে অর্জন করে নিয়ে আসতে হয়েছে তা নয়, এটাই তাঁর স্বরূপ। আর বলছেন *ভব ভাবনায়,* এই যে সংসার, সংসারে যত রকমের ভাব আছে, এর সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সবই মা। *বার্তা চ সর্বজগতাং*, এখাবে বার্তা মানে কথাবার্তা নয়। বার্তা মানে জাগতিক বিদ্যা, যে বিদ্যা দিয়ে লৌকিক কার্য যেমন চাষবাশ করা হয়, পশুপালন ইত্যাদি করা হয়। যত রকমের জাগতিক বিদ্যা আছে সেটাও মা আপনি। তার মানে জাগতিক বিদ্যাটাও মা দুর্গা। তাহলে মা কি কি বলছেন? বেদ মা, যে বেদ বিদ্যার দ্বারা স্বর্গাদি পাওয়া যায় সেটাও তিনি আর পরা বিদ্যা, যেটা দিয়ে মানুষ মুক্তি পায় সেটাও তিনি। মুক্তি মানে কিন্তু জগৎ থেকে বেরিয়ে যাওয়া নয়, মুক্তি মানে আমি যা আছি সেটাই থাকব, আমি যে কিছু পাচ্ছি, নতুন কোন জায়গায় চলে যাচ্ছি, মুক্তি সেই রকম কিছু নয়। জগতের প্রতি আপনার যে দৃষ্টিভঙ্গী, জগতের ব্যাপারে আপনার যে জ্ঞান সেটা পাল্টে যায়, মুক্তি মানে আপনিই সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া।

পরমার্তিহন্ত্রী, জগতের যত রকমের দুঃখ কষ্ট আছে, মা সব আর্ত, কষ্টকে নাশ করেন। মানুষের টাকার জন্য আর্তি, মানুষের কামভোগ করতে না পারার কষ্ট, মনের মত মেয়ে জুটছে না বলে ছেলেরা বিয়ে করতে পারছে না, মেয়েরা বিয়ে করতে চাইছে কিন্তু ছেলে জুটছে না। আর যখন স্বামী-স্ত্রী হয়ে গেল তখন টাকা-পয়সা জুটছে না, ভোগ কোথা থেকে করবে! এটা হল প্রথম কষ্ট। যাদের টাকা-পয়সা, কামভোগ সব হয়ে গেছে তাদের দুশ্চিন্তা হয় মরার পর স্বর্গ পাবো কিনা। আর জগতের সুখও চায় না আর পরলোকের সুখও চায় না সে মুক্তি হবে কিনা তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা করে যাচ্ছে। জগতে যত রকমের দুঃখ-কষ্ট আছে তাকে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। মা হলেন *পরমার্তিহন্ত্রী*, জগতে যত রকমের কষ্ট আছে মা সব কষ্টকে হরণ করেন। অর্থের অভাব, কামের অভাব, ধর্মের অভাব আর জ্ঞানের অভাব সবটাই মা নিজে। তবে এই দুঃখ হরণের কথা যে বলছেন, এটাকে কি স্বাধীন ভাবে বলছেন, নাকি বিদ্যার সঙ্গে যোগ করছেন এটা বলা নেই। বিদ্যার সঙ্গে যদি যোগ করা হয় তখন এর অর্থ হবে, মানুষের যত দুঃখ-কষ্ট আছে এই দুঃখ-কষ্ট দূর হয় বিদ্যার দ্বারা। যেমন আমার খিদে পেয়েছে, এটা একটা দুঃখ। এই দুঃখের নাশও বিদ্যা দিয়েই হয়। রান্নাবান্নার বিদ্যা যদি জানা থাকে, বা খাদ্য সংগ্রহের বিদ্যা জানা থাকলে, শিকার করা, চাষবাষ করার বিদ্যা দিয়েই খিদে মিটবে। তৃষ্ণাটাও একটা দুঃখ, তৃষ্ণার নিবারণ পানীয় জল দিয়েই করতে হবে। পানীয় জল কিভাবে সংগ্রহ করে মজুত করতে হয়ে সেটাও একটা বিদ্যা। এটাকে সংস্কৃতে বলে বার্তা। জাগতিক কাজ যে বিদ্যার দ্বারা হয় সেই বিদ্যাকে বলে বার্তা। এখন যে শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য চলছে, সবটাই বার্তার মধ্যে পড়ে যাবে। জাগতিক অর্থে বার্তাকে আরেকটু টানলে সেখানে এসে যাবে বেদ চর্চা, সেখান থেকে এসে যাবে যজ্ঞ চর্চা, তারপরে আসে পরা বিদ্যা। তাই জগতে যত রকমের দুঃখ কষ্ট আছে সবটাই দূর হয় মায়ের কৃপায়। কিন্তু এখানে বিদ্যা রূপে বলছেন। মা বিদ্যা রূপে অর্থাৎ লৌকিক শিক্ষা দিয়ে, ধার্মিক শিক্ষা দিয়ে আর আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়ে মানুষের যত রকমের দুঃখ কষ্ট হতে পারে সব রকম দুঃখ কষ্টের নাশ করেন। এই তিনটে বিদ্যা, লৌকিক বিদ্যা, ধার্মিক বিদ্যা আর আধ্যাত্মিক বিদ্যা, মা নিজেই সাক্ষাৎ এই তিনটে বিদ্যা।

মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা।।১১

এবারে মায়ের চরিত্রের অন্যান্য দিকগুলিকে নিয়ে বলছেন। যাঁরাই শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন, শাস্ত্র বোঝার জন্য তাঁদের একটা বিশেষ ধরণের ক্ষমতা থাকা দরকার। স্বামী তুরিয়ানন্দজী মহারাজ একজন সন্ন্যাসীকে বলছেন, গীতার যে কোন একটি শ্লোককে নিয়ে একটি মাস ধ্যান করলে তবে গিয়ে সেই শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট হবে। গীতার মোট শ্লোক হল সাতশ। এখন কাউকে যদি পুরো গীতাকে বুঝতে হয় তাহলে তাকে এই হিসাবে ষাট বছর ধরে একটি একটি করে শ্লোক ধ্যান করে যেতে হবে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে গীতা বুঝতেই আমাদের সারাটা জীবন চলে যাবে, এরপরও আমাদের আরও কত শাস্ত্র বাকি থেকে যাবে। আচ্ছা না হয় কিছু শ্লোক বাদ দেওয়া যেতে পারে, প্রথম অধ্যায় পুরোটা আর শেষ অধ্যায়ের শেষের কিছু শ্লোক বাদ দিয়ে দেওয়া হল। তাতেও ধ্যান করে করে বুঝতে মোটামুটি চল্লিশ বছর লেগে যাবে। স্বামী তুরিয়ানন্দজী আসলে যা বলেছেন কোথাও এতটুকু বাড়িয়ে বলেননি, ব্যাপারটা ঠিক তাই। এভাবে ছাড়া শাস্ত্র বোঝা যায় না। লোকে বলবে ও কিছু না, আর নয়তো বলবে সব বুঝে ফেলেছি। প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে পোড়াতে আর সর্বক্ষণ শাস্ত্রের মধ্যে লেগে থাকতে থাকতে শাস্ত্রের কথা স্পষ্ট হতে শুরু হয়। আর শাস্ত্র ঠিক ঠিক একমাত্র বুঝতে পারেন যিনি অনুভূতি সম্পন্ন।

স্বামীজীর রচনাবলী যাঁরা প্রথম প্রথম পড়তে শুরু করেন, তাঁদের মোটামুটি সবারই স্বামীজীর প্রত্যেকটি কথাকে কী দারুণ মনে হয়। পরে আস্তে আস্তে আরও পড়ার পর মনে হতে শুরু হবে, আরে তাই তো! আমাদের গীতা, উপনিষিদাদি শাস্ত্রে যা আছে সেটাকেই যুগোপযোগী করে স্বামীজী নতুন ভাষায় বলছেন। কিন্তু একটা বয়সের পর অবাক হয়ে ভাবতে থাকবেন আমাদের যত শাস্ত্র আছে তার সমস্ত জ্ঞানকে আহরণ করে স্বামীজী নিজের মধ্যে ধারণ করে আছেন। শুধু ধারণ করেই থাকেননি, পুরো জ্ঞানকে একটা নতুন ভাষায়, নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপিত করেছেন। ভগবান ছাড়া এ কাজ কেউ পারে! ভগবান কিংবা ঈশ্বরকোটির নীচে যাঁরা আছেন, এনারা হলেন দ্বিতীয় স্তরের। দ্বিতীয় স্তরের নীচে তৃতীয় স্তরে যাঁরা আছেন, এনাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান যদি না হয়ে থাকে তাহলে তাঁদের জীবনের একটাই জিনিষ পাওয়ার থাকে তা হল মেধা। মেধা যদি থাকে তাহলে জগতে যা কিছু পাওয়ার থাকে তার মোটামুটি সব কিছুই এসে যায়। মেধা দিয়েই সব কিছু পাওয়া যায়, মেধা না থাকলে কিছুই হয় না। সেইজন্য বেদে মেধা দেবীর উপর নামকরা সূক্ত আছে, মেধাসূক্তম্। সন্ন্যাসীরাও মেধা দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন। জীবনে একটা জিনিষই যদি পাওয়ার মত থাকে তা হল মেধা। মেধা থাকলে সব কিছুই পেয়ে যাবেন, অর্থ পাবেন, নাম-যশ পাবেন, কাম পাবেন আবার মুক্তিও পাবেন। মেধা পাওয়া আর মেধাকে ধরে রাখার জন্য হিন্দুরা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন। গায়ত্রী মন্ত্র জপটাই মেধা ও বুদ্ধির জন্য। *ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ*, আমার বুদ্ধি যেন তীক্ষ্ণ হয়। মেধা দিয়ে কী হবে? আমার বুদ্ধি যেন তোমার দিকে, ঈশ্বরের দিকে যেতে পারে, আমি যেন তোমার কথা ভাবতে পারি। গায়ত্রী মন্ত্রের জপ এই জন্যই করা হয়।

মেধার অর্থ হল গ্রহণ ধারণ সামর্থম্। যে কোন শাস্ত্রের বক্তব্য, যে কোন পরিস্থিতিকে আপনি কত ভালো হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন আর কত ভালো করে আপনি সেটাকে ভেতরে দীর্ঘকাল ধরে রাখতে পারছেন। এটাই মেধা। বুদ্ধির সংজ্ঞা যেমন নিশ্চয়াত্মিকা, কোন কিছুকে নিশ্চিত ভাবে জানা। বুদ্ধির ইংরাজী হল intellect কিন্তু মেধার ইংরাজী হল talent। মেধা যদি না থাকে বুদ্ধিও নীচে পড়ে থাকবে। বুদ্ধি সবারই আছে, একটা টিকটিকি সেও জানে এটা খেতে হবে, এটা খেতে নেই, কিন্তু বুদ্ধিটা খুব অল্প মাত্রায়। মেধার সর্বোচ্চ প্রকাশ হয় শাস্ত্রের সারতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গমম করাতে। ঠাকুর বলছেন পল্টুর কী বুদ্ধি, চটপট বুঝে নেয়। ঠাকুর যে কথাগুলো বলছেন পল্টু চটপট বুঝে নিচ্ছে, মানে গ্রহণ করে নিচ্ছে আর দুদিন পরে ভুলে যাচ্ছে না, ধারণ করে রাখার ক্ষমতাও আছে। শাস্ত্রের কথাকে গ্রহণ ও ধারণ করার ক্ষমতা মানুষের সব থেকে কম থাকে। শাস্ত্রের কথা যে ধারণ করতে পারে সে জগতের সব কাজ করতে পারবে। সেইজন্য আগেকার দিনে ব্রাহ্মণরা পাঁচ বছর বয়স হয়ে গেলেই বাচ্চাদের উপনয়ন দিয়ে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করাতেন। ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ, শাস্ত্র মুখস্ত আর শাস্ত্রের আলোচনা করিয়ে করিয়ে ছোটবেলাতেই বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ তৈরী করে দিতেন। এরপর এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে যেখানেই লাগাবে সেখানেই সাফল্য পেয়ে যাবে।

শাস্ত্রের উপর যার দখল এসে গেছে, শাস্ত্রের যে কোন কথাকে ধারণা করার ক্ষমতা যার এসে গেছে তার কাছে জিনিয়াস শব্দটাও খুব সাধারণ শব্দ হয়ে যায়। এই জগতে কোন কিছুতে যদি কেউ শ্রেষ্ঠত্ব পেতে চায়

তাহলে সবার আগে তার মেধা দরকার। জগতের সব বিদ্যা চেষ্টা করে, বুদ্ধি দিয়ে বুঝে আয়ত্ত করে নেওয়া যেতে পারে, ফিজিক্স, বায়োলজি, ভূগোল সব কিছু বুঝে নিতে বেশি সময় লাগবে না, কিন্তু শাস্ত্র সে কখনই বুঝতে পারবে না। স্বামীজীর ক্ষমতাকে বোঝার যদি কারুর ইচ্ছে হয় তাহলে তিনি ছয় খণ্ডের নিউ ডিসকভারী পড়বেন। ওর মধ্যে একজন মহিলা, আমেরিকাতে তাঁর বাড়িতে স্বামীজী কিছু দিন ছিলেন, তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন – একদিন কয়েকজন ফাদার ওনার বাড়িতে এসেছেন স্বামীজীর সঙ্গে তর্ক করতে। তর্ক করতে গিয়ে ওনারা বাইবেল থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়ে বলছিলেন। ভদ্রমহিলা বলছেন, আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা খুব অন্যায় বলে মনে হচ্ছিল, একজন হিন্দুর সঙ্গে যদি তর্ক করতে হয় তাহলে আপনি হিন্দু শাস্ত্র নিয়ে কথা বলুন, বাইবেল নিয়ে কেন বলছেন! ভদ্রমহিলা দেখছেন স্বামীজী ফাদারদের সব কথার ফট্ ফট্ করে উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। এরপর ওনারা বাইবেলের ওপর যত ভাষ্যাদি রচিত হয়েছে, সেখান থেকে বিভিন্ন ধরণের ভাষ্য নিয়ে তর্ক করতে শুরু করেছেন। স্বামীজী সেগুলোরও উত্তর খুব সহজ সরল ভাবে দিতে শুরু করেছেন। সেখান থেকে সরে এসে এবার ফাদাররা ভাষ্যাদির উপর যে উপভাষ্য আছে সেখান থেকে নিয়ে তর্ক করতে শুরু করলেন। সেগুলোকেও স্বামীজী কোট করে যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত ফাদাররা পরাস্ত হয়ে চলে যাচ্ছেন। তখন ভদ্রমহিলা লিখছেন It was a personal victory for me। এই রকম আরেকটি ঘটনা আছে। স্বামীজী একজনের বাড়িতে অতিথি হয়ে আছেন। সেখানেও একদিন কিছু লোকজন জড়ো হয়েছে। অনেকে অনেক রকম আলোচনা করছেন। তার মধ্যে হঠাৎ একজন জিজ্ঞেস করছেন – আপনি অনেক কিছু বললেন, বিশ্ব ইতিহাসের উপর কোন বই পড়লে ভালো? স্বামীজী তখন তাকে বইয়ের নাম বলে দিলেন এই বইগুলো পড়ুন। সেখান থেকে আরেকজন জিজ্ঞেস করলেন ফিজিক্সের উপর কোন বই পড়লে ভালো, স্বামীজী কয়েকটা বইয়ের নাম বলে দিলেন। এইভাবে কেউ কেমেস্ট্রি, বায়োলজির উপর বইয়ের কথা জানতে চাওয়ার পর হঠাৎ যে পিনড্রপ সাইলেন্স নেমে এল, যখন একজন বলছে 'স্বামীজী খ্রিশ্চানিটির উপরে কোন বই পড়লে ভালো'? একবার ভাবুন, আমেরিকাতে খ্রিশ্চানরা একজন হিন্দু সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করছেন খ্রিশ্চান ধর্মকে ভালো করে জানার জন্য কোন বই পড়া ভালো! স্বামীজী তাকেও বইয়ের নাম বলে দিলেন। তৃতীয় আরেকটি ঘটনা। স্বামীজী তখনও আমেরিকায় জাননি, দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করছেন। সেখানে এক জায়গায় এক ভদ্রলোক ইলেক্ট্রিক মেশিন নিয়ে কিছু কাজ করছিলেন। স্বামীজী তাঁর সঙ্গে ইলেক্ট্রিসিটি নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন। ভদ্রলোক ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তিনি তো হতবাক হয়ে গেছেন – স্বামীজী! আপনি ইলেক্ট্রিসিটির ব্যাপারেও এত কিছু জানেন! মেধা দেবী স্বামীজী উপর এমন কৃপা করেছেন যে তাঁর মেধা নাড়িকে খুলে দিয়েছেন। মেধা খুলে যাওয়ার ফলে স্বামীজী যেটাতে মন লাগাচ্ছেন সেটার উপরেই তাঁর পুরো ক্ষমতা পেয়ে যাচ্ছেন।

ঠাকুরেরও একই জিনিষ ছিল। আমরা মজা করে বলি, ঠাকুর অঙ্ক-টঙ্ক জানতেন না, ঠাকুর নিজেই বলছেন শুভঙ্করী করতে গিয়ে তাঁর ধাঁধা লাগতো, পড়াশোনাও করলেন না। কিন্তু যখন তাঁকে একজন বলছেন 'মশাই আপনি কী জানেন! আপনি তো বইটই কিছু পড়েননি', তখন ঠাকুর বলছেন 'ওগো শুনেছি কত'। তার মানে, শাস্ত্রের সার সবটাই জানা আছে। ঠাকুরের কথামৃত যাঁরা নিষ্ঠা নিয়ে নিত্য অধ্যয়ন করে যাচ্ছেন, তাঁরা দেখতে পাবেন, কথামৃতে ঠাকুর যখন গীতা থেকে, পুরাণ থেকে, অধ্যাত্ম রামায়ণ, ভাগবত থেকে কিছু বলছেন তখন লক্ষ্য করলে দেখবেন ওর সার যেটা ঠিক সেই কথাটাই তুলে নিয়ে আসছেন। কত কঠিন জিনিষ, যেমন সত্ত্ব, রজ ও তমকে নিয়ে যখন বলছেন, সেখানেও কোথাও কোন ধরণের এতটুকু দোষ পাওয়া যাবে না। এমনকি হাজরাকে একদিন বলছেন 'তুমি শুদ্ধাত্মাকে ঈশ্বর বল কেন'? আমাদের মনেও সংশয় হয় ঠাকুর কী বলতে চাইছেন! কিন্তু খুব গভীর ভাবে চিন্তন করলে বোঝা যায় ঠাকুর শাস্ত্রের অতি সূক্ষ্ম ও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি তত্ত্বকে কীভাবে সঠিক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন। যাঁরা একটু আধটু শাস্ত্র চর্চা করেন তাঁদের কাছেও এই জিনিষগুলো গুলিয়ে যায়। কিন্তু পুরো বেদান্ত ভেঙ্গে পড়বে যদি শুদ্ধাত্মাকে ঈশ্বর বলা হয়। অথচ হাজরা অত শাস্ত্র পড়তেন, সব সময় জপ করতেন কিন্তু এই জায়গাটা তাঁর কাছে পরিষ্কার নয়। শাস্ত্রের সার তিনি ধরতে পারছেন না, কারণ মেধা নেই। মেধা যদি না থাকে কোন ভাবেই শাস্ত্রের কথা ধরতে পারা যাবে না।

নামকরা মুসলিম পণ্ডিত আলবেরুনি দশম শতাব্দিতে ভারতে এসে দিল্লীর কাছাকাছি এক জায়গায় অনেক বছর ছিলেন। তাঁকে ভারতে পাঠানোর উদ্দেশ্যই ছিল হিন্দুদের বিদ্যাকে আয়ত্ত করা। কিন্তু সেই সময় সোমনাথ ও অন্যান্য অনেক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করার জন্য হিন্দুরা মুসলমানদের খুব ঘৃণা করতে শুরু করে দেয়। সেইজন্য বেনারস, কাশ্মীরের যে নামকরা পণ্ডিতরা ছিলেন তাঁরা আলবেরুনিকে সেখানে ঢুকতেই দিলেন না। দিল্লী আশেপাশে যেসব পণ্ডিতরা ছিলেন তাঁদের সাথেই তিনি কথাবার্তা বলতেন। তিনি লিখছেন, এখানকার ব্রাহ্মণরা সব কটি বেদ মুখস্ত করে রেখেছে, কথায় কথায় বেদ শুনিয়ে দেবে। কিন্তু শাস্ত্রের কোন কিছুকে নিয়ে এঁদের সঙ্গে বিচার করতে গেলে আর বিচার করতে পারেন না। আসলে বলতে চাইছেন, ব্রাহ্মণগুলো বেদের কিছুই বোঝে না, না বুঝেই সব মুখস্ত করে রেখেছে। দশম শতাব্দিতে আলবেরুনি এই ধরণের মন্তব্য করছেন। কত বড় অপমানজনক কথা, চারটে বেদ মুখস্ত, কিন্তু শাস্ত্রের কোন একটা বিষয় নিয়ে বিচার করতে গেলে আর বিচার করতে পারছে না। এই সমস্যা শুধু ভারতের নয়, সারা বিশ্বের সমস্যা। কিন্তু ভারতে আবার বিশেষ সমস্যা। রিচার্ড ফাইনম্যানকে একবার ব্রাজিলে পাঠানো হয়েছিল দেখার জন্য যে সেখানে স্কুল কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার কেমন হচ্ছে। ওখানে অনেক কিছু দেখার পর রিচার্ড ফাইনম্যান রিপোর্ট তৈরী করে তার উপসংহারে বলছেন – এখানে বিজ্ঞান পড়ানো হয় না, বিজ্ঞানের মাধ্যমে ইংলিশ পড়ানো হয়। আমাদের সারা ভারতবর্ষেও এই একই অবস্থা। এখানে যে কোন বিষয়কে যখন পড়ানো হয়, তা বিজ্ঞান হোক, ইতিহাস হোক, ভূগোল হোক, যে কোন বিষয় দিয়ে বাংলা মিডিয়ামে বাংলা শেখানো হয় আর ইংলিশ মিডিয়ামে ইংরাজী শেখানো হয়। বিষয় জ্ঞান কারুকেই দেওয়া হচ্ছে না। যে জিনিষগুলো আমাদের প্রতিদিন প্রতি মুহুর্তে কাজে লাগছে, যেমন ইলেক্ট্রিসিটি, আগুন, জল ইত্যাদি। আমাদের মধ্যে কজন আছে যে বলতে পারবে ইলেক্ট্রিসিটির ব্যাপারে আমার সব জানা আছে। আমরা কেউই ঠিক ঠিক জানি না ইলেক্ট্রিসিটি জিনিষটা কি, কি করে ইলেক্ট্রিসিটি চলছে, ২২০ ভোল্ট লেখা থাকে, ২২০ ভোল্টের সাথে ১১০ ভোল্টের কি তফাৎ এগুলোর ব্যাপারে আমরা কেউই জানি না। আমরা জানি না বলে আমাদের ছেলেমেয়েরাও জানতে পারে না। অথচ রোজ আমরা এগুলোকে নিয়েই নাড়াচাড়া করছি। যে জিনিষগুলো রোজ দেখছি সেই ব্যাপারেই কোন আগ্রহ নেই অথচ যার ব্যাপারে কিছুই জানি না সেই শাস্ত্রের কথা আমরা কি করে বুঝতে সক্ষম হবে! কোন দিনই শাস্ত্রের কথা বুঝতে পারব না। কারণ, শাস্ত্রের যে সার বুঝবে, শাস্ত্রের মর্মকে যে বুঝবে, এটাকে বোঝার জন্য দরকার মেধা। মেধা না হলে কোন বিষয়েই আমরা জানতে পারব না। কিন্তু আমাদের বেশির ভাগেরই বুদ্ধি হল চিড়ে ভেজা বুদ্ধি। চিড়ে ভেজা বুদ্ধি দিয়ে সংসারের কাজ কোন রকমে চলে যায়। সুইচ অন করলে পাখা ঘুরবে, বাতি জ্বলবে এই বুদ্ধিগুলোই আছে। কিন্তু মেধা পুরো আলাদা একটা জিনিষ। বেদে মেধা দেবীর উপর খুব বিখ্যাত স্তুতি আছে। আর গায়ত্রী মন্ত্রেও মেধাকে স্তুতি করা হচ্ছে। বুদ্ধি হয়ে গেছে, মেধাও পেয়ে গেছেন, এটা কী করে বোঝা যাবে? ঠাকুর পরিষ্কার বলছেন, শাস্ত্রের কথা চটপট ধরে ফেলে। মেধা শাস্ত্রের সারকে ধারণ করে নেয়। ঠাকুর বেদ, মহাভারত, রামায়ণ কিছুই জানতেন না, কিন্তু শাস্ত্রের সারটুকু জেনে গিয়েছিলেন। শাস্ত্রের সার যদি কেউ একবার ধরে নিতে সক্ষম হয় তাহলে বুঝতে হবে তার মেধা জেগে উঠেছে।

সেই মেধাকে নিয়েই এই মন্ত্রে বলছেন, *মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা*, যাঁর কৃপায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করে শাস্ত্রের যে জ্ঞান লাভ হয় সেই মেধা, মা তুমি নিজে। মা! তুমি কৃপা না করলে শাস্ত্রের সার ধারণা করা যাবে না। শাস্ত্রের সার গ্রহণ করতে পারা, শাস্ত্রের মর্ম ধরতে পারা মেধার জন্যই সম্ভব, মেধা ছাড়া হবে না, আর এই মেধা মা তুমি নিজে। সেই প্রথম থেকে বলছেন স্বাহা তুমি, স্বধা তুমি, পরা বিদ্যা তুমি, বার্তা তুমি, বেদ তুমি সেখান থেকে এসে বলছেন যার দ্বারা শাস্ত্রের সার গ্রহণ ও ধারণ করা সম্ভব সেই মেধা তুমি। অন্য জায়গায় বলবে, মানুষের মনে যে ভক্তি আসে সেটাও তুমি। এই যে এখানে সবাই শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা উপেক্ষা করে দিনের পর দিন নিষ্ঠা নিয়ে শাস্ত্রের কথা শুনতে আসছেন, শাস্ত্রের প্রতি যে এই শ্রদ্ধা এই শ্রদ্ধাই অন্যদের থেকে আপনাদের পৃথক করে দিয়েছে। এই শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাটাও মা নিজে। যে কোন ক্ষমতা সেটা মা নিজে। কিন্তু যেটাতে ক্ষমতা নেই সেটা কে? সেটাও তিনি। দারিদ্রের রূপ সেটাও মায়ের রূপ। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য যখন বলা হয় তখন ইতিবাচক দিকগুলোকে নিয়েই বলা হয়। যখন কেউ সাধনা করতে শুরু করবেন তখন তাঁকে বলবে তুমি তমো গুণ থেকে

রজো গুণে যাও, রজো গুণে এলে বলবে তুমি রজো গুণ থেকে সত্ত্ব গুণে যাও, তুমি ভালো হও। ভালো কি? তুমি সত্য কথা বলবে, সচ্চরিত্রের হবে, সদ্ব্যবহার করবে, সবই সৎ সৎ করে বলবে। এরপর যখন জ্ঞান হয়ে যাবে তখন দেখবে অধ্যাত্মের সঙ্গে সৎএর কোন সম্পর্কই নেই, তিনি তো সৎ অসৎএর পারে। প্রথমেই যদি তাদের বলে দেওয়া হয় তুমি সৎ অসৎএর পারে যাও, তখন সে হয়তো একটা লম্পট হয়ে যাবে। প্রথমে লম্পটগিরিটা ছাড়াবার জন্য দেখাতে হয় শুভকে। কারণ শুভ কিছু করার জন্য চাই ক্ষমতা। অশুভ করতে ক্ষমতা লাগে না, অশুভ হয় ইন্দ্রিয়ের জোরে। ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের বস্তু এক, ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের বস্তুদের দিকে দৌড়াবে এটা তার স্বভাবেই আছে। ইন্দ্রিয়ের দৌড়ানকে আটকাবার জন্য বুদ্ধির ক্ষমতা থাকা দরকার। বুদ্ধির শক্তি যদি না বাড়ে ইন্দ্রিয়কে বস্তু থেকে সরাতে পারবে না। সেইজন্য প্রথমে বলা অশুভ গুলিকে ছাড়তে। এবার যখন শক্তি হয়ে গেল, তখন শুভকে ছাড়া আরও বেশি কঠিন হয়।

ঠাকুর এক সময় মায়ের কাছে সব কিছু অর্পণ করে দিচ্ছিলেন, এই নাও মা তোমার পাপ এই নাও তোমার পূণ্য, এই নাও তোমার শুচি এই নাও তোমার অশুচি, এই নাও তোমার ধর্ম এই নাও তোমার অধর্ম। এই করে করে যখন সত্যে এলেন তখন বলতে পারলেন না মা এই নাও তোমার সত্য এই নাও তোমার মিথ্যা। বলছেন, সত্যকে ছাড়া যাবে না। কারণ ঠাকুর এবার সত্যের অবতার, তিনি হলেন সত্যের আধার। সত্যকেও যদি মায়ের পায়ে অর্পণ করে দেন তাহলে সেই আধারটাই চলে যাবে। সত্যকে নিয়েই তিনি সাধনা করে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতারে তিনি সত্য মিথ্যার পারে ছিলেন। ঠাকুর কিন্তু সত্য মিথ্যার পারে নন, উনি সত্যকে ধারণ করে রেখেছিলেন। অবতারকেও একটা কিছুকে আশ্রয় করে থাকতে হয়। শ্রীরামচন্দ্র যেমন মর্যাদাকে আশ্রয় করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আবার ধর্মকে ধরে রেখেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের নামই ধর্ম। শ্রীকৃষ্ণ তাই ধর্মকে ছাড়তে পারলেন না। যদিও ঠাকুর বলছেন এই নাও মা তোমার ধর্ম এই নাও তোমার অধর্ম। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ধর্মকে কোথাও ছাড়ছেন না। মহাভারতে বর্ণনা আছে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানী কিন্তু সকালে উঠে তিনি আচমন করছেন, জপাদি করছেন। ঠাকুর এসব করতেন না। একটা কিছু সবাইকে ধরে রাখতে হবে, ত্রিগুণাতীত হয়ে গেলে তো শরীরই চলে যাবে। প্রথমে মানুষ অশুভকে ছাড়ে, অশুভকে ছাড়ার পর পরে শুভ ও অশুভের পারে চলে যায়।

একদিকে মা যেমন মেধা, অন্যদিকে মায়ের আরেকটা রূপ হল – *দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা*। এই যে ভবসাগর, জন্ম-মৃত্যুর যে সমুদ্র, হে মা! এই সমুদ্রকে একমাত্র তুমিই পার করাতে পার। পুরো শাক্ত দর্শন ও তন্ত্রের একটা বলিষ্ঠ মত হল, এই সংসারে যিনি আমাদের বন্ধনে রেখেছেন তিনিই এই সংসার বন্ধন মোচন করবেন। যেমন সুপ্রিম কোর্টের আদেশ নিম্ন আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যায় না, ঠিক সেই রকম মায়ের আদেশকে কেউ উল্লঙ্ঘন করতে পারে না। আমাদের যে বন্ধন এই বন্ধন একেবারে primordial, সৃষ্টির যে মূল অবিদ্যা সেই অবিদ্যা দিয়ে আমরা সংসারের সাথে বাঁধা হয়ে আছি। এই অবিদ্যাকে কে সরাতে পারেন? যিনি অবিদ্যা দিয়ে বেঁধেছেন তিনিই সরাবেন কিংবা তাঁর উপরে যিনি আছেন। হাইকোর্ট যদি কোন সাজা দেয়, সেই সাজা থেকে ছাড় দিতে পারে একমাত্র হাইকোর্ট তা নাহলে সুপ্রিম কোর্ট, কিন্তু নিম্ন আদালত কখনই সাজা মুকুব করতে পারবে না। আমাদের যে এই অবিদ্যা, যে অবিদ্যার জন্য আমাদের বোধ হচ্ছে আমি হলাম মন, আমি এই শরীর, এই বোধ কে দিয়েছেন? মা দুর্গাই দিয়েছেন। এই বোধ কে সরিয়ে দিতে পারেন? একমাত্র মা দুর্গাই সরাতে পারেন। কারণ মার নীচে যারা আছে তারা তো সরাতে পারবে না। তাঁর উপরে আছেন ভগবান। তিনি কি বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে দিতে পারবেন? ছাড়াতে পারবেন না। কিন্তু যিনি সগুণ সাকার তিনি পারবেন। কারণ সগুণ সাকার ও মা এক। নির্গুণ নিরাকার যিনি, যিনি সবার উপরে, তিনি কোন কিছুতে নিজেকে জড়াবেন না। সেইজন্য মুক্তির দ্বার উন্মোচন করবেন একমাত্র মা। সেইজন্য বলা হয় শক্তি সাধন ছাড়া মুক্তি হয় না। তাই তো অন্যান্য রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়ে শক্তির আরাধনা করান হয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের আগে অর্জুনকে দিয়ে মা দুর্গার আরাধনা করিয়েছিলেন। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে কোথাও এই ধরণের শক্তি আরাধনার উল্লেখ নেই। কিন্তু পরের দিকে ধর্মীয় সাধনার বিবর্তনের একটা পর্বে এসে তাঁরা দেখলেন শক্তি সাধনা ছাড়া মুক্তি হবে না। যাঁরা জ্ঞানমার্গী সাধু, যাঁরা নেতি নেতি সাধনা করে যাচ্ছেন, তাঁরা অন্য পথ অবলম্বন করেন। কিন্তু জ্ঞানমার্গীরা ছাড়া সাধারণ যাঁরা এই জগতে আছেন তাঁদের শক্তির সাধনা ছাড়া মুক্তি হবে না। স্বামীজীও অনেক জায়গায় বলেছেন আর ঠাকুরও

বলছেন এবং আধ্যাত্মিক জীবনের যে প্রচলিত পথ তাতেও এই কথাই বলা হচ্ছে, মুক্তির দ্বারে মা প্রহরী হয়ে আছেন, মা পথ না ছাড়লে এই দ্বারকে কেউ অতিক্রম করতে পারবে না।

মুক্তির দ্বার যেন এক নারী। ওই নারীর দিকে আপনি যদি কাম ভাব নিয়ে এগোন আপনাকে ওর মধ্যে আরও ফেঁসে যেতে হবে। আর ওই নারীর প্রতি যদি মা মা বলে এগিয়ে যান তিনি লজ্জায় তখন পথ ছেড়ে দেবেন। তার মানে, এই জগৎ হল এক দুর্জয় কাম ভাবের প্রতিমূর্তি। জগতের প্রতি যদি কাম ভোগ চরিতার্থ করার লালসার ভাব থাকে তাহলে আপনি আর মুক্তি পাবেন না। কিন্তু এই জগতকেই যদি মাতৃ রূপে দেখেন তখন তিনি লজ্জা পেয়ে যাবেন। স্বামীজী বলছে, আমেরিকাতে মেয়েরা স্বামীজীকে দেখে এগিয়ে আসত। চিঠিতে স্বামীজী বর্ণনা দিচ্ছেন, ভোগের দেশ তো, মেয়েরা সব এগিয়ে আসে কিন্তু প্রথমেই তিনি কাউকে মা, কাউকে বোন বানিয়ে ওদের মন থেকে ওই বিকারটা সরিয়ে দিতেন।

বলছেন *দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা*, দুর্গ মানে অত্যন্ত দুর্গম, এই যে জন্ম-মৃত্যুর সাগর, এর পারে যাওয়া অত্যন্ত দুরগম্য, একেবারেই সম্ভব নয়। জন্ম-মৃত্যুর চক্র কেন চলছে? কারণ সবাই অজ্ঞানে পড়ে আছে। কিন্তু যদি একবার জ্ঞান হয়ে যায় তাহলে আর জন্ম-মৃত্যু হবে না। জ্ঞান কীভাবে হবে? মা যদি কৃপা করেন, মায়ের সাধনা করা হলে তিনি আপনাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবেন। মুক্তি মানে স্বরূপ জ্ঞান।

আর বলছেন, *শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা*, মধু ও কৈটভের অরি হলেন ভগবান বিষ্ণু, সেই ভগবানের হৃদয়ে যিনি বাস করেন, বিষ্ণুর হৃদয়ে বাস করেন মা লক্ষ্মী, আপনি হলেন সেই লক্ষ্মী। এখানে শ্রীর অনুবাদ করছেন, কোথাও তাঁর কোন আসক্তি নেই, আমাদের জানা নেই কেন এই অর্থ করেছেন। কিন্তু শ্রী এখানে মা দুর্গাকেই বলা হচ্ছে, ভগবানের হৃদয়ে মা শ্রী রূপে বিদ্যমান। আর *গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা* – ভগবান শিব, তাঁর সব কিছু হলেন মা গৌরী, এই গৌরীও আপনি নিজে। এই মন্ত্রে মায়ের চারটি উপমা নিচ্ছেন। প্রথমে মানুষের মনে যে মেধা, মেধাই হল মানুষের জীবনে শ্রেষ্ঠ পাওয়া, জীবনে মেধা ছাড়া আর কিছু চাওয়াই যায় না। ডলারকে যেমন টাকার মূল্যে ফেলা হয়, ঠিক তেমনি মেধার মূল্যই নাম-যশে রূপান্তরিত হয়, টাকা-পয়সাতে রূপান্তরিত হয়। অন্য দিকে মা হলেন মুক্তিদাত্রী, আর ভক্তদের জন্য বলছেন বিষ্ণুর হৃদয়ে যিনি আছেন তিনিও আপনি এবং শিবের যে প্রাণ গৌরী, সেই গৌরীও আপনি।

ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র-
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তিকান্তম্।
অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাপ্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ।।১২

যুদ্ধের সময় যুদ্ধরত সব যোদ্ধাদেরই নিজের প্রাণের চিন্তা থাকে। কিন্তু সামনা-সামনি লড়াইয়ের সময়েও একজন মানুষকে খুন করে দেওয়াটা খুব কঠিন কাজ। অনেক প্রশিক্ষণ থাকলেই মানুষ মানুষকে বধ করতে পারে, তা নাহলে কোন মানুষের জীবন নিয়ে নেওয়া খুব কঠিন কাজ। যদি impersonal হয়ে যায় তখন মারতে পারে, কোন যোদ্ধা হয়ত একটা বোমা ছুড়ে দিল তাতে কে মরল কে বাঁচল তাতে তার কিছু আসে যায় না। কিন্তু সামনা-সামনি কাউকে মারা খুব কঠিন। সেইজন্য যুদ্ধে নিয়ম করে দেওয়া হয়েছিল, যুদ্ধে কেউ আত্মসমর্পণ করে দিলে তাকে আর কেউ অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে পারবে না। মহাভারতের যুদ্ধ নিয়ে এর আগেও আমরা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলাম যে, যখন দুই মহারথীর মধ্যে যুদ্ধ হত তখন তাদের সঙ্গে যে হাজার হাজার সৈন্য থাকতে তাদের সাথে এই মহারথীদের কোন সম্পর্ক থাকত না, কিন্তু একজন মহারথী পালিয়ে গেলে কিংবা পরাজিত হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার সব সৈন্যরা পালিয়ে যেত। কারণ তাঁরাও অকারণে মানুষ মারতে চাইতেন না। ইদানিং জেহাদী কীভাবে তৈরী করা হয় এই নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। যারা খুব গরীব লোক, খাবার জুটছে না, বাড়ির লোক খাওয়াতে পারছে না, এদেরকে ধরে ধরে জেহাদী ক্যাম্পে ভর্তি করে নিয়ে বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণ দিতে থাকে। প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর এদের বিভিন্ন রকমের জেহাদী কাজে নামিয়ে দেওয়া হয়। একেবারে চরম মুহূর্তে যখন সুইসাইড এ্যাটাকে নামতে যাচ্ছে, যার নাম ফিদাহিন এ্যটাক, এবার তাকে অনেক লোককে বোমা

মেরে, গুলি মেরে খুন করতে হবে আর নিজেও মারা যাবে, তখন দেখা যায় অনেকে শেষের দিকে পালিয়ে যায়। অনেকে আছে যারা দু বছর ধরে ট্রেনিং নিয়েছে, বাড়ির লোকেদের ফোনে কেঁদে কেঁদে বলছে 'তোমার এসে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও'। কারণ মানুষকে জানে মেরে ফেলা খুব কঠিন। মানুষ মারার জন্য নিজের মনকে ভোঁতা করে দিতে হয়, মন যদি সংবেদনশীল থাকে সে কখনই মানুষকে মারতে পারবে না। লড়াইয়ে মানুষ মারতে হলে দুটো পথ, মদ, ড্রাগস নিয়ে ব্রেনটাকে ডাল করে দিতে হবে আর তা নাহলে ক্রোধবৃত্তিকে প্রচণ্ড ভাবে জাগাতে হবে। এমন একটা ক্রোধ তৈরী করবে ব্রেনটা যেন ভোঁতা হয়ে যায়।

এখানে মায়ের রূপের বর্ণনা করা হচ্ছে। মা হলেন শক্তিস্বরূপিণী, যার জন্য মাকে কিছুই করতে হচ্ছে না, তাঁকে ভেতরে ক্রোধ সৃষ্টি করতে হচ্ছে না, মনকে কোন রকম intoxicate করতে হচ্ছে না। যুদ্ধের সময় তিনি হাসছেন *ঈষৎসহাসমমলং*, হা হা করে হাসছেন তা নয়, ঈষৎ, হাল্কা হাসি। দেবতারা আশ্চর্য হয়ে বলছেন, আপনার মুখের এই মিষ্টি হাসি দেখেও মহিষাসুর কীভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে আপনাকে আক্রমণ করার কথা ভাবল, আপনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, দেখে সত্যি অবাক লাগছে। মা হলেন পরমাসুন্দরী, সৌন্দর্যের পরাকাষ্টা, নির্মল রূপ, কমনীয় মুখমণ্ডল তার মধ্যে আবার মুখে মিষ্টি মিষ্টি হাসি, এরপরেও মহিষাসুর আপনাকে কী করে আক্রমণ করতে ইচ্ছে করল ভেবে অবাক লাগছে।

দৃষ্ট্বা তু দেবি কুপিতং ভ্রুকুটিকরাল-
মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্যঃ।
প্রাণান্মুমোচ মহিষস্তদতীব চিত্রং
কৈর্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন।।১৩

মন্ত্রের শেষে বলছেন *কুপিতান্তক*, অন্তক মানে যমরাজ। আসলে তিনি সর্বান্তক, সর্বান্তক মানে তিনি সব কিছুই শেষ করে দিতে পারেন। মৃত্যুর করাল রূপকে কেউ যদি সামনা-সামনি দেখে নেয় তখন ওই রূপ দেখে কে আর বেঁচে থাকতে পারবে! মৃত্যুর এই ধরণের করাল রূপের বর্ণনা বিভিন্ন মিথসে পাওয়া যায়, গ্রীকদের একটা কাহিনীতে মিডুসা বলে এক ডাইনী ছিল, ওর মুখ যে দেখে নেবে সে সঙ্গে সঙ্গে পাথর হয়ে যাবে, ওর মুখ দেখে নেওয়া মানে ওখানেই শেষ। হারকিউলাসকে বলা হয়েছিল ওই ডাইনীর মুণ্ডুটা কেটে নিয়ে আসতে। কিন্তু মুণ্ডু কাটবে কী করে! সে তো সাক্ষাৎ মৃত্যু, যে ওর মুখ দেখে নেবে তার শরীর পাথর হয়ে যাবে। কিন্তু হারকিউলাসও অসীম সাহসী ও বীর। সে আয়নাতে মুখ দেখে দেখে ওর মুণ্ডুটা কেটে দিয়েছে। কাটা মুণ্ডুটা যাতে না দেখতে হয় সেইজন্য ওটাকে একটা বস্তায় বন্ধ করেছে। এরপর হারকিউলাসকে আবার এক শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হবে, সে তখন বস্তা থেকে মুণ্ডুটা ঝপাৎ করে ওর শত্রুর মুখের সামনে বার করে দেখিয়ে দিয়েছে, শত্রু ওখানেই পাথর হয়ে গেল। এই কাহিনীগুলোতে দেখানো হচ্ছে মৃত্যুর করাল রূপ মানুষকে কিভাবে শেষ করে দেয়।

এখানে বলছেন, মা সৌম্যা রূপা, কিন্তু তিনি যদি তাঁর ভ্রুযুগল একটু তুলে দেন তখন তিনি হয়ে যাবেন মৃত্যুরূপিণী। তখনও যে তাঁর সুমনোহর কান্তিতে কোন রকম বিকৃতি এসে যাবে তা নয়। মায়ের মুখে তখনও মিষ্টি হাসি, সৌম্য রূপ, স্বর্ণপ্রভাতুল্য মনোহরকান্তি সবই আছে। কিন্তু শুধু সামান্য একটু ভ্রুকুটি তুলেছেন। আমাদের ক্ষেত্রে কি হয়, ক্রোধবৃত্তিকে জাগাতে হবে, ক্রোধবৃত্তি জাগাবার পর মনকে স্তম্ভিত করে দিতে হবে তারপর সেই ক্রোধ দিয়ে অপরের উপর মৃত্যুর খেলা চালাতে হবে, মাকে এসব কিছুই করতে হচ্ছে না। একটু ভ্রুকুটি তুলে দিলেন, ঐটুকুতেই কাজ হয়ে যাবে। যাঁরা অত্যন্ত ক্ষমতাবান লোক তাঁরাও চোখের চাহনিটা একটু পাল্টে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেন না। গান্ধীজীকে একবার ইউরোপ ভ্রমণে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সেই সময় তিনি মুসোলিনির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। গান্ধীজী যাওয়ার পর ইচ্ছে করেই মুসোলিনি গান্ধীজীকে বাইরে অনেকক্ষণ প্রতিক্ষা করতে বাধ্য করেছিলেন। অনেকক্ষণ প্রতিক্ষা করার পর গান্ধীজীকে যখন ভেতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন একটার পর একটা লম্বা রাস্থা আর অনেকগুলো বিশাল দরজা পেরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যাওয়ার পথে দুপাশের দেওয়ালে বিভিন্ন রকমের বিভৎস ধরণের মুখোশ, বন্দুক, পিস্তল, চাবুক, যেসব অস্ত্র দিয়ে মানুষকে শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়া হয় সেই ধরণের সব অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখা আছে, যেগুলো দেখলেই যে কোন লোকের মনে ভীতির সঞ্চার হয়ে যাবে। গান্ধীজী সব কিছু দেখার পর একটা মিষ্টি হাসি দিলেন, হাসি দিয়ে বলছেন 'মানুষকে

ভয় দেখানোর কত রকম কায়দা হয়েছে’। গান্ধীজী ওখানেও সম্পূর্ণ নির্বিকার ভাবে থাকলেন। সাধারণ মানুষ এই ধরণের জিনিষ দেখে আতঙ্কিত হয়ে যাবে, কিন্তু যাঁরা self-possessed তাঁদের কিছু হয় না। পরে দেখা গেল ঠিক তাই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বোঝাই গেল মুসোলিনি ভেতর থেকে অত্যন্ত দুর্বল লোক ছিল। হিটলার চিরদিনই জানত মুসোলিনি একটা অপদার্থ। যারা অপদার্থ তারা কী করে? লোককে চমকাবে, ভয় দেখাবে – তুমি আমাকে জানো না আমি কি করতে পারি! ক্ষমতাবানরা এসব কিছু করেন না, কিছু যদি করতে হয় তাহলে ভ্রুটা একটু কুঁচকে দিলেন, এটুকুতেই তাঁর সামনের লোক শেষ।

ঠিক সেই কথাই বলছেন, এটা খুবই আশ্চর্যের যে, মা! তুমি একটু ভ্রুটা তুলে দিলে তাতেই তোমার মৃত্যুরূপা রূপ বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু তোমার সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যুরূপা রূপ দেখেও মহিষাসুর তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করল না, এটাই পরমাশ্চর্য। তুমি যদি একটু ভ্রুকুটি করে দাও সেটাই হয়ে যাবে ক্রুদ্ধ যমরাজের রূপ। যমরাজের ক্রুদ্ধ হওয়া আর তোমার ভ্রুটা একটু সামান্য তোলা একই জিনিষ। বড় বড় ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক নেতারা কখনই রেগে যান না, রেগে গেলেও বাইরে প্রকাশ হতে দেন না। মা হলেন আদ্যাশক্তি, আদ্যাশক্তি ভ্রুটা একটু তুলে দিয়েছেন সেটাই অনেক। মায়ের এই ভ্রুকুটি কার সাথে তুলনা করছেন? যমরাজের ক্রুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। যমরাজকে সাধারণত ক্রুদ্ধ হতে হয় না। যমরাজ নিজেও সব জায়গায় যান না, যমদূত গুলোকে পাঠিয়ে দেন, ওরা শুধু তুলে নিয়ে চলে আসবে। বলছেন যমরাজের ক্রোধ মূর্তি, যমরাজ ক্রুদ্ধ হওয়া মানে পুরো সৃষ্টিটাই নাশ হয়ে যাওয়ার কথা। যমরাজের ওই ক্রুদ্ধ রূপের থেকেও আরও ভয়ঙ্কর হল মায়ের একটু ভ্রুকুটি তোলা। যমরাজকে ক্রুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনই হয় না, কারণ যমরাজের নীচের লেভেলেই সব কাজ হয়ে যায়, যমের দূতরা গিয়ে সোজা তুলে নিয়ে চলে আসবে। সাবিত্রীর স্বামী সত্যবানকে যমদূতরা নিয়ে যেতে পারল না, তাই যমরাজকে আসতে হয়েছিল। সেখানেও সাবিত্রী পতিব্রতা ধর্মে প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন বলে যমরাজকে অনেক মিষ্টি মিষ্টি করে সাবিত্রীকে বলতে হয়েছিল, ওর সময় হয়ে গেছে তাই ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। সাবিত্রী প্রচণ্ড বুদ্ধিমতী। তিন বার বর নেওয়ার পরও সাবিত্রী যমরাজের পেছন ছাড়ছিলেন না, তখন যমরাজ যেন একটু রাগবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু সাবিত্রীতো যমরাজকে প্যাঁচে ফেলে দিয়েছেন। এই যমরাজ যদি রেগে যান পুরো সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। যমরাজের সেই ক্রোধের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে মায়ের একটু ভ্রুকুটি কুঞ্চন করা নিয়ে। একই সঙ্গে অতি সৌম্য আর অতি রৌদ্র রূপ থাকতে পারে না। মা দুর্গা হলেন একমাত্র এই রূপের প্রতীক, মায়ের একই সাথে সৌম্য মুর্তি আর রৌদ্র মুর্তি, মা কালীও নন। যদিও মা কালীর শ্যামা কালী রূপে বরাভয় মুদ্রা আনা হয়েছে, কিন্তু এই দুটো রূপ একই সাথে মা দুর্গারই আছে। আগের মন্ত্রে বলছেন *ঈষৎসহাসমমলং*, আর পরের মন্ত্রে বলছেন *ভ্রুকুটিকরালম্*, দুটো এক সঙ্গে চলছে।

আমাদের সংসারের মধ্যেই কিন্তু সৌম্য আর রৌদ্র এই দুটো রূপ একই সঙ্গে দেখা যায়। বেশির ভাগ নারীদের স্বামীর প্রতি রৌদ্ররূপ আর নিজের সন্তানের প্রতি সৌম্যরূপ দেখা যায়। ভগবান ছাড়া সৃষ্টি কেউ করতে পারে না। এই চণ্ডী কাহিনী কে রচনা করেছেন? ব্যাসদেব তো রচনা করেননি, যদিও ব্যাসদেবের নামে credit দেওয়া হয়, ব্যাসদেবের থেকে আরও কম প্রতিভা সম্পন্ন কোন কবি হয়তো রচনা করেছেন। তাঁর ক্ষমতা কোথায় যে নতুন কিছু নিয়ে আসবেন। সংসারে যা দেখেছেন, অভিজ্ঞতার পুঁজিতে যা কিছু জমা আছে, সেটাকেই অবলম্বন করে বাড়িয়ে বাড়িয়ে সেই বিরাট স্তরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছেন। সংসারে সব সময়ই এই রৌদ্র মুর্তি আবার এই সৌম্য মুর্তি দেখা যাচ্ছে। ঠাকুরও দিব্য দৃষ্টিতে দেখছেন, গঙ্গা বক্ষ থেকে এক স্ত্রী উঠে এলেন, উঠে এসে এক সন্তান প্রসব করলেন, সন্তানকে স্তন্য পান করালেন, তারপর সেই সন্তানকে আবার কচ কচ করে খেয়ে নিলেন। এগুলো কোন কল্পনা কিছু নয়, ঠাকুর যা কিছু দেখছেন সবটাই সত্য। এটাই জগতের বাস্তব চিত্র। যে শক্তি দিয়ে জগৎ পরিপালিত হচ্ছে, সেই শক্তি দিয়েই জগতের সংহার হয়। সেই শক্তিরই মূর্ত রূপ মা দুর্গা। দুটো মন্ত্রে মায়ের দু রকম রূপ দেখান হল। মা তাঁর রৌদ্র মুর্তি দেখাচ্ছেন না, শুধু ভ্রুটা একটু কুঞ্চিত করেছেন। রৌদ্র মুর্তি ধরলে তো কী হবে কল্পনাই করা যাবে না। কর্পূর যেভাবে উবে যায়, মায়ের রৌদ্র রূপে সৃষ্টি সেইভাবে উবে যাবে। মায়ের একটু ভ্রুকুটিতেই ত্রাহি ত্রাহি ছুটে যাবে, সেই রূপ দেখেও মহিষাসুর মারা গেল না, এটাই আশ্চর্যের। মহিষাসুরের বধ হয়ে যাওয়ার পর দেবতা ও ঋষিরা মিলে দেবীর স্তুতি করছেন, এবার তাই বলছেন –

দেবি প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি।
বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত-
ন্নীতং বলং সুবিপলং মহিষাসুরস্য।।১৪

দেবীকে বলছেন, *দেবি প্রসীদ*, হে দেবী আপনি শান্ত হন। *পরমা ভবতী ভবায়*, ভব মানে সংসার, এই সংসারে আপনি হলেন পরমাত্মস্বরূপা, সেইজন্য আপনিই একমাত্র এই সংসারের মঙ্গল করতে পারেন। আপনি ক্রুদ্ধা হলে যে কি হয় সেটা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনার রাগ মাত্রে এত বিশাল অসুর সৈন্য, যারা দেবতাদের পরাভূত করে রেখেছিল, মুহুর্তে নিঃশেষ হয়ে গেল। আপনি যদি রেগে থাকেন তাহলে এই সংসার বিনাশ হয়ে যাবে। সেইজন্য মা! আপনি শান্ত হন। হিরণ্যকশ্যপুকে বধ করার জন্য ভগবান বিষ্ণুকে নৃসিংহ অবতার রূপ ধারণ করে ক্রোধবৃত্তিকে অবলম্বন করতে হয়েছিল। সিংহের তামসিক বৃত্তি অনেক বেশি তাই নৃসিংহ অবতারে ভগবান পুরো তামসিক বৃত্তিকে ধারণ করেছিলেন। কিন্তু এখানে মায়ের যে সৌম্য মুর্তি এটা হল সত্ত্ব গুণের আধার, আর মায়ের যে ক্রোধ বৃত্তি নিচ্ছেন তখন তিনি একটু যেন রজোগুণ ধারণ করছেন। হিরণ্যকশ্যপু বধ হয়ে যাওয়ার পরেও সেই নৃসিংহের লোম, কেশর সব রাগে সজারুর কাঁটার মত সোজা হয়ে আছে, দেবতারাও ভয়ে তাঁর কাছে যেতে সাহস করতে পারছেন না। প্রহ্লাদ তখন গিয়ে ভগবানের স্তব স্তুতি করতে শুরু করলেন। প্রহ্লাদ স্তব-স্তুতি করাতে ভগবান শান্ত হলেন। নৃসিংহ অবতার আর মায়ের শক্তির মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কারণ দুটোই অবতারের শক্তি। তাই দেবী যদি ক্রোধে এসে যান তাহলে যে শক্তি জগতের পরিপালন করছে সেই শক্তিই জগতের বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সেইজন্য বলছেন দেবি প্রসীদ, মা! আপনি শান্ত হন।

এর মধ্যেও অনেক আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আছে। এই ধরণের সাহিত্যকে বলা হয় multi layer works। মায়ের আবির্ভাব মানে শক্তির আবির্ভাব, শক্তির আবির্ভাব মানে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আবির্ভাব। আমাদের মনের যে বৃত্তি তার মধ্যে যখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা ভাবের উদয় হয় তখন আমাদের মনে যে হাজার রকমের অঙ্কট-বঙ্কট আছে এগুলো এমনিতেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মায়ের যে ভাব, তা হল আত্মজ্ঞানের ভাব। সেটাই এখানে একটা প্রতীক রূপে দেখান হয়েছে, মায়ের আবির্ভাব হলে অঙ্কট-বঙ্কট রূপ মহিষাসুরের সব সৈন্য এমনিতেই মুহুর্তের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। এক আধটা থেকে যায়, যে জায়গাতে দুর্বলতাটা বেশি আছে, সেই জায়গার বৃত্তিগুলো থেকে যায়। যিশু, বুদ্ধ এমনকি ঠাকুরের জীবনেও দেখা যায়, ওনাদের যে জিনিষটার প্রতি দুর্বলতা ছিল সেটাই last temptation হয়ে এসেছিল। কারণ ওগুলি মনের তৈরী কিনা, ওগুলো তো বাস্তবিক কখন আসে না। তাই বলছেন আপনি প্রসন্না হলে সবারই মঙ্গল হয়, কি রকম মঙ্গল হয় –

তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না।।১৫

তে সম্মতা জনপদেষু, আপনি যাঁর প্রতি প্রসন্না হন তিনিই সমাজে মর্যাদার আসন পান। *ধনানি তেষাং*, আপনি যাঁর প্রতি প্রসন্না সে অর্থবান হয়, মানুশের যে যশ হয় এটা আপনারই কৃপা। *ধর্মবর্গঃ*, মানুষের মধ্যে ধর্মের সব কিছু পালন করার যে শুভ প্রবৃত্তির উদয় হয়, কিন্তু তাও মায়ের কৃপা না পাওয়া পর্যন্ত কেউ ধর্ম পালন করতে পারবে না। শুধু ধর্ম পালনই নয়, মায়ের কৃপা না থাকলে কেউ সম্মান পাবে না, যশ পাবে না, টাকা-পয়সাও পাবে না আর ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটের কোনটাই সে করতে পারবে না যদি মায়ের কৃপা না থাকে।

বাড়ির ভেতরে স্ত্রী মানছে, সন্তান মানছে, চাকর-বাকররা সম্মান দিচ্ছে, সবাই সবার প্রতি যে মর্যাদপূর্ণ আচরণ করে যাচ্ছে, এর সব কিছু সেই পরিবারেই দেখা যাবে যেখানে মায়ের কৃপা বর্ষিত হয়। মায়ের কৃপা না হলে কিছুই হবে না। ঠাকুর যে শ্রীশ্রীমাকে মাতৃরূপে পূজা করলেন, মায়ের এই পূজার ভেতর দিয়ে ঠাকুর জগতের কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করে দিলেন। দেশের উপর মাতৃশক্তির কৃপা বর্ষিত হওয়ার পথকে সুগম করে দেওয়ার

জন্য, মাতৃরূপের আরাধনা করে ঠাকুর জগতের কুলকুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে দিলেন। স্বামীজীও যে মঠে দুর্গাপূজা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আর সাধারণ ভাবে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন যে প্রথম থেকে শক্তিকে মেনে আসছে, এই ভাব ঠাকুরের ভাবধারা থেকেই সঞ্চারিত হয়েছে। আমরা যা কিছুই চাইছি, জ্ঞান, ভক্তি, ঐশ্বর্য, সম্পদ যাই চাই না কেন, শক্তির পূজা না করলে কিছুই আসবে না। আর যাঁরা পুরোপুরি আধ্যাত্মিকতার দিকে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের দিকে চলে গেছেন, বিশেষ করে যাঁরা জ্ঞানমার্গের সাধু, তাঁরা এই দিকটা এড়িয়ে চলে যান। এই ব্যাপারটা কতটা ঠিক আমাদের জানা নেই, কারণ বেদান্ত বলতে আমরা আচার্য শঙ্করকেই জানি, তিনিও তো শক্তি আরাধনার ব্যাপারে কোন বিরূপতা প্রকাশ করেননি আর তিনি নিজেও শক্তির আরাধনা করেছেন। বর্তমান কালের বেদান্ত বলতে যা বোঝায় বা ঠাকুরের সময় বেদান্ত বলতে যা বোঝাত এর একটা নাম আছে, তাকে বলে Post Shankar Vedanta, এরা যে আসলে কী বলতে চান বোঝা যায় না। তবে তোতাপুরী ওই সম্প্রদায়ের ছিলেন, তিনি কালী মানতেন না, শক্তি আরাধনায় বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর তাঁর মধ্যেও কোথাও একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পরে দেখা গেল তিনি মায়ের অনেক স্তোত্র পাঠ করতে শুরু করেছিলেন, তার মানে মায়ের স্তোত্রগুলো তাঁর জানা ছিল। তবে সাধারণত আত্মজ্ঞানের দিকেও যাঁরা যান, বেদান্ত মতে চলেন তাঁরাও শক্তি আরাধনাকে মানেন। শক্তির কথা গীতাতেও বেশ কয়েবার ঘুরে ঘুরে এসেছে।

সদাভ্যুদয়দা, যে কোন অভ্যুদয়, তা সমাজের অভ্যুদয়ই হোক কিংবা দেশেরই হোক বা সারা বিশ্বেরই হোক বা ব্যষ্টি স্তরেই হোক, মা প্রসন্না না হলে কোথাও কখনই অভ্যুদয় আসবে না। জগজ্জননী প্রসন্না না হলে সমাজ, দেশ ও জগতের কিছুই মঙ্গল সাধিত হবে না। জগজ্জননীর রূপে তো আমরা মাকে পাই না, পৌরাণিক কাহিনীতে আছে মা রেগে গিয়ে নিজের সন্তানদের উপরই অভিশাপ দিতে শুরু করে দিয়েছে, সন্তানরাও জানে মায়ের অভিশাপ মানে তারাও আর বাঁচবে না। আসলে সেইভাবে আমরা তো জগজ্জননী রূপে কোথাও পাই না। আর জগজ্জননী এবং নিজের যে গর্ভধারিণী এই দুটোতে তফাৎ তো হবেই। এখানে বলছেন জগজ্জননী যাঁর উপর প্রসন্না হন তাঁর অভ্যুদয় হবেই। তবে গর্ভধারিণীর সাথেও এর একটা সম্পর্ক আছে, মা যদি সন্তানের উপর খুব খুশি থাকে সচরাচর সেই সন্তানের কোন আপদ-বিপদ হয় না। দেখা যায়, যাদের বাড়িত প্রচুর অশান্তি, ঝগড়া-বিবাদ লেগে আছে, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এদের কোন বুড়ি মা বা কোন না কোন বৃদ্ধা শারীরিক বা মানসিক খুব কষ্টের মধ্যে পড়ে আছেন। প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে অনেক রকম সম্পর্কের মায়েরা জড়িয়ে থাকেন। দিদিমা, ঠাকুরমা, বৃদ্ধা কাকিমা, জ্যেঠিমা, পিসিমা এই ধরণের সম্পর্কের কোন না কোন বৃদ্ধা আমাদের কারুর না কারুর উপর নির্ভরশীল হয়ে আছেন। এঁদের কেউ একজন যদি কষ্টের মধ্যে দিন কাটায় তাহলে যার উপর তিনি নির্ভর করে আছেন তার জীবনে প্রচুর বিপদ আসবে। খুব কাছে আমরা তিনজন মাকেই পাই, নিজের মা, ঠাকুরমা আর দিদিমা, এই তিনজনও যদি প্রসন্না থাকেন তাহলে তার আপদ-বিপদ কখনই আসবে না। আপদ-বিপদ যা আসার সেতো আসবেই, কর্মের খেলাকে তো কেউ আটকাতে পারবে না। কিন্তু এদের তিনজনের ভালোবাসা আমাদের সব রকম আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করে। এই তিনটে দরজার একটা দরজা যদি ভেঙে পড়ে তাহলে বন্যার জলের মত বিপদ ঢুকে আসে। আপনি পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে খোঁজ নিয়ে দেখুন, যাদের বাড়িতে খুব অশান্তি চলছে, কষ্ট চলছে, কিছু একটা কারণে এদের মায়েরা খুব গোলমেলে, নিজেরাও শান্তিতে থাকবে না, বাড়ির লোকগুলোকেও শান্তিতে থাকতে দেবে না। বয়স হলে বেশির ভাগ মেয়েদেরই যে মাথাটা খারাপ হয়ে যায় এতে কোন সন্দেহই নেই। মায়ের যদি মাথা খারাপ হয় তাতেও গোলমাল হতে থাকবে, এটাই সমস্যা। মাথা খারাপ হওয়ার পেছনে আছে অনেক কামনা-বাসনার অপুর্তি। নিজের ভোগ-বাসনার পুর্তি এখন নিজের ছেলের উপর দিয়ে করতে চাইছে, এদের সংসারে ঝামেলার শেষ হবে না। তবে এর থেকে বাঁচার একটাই পথ, ঠাকুর বলছেন ধর্ম পথে মাও যদি ব্যাঘাত দেয় সেই মাকে ত্যাগ করে দিলে কোন পাপ লাগবে না। ধাক্কা যে লাগবে না তা নয়, ধাক্কা একটা মায়ের তরফ থেকে লাগবে, তবে উনিই আবার সেই ধাক্কা থেকে রক্ষা করবেন।

আসলে এই ধরণের স্তুতি করতে করতে আমাদের চেতনা একটু একটু করে জাগ্রত হতে শুরু করে। চেতনা একটু যেই জাগলো, আবার সে ভোগে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আবার কোন ভাবে ধাক্কা খেয়ে চেতনাটা জাগতে থাকে। এইভাবে ধাক্কা খেতে খেতে একটু একটু করে চেতনার বিকাশ হতে হতে একটা সময় সে পুরোপুরি এই

পথে নেমে পড়ে। গীতায় ভগবান বলছেন *বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে*, একদিনে বা এক জন্মে চেতনা হবে না। হিন্দুরা এই ব্যাপারগুলো খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছিলেন বলে বারবার ধর্ম, অর্থ ও কামের কথা বলে গেছেন। ধর্ম, অর্থ ও কাম থেকে যাদের পুরোপুরি বিরক্তি এসে গেছে মোক্ষ পথ একমাত্র তাদেরই জন্য। ঠাকুর বলতেন তোমরা ঈশ্বরকে ভালোবাস। ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্য তো ধর্ম, অর্থ ও কাম ছাড়তে হবে না। উনি বলতেন বিষয়ের আসক্তি ত্যাগ কর। ধর্ম, অর্থ ও কামও বিষয়ের আসক্তিকে অনুমতি দেয় না। ধর্ম, অর্থ ও কাম এবং কামিনী-কাঞ্চন এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য হল, কামিনী-কাঞ্চন বলতে বোঝায় পুরোপুরি বিষয়াসক্ত। আর বিষয়ের আসক্তিকে ছেড়ে দিলে সেটা তখন অর্থ আর কাম হয়ে যায়। আমাদের শাস্ত্রে অর্থ ও কামের অনুমতি রয়েছে। ঠাকুরও যখন কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলছেন, তখন তিনি তাদের জন্যই বলছেন, যারা কামিনী-কাঞ্চনে একেবারে আসক্ত হয়ে রয়েছে। আগেকার দিনে বিয়ে করা হত একমাত্র সন্তানোৎপত্তির জন্য। সন্তানোৎপত্তি কেন? যাতে পিতৃপুরুষরা জল পায়, সন্তান পিণ্ডদান করার পর যাতে আমি স্বর্গে সুখে থাকতে পারি, ইত্যাদি। বিয়ের পেছনে তাঁদের শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়জনিত সুখ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য কখনই ছিল না। টাকা-পয়সা উপার্জনের উদ্দেশ্যও ছিল, যাতে আমি যজ্ঞাদি, দান, তীর্থাদির দ্বারা ধর্মকর্মাদি করতে পারি, পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে পারি।

গীতাপ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হনুমান প্রসাদজী একটা কাপড়ের বড় মিলের মালিক ছিলেন, সেখান থেকে প্রচুর মুনাফা আসত। তিনি ঠিক করলেন, কাপড়ের মিল থেকে যা আমার মুনাফা হবে সব টাকা গীতাপ্রেসের বইগুলোকে subsidized করাতে লাগাবেন। সেইজন্য গীতাপ্রেসের বইগুলো এখনও এত কম দামে আমরা পাচ্ছি। উনি নিজেও একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি বলে দিলেন এই টাকা ধর্মের জন্য যাবে। আজকে গীতাপ্রেস পুরো একটা স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান রূপে দাঁড়িয়ে আছে। ভারতের ইতিহাসে বই বিক্রীর দিক থেকে গীতাপ্রেস আজ এক নম্বরে। ভারতের ইয়ং জেনারেশান থেকে শুরু করে উপর মহলে সিনিয়র কর্মচারীরা এত এত টাকা রোজগার করে যাচ্ছে, তাদের কজন ধর্মের জন্য অর্থ দান করছে? সবটাই নিজেদের ভোগের পেছনে তো খরচ করছেই তার উপর আবার চেষ্টা করে যাচ্ছে যাতে আরও কত অসদোপায়ে অর্থোপার্জন করা যেতে পারে। এই আসক্তি যখন টাকার পেছনে এসে যায় তখন সেটাই কাঞ্চন হয়ে যায়। নারীসুখের প্রতি যখন তীব্র আসক্তি আসে তখন সেটাই কাম হয়ে যায়, এই কামিনী-কাঞ্চনের কথাই ঠাকুর বলছেন। এই দুটোই যখন আসক্তি শূন্য হয়ে যায় তখন সেটাই হয়ে যায় অর্থ আর কাম। পরের মন্ত্রে বলছেন –

> ধর্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্মাণ্য-
> ত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।
> স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতীপ্রসাদা-
> ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি তেন।।১৬

মৃত্যুর পর মানুষ পৃথিবীলোক থেকে স্বর্গে গিয়ে যে সুখ পায়, এই সুখ কী করে পায়? ধর্ম করে। মানুষ যদি ধর্ম করে তাহলে এই লোকে সুখ পায় আর মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়ে সুখ পায়। কিন্তু মায়ের কৃপা না হলে মানুষ এই ধর্মও করতে পারবে না। জেহাদীরা সবাই বলে, আল্লার জন্য তুমি যদি যুদ্ধে নামো আর তুমি যদি শহিদ হয়ে যাও, তাহলে তোমার জন্য অনন্ত সুখ। স্বামীজী বারবার বলছেন অনন্ত সুখ বলে কিছু হয় না, যুক্তিতেই দাঁড়ায় না। আমরা যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নিই ওরা যে বিধর্মীদের গলা কাটছে, ভালো কাজই করছে, কিন্তু তার জন্য তাকে কি করে স্বর্গে অনন্ত সুখের জন্য নিয়ে যাবে! তাহলে মানুষ কি করে স্বর্গে সুখ পাবে? *প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি*, প্রত্যেক দিন যদি আপনি সুকৃতী করেন। বছরে একদিন ঠাকুরের উৎসবে মঠে এসে খিচুড়ি ভোগ খেয়ে গেলেন আর মনে করবেন রামকৃষ্ণলোকে আপনার সিট গ্যারান্টি হয়ে গেল, কখনই তা হবে না। যে প্রতিদিন দীর্ঘকাল ধরে করে যাচ্ছে, *দীর্ঘকালনৈরন্তর্য*, রোজ করে যাচ্ছে, তখন এটাই তাকে শেষে সুকৃতীতে নিয়ে যাবে, যে সুকৃতী আপনাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে, যে সুকৃতী আপনাকে ইহলোকে সুখ দেবে, তাছাড়া হবে না। বলছেন এটাও মায়ের কৃপা না হলে হয় না। তারপরে বলছেন –

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা।।১৭

আমাদের মন দুটো স্তরে থাকে, একটা স্তরে মন নিম্ন অবস্থায় থাকে। মনে কোন দুঃখ, তা যে কোন দুঃখই হোক না কেন, দুঃখ থাকা মানেই মন নিম্ন স্তরে। মনের আরেকটি স্তর হল মনে কোন দুঃখ নেই, মন একটা স্থিতাবস্থায় রয়েছে, যেটাকে আমরা বলি সুখ। এমনকি যখন কোন ইতিবাচক কোন কিছু আসে তখন এটাই দুঃখের অবস্থাকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু ঠিক ঠিক আনন্দ বলতে যা বোঝায়, সেই আনন্দ একমাত্র হয় যাঁরা ঈশ্বর চিন্তনের গভীরে চলে যান। আমরা যখন সাধারণত বলি সুখে আছি, মূলতঃ মনে তখন দুঃখের অভাব চলছে। দুঃখটাই মনের স্বাভাবিক অবস্থা। সংসারে সব সময় এমন কিছু না কিছু লেগেই থাকে যেটা আমাদের দুখী করে রাখছে। যেমন টাকা-পয়সার অভাব আমাদের দুঃখ দেবে, সন্তান কাছে নেই দুঃখ দেবে, জীবনে আমাদের দুঃখই লেগে আছে, দুঃখ ছাড়া কিছু নেই। দুঃখ আর সুখ মনের এই দুটো অবস্থাকে নিয়েই এই মন্ত্রে বলছেন।

ভয় আর দুঃখ একসাথেই চলে। কিসের ভয়? দুঃখের ভয়। যে জিনিষটা আমার কাছে আছে সেটা হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কটাই ভয়, আর জিনিষটা চলে গেলে দুঃখ হবে। ভয় আর দুঃখ একই জিনিষ। যেখানেই মোহ সেখানেই ভয়। মোহ মানে যে জিনিষটা আছে সেটা চলে যাওয়ার ভয়। নিজের শরীরকে আমরা প্রচণ্ড ভালোবাসি সেইজন্য সবাই মৃত্যুকে ভয় করি। অপরের শরীরকে যখন ভালোবাসছি তখন সেও যখন দূরে চলে যাবে সেটাও আমার কাছে মৃত্যুর সমান। মা সন্তানকে খুব ভালোবাসে, সন্তান একটি মেয়েকে বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেল, মায়ের মনে এখন শুধু দুঃখ আর দুঃখই। মা সন্তানের শরীরকে নিজের শরীর মনে করত, সন্তান মায়ের কথা মত চলল না, তার মানে মায়ের কাছে সেই সন্তান মারা যাওয়ার সমান হয়ে গেল। মৃত্যু মানে হারিয়ে যাওয়া। ওই যে আশঙ্কা ছিল, সন্তান একদিন আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে, সেই আশঙ্কা এখন বাস্তব হয়ে গেছে। এবার মায়ের চোখে জল পড়তে থাকবে। সেইজন্য প্রথমেই বলা হয় শরীর বোধ থেকে বেরিয়ে এস। যেমনি নিজের ও অপরের শরীর ও মনের সঙ্গে একাত্ম বোধ হওয়া থেকে বেরিয়ে আসবে, তেমনি দুঃখ কষ্ট অনেক কমে যাবে।

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ, মনে যে ভয়ই থাকুক না কেন, মা দুর্গাকে স্মরণ করলেই ভয় চলে যাবে। যারা খুব ভক্ত তাদের মনে যখন খুব দুঃখ কষ্ট হয় তখন ঠাকুরের কথা মনে করে। আর যখনই ঠাকুরের সামনে মাথা নত করে, ঠাকুরকে প্রণাম করে তখনই ভয়-টয় সব কেটে যায়। *স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি*, আর যদি আপনার কোন দুঃখ ভয় না থাকে তখন আপনি স্বস্থ। স্বস্থ মানে 'স্ব'তে যখন অবস্থান করা অর্থাৎ নিজেতে অবস্থান করা। সেই অবস্থায় আপনি যদি মা দুর্গাকে স্মরণ করেন তখন শুভ মতি হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হয়। কবীর দাসের খুব নামকরা দোহা আছে দুখমে সুমেরণ সব করে, সুখমে করে না কোঈ। দুঃখের সময় সবাই ভগবানের কথা স্মরণ করে, সুখে থাকলে কেউ ভগবানের কথা স্মরণ করে না। বলছেন, যো সুখমে সুমেরণ করে তো দুখ কাহে কো, সুখে যদি ভগবানকে স্মরণ করে তাহলে আর কোন দিন দুঃখ হবে না। এখানেও সেই কথাই বলা হচ্ছে, যখন আমি দুঃখে আছি, আমি যদি মাকে স্মরণ করি আমার দুঃখটা চলে যাবে। আর যদি আমার দুঃখ না থাকে, আমি তখন স্বস্থ, তখনও যদি আমি মাকে স্মরণ করি তাহলে আমার শুভ মতি হবে, আমার আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে বা আধ্যাত্মিক ব্যপারটা যাঁরা বোঝেন না তাঁরা আধ্যাত্মিক জগতে এগিয়ে যাবেন।

দুঃখে স্মরণ করলে মা তুমি দুঃখ হরণ কর, সুখে স্মরণ করলে তুমি শুভ মতি দাও। কিন্তু দুঃখে আপনার গর্ভধারিণী মাকে স্মরণ করলে মা আপনার দুঃখ হরণ করবেন। আর সুখে যদি স্মরণ করেন? গর্ভধারিণী মা সুখটা হরণ করবেন। মায়েদের কাজই হল হরণ করা, দুঃখের সময় দুঃখ হরণ করবেন, সুখের সময় সুখটাও হরণ করবেন। ছেলে বিয়ে করে নতুন বউকে নিয়ে সুখে আছে দেখলে মায়ের গাত্রদাহ হবে। জগজ্জননী কখন এই রকম করেন না, দুঃখের সময় জগজ্জননীকে স্মরণ করলে তিনি দুঃখ হরণ করেন, আর সুখের সময় স্মরণ করলে তিনি শুভ মতি দেন। গর্ভধারিণী মা আর জগজ্জননীর মধ্যে এটাই পার্থক্য। অপরের সুখ দেখে সুখী হওয়া মানুষের স্বভাবেই নেই। যদি অপরের সুখ দেখে ভালো লাগছে তাহলে বুঝবেন আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে তিনি অনেক

উন্নত। অপরের সুখ কেউই সহ্য করবে না, গর্ভধারিণী মাও একটা পরিস্থিতিতে সন্তানের সুখ সহ্য করতে পারবে না। মা চায় মায়ের কথামত ছেলে যেন ওঠবোস করে।

কিন্তু যিনি জগজ্জননী তিনি সেই রকম নন। শুধু তাই না, *দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা*, হে দারিদ্র, দুঃখ ও ভয়হারিণী দেবি! আপনি ছাড়া এই জগতে কে আর আছে যাঁর চিত্ত সকলের জন্য সদাই দয়ার্দ্র। সবারই মঙ্গলের জন্য আপনিই আছেন। এখানে কোন কিছু একটুও বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না, এর প্রত্যেকটি বক্তব্য পুরোপুরি আক্ষরিক অর্থেই সত্য। যাঁরা ঈশ্বরের অবতার, অবতারের মত যাঁরা বড় সাধু মহাত্মা এই কজন ব্যক্তিত্ব ছাড়া কারুর পক্ষে সম্ভব নয় যে অকাতরে সবাইকে ভালোবাসা দিয়ে যাবেন। এক সময় কাশীর অদ্বৈতাশ্রমে এক ভক্ত মহিলা নিজের ছেলেকে নিয়ে রোজই আসতেন। কিছু দিন পরে যেভাবেই হোক ছেলেটি ব্রক্ষ্মচারী হয়ে মঠে যোগ দিয়েছে। ব্যস্, সেই দিন থেকে ভক্ত মহিলা মঠে ঢোকা তো বন্ধই করে দিলেন, উপরন্তু রোজ মঠের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মঠের মহারাজদের নামে আর ছেলের নামে এক ঝুড়ি গালাগাল দিয়ে বেরিয়ে চলে যেত। ছেলে সুখে থাকবে বলে সাধু হয়েছে, মায়ের সেই সুখ সহ্য হচ্ছে না। সেইজন্য বলছেন জগজ্জননী ছাড়া অপরের সুখ কেউ সহ্য করতে পারবে না। পাগলী মামী শ্রীমাকে বলছেন ‘তোমার যত ভালোবাসা শুধু বেড়ালের প্রতি’। শুনে মা বলছেন, ‘আমার ভালোবাসা যার প্রতি নেই সেতো অভাগা’, তারপরেই মা বলছেন ‘আমি তো এমন কাউকেই পাচ্ছি না যার প্রতি আমার ভালোবাসা নেই’।

এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে
কুর্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু
মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেব।।১৮

এই যে আপনি সব অসুরদের নিধন করলেন, মৃত্যুর পর এরা নরকে যাবে কিংবা এরা মরলে জগতের শান্তি হবে, এই সব ভেবে আপনি কিছু করেন না। তাহলে তিনি কি করেন? মা এদের সামনে এসে গেছেন, মায়ের আগমনে এদের মধ্যে একটা পূণ্য প্রভাব এসে গেছে। পূণ্য প্রভাবের জন্য অসুরদের আপনি অস্ত্র দ্বারাই বধ করছেন। আপনার অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুর হওয়ার জন্য সমস্ত অসুররাই এবার স্বর্গে যাবে। অসুররা সবাই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে মায়ের পূণ্য স্পর্শ লাভে ধন্য হয়ে যাচ্ছে। ভক্তিশাস্ত্রে এই ব্যাপারগুলোকে খুব মান্যতা দেওয়া হয়। ঠাকুর একবার রাখালকে নিয়ে গোপালের মার বাড়ি গেছেন। ওই বাড়িতে আবার দুটো ভূত থাকত। ঠাকুর আসাতে ভূত দুটো ঠাকুরকে বলছে ‘তুমি এখান থেকে চলে যাও, তোমার গায়ের বাতাস আমরা সহ্য করতে পারছি না’। অনেক কাল পরে শ্রীমাকে একজন বলছেন ‘আহা ওই ভূতগুলো কী বোকা ছিল, ওরা ঠাকুরের কাছে মুক্তি চাইল না’। যিনি এই কথা শ্রীমাকে বলছিলেন, তিনি ধরতে পারছেন না কত বড় ভুল কথা বলছেন। আসলে ওই ভূত দুটো তো ঠাকুরকে ঠাকুর রূপে জানে না। সেই কারণেই ঠাকুরের পবিত্রতা তাদের সহ্য হচ্ছিল না। শ্রীমা তখন বলছেন ‘ঠাকুরকে দর্শন করেছে, তাতেই তাদের মুক্তি হয়ে যাবে’। মুক্তি মানে প্রেতযোনি থেকে মুক্তির কথা মা বলছেন। ভগবানের দৃষ্টি যার উপর পড়ে তারই মুক্তি হয়ে যায়।

হিন্দুশাস্ত্রে ভগবান কখনই কাউকে নরকে পাঠাতে পারেন না। কিন্তু খ্রিশ্চান ও ইসলাম ধর্মে অন্য রকম বলা হয়, যারা ঠিক ভাবে থাকে না তাদের ভগবান নরকে পাঠিয়ে দেন। গীতায় ভগবান বলছেন আসুরিক যোনিতে যারা ঠিক ভাবে থাকে না তাদেরকে ভগবান *ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু*, অজস্র অশুভ যোনিতে নিক্ষেপ করেন। এটাকেই অবলম্বন করে মাধ্বাচার্য এক সময় বলে দিলেন তিনি চিরদিনের জন্য তাদের নরকে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র এই ধরণের কথা কখনই মানবে না। আর ভগবান তো কখনই এই রকম করতে পারেন না। ভগবান যদি নিজের হাতে অসুরদের মারেন, এতে অসুররা যদি মারাও যায় তাও তারা স্বর্গেই যাবে। বাল্মীকি রামায়ণেও আমরা পাই শ্রীরামচন্দ্র যেসব অসুরদের নিধন করছেন তাদের সবার যোনি মুক্তি হয়ে যাচ্ছে। তাই ভগবান কাউকে নরকে পাঠাতে পারেন এটা আমরা মানি না। খ্রিশ্চান ও ইসলাম ধর্মে ভগবান, যিনি কর্ম বিধাতা, তিনি বিচার করেন এবং তাদের কর্মানুসারে কাউকে নরকে কাউকে স্বর্গে পাঠান। কিন্তু আমাদের মূল কথা হল ভগবান যদি কৃপা করেন তাতেও আমার মুক্তি হবে আর যদি ভগবানের হাতে মারাও যাই তাতেও আমার

মুক্তি হবে, এখানে অবশ্য যোনি মুক্তির কথা বলা হচ্ছে। এখানে এক ধাপ এগিয়ে দেওয়া হয়েছে, মা তো একটি হুঙ্কারে বা দৃষ্টিপাত মাত্রেই সব কটা অসুরকে নিমেষে শেষ করে দিতে পারতেন। মা তা করছেন না, তিনি যখন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, যুদ্ধ করতে গিয়ে তাঁর অস্ত্র দিয়ে যে তিনি অসুরদের স্পর্শ করছেন তাতেই এরা সবাই এবার স্বর্গে যাবে। এর আগের মন্ত্রে বলা হয়েছিল মা হলেন *সর্বোপকারকরণায়*, জগতের সবার উপকার করেন, অসুর যারা তাদেরও তিনি উপকার করছেন। উপকার করতে চাইছেন বলে মা চাইছেন না যে অসুররা সব নরকে যাক। এদেরও নিজস্ব শক্তি আছে আর তার সঙ্গে তারা মায়ের দর্শন লাভ করেছে। মায়ের দর্শন পেলে তার কি কখন আর নরকে গতি হতে পারে! সেইজন্য মা ইচ্ছামাত্র অসুরদের নাশ না করে নিজের শস্ত্র দিয়ে তাদের বধ করছেন। মুক্তি অনেক রকমেরই হয়, যোনি মুক্তিও এক রকম মুক্তি। এদের সব যোনি মুক্তি হবে, সেইজন্য বলছেন সবাই স্বর্গে যাবে। স্বর্গে থেকে ফেরার পর যেমন ছিল সেখান থেকেই আবার শুরু করবে।

দৃষ্টৈব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতাঃ
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতিসাধ্বী।।১৯

এর আগে বলা হয়েছিল, মা যদি একবার কুপিত নয়নে অসুরদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তাতেই সব অসুর ভস্ম হয়ে যাবে। ভস্ম হয়ে গেলে তো আর স্বর্গে যেতে পারবে না। ভস্ম হয়ে যাওয়াকে একটা অভিশাপ বলা হয়। সেইজন্য আপনি আপনার দিব্য শস্ত্র দিয়ে প্রহার করেন। মায়ের শস্ত্র প্রহারেও যদি মৃত্যু হয়, সেটাও গঙ্গাবারি সিঞ্চন করে দেওয়ার মত মুক্তি। মা সবারই উপকার করেন, কারণ তিনিই জগতপ্রসবিনী। ভগবান জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করা যে কত কঠিন কাজ যিনি সৃষ্টি করেন তিনিই জানেন। সেই সৃষ্টি রক্ষা করে পালন করা আরও কঠিন কাজ। জগতে তিনটে গুণের খেলা চলছে, তার উপর আবার তন্মাত্রারা আছে, সেই তন্মাত্রাগুলিও এক অপরের সাথে খেলা করে চলেছে, কখন যে কি হয়ে যাবে কিছুই করার থাকে না। কিন্তু তাতেও যদি দেখা যায় কেউ বেশি শক্তি অর্জন করে ফেলে, যার জন্য সৃষ্টির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ভগবান তখন নিজে এসে ঠিক করে দেন। যখন দেখা গেল অসুরদের শক্তি অনেক বেড়ে গেছে, তখন তিনি দু-চারটে অসুরকে মেরে দেন। আর যদি কোন সাধু সন্ন্যাসী ঠিক ভাবে সাধনা না করেই বেশি শক্তি অর্জন করে নিয়েছেন তখন তিনি দেবতাদের দিয়ে কয়েকটা অপ্সরাকে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর ক্ষমতাটা নাশ করে দেন। ভগবান সব সময় নিরপেক্ষ, তিনি যে একে ভালো করছেন, তাকে খারাপ করছেন তা নয়, তিনি নিরপেক্ষ। সবারই প্রতি তাঁর করুণার ভাব। অসুরদের নিধন যে তিনি কাম-ক্রোধের বশবর্তী হয়ে করেছেন, তা নয়। মা যখন নিজের সন্তানকে মারেন তাতে কোন ক্রোধ থাকে না। ঠিক তেমনি জগজ্জননী বা ভগবান যখন কোন জাতি বা কাউকে দণ্ড দিচ্ছেন তাতে তাঁর কোন ক্রোধ নেই। শুধু তাই না, এমন ভাবে নিজের শস্ত্র দিয়ে প্রহার করছেন, যার ফলে তাঁর স্পর্শ পেয়ে সবাই স্বর্গে চলে যেতে পারে। এটাকেই আবার খুব কাব্যিক দৃষ্টিতে বলছে –

খড়্গপ্রভানিকরবিস্ফুরণৈস্তথোগ্রৈঃ
শূলাগ্রকান্তিনিবহেন দৃশোঽসুরাণাম্।
যন্নাগতা বিলয়মংশুমদিন্দুখণ্ড-
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ।।২০

দেবতারা বলছে, মা! আপনি যখন আপনার খড়্গ আর শূল অসুরদের উপর নিক্ষেপ করছিলেন, তখন খড়্গ আর ত্রিশুলের অগ্রভাগ তেজের প্রভাবে জ্বলজ্বল করছিল, ওই ঘনিভূত তেজঃপুঞ্জের দিকে তাকালেই চোখ ঝলসে যাবে। মায়ের অস্ত্র তো আর আমাদের মত সাধারণ কোন অস্ত্র নয়, এগুলো দেবতাদের দেওয়া সব দিব্য অস্ত্র। দেবতারা বলছেন, আপনার অস্ত্রের যে তীব্র জ্যোতির্ময় আলোরাশি তাতে তো অসুরদের চোখ ঝলসে গিয়ে অন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। অসুররা যে অন্ধ হয়ে যায়নি এটাই আশ্চর্যের। তাহলে কেন অসুরদের চোখ অন্ধ হয়নি? কারণ অসুররা তখন আপনার সুমনোহর মুখমণ্ডলে চন্দ্রিমার স্নিগ্ধ আলোকে দর্শন করছিল। একদিকে আপনার অস্ত্রের তেজঃপুঞ্জের জ্যোতি চোখকে ঝলসে দিচ্ছে, অন্য দিকে আপনার চেহারায় এতই সুমনোহর দিব্য সৌম্য

ভাব বিরাজ করছিল যে, সেই সৌম্য রূপের দিকে অবলোকন করার জন্য অসুরদের চোখকে শান্তি দিচ্ছিল, সেইজন্যই অসুররা অন্ধ হয়ে যায়নি।

দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া তয়েত্থম্।।২১

হে দেবী! আপনার ব্যবহারে যে শীল, এই শীলতা হল দুরাচারীদের দুর্ব্যবহারকে দূর করার জন্য, আপনার শীল দুরাচারীদেরও পথে নিয়ে আসে। আর আপনার যে রূপ এই রূপের চিন্তন করা যায় না। কারণ আমাদের মন বা বুদ্ধি হল এক সের ঘটি, তাতে পাঁচ সের দুধ কী করে ধরবে! মন বা বুদ্ধির পেছনে যে শক্তি আছে সেই শক্তিকে কখন চিন্তন করতে পারা যায় না। দেবতারা তাই বলছেন আপনার যে রূপ সেটাকে কখন চিন্তন করা যাবে না, আপনার এই অচিন্ত্য রূপের কোন কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। *বীর্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং*, আর আপনার যে শক্তি, সেই শক্তিও এমন যে, এই অসুরদের এমনই ক্ষমতা ও শক্তি যে তারা দেবতাদের পরাজিত করে সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল, সেই আসুরিক শক্তিকে আপনার শক্তি ক্ষণিকের মধ্যে নাশ করে দিল। প্রথম কথা হল মায়ের শক্তি আর শীল দুরাচারীদের নিয়ন্ত্রণে রাখছে, মায়ের যে রূপ সেই রূপের চিন্তন করা যায় না আর কোন কিছুর সঙ্গে তুলনাও করা যায় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণে ধারণা করা যাচ্ছে, যেটাকে ধারণা করা যাবে না সেটাক উপমান প্রমাণের সাহায্যে ধারণা করাতে হয়, যেমন যে বাঘ দেখেনি তাকে বেড়ালের উপমা দিয়ে বাঘের সম্বন্ধে ধারণা করান যায়। মায়ের রূপ চিন্তন করা যাবে না ঠিকই, কিন্তু উপমা দিয়ে কি জানা যাবে? না, কোন কিছুর সঙ্গে তুলনা করেও জানা যাবে না। অথচ আপনার ক্ষমতা হল, যে দেবতারা এই জগতে সব থেকে শক্তিমান, তাদেরও যারা পরাস্ত করেছিল, সেই অসুরদেরও আপনি মুহূর্তের মধ্যে নাশ করে দিলেন। সেটাই আরও বিস্তার করে বলছেন –

কেনোপমা ভবতু তেহস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েহপি।।২২

যিনি শত্রুদের এত ভয় দেখাচ্ছেন, যাঁর ভয়ে শত্রুরা কাঁপছে, তার সাথে যাঁর এই স্নিগ্ধ মনোহর রূপ, তিনটে লোকে এমন কোন বস্তু নেই যে যার সঙ্গে আপনার এই শৌর্য ও বীর্য আর একই সাথে আপনার এই মনোরম সৌন্দর্যের তুলনা করা যেতে পারে! আবার একাধারে *চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা*, এটাই মায়ের ঠিক ঠিক রূপ। একদিকে মায়ের চিত্ত সবার জন্য সর্বদা কৃপায় পরিপূর্ণ, *সদার্দ্রচিত্তা*, আবার অন্য দিকে *সমরনিষ্ঠুরতা* – যুদ্ধে আপনার নিষ্ঠুরতা। যাঁদের উপর আপনি নিষ্ঠুর হচ্ছেন তাদের উপরেও আপনার কৃপা। গর্ভধারিণী মা সন্তানকে একদিকে অপত্য স্নেহ ভালোবাসা দিচ্ছেন অন্য দিকে আবার অন্যায় করলে কঠোর ভাবে সন্তানকে শাসন করছেন। মা যখন সন্তানকে শাসন করছেন তখনও তার উপর মায়ের ভালোবাসা থাকে। এই ভাবটাই যখন জগজ্জননীর উপর আরোপ করা হয় তখন ব্যাপারটা এভাবেই দাঁড়ায়। মায়ের যে বরাভয় রূপের কথা বলা হয়, মা এক হস্তে বর দিচ্ছেন আবার অন্য হস্তে অভয়ও দেন। আবার অন্য হাতে তাঁর নরমুণ্ড, খড়্গ দিয়ে দুরাচারীদের মুণ্ড কেটে যাচ্ছেন, এটাই মায়ের ঠিক ঠিক রূপ, আর বাস্তবিক এটাই হয়। সমগ্র জগতের প্রতি মায়ের সমান কৃপাদৃষ্টি আবার অন্য দিকে যুদ্ধে তিনি নিষ্ঠুর, এই বৈপরীত্য সমাবেশ একমাত্র জগজ্জনীতেই সম্ভব। সেইজন্য বলছেন *ত্বয্যেব দেবি ভুবনত্রয়েহপি*, ত্রিলোকে একদিকে সবার প্রতি কৃপা অন্য দিকে যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা এই বৈপরীত্য রূপ আপনার ছাড়া আর কারুর মধ্যে দেখা যাবে না।

ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন
ত্রাতং ত্বয়া সমরমুর্ধনি তেঽপি হত্বা।
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত-
মস্মাকমুন্মদসুরারিভবং নমস্তে।।২৩

হে মা! আপনি অসুরদের বিনাশ করে এই ত্রিভুবনকে রক্ষা করেছেন, এই অসুররাও আপনার হাতে নিহত হয়ে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েছে, আর আপনি দেবতাদের শত্রু উন্মত্ত অসুরদের ভয় থেকে আমাদের পরিত্রাণ করেছেন, মা! আপনাকে আমরা প্রণাম করছি।

সমগ্র চণ্ডীই মন্ত্রশক্তির উপর চলছে। আমরা মনে করি যে, আমরা খাওয়া-দাওয়া করছি, ভালোবাসা পাচ্ছি, শরীর চর্চা করছি, কাজকর্ম করছি এতেই আমাদের জীবন চলছে। কিন্তু জীবন আসলে এভাবে চলে না। খাওয়া-দাওয়া, শরীর চর্চা, কাজকর্ম এগুলো আমাদের শরীরকে চালায়। এগুলো ঠিকমত হলেই যে শরীর সব সময় ভালো থাকবে তা নয়। মঠের অনেক সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা খুব কম খাওয়া-দাওয়া করেন কিন্তু তাঁদের ভেতরে এত অফুরন্ত প্রাণশক্তি যে কল্পনাই করা যায় না। সেই ভোর সাড়ে-তিনটের সময় ঘুম থেকে উঠছেন তারপর থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত টানা কাজ করে যাচ্ছেন। দুপুরে যে ঘুমোবেন তাও দেখা যায় না। সবাই যখন দুপুরে ঘুমোচ্ছেন উনি তখন হয়তো কোন বই পড়ে যাচ্ছেন। আমরা মনে করি খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত করলেই শরীর চলবে কিন্তু তা নয়। আমাদের শরীর চলে প্রাণশক্তি দিয়ে। সাধারণ লোক প্রাণশক্তিকে খুব স্থুল স্তরে নিয়ে চলে যান। স্বামীজী বিদেশ থেকে ভারতে ফেরার সময় কায়রোতে কিছুক্ষণের জন্য জাহাজ দাঁড়িয়েছিল। জাহাজ থেকে নেমে স্বামীজী সঙ্গীদের সঙ্গে কায়রো শহরে হাঁটতে হাঁটতে বুঝতেই পারেননি কখন তাঁরা একটা রেডলাইট এরিয়াতে ঢুকে পড়েছেন। মেয়েগুলো সেখানে অর্ধনগ্ন অবস্থায় নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করছে, ঠাট্টা ইয়ার্কি করছে, জোরে জোরে কথা বলছে। স্বামীজীর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন ওনারা তাড়াতাড়ি স্বামীজীকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিলেন। মেয়েগুলোকে দেখে স্বামীজীর মনে একটা তীব্র করুণার ভাব জেগে উঠেছে। তিনি মেয়েগুলির কাছে গেলেন, ওদের দেখে স্বামীজীর চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে। তাঁর সঙ্গীদের বলছেন – দেখো! এরা নিজেদের দিব্য শক্তিকে শরীরের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছে। স্বামীজী এই যে দিব্য শক্তির কথা বলছেন, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু চলে তা চলে একমাত্র এই দিব্য শক্তিতে।

মানুষ মাত্রই কতকগুলি ভাবের সম্মিলিত রূপ, এই ভাবের উপর আধারিত করেই মানুষের জীবন চলে। মানুষের সব থেকে জোরালো ভাব হল, আমরা কেউই নিজেদের শরীর ছাড়া অন্য কিছু মনেই করতে পারি না। গীতাতে ভগবান অর্জুনকে পর পর কয়েকটি মতাদর্শের কথা বলার পর বলছেন, তোমাকে এর মধ্যে যে কোন একটা মতকে তো মানতে হবে। আর যে মতকেই তুমি গ্রহণ করো না কেন কারুর মৃত্যুতে তোমার কখনই শোক করা উচিত হবে ন। হয় আপনি মনে করুন দেহটাই সব, তাহলে যে জন্মেছিল সে মরে গেছে, এতে অস্থির হওয়ার কী আছে! দেহের পেছনে যদি সূক্ষ্ম শরীর আছে মনে করেন তাহলে মরে গেছে আবার জন্মাবে, তাতেও ভাবার কিছু নেই। আর যদি শুদ্ধ আত্মা রূপে দেখেন, বেশির ভাগ লোকরই যেটা দেখার ক্ষমতা নেই, আত্মার জন্ম নেই মৃত্যু নেই। আমরা আত্মার ব্যাপারে যদি নাই যাই তাহলে দুটোর মধ্যে একটা তো হবে, হয় আপনার আত্মা আছে আর তা নাহলে আত্মা বলে কিছু নেই, তৃতীয় কোন সম্ভবনা নেই। যদি আত্মা না থাকে, তাহলে মরে গেলে তো ভালোই হল, কষ্ট থেকে রেহাই পেয়ে গেলেন। কিন্তু এই মতেও আমাদের দৃঢ়তা নেই। আর তা নাহলে ভেতরে একটা সূক্ষ্ম শরীর আছে, মরে গেলে সেই সূক্ষ্ম শরীর আবার কোথাও জন্ম নেবে। মরে গেলে এতো দুঃখ করার কী আছে! আপনার এখানে কিছু অনুভব হওয়ার কথা ছিল সেটা হল না ঠিকই। কিন্তু মৃত্যুর পর আপনি স্বর্গেই যান, নরকেই যান আবার তো আপনি ফিরে আসবেন, এবং আবার সুযোগও পাবেন, তার জন্য এখন থেকে ভেবে ভেবে মাথা খারাপ করার কী আছে! অল্প বয়সে সন্তান মারা গেলে মায়ের কষ্ট হওয়াটা স্বাভাবিক, কারণ সন্তান মায়ের অঙ্গ, অঙ্গ নাশ হলে কষ্ট হবেই। ভারতে কোন কালেই মৃত্যুকে কোন মূল্য দেওয়া হয়নি, কিন্তু ইদানিং কালে সবাই উঠে পড়ে শুধু শরীরের যত্ন নেওয়ার জন্য কত কিছু করে যাচ্ছে আর তার সাথে মৃত্যুকে বেশি বেশি গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়েছে, যত মৃত্যুকে পিছিয়ে দিতে পারা যায়, তার চেষ্টাই সবাই করে যাচ্ছে।

আমি কি? আমি হলাম আমি যে ভাবকে নিয়ে আছি সেটাই আমি। আমরা সবাই হলাম three dimensional representation of an idea or a bundle of ideas। চিত্রকার ক্রোধের ভাব ফুটিয়ে তোলার জন্য এক রকম ছবি আঁকবেন, ভালোবাসার ভাব প্রকাশ করার জন্য অন্য রকম ছবি আঁকবেন। ঘৃণা, ক্রোধ, ভালোবাসা, এগুলো এক একটা আইডিয়া, এই আইডিয়াকে ছবিতে ফুটিয়ে তুলছে। ওই ভাবকেই যখন three dimensionalএ নিয়ে আসা হয় তখন সেটাই একটা মুর্তি হয়ে যাবে। এটাই যখন living three dimensional হয়ে যাবে তখন সেটাই আমি আপনি হয়ে যাব। এই যে প্রাণশক্তি, যে শক্তি দিয়ে আমি আপনি তৈরী হয়েছি, শুধু তৈরী হইনি, এটাই আমি। যখন এই শক্তিকে শরীরের প্রতি বেশি প্রবাহিত করছি তখন আমি নিজেকে degrade করে দিচ্ছি। যখন এই শক্তিকেই বুদ্ধির বিকাশে, চিন্তার ক্ষেত্রে নিয়ে যাচ্ছি তখন আমিই একজন বড় নামকরা কোন ব্যক্তিত্ব হয়ে যাচ্ছি। যিনি এই শক্তিকে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ঢেলে দিচ্ছেন, জগতের সবাই তখন তাঁকেই পূজা করছে। প্রাণশক্তি মোটামুটি এই তিনটে স্তরেই চলে, জাগতিক স্তরে, শারীরিক স্তরে আর সংস্কৃতির স্তরে, যেখানে বিদ্যাচর্চা, সংস্কৃতির চর্চা হচ্ছে আর তা নাহলে আধ্যাত্মিক স্তরে। যারা সংস্কৃতির স্তরে এসে গেছে তারা অনেক উচ্চস্তরের।

আমি আপনি সবাই এক একটা Psychic Force। এই Psychic Forceএর ব্যাপারটা যখন আমরা বুঝতে পারব, মন্ত্রশক্তির ক্ষমতাটাও তখন বুঝতে পারব। বেশির ভাগ মানুষ যে ইষ্টমন্ত্র জপ করছে, গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছে, সবাই যন্ত্রের মত জপ করে যাচ্ছে, আমাদের জপটাই যান্ত্রিক হয়ে যায়। মন্ত্রের শক্তি সব সময় সূক্ষ্ম জিনিষের উপর কাজ করবে। ইলেক্ট্রিক্যাল সিগনাল দেওয়ালে দিলে কিছুই হবে না, অথচ মঙ্গল গ্রহে যে মঙ্গলযান পাঠানো হচ্ছে এখান থেকে ইলেক্ট্রনিক সিগনাল দিয়ে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। মূল কথা জিনিষটাকে সূক্ষ্ম হতে হবে। আমার নিজের ব্যাপারে যে প্রাথমিক ধারণা, এই ধারণা যতক্ষণ সূক্ষ্ম স্তরে না যাবে ততক্ষণ মন্ত্রশক্তি কাজ করতে পারবে না। মন্ত্রের ভাবটাই বা আপনি বুঝবেন কোথা থেকে! তাই যন্ত্রের মত আমরা ঠাকুরের কাছে যাচ্ছি, মাথা ঠুকে ঠুকে বলছি ঠাকুর রক্ষা কর, এইভাবে কোন দিন ঠাকুর রক্ষা করবেন না। কারণ আমরা মনে করছি আমরা হলাম একটা স্থুল শরীর, আমাদের বাবা, মা, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান এদের আমরা সব থেকে গুরুত্ব দিচ্ছি। ভগবান কী করে আমাদের কৃপা করবেন, কৃপা যে করবেন সেই সূক্ষ্ম ভাব কি আমাদের আছে? যখন আমরা ঠিক ঠিক বুঝতে শুরু করব যে আমরা হলাম psychic bodies, তখন মন্ত্রশক্তি কাজ করতে শুরু করবে। ঠাকুর রং বীজমন্ত্রে চারিদিকে জল ছিটিয়ে দেখছেন তাঁর চারপাশে একটা অগ্নির বলয় তৈরী হয়ে গেছে, এরপর ওই বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করে কোন অশুভ শক্তি বিঘ্ন তৈরী করতে পারবে না। সব পূজারীরাই রং মন্ত্র দিয়ে জল ছিটিয়ে পূজো করতে বসছেন, কই তাঁরা তো অগ্নির বলয় তৈরী হতে দেখছেন না। কারণ, আমরা সব সময় মেনে চলছি যে আমরা হলাম স্থুল শরীর, আমাদের আচার, ব্যবহার, খাওয়া-দাওয়া সবটাই এই স্থুল শরীরকে কেন্দ্র করে।

ঠাকুর সাধুসঙ্গের কথা বার বার বলছেন। কেন বলছেন? কারণ সাধুসঙ্গের প্রভাবে শরীরের প্রতি প্রীতি ভাবটা কমতে থাকে। শরীরের প্রতি প্রীতিটা কমতে থাকলে আমাদের যে বাস্তবিকতা, আমাদের যে Psychic Force আছে, সেটা আস্তে আস্তে খুলতে শুরু করে। তখন আমরা যে প্রার্থনা করব, ইষ্টমন্ত্র জপ করব, তখনই এগুলো ঠিক ঠিক কাজ করতে শুরু করবে। প্রাণশক্তিই হোক আর যে শক্তিই হোক, শক্তি মানে শক্তিই। ইলেক্ট্রিক সিগন্যাল দিয়ে যে কোন ওয়েভকেই কাউন্টার করা যায়। ঠিক তেমনি, এখন আমরা হলাম এক ধরণের Psychic Force, অসুররা হল অন্য ধরণের Psychic Force। এই Psychic Forceএর মধ্যে যখন লড়াই চলে, তখন এই মন্ত্র, পূজো-পাঠ ঠিক ঠিক কাজ করে। এর পরের যে চারটি মন্ত্র আসছে এই মন্ত্রগুলো হল ঠিক ঠিক Psychic মন্ত্র। যদিও পুরো চণ্ডীটাই মন্ত্রশক্তি। যাদের সব সময় অনেক রকম আপদ-বিপদ লেগে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে এই চারটি মন্ত্র কবচের মত কাজ করে। এই চারটি মন্ত্রকে পাঠ করতে করতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো শরীর স্পর্শ করে দিলে এই মন্ত্রই কবচের মত কাজ করবে। এটা নিজের উপরে বা অপরের উপরেও করা যেতে পারে। এর প্রত্যেকটিই একেবারে সিদ্ধমন্ত্র। এই চারটে মন্ত্র হল রক্ষাকবচ।

কিন্তু আমি মনে করছি আমি এই দেহ, দেহবোধের থেকে একটু উপরে নিয়ে গেলে মনে করছি আমি হলাম মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। দেহ-মন বোধের মধ্যে পড়ে থাকলে এই ধরণের মন্ত্রের শক্তি ঠিক ঠিক কাজ করবে

না। মায়েরা সন্তানকে ভালোবাসে, সন্তানের মঙ্গলের জন্য মায়েরা সন্তানের গলায় তাবিজ, মাদুলি ঝুলিয়ে দিচ্ছে, মঙ্গলের জন্য অনেক কিছুই করেন। কিন্তু যিনি জানেন ও বোঝেন যে আমি হলাম আমার ভেতরে যে Psychic Force আছে আমি তারই মুর্তরূপ, তখন এই মন্ত্রশক্তি প্রচণ্ড ভাবে কাজ করবে। যাঁরা অবতার পুরুষ, সচ্চিদানন্দই যাঁদের কাছে সব, তাঁদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, যেমন দক্ষিণেশ্বরে রাজা মহারাজের শরীর প্রচণ্ড খারাপ হয়েছে। ঠাকুর খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন। ঠাকুর রাখালকে বলছেন 'এই নে জগন্নাথের আটকে প্রসাদ খা'। জগন্নাথের আটকে প্রসাদের সঙ্গে শরীর ভালো হওয়ার কী সম্পর্ক আছে যে, ঠাকুর রাখালকে খেতে বলছেন! কিছু দিন আগে কেমেস্ট্রির প্রফেসার সি এন আর রাওকে ভারতরত্নম দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ধর্মকে খুব বেশি মান্যতা দেয় বলে প্রফেসার রাও আপত্তি করে এক জায়গায় কিছু কথা বলেছেন। যেমন, রকেট লঞ্চ করার আগে বিজ্ঞানীরা তিরুপতি মন্দিরে গিয়ে পুজো দিচ্ছে কেন? কেমেস্ট্রির উপর কাজ করে করে ওনার কাছে এখন সবটাই কেমিক্যাল রিএকশান। প্রফেসর রাওএর মত বিজ্ঞানীরা মনে করেন মস্তিষ্কে যে কেমিক্যাল রিএকশান হচ্ছে সেটাই আপনি। একা প্রফেসার রাও নয়, ওনার মত অনেক বিজ্ঞানীও মনে করেন আমাদের সবটাই ব্রেণ কেমিক্যালস, যার জন্য এই ধরণের কিছু হলে অমুক ওষুধ দিলে সঠিক নিরাময় হয়ে যায়। ধর্মও ঠিক তাই, যখন ব্রেণে এক ধরণের কেমিক্যাল রিলিজ হয় তখন এই ধরণের কিছু অনুভূতি আসে, সেটাই ধর্ম। এদেরকে তখন বলতে হয়, সবই যদি কেমিক্যাল রিএকশান হয় তাহলে স্ত্রীকে, সন্তানকে ভালোবাসার কি দরকার, এত এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করারই বা কি দরকার। সমস্যা হল, যখন যুক্তি টানতে টানতে একটা জায়গায় গিয়ে যখন নিজেদের যুক্তির বাঁধনকে পেরিয়ে যেতে হবে, সেই জায়গায় গিয়ে নিজেরা আটকে ওখানেই থেকে যায়। তখন এদের যত রকম ধাক্কা আছে সব সূক্ষ্ম জিনিষে গিয়ে পড়ে। গ্রামের কোন মজুরকে যদি আপনি কালিদাসের কবিতা পাঠ করে শোনাতে চান, সে বেচারী কি বুঝবে! আমাদের অবস্থাও ঠিক তাই। আমরা আমাদের ব্রেণের নিউরোনগুলোর মধ্যে এত আবদ্ধ হয়ে আছি যে আমাদের আসল আমিটাকে বোধ করতে পারছি না। এটা ঠিক যে, আমাদের শরীর আছে এই শরীরের কোন ধর্মই অস্বীকার করা যায় না। শরীরের পেছনে যে মন বুদ্ধি আছে সেটাকেও কেউ না করছে না। কিন্তু এই পাখা চলছে, এর পেছন বিদ্যুৎএর শক্তি আছে বলে চলছে, পাখাটা এখানে স্থুল, বিদ্যুৎ সূক্ষ্ম। দুটোরই দরকার আছে, কিন্তু বিদ্যুতের গুরুত্ব সবার থেকে বেশি।

যাঁরা সাধনা করেন তাঁরা জানেন যখন আপদ-বিপদ হয়, যেখানে শত্রুর দ্বারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমার উপর আঘাত আসার সম্ভবনা আছে তখন এই চারটি মন্ত্র রক্ষা করবে। কিন্তু কোথায় রক্ষা করবে? Psychic level এ রক্ষা করবে। দুষ্ট লোকেরও একটা ক্ষমতা আছে, অশুভ শক্তিও শক্তি, সেই শক্তিও প্রভাব বিস্তার করবে। এই চারটি মন্ত্র জপ করা মানে সব কিছু দিয়ে রক্ষাকবচ করে নিয়ে নেওয়া হল। এরপরেও যদি আঘাত আসে, তার মানে বুঝে গেলেন এবার আপনার কিছু করার নেই। যাঁরা এগুলোকে একটু গভীরে জানেন ও বোঝেন, তাঁরা এই ধরণের মন্ত্রের দ্বারা দৈবী শক্তিকে আহ্বাণ করে নিয়ে আসেন। আর আমাদের নিজেদের তরফ থেকে যা কিছু করার সবটাই করব এবং করতেও হবে। দেবতারাও তো লড়াই করছেন, তিনি তো দেবতাদেরও দেবী, দেবতারা তো কথায় কথায় দেবীকে আহ্বাণ করে আনছেন না। এগুলো করলে আমাদের শক্তিটা একটু বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু শক্তি আপনাকেই রাখতে হবে। এই চারটি মন্ত্র হল –

শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ।।২৪

মায়ের যে মূল কয়েকটি দিব্যাস্ত্র ও আভরণ রয়েছে সেগুলোকে উল্লেখ করে বলছেন, এগুলোর সাহায্যে মা যেন আমাদের রক্ষা করেন। রক্ষা কর বললেই তো তিনি রক্ষা করবেন, কিন্তু কি দিয়ে, কিসের সাহায্যে, কীভাবে রক্ষা করবেন সেটা তাঁর ব্যাপার। আসলে মন্ত্রকে একটু দীর্ঘায়িত করে দেওয়া হচ্ছে যাতে আমরা বেশি সময় ধরে মায়ের স্তব করতে পারি। যাতে মন্ত্রোচ্চারণের সময়ের মধ্যে পুরো শরীরকে স্পর্শ করে নিতে পারা যায়। দ্বিতীয়ত যখন মন্ত্রের পাঠ করা হচ্ছে তখন মন্ত্রের পটভূমিকে চোখের সামনে দৃশ্য রূপে দেখার সুবিধার জন্য এভাবে বর্ণনা করা হয়। হে অম্বিকে! তোমার হস্তে যে শূল আছ, যে খড়্গা আছে, সেই শূল ও খড়্গা দিয়ে আমাকে রক্ষা কর। আগেকার দিনে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শব্দের সাহায্যে বিভিন্ন সঙ্কেত পাঠাবার জন্য ঢাক, ভেরি, শঙ্খ, ঘণ্টা এই ধরণের কিছু

বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করা হত। এই বাদ্যযন্ত্রের শব্দের সাহায্যে সৈন্যদের সঙ্কেত দেওয়া হত তোমাদের এখন এগোতে হবে বা পিছোতে হবে। ঘণ্টার ধ্বণিকে এইভাবে কাজে লাগান হত। হাতীর গলাতেও ঘণ্টা ঝোলান থাকত, ঘণ্টার আওয়াজেই সবাই বুঝে যেত যে হাতী আসছে, আমাদের এখন সরে যেতে হবে। মায়ের হাতেও ঘণ্টা, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর ঐরাবতের গলা থেকে এই ঘণ্টা মাকে দিয়েছিলেন। বলছেন এই ঘণ্টাধ্বণি ও ধনুকের টঙ্কার দিয়ে আপনি আমাদের রক্ষা করুন। দেবী একদিক থেকে নয়, চারিদিক থেকে যেন তিনি আমাদের রক্ষা করেন তাই বলছেন –

প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য চোত্তরস্যাং তথেশ্বরি।।২৫

হে চণ্ডিকে! আপনি আমাদের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক রক্ষা করুন। হে ঈশ্বরী! ত্রিশূলকে সঞ্চালন করে আপনি আমাদের উত্তর দিক রক্ষা করুন। আসলে বলতে চাইছেন পূব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ কোন দিক থেকেই যেন আমাদের কোন বিপদ না আসে।

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যন্তঘোরাণী তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্।।২৬

কয়েক অধ্যায়ের পরে চণ্ডীতে বর্ণনা আসবে, মা যখন কোন কাজ করতে চান তখন সেই কাজ করার জন্য মায়েরই শরীর থেকে বিভিন্ন শক্তি বেরিয়ে আসে। এর আগেও দেখানো হয়েছে ভগবান বিষ্ণু যখন যোগনিদ্রায় ছিলেন তখন তাঁর কানের মল থেকে মধু আর কৈটভ নামে দুই দৈত্য বেরিয়ে এসেছিল। পুরাণে তো এই ধরণের ভুরি ভুরি বর্ণনা পাওয়া যায়। রামায়ণেও বর্ণনা আছে যে ব্রহ্মা একবার হাই তুললেন তখন সেই হাই থেকে জাম্বুবান জন্ম নিলেন। এনারা দিব্য সত্তা কিনা, ফলে তাঁদের শরীরের খুব সাধারণ কাজকর্ম থেকেও কোন শক্তি জন্ম নিয়ে নেয়। শুভ শক্তি আর অশুভ শক্তি সবটাই তো মায়েরই শক্তি। ওই শক্তিগুলিকে যদি কোন সাকার বা মূর্তরূপ দেওয়া হয় তখন স্বাভাবিক ভাবেই নানা রকমের রূপ পরিগ্রহ হতে দেখা যাবে। এর পরের অধ্যায়েই আসবে কীভাবে মায়েরই শরীর থেকে একটা সুন্দর রূপ বেরিয়ে এসেছে, সুন্দর রূপ বেরিয়ে আসার জন্য মায়ের শরীরের রঙটা কালো রূপ হয়ে গেল। ত্রিলোকে মায়ের অনেক রকম রূপ আছে, তার মধ্যে কিছু রূপ অত্যন্ত সৌম্য রূপ আবার অনেকগুলো রূপ অত্যন্ত ঘোরা ভয়ঙ্করা রূপা। বলছেন মায়ের সৌম্য রূপ আর অত্যন্ত ঘোরা ভয়ঙ্কর রূপ, এঁরা সবাই মিলে যেন আমাদের রক্ষা করেন। সৌম্য রূপও আমাদের রক্ষা করুন আর ঘোরা রূপাও আমাদের রক্ষা করুন।

খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্বতঃ।।২৭

মায়ের কাছে নানা রকমের দিব্যাস্ত্র আছে, খড়্গ, শূল, গদা ইত্যাদি, এগুলো মায়ের করপল্লবে শোভিত হয়ে আছে। বলছেন, হে অম্বিকে! আপনার করপল্লবে যে সকল অস্ত্র আছে, সেই সব অস্ত্র দিয়ে আপনি সর্ব দিক থেকে আমাদের রক্ষা করুন। এখানে আবার কিন্তু মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এই মন্ত্রগুলোকে যখনই আমরা শাব্দিক ভাবে দেখতে যাব তখন এগুলো কবিতা ছাড়া কিছুই মনে হবে না। কিন্তু যেমনি আমরা মন্ত্রবিদ্যা রূপে দেখব তখন এর প্রত্যেকটি শব্দ একটা আলাদা শক্তি হয়ে কাজ করতে শুরু করে দেবে। শুধু এই চারটি মন্ত্রই নয়, চণ্ডীর প্রত্যেকটি শ্লোকই মন্ত্র, প্রত্যেকটি মন্ত্রের আলাদা শক্তি আছে। চণ্ডীর যজ্ঞ যখন হয় তখন প্রত্যেকটি মন্ত্রকে পাঠ করেই আহুতি দেওয়া হয়।

চণ্ডীর কাহিনী এসেছে মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে, আর মার্কণ্ডেয় ঋষিই এই কাহিনী বলছেন। সেই কাহিনীতে আবার সুরথ রাজা আর সমাধি বৈশ্য দুজন মিলে এক ঋষির কাছে গিয়ে মহামায়ার ব্যাপারে জানতে চাইলেন। তখন ঋষি তাদের সব বলতে শুরু করলেন। দেবতারা স্তব করলেন, স্তব করার পর সেই ঋষি আবার বলছেন –

ঋষিরুবাচ।।২৮
এবং স্তুতা সুরৈর্দিব্যৈঃ কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ
অর্চিতা জগতাং ধাত্রী তথা গন্ধানুলেপনৈঃ।।২৯
ভক্ত্যা সমস্তৈস্ত্রিদশৈর্দিব্যৈর্ধূপৈঃ সুধূপিতা।
প্রাহ প্রসাদসুমুখী সমস্তান্ প্রণতান্ সুরান্।।৩০
দেব্যুবাচ।।৩১
ব্রিয়তাং ত্রিদশাঃ সর্বে যদস্মত্তোহভিবাঞ্ছিতম্।।৩২

এইভাবে জগতের মা দুর্গাকে দেবতারা মিলে স্তব করলেন এবং স্বর্গের নানা রকম দিব্য পুষ্প আর গন্ধচন্দনাদি দিয়ে মাকে পূজা করলেন। এরপর যখন সকলে মিলে ভক্তি সহকারে সব কিছু মায়ের চরণকমলে নিবেদন করে প্রণাম করলেন তখন দেবী অত্যন্ত প্রসন্না বদনে প্রণামরত দেবতাদের উদ্দেশ্যে বললেন 'তোমরা সবাই আমার কাছ থেকে কি বরপ্রাপ্তির অভিলাষ করছ আমাকে বল'। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, মায়ের যে শক্তি, এই শক্তি সব সময় সমস্ত রকমের পক্ষপাতশূন্য, মায়ের শক্তি কাউকে কখন পক্ষপাত করে না। ভগবান কখনই দেবতাদের পক্ষপাত করেন না। কিন্তু যাঁরা স্তুতি করলেন, তার মানে যাঁরা আত্মশক্তির দিকে গেলেন তাঁদের মধ্যে এই শক্তি প্রকাশিত হয়ে যাবে। অসুর মানে অসু অর্থাৎ প্রাণশক্তির উপর যারা বেশি নির্ভর করে আছে, প্রাণশক্তি মানে পুরো এ্যাণার্জির উপর দিয়েই চলে, সে যে কোন form of energy হতে পারে। দেবতারাও এ্যাণার্জির সাহায্যে অর্থাৎ তাঁদের যে ইন্দ্রিয় আছে তাই দিয়েই কাজ করেন। কিন্তু দেবতাদের প্রধান বল হল দিব্য, দিব্য মানে আত্মশক্তি বা আত্মজ্যোতি। দেবতাদের শক্তির প্রধান উৎসই হল এই আত্মজ্যোতি। প্রাণশক্তি যে কোন সময়ই সব থেকে ক্ষমতাসম্পন্ন। এর ভালো উপমা হল – ট্রেন লাইন দিয়ে একটা ট্রেন যাচ্ছে, ট্রেন লাইনের পাশেই একটা ছোট্ট পিঁপড়ে আছে। প্রাণশক্তি হল একটা চলন্ত ট্রেন আর দেবতাদের শক্তি হল ওই পিঁপড়ে, তুলনা করে বোঝার জন্য বলা হল। ট্রেনের শক্তি, এ্যারোপ্লেনের শক্তি, বম্বিংএর যে শক্তি, এই শক্তি কোথায় পিঁপড়ে কে উড়িয়ে বাষ্প করে দেবে যে খুঁজেই পাওয়া যাবে না। কিন্তু পিঁপড়ের মধ্যে আলাদা একটা শক্তি আছে, যে শক্তি ট্রেনের মধ্যে নেই। ট্রেন হল উচ্চ কারিগরির এক যান্ত্রিক শক্তি। পিঁপড়ের মধ্যে যে প্রাণ চলছে, ওই প্রাণ সেই সর্বব্যাপী চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে আর ওই চৈতন্যের দ্বারাই সে পরিচালিত হচ্ছে। পিঁপড়ে একটা ট্রেনকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য লাইন থেকে নেমে আসার ক্ষমতা রাখে।

কিন্তু চৈতন্য শক্তি দিয়ে যারা চালিত হয়, আপাত ভাবে তারা সব সময় মার খাবে। ভারতবর্ষ চিরদিন চৈতন্য শক্তির উপর নির্ভর করে চলেছে। যার ফলে বাইরে থেকে শক্তিগুলো আদিম কাল ভারতের উপর আক্রমণ চালিয়ে আসছে, ভারতকে পিষে দিয়ে চলে যাচ্ছে, নয়তো এখানেই রাজা হয়ে বসে যাচ্ছে। কিন্তু চৈতন্য শক্তিকে আধার করে চলছে বলে ভারত আবার ঠিক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। একটা ঘাসের মধ্যেও সেই চৈতন্য শক্তি বিরাজ করছে। রাস্তার ধারে কত রকমের যানবাহন পিষে দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু একটু জল পেলে আবার ঘাস চাঙ্গা হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। চৈতন্যের শক্তির ধরণটাই পুরো আলাদা। দেবতাদের যে জীবন চলছে বা আমাদের যে জীবন চলে, সাধারণ অবস্থায় আমরা সবাই প্রাণশক্তিতেই চলি। সাধারণ অবস্থায় আমরা সবাই অসুর। কিন্তু যাদের মধ্যে প্রাণশক্তি বেশি, তারা যখন মাথার উপর চড়ে বসে তখন দেবতারা সেই সময় যখন আত্মশক্তিকে টানতে শুরু করে তখন দেবতারা আবার ক্ষমতাবান হয়ে যায়। অসুররা তখন দেবতাদের নাগাল পায় না, কারণ তারা কখনই আত্মশক্তি থেকে নিজেদের শক্তির যোগান নেবে না। ওরা সব সময়ই প্রাণশক্তির উপর জোর দিয়ে রেখেছে। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ডের মত পাশ্চাত্য দেশগুলি প্রাণশক্তির উপরই নির্ভর করে আছে। যত কারিগরি বিদ্যা, বিজ্ঞানের অগ্রগতি সব সময় ওই দেশগুলো থেকে আসতে থাকবে। স্তব স্তুতি করা মানেই, আধ্যাত্মিক শক্তি বা চৈতন্য শক্তির জাগরণ। এই আধ্যাত্মিক শক্তি বা চৈতন্য শক্তির জাগরণের জন্য আপনি নিজের আত্মজ্ঞানকে লাগাতে পারেন, কিংবা পূজা, পাঠ, জপ দিয়ে জাগাতে পারেন অথবা ছোট বড় দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদির দ্বারা জাগাতে পারেন। আমরা তাই সব সময় চেষ্টা করি যাতে এই আত্মশক্তি জাগ্রত হয়। যাঁর মধ্যে আত্মশক্তি একবার যদি জেগে যায়, এরপর তিনি সব কিছুর ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে চাইলে যাবেন।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ব্যাপারে শোনা যায়, কোন অসুখ হলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা আগে বিচার করে দেখেন, এই যে আমার অসুখ হয়েছে, কিছু গোলমাল হয়েছে বলেই কি এই অসুখ হয়েছে, নাকি আমার পূর্বজন্মের কোন কর্মের জন্য হয়েছে। ওনারা বুঝতে পারেন। যেমন আপনি রাস্থা দিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ কোন কিছুতে হোঁচট খেয়ে আপনার পা কেটে গেছে, তখনই একমাত্র এনারা চিকিৎসা করান। কিন্তু যখন বুঝলেন কোন কর্মের খেলার জন্য শরীর খারাপ হয়েছে, তখন তাঁরা কোন চিকিৎসাই করান না। সামান্য হয়ত ব্যাথা কমার জন্য কিছু একটা লাগিয়ে দিলেন, আর বাকিটা আপনা থেকেই সেরে যাবে। এগুলোকে আমাদের পক্ষে বোঝা খুব মুশকিল, বোঝার পর বিশ্বাস করে নিজের জীবনকে সেই ভাবে সংঘটিত করা আরও কঠিন।

তবে আজ কোন খারাপ কাজ করে পরের দিনই আপনি সমস্যায় পড়ে গেলেন, বুঝে নিন আপনার খুব ভাগ্য ভালো যে আপনি বেঁচে গেলেন। আর যদি খারাপ কাজ করার পরেও আপনার সব কিছু ঠিকমত চলছে, তার মানে আপনার এখন অনেক পূণ্য কর্ম চলছে, হয়ত দশ জন্মের পুরনো পূণ্য কর্ম এতদিনে ফলপ্রসু হতে শুরু হয়েছে, আর এখন যে খারাপ কাজ করছেন, এই কর্মের ফল বেরোতে অনেক দিন সময় লাগবে। এরপর যে অশান্তি, কলহ চলতে শুরু করবে তার থেকে মুক্তি পেতে অনেক দিন লাগবে। কারণ আগে আগে এত বাজে কর্ম করা হয়েছে সেগুলো পরিষ্কার হতে অনেক সময় লেগে যাবে। রাজনীতির লোকেরা আজকে যে গোলমাল করছে হয়ত দশ পনের বছর পরে গিয়ে সেই কাজের জন্য ধরা পড়ছে। কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীরা আজকে কোন গোলমাল করলে পরের দিনই ধরা পড়ে যাবে। কারণ সন্ন্যাসীদের কর্ম পরিষ্কার হয়ে রয়েছে, তাঁরা এখন মুক্তির পথে, এই জন্মে না হোক কয়েক জন্ম পরেই তিনি মুক্তি পেয়ে যাবেন। আত্মশক্তিতে চলছেন বলে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে রয়েছে, বাকিরা প্রাণশক্তিতে চলছে।

এই আত্মশক্তির উপর আধার করে যখন আরাধনা করা হয়, তা তিনি জ্ঞানমার্গে সাধনা করে আত্মার ধ্যান করুন বা ভক্তিমার্গে সাধনা করে ঈশ্বরের ধ্যান করুন বা যোগ পথে মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি করুন, যে পথেই যান, তিনি যদি প্রসন্না হয়ে যান সবাই সিদ্ধির অবস্থায় চলে যাবে। কিন্তু আপনি যে পথেই মায়ের প্রসন্নতা লাভের চেষ্টা করুন না কেন, ত্যাগ আর তপস্যা না থাকলে কিছুই হবে না। যিনি যোগ মতে সাধনা করছেন তিনিও ত্যাগ ও তপস্যার দ্বারা মনের এমন একাগ্রতা লাভ করেছেন যে তাঁর অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নেই, ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টি নেই। প্রকৃতি আমাদের সব সময়ই ত্যাগ করাতে বাধ্য করে যাচ্ছে। বেঁচে থাকতে কিছুই ত্যাগ করতে পারছি না, কিন্তু মৃত্যু যখন টেনে নিয়ে চলে যায় তখন সব কিছুই এখানে পড়ে থাকে। জন্মজন্মান্তর ধরে ত্যাগের অনুশীলন করে আসছে কিন্তু এমনই অভ্যেস হয়ে আছে যে, নতুন জন্ম নেওয়ার পর আবার সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছি। সেইজন্যই শক্তি আরাধনা করে মাকে প্রসন্না করতে হয়। যোগ সাধনা করে করে স্বাভাবিক ভাবে মন যাঁদের একাগ্র হয়ে আছে, তাদের ক্ষেত্রেও ওই একই জিনিষ হবে। কী একই জিনিষ হবে? *ব্রীয়তাং ত্রিদশাঃ সর্বে যদস্মত্তোহভিবাঞ্ছিতম্‌*, তোমার যে এই নিষ্ঠা, তা আত্মজ্ঞানের প্রতিই হোক বা চিত্তবৃত্তি নিরোধেই হোক, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতেই হোক কিংবা দেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজাই হোক, মা প্রসন্না হয়ে বলবেন – তোমার কী বর চাই বল।

সাক্ষাৎ জগন্মাতার শ্রীমুখে এই আশ্বাস বাক্য শোনার পর দেবতারা অভিভূত হয়ে গেছেন। কারণ দেবতাদের প্রধাণ উদ্দেশ্য ছিল শত্রু দমন করা, দেবী কর্তৃক সেই শত্রু দমন তখন হয়ে গেছে, মহিষাসুর বধ হয়ে গেছে, মহিষাসুরের বিশাল সৈন্যবাহিনীর নাশ হয়ে গেছে। এরপর দেবীর কাছে দেবতাদের তো আর কিছুই চাওয়ার অবশিষ্ট নেই। বিশেষ কোন দিনে, গঙ্গা স্নান করে শুদ্ধ মনে মন্দিরে গিয়ে খুব মন দিয়ে একাগ্র ভাবে অনেকক্ষণ জপ-ধ্যান করার পর দেখা যায় ঠাকুরের কাছে কিছু চাইতেও ইচ্ছে হয় না। এমনি সময়ে সাধারণ অবস্থায় দৌড়তে দৌড়তে ঠাকুরের কাছে যখন যাচ্ছে তখন চাহিদার লম্বা একটা তালিকা নিয়ে হাজির হয়ে যাচ্ছে। আসলে নিষ্ঠা নিয়ে, একাগ্র ভাবে অনেকক্ষণ জপ-ধ্যান করার পর সাংসারিক ভাবটা তখনকার মত কিছুক্ষণের জন্য উড়ে যায়। দেবতারাও মায়ের স্তুতি করার পর তাঁদেরও মন থেকে জাগতিক ভাবটাই চলে গেছে, সেইজন্য তাঁরা জগন্মাতাকে বলছেন –

দেবা উচুঃ।৩৩
ভগবত্যা কৃতং সর্বং ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে।৩৪
যদয়ং নিহতঃ শত্রুরস্মাকং মহিষাসুরঃ।।

হে দেবী ভগবতী! আপনি আমাদের সব ইচ্ছাই তো পূর্ণ করে দিয়েছেন, আমাদের আর কিছু লাগবে না। আর আপনি আমাদের মহাশত্রু মহিষাসুরের তো বধ করেই দিয়েছেন। এরপর আপনার কাছে আমাদের তো আর কিছু চাওয়ার থাকতে পারে না।

যদি বাপি বরো দেয়স্ত্বয়াস্মাকং মহেশ্বরী।৩৫
সংস্মৃত সংস্মৃত ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ।।
যশ্চ মর্ত্যঃ স্তবৈরেভিস্ত্বাং স্তোষ্যতমলাননে।৩৬
তস্য বিত্তর্দ্ধিবিভবৈর্ধনদারাদিসম্পদাম্।
বৃদ্ধেয়হস্মৎপ্রসন্না ত্বং ভবেথাঃ সর্বদাম্বিকে।।৩৭

যদি আপনি আমাদের একান্তই কোন বর দিতে ইচ্ছে করেন তাহলে এই বর দিন, যখনই আমরা আপনার স্মরণ করব, তখনই আপনি যেন আমাদের সামনে আবির্ভূতা হয়ে আমাদের মহা আপদ থেকে পরিত্রাণ করবেন। তাই না, হে অম্বিকে! মর্ত্যলোকে কোন মানুষ যদি আপনার স্তুতি করে তাহলে তখনও আপনি যেন তাদের যার যা কষ্ট আছে সেই কষ্ট থেকে পরিত্রাণ করে সর্বদা তাদের শ্রী বৃদ্ধি করে দেবেন।

আমাদের শাস্ত্রের একটা সমস্যা হল, শাস্ত্রের কোন জায়গাতে অর্থবাদ করা হচ্ছে, অর্থবাদ মানে বিদ্যার স্তুতি, আর কোন জায়গাতে সত্য লুকিয়ে আছে, সেই জায়গাটা ধরা মুশকিল হয়ে যায়। তবে আমাদের পরম্পরাতে প্রথম থেকে সারা দেশেই প্রচলিত হয়ে আছে যে, যখনই দুঃখ-কষ্ট হয় তখন চণ্ডী পাঠ করলে দুঃখ-কষ্টগুলি কেটে যায়। অনেক সন্ন্যাসীদেরও নিয়মিত চণ্ডী পাঠ করতে দেখা যায়। বলা হয় চণ্ডী পাঠে অনেক যোগসিদ্ধি হয়। গীতার ব্যাপারে এই ধরণের কিছু অর্থবাদ শোনা যায় না, তবে বলা হয় গীতা নিয়মিত পাঠ করলে আত্মজ্ঞানের প্রতি রুচি আসে। কিন্তু যদি যোগসিদ্ধি পেতে হয়, টাকা-পয়সা, মান-যশ চাই, শত্রু দমন করতে হবে এসবের জন্য নিয়মিত চণ্ডী পাঠ খুবই ফলপ্রদক। তবে এই মন্ত্রগুলো যেখানে আছে সেখানেই এই ধরণের অর্থবাদ করা হয়ে। যেমন এখানে বলছেন, মা! ভক্তিভরে কেউ যদি তোমার কথা স্মরণ করে তাহলে তার উপর প্রসন্না হয়ে তুমি এই কৃপা কর যাতে তার *বিত্তর্দ্ধিবিভবৈর্ধনদারাদিসম্পদাম্*, তার বিত্ত, ধন, সম্পদ, স্ত্রী, পুত্র সব কিছু যেন বৃদ্ধি পায়। যাদের ধন সম্পদ আছে তাদের যেন এগুলো আরও বৃদ্ধি হয় আর যাদের নেই তাদের যেন এসবের কোন অভাব না থাকে, এটাই আপনার কাছে আমাদের প্রার্থনা, আমরা আর অন্য কোন বর চাই না। এটাকেই আবার অনেকে অন্য ভাবে বলেন, দেবতারাই যখন আমাদের মত মর্ত্যবাসীদের জন্য মায়ের কাছে বর প্রার্থনা করেছেন, এরপর আমরাও যদি স্তুতি করি স্বাভাবিক ভাবে আমরাও তাই পাব। তখন ঋষি বলছেন –

ঋষিরুবাচ।।৩৮
ইতি প্রসাদিতা দেবৈর্জগতোহর্থে তথাত্মনঃ।
তথেত্যুক্ত্বা ভদ্রকালী বভুবান্তর্হিতা নৃপ।।৩৯
ইত্যেতৎ কথিতং ভূপ সম্ভূতা সা যথা পুরা।
দেবী দেবশরীরেভ্যো জগৎত্রয়হিতৈষিণী।।৪০

ঋষি তখন বললেন, দেবতারা এইভাবে নিজেদের আর জগতের কল্যাণের উদ্দেশ্যে ভদ্রকালীকে প্রসন্ন করার পর দেবী তথাস্তু, তোমরা যেমনটি প্রার্থনা করেছ তেমনটিই হবে বলে অন্তর্হিতা হয়ে গেলেন। পুরাকালে ত্রিলোকের মঙ্গলকারিণী দেবী দেবতাদের শরীর থেকে যেভাবে আবির্ভূতা হয়েছিলেন সেই কাহিনী তোমাদের শোনালাম।

পুনশ্চ গৌরীদেহা সা সমুদ্ভূতা যথাঽভবৎ।
বধায় দুষ্টদৈত্যানাং তথা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।।৪১
রক্ষণায় চ লোকানাং দেবানামুপকারিণী।
তচ্ছৃণুষ্ব ময়াখ্যাতং যথাবৎ কথয়ামি তে।।৪২

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
শক্রাদিকৃতদেবীস্তুতির্নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।।

দেবতাদের হিতকারিণী সেই দেবী এবং ত্রিলোকের রক্ষণার্থে গৌরী দেবীর শরীরে আবার যেভাবে আবির্ভূতা হয়েছিলেন এবং যে ভাবে দুষ্ট দৈত্যদের তথা শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করেছিলেন সেই কাহিনী এখন আমি তোমাদের বলছি শোন। দেবতাদের রক্ষার জন্য আর তিনটে লোকের ভালো করতে দেবী যেমনটি করেছিলেন ঠিক তেমনটি তোমাদের কাছে বর্ণনা করছি। চণ্ডীর চতুর্থ অধ্যায় অত্যন্ত উচ্চমানের এবং নিত্য পাঠ্য।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ও অত্যন্ত মূল্যবান একটি অধ্যায়। মায়ের যত রকম দিব্য রূপ হতে পারে, সমস্ত রূপের এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। শুম্ভ আর নিশুম্ভ এই দুই অসুর খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। মজার ব্যাপার হল, অসুরদের মধ্যেও যে শক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তারাও সেই শক্তি সাধারণত কোন না কোন দেবীর আরাধনা করেই লাভ করে থাকে। কিন্তু ত্যাগ বৈরাগ্য না থাকার জন্য লোভ, হিংসা, ঈর্ষা এই রিপুগুলো এদের মধ্যে থেকে যায়, আর তা থেকে ক্রমশ মানসিক ভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত এই শক্তিই তাদের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে জীবনে কোন দিন কোন ঝামেলা বা বিপদের মধ্যে পড়েনি, কিন্তু এই ঝামেলা বা বিপদ বাইরে থেকে কখন আসে না, আমাদের নিজেদের ভেতর থেকেই তৈরী হয়। গানে আছে স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা, আমি নিজেই নিজের বিপদের গর্তটা খুঁড়ে রেখেছি। কিসের জন্য? একটা না একটা কামনা মনকে অবসাদগ্রস্ত করে তুলছে, আমাকে এই জিনিষটা পেতেই হবে। যেমন সীতার, আমার সোনার হরিণ চাইই চাই, মন একেবারে সোনার হরিণের প্রতি আসক্ত হয়ে গেছে। আমাদের সবারই কম বয়সে, কম বয়সেই বা কেন, বুড়ো বয়সেও থাকে, আমার এই রকমটি চাই, যে রকমটি বলছি সেই রকমটিই হতে হবে। এই তীব্র আসক্তি যখন অপূর্ণতায় চলে যায় তখনই মানুষ দুঃখ-কষ্টে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

দেবতারা যখন সাধনা করেন তখন এই দুটো উদ্দেশ্যই সাধারণত সেখানে থাকে, অন্যায় ভাবে কোন কিছু একটা হরণ হয়ে গেছে, সেটাকে উদ্ধার করতে হবে। দ্বিতীয় জগতের হিতের জন্য। দেবতাদের সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য এই দুটোই। কোন কামনা নেই, শুধু জগতের হিতের জন্য সাধনা করা একমাত্র ঋষিরাই পারেন। স্বামীজী মঠ স্থাপনা করে এর উদ্দেশ্য ঠিক করে দিলেন আত্মানাং মোক্ষার্থায় জগদ্ধিতায় চ। নিজের মোক্ষ কামনা কামনার মধ্যে পড়ে না, কারণ মোক্ষ মানে নিজের স্বরূপে অবস্থান। সেইজন্য আত্মজ্ঞানকে জ্ঞানের মধ্যে বলা হয় না। আর মোক্ষ সাধন পুরুষার্থ অর্থাৎ জীবনের লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে না। এই ভাবে পার্থক্য করা যেতে পারে – আমরা সবাই এখানে মানসিক উদ্বেগ ও হতাশা নিয়ে আসছি, সবারই মধ্যে উদ্বেগ ও হতাশা আছে। এই দুটোর পেছনে আছে মনের মত কিছু জিনিষ পেতে চাইছি কিন্তু পাচ্ছি না বা ভালো লাগার কিছু জিনিষ হাত থেকে চলে গেছে। ঠাকুরও তো মায়ের জন্য কত কান্নাকাটি করছিলেন, ঠাকুরও তো মাকে পাচ্ছিলেন না বলে নিজের গলা কাটতে গিয়েছিলেন। কই আমরা তো একবারও বলছি না ঠাকুরের stress আর depression হয়েছিল! মানুষ তো depression হলেই আত্মহত্যা করতে চায়। ঠাকুর তো নিজের গলা কাটতে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোন বইতে তো বলছে না যে ঠাকুরের এমনই depression হয়েছিল যে তিনি আত্মহত্যা করতে গেলেন। মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসকরা বলতে পারেন, ঠাকুরের স্বভাবে একটু depressive tendency ছিল, বিশেষ ধরণের ড্রাগস দিলে এই tendencyটা চলে যেত। এই ধরণের কথা কেউই কোন দিন বলবে না। তার কারণ হল, এই যে stress, depression, tensionকে নিয়ে যত কথা বলা হয় এগুলো সব জাগতিক জিনিষের চাওয়া-পাওয়াকে নিয়ে বলা হয়। জাগতিক বস্তুর চাহিদাই আমাদের শোক আর মোহ রূপে আঘাত করে। শোক হল যে জিনিষট ছিল সেটা চলে গেছে আর মোহ হল কোন জিনিষ আমি পেতে চাইছি কিন্তু পাচ্ছি না। এই শোক আর মোহ যখন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যায় তখনই লোভ, tension, stress, depression এগুলো আসে। কিন্তু মানুষ যখন নিজের

স্বরূপকে জানার জন্য বা নিজের ইষ্টের সঙ্গে এক হওয়ার জন্য তীব্র সাধনা করে তখন তাকে বলা হয় ব্যাকুলতা। ঠাকুরের মধ্যে যা কিছু হচ্ছিল এটাকেই বলে ব্যাকুলতা, বিকল। যদিও কবিতায় প্রেমিক প্রেমিকার মিলনের তীব্র আকাঙ্খাকে বিকল বলে, কিন্তু ঠিক ঠিক ব্যাকুলতা বলতে বোঝায় যখন মানুষ আত্মজ্ঞানের দিকে এগোতে গিয়ে যে তীব্র আকাঙ্খা হয় সেটাকেই ব্যাকুলতা বলে, এর বাইরে আর কিছুকে ব্যাকুলতা বলা যায় না।

দেবতারা যখন সাধনা করেন তখন তাঁদের মধ্যেও ব্যাকুলতা থাকে, কিন্তু তাঁরা জানেন যে এর আগে আমরা এমন এমন তপস্যা করেছি যার জন্য আজ আমরা দেবত্ব লাভ করেছি। দেবত্ব পাওয়ার পর অসুররা যখন দেবতাদের অধিকার কেড়ে নেয় তখন তাঁরা ভাবেন আমাদের প্রতি এই রকম কেন হল! অসুরদের ক্ষেত্রে সমস্যা হল, ওদের কোন তপস্যা নেই, ওরা যা কিছু করেছে সব ওদের বাহুবলে করেছে। অসুরা হঠাৎ বলে দেয় আমার এই জিনিষটা চাই, তখন প্রথমেই তাদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আসক্তির ভাব চলে আসে। তখন অসুররা সাধনা করতে শুরু করে। সাধনার একটা শক্তি আছে, এই শক্তির জন্য অসুররাও ফল পেয়ে যায়। কিন্তু ভেতরে আসক্তি আছে, এই আসক্তির ভাবটাই পবিত্রতার ভাবকে অবরুদ্ধ করে দেয়। পবিত্রতা না থাকার ফলে কী হবে? সাধনার এই ফল তো তার কাছে আসবে, কিন্তু সাথে সাথে নিশ্চিত ভাবে তার জীবনে অনেক ভয়ঙ্কর বিপদও ডেকে নিয়ে আসবে। আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স এদের সবার কাছে এ্যটম বোমা আছে, কেউ কোন চেঁচামেচি করছে না। কিন্তু পাকিস্তান বোমা বানাতে যাচ্ছে, ইরানও বোমা বানাতে চাইছে, আর এই নিয়ে সারা বিশ্বে কত হৈচৈ চলছে। ইজরাইল তো ইরাক ইরানের পরমাণু কেন্দ্রে আক্রমণ করে উড়িয়ে দিল। আমেরিকা রাশিয়ার ক্ষেত্রে এই জিনিষ কেন করা হচ্ছে না? কারণ সবাই জানে, ওরা যে শক্তিটা পেয়েছে, সেই শক্তিকে কীভাবে কাজে লাগাতে হবে তারা ভালোভাবে জানে। পাকিস্থান, ইরাক, ইরান এরা হল সব অসুরের দল, এদের হাতে যদি আণবিক শক্তি চলে যায় এরা কী যে করে বসবে কোন ঠিক নেই।

অসুরদের ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিষ হয়। এরাও যখন সাধনা, তপস্যা করছে তখন শক্তিটা পেয়ে যাচ্ছে। শক্তি পাওয়ার পর সেই শক্তিকে নিয়ে যে কোথায় কী করবে কোন ঠিক নেই। প্রথমে চারিদিকে নাশকতামূলক কাজ করতে থাকবে, ওকে শেষ করতে হবে, তাকে শেষ করতে হবে, তারপর নিজেও শেষ হয়ে যাবে। কারুকে যদি নাশ করতে হয় তাহলে তার হাতে বিরাট ক্ষমতা দিয়ে দিতে হবে। যে কোন লোককে যদি absolute power দিয়ে দেওয়া হয়, ওর বিনাশ হবেই, কেউ ওকে বাঁচাতে পারবে না। ভস্মাসুরের কাহিনীতে তাই হয়েছে, রাবণের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আমাদের যত অসুরের কাহিনী আছে তার প্রত্যেকটিতে দেখা যাবে ওদের কিছু ক্ষমতা ছিল, হয় ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তা নাহলে সে মুণ্ডুকাটা তপস্যা করেছে। অসুররা এমন তপস্যা ও সাধনা করে যেটা মানুষ বা দেবতারা কখনই করতে পারবে না। ওই মুণ্ডুকাটা তপস্যার ফলও সাংঘাতিক হবে। ওই ক্ষমতা পেয়ে এরা তারপর জগতের ভারসাম্যকে নষ্ট করে দেয়। জগতের ভারসাম্য যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন ভারসাম্য ফিরিয়ে এনে জগতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার কাজে ভগবানকে নামতে হয়। সেই কথা দিয়েই পঞ্চম অধ্যায় শুরু করছেন –

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

(দেবতাদের দ্বারা দেবীস্তুতি, শুম্ভ কর্তৃক দেবীর কাছে
দূত প্রেরণ এবং দূত মারফত শুম্ভের প্রতি দেবীর বার্তা)

(ওঁ ঐঁ)ঋষিরুবাচ

পুরা শুম্ভনিশুম্ভাভ্যামসুরাভ্যাং শচীপতেঃ।
ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হৃতা মদবলাশ্রয়াৎ।।১

শুম্ভ আর নিশুম্ভ নামে এই দুই অসুর পুরাকালে নিজেদের শক্তির জোরে শচীপতি ইন্দ্রের তিনটে লোকের অধিকারত্ব আর যজ্ঞভাগ কেড়ে নিয়েছিল। যজ্ঞভাগ হল, বৈদিক যুগে যখন প্রচুর যজ্ঞাদি হত, এখনও যখন কোথাও কোথাও খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা হয়, তখন বিভিন্ন দেবী-দেবতাদের ইহা গচ্ছ ইহা তিষ্ঠ ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা আবাহন করা হয়, আপনি এখানে আসুন, আপনি এখানে বসুন। যখন যজ্ঞ হয় সেই যজ্ঞের একটা সূক্ষ্ম ভাগ দেবতারা পেয়ে যান। বৈদিক কালে যজ্ঞের ভাগ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকার ছিল ইন্দ্রের। যজ্ঞের প্রধান ভাগটাই ইন্দ্রের ভোগে চলে যেত, কারণ সে দেবতাদের রাজা, আর তাতেই ইন্দ্রের এত শক্তি। অশ্বিনীকুমারদের বৈদিক যুগে এক সময় যজ্ঞের ভাগ দেওয়া হত না, দেবতাদের চিকিৎসক হওয়াতে ওনারা হয়ে গেলেন সেবক, তাই এই দুই দেবতা যজ্ঞের কোন ভাগ পেতেন না। বৈদিক যুগে ডাক্তারদের কখনই সম্মান দেওয়া হত না, তাদের সেবক রূপেই ভাবা হত। পরের দিকে চ্যবন ঋষি এই প্রথা থেকে সরে এসে ঠিক করলেন আমি অশ্বিনীকুমারদেরও যজ্ঞের ভাব দেব। সেই থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়রা যজ্ঞ ভাগের অধিকার পেতে থাকলেন। অসুররা ইন্দ্রকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাড়িয়ে দিয়ে বলে দিল এবার থেকে যজ্ঞের ভাগ আমরাই নেব। যজ্ঞ ভাগ অনেকটা এখনকার দিনের কর আদায় বলা যেতে পারে। দেবতাদের শক্তি আসত যজ্ঞভাগ থেকে আর সোমরস পান করে। শুধু তাই নয় –

তাবেব সূর্যতাং তদ্বদধিকারং তথৈন্দবম্।
কৌবেরমথ যাম্যঞ্চ চক্রাতে বরুণস্য চ।।৩

তাবেব পবনর্দ্ধিঞ্চ চক্রতুর্বহ্নিকর্ম চ।
ততো দেবা বিনির্ধুতা ভ্রষ্টরাজ্যা পরাজিতাঃ।।৪

সূর্য, চন্দ্রমা, কুবের, যম, বরুণ, বায়ু, অগ্নি বিভিন্ন যে দেবতারা আছেন, শুম্ভ আর নিশুম্ভ দুই অসুর এই দেবতাদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে নিজেরাই দেবতাদের সব কাজ করতে লাগল। এরা দেবতাদের অপমানিত, রাজ্যভ্রষ্ট, পরাজিত করে স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিল।

হৃতাধিকারাস্ত্রিদশাস্তাভ্যাং সর্বে নিরাকৃতাঃ।
মহাসুরাভ্যাং তাং দেবীং সংস্মরন্ত্যপরাজিতাম্।।৫

তয়াস্মাকং বরো দত্তো যথাপৎসু স্মৃতাখিলা।
ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ।।৬

ইতি কৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্।
জগ্মুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ।।৭

অসুরদের কাছে স্বর্গের সব অধিকার হারিয়ে, লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে দেবতারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে গেছে। তখন দেবতাদের মনে পড়ল, মা জগদম্বা আমাদের বর দিয়েছিলেন আমরা যখনই তাঁকে স্মরণ করব তিনি আমাদের কৃপা করবেন আর আমাদের মহা বিপদকে তৎক্ষণাৎ নাশ করে দেবেন। দেবতারা তাই দেবীর আরাধনা করার জন্য গিরিরাজ হিমালয়ে গিয়ে ভগবতী বিষ্ণুমায়ার স্তুতি করতে লাগলেন। হিমালয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে, পার্বতী হলেন হিমালয়ের কন্যা আর শিবের সঙ্গে তাঁকে হিমালয়ে পাওয়া যায়। আর এও হতে পারে, আগেকার দিনে ঋষি-মুনিরা হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করতেন, সেই ভাবটা এখানেও আরোপ করা হয়েছে যে,

দেবাতারা হিমালয়ে গিয়ে মায়ের স্তুতি করতে শুরু করেছেন। হিমালয়েই যে মা অবস্থান করছেন ঠিক তা নয়, ওখানে গিয়ে দেবতারা যেন চোখ বন্ধ করে স্তব করে যাচ্ছেন।

যাঁরা ভক্তি চান, যাঁরা মায়ের কৃপা প্রার্থী, নিজের মধ্যে মায়ের শক্তির আবির্ভাব যাঁরা চান, তাঁদের জন্য পঞ্চম অধ্যায়ের নয় থেকে আশি নম্বর মন্ত্র পর্যন্ত এই দেবীস্তুতি অত্যন্ত শক্তিশালী একটি স্তুতি বলে মনে করা হয়। যে আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা মানুষের অন্তর্জগতের সব কিছুর কাজ চলে, এখানে সেই শক্তিরই পূর্ণাঙ্গ রূপে বর্ণনা করা হচ্ছে। গীতার পঞ্চদশোহধ্যায়ে ভগবান বলছেন *অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহিমাশ্রিতঃ*, প্রাণির মধ্যে যে বৈশ্বানর অর্থাৎ ক্ষুধা অগ্নি আছে সেটা আমি, যে অগ্নির সাহায্যে ভুক্ত দ্রব্য পাচন হয়ে সমস্ত প্রাণির স্থূল শরীরকে পুষ্টিতা ও সতেজতা প্রদান করে যাচ্ছে। ভগবান আবার বলছেন *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ*, স্মৃতি আমার থেকেই হয়, জ্ঞান আমার থেকেই হয়। তাই না, শুধু স্মৃতি আর জ্ঞান নয়, *অপোহনম্*, জ্ঞানের যে নাশ হয়ে যায় সেটাও আমার থেকেই আসে। এর ভালো উপমা, একটা গাড়ি যখন সামনের দিকে যায় সেটাও তার ইঞ্জিন আর পেট্রলের জন্যই যায়, গাড়ি যখন পেছনের দিকে যায় সেটাও ওই ইঞ্জিন আর পেট্রলের শক্তিতেই যায়। কেউ যদি ইচ্ছে করেন ব্যাক গিয়ারে কলকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত গাড়িকে নিয়ে যেতে পারেন আবার সামনের দিকে চালিয়েও নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু দুটো ক্ষেত্রেই দরকার শক্তি। মানুষের যা কিছু ভালো হয় সেটাও শক্তির জন্য হয়ে থাকে, মানুষের খারাপ যেটা হয় সেটাও শক্তির জন্যই হয়।

এখন আমাকে নিজে ঠিক করতে হবে আমি কি চাইছি। আমি যদি মায়ের সৌম্য রূপ পেতে চাই তখন আমাকে এক রকম করতে হবে। তিনটে লোকের মধ্যে যে স্বর্গলোক চাইছে তাকে আরেক রকম করতে হবে। কিন্তু ভগবানের দৃষ্টিতে স্বর্গও যা নরকও তাই, জীবনও যা মৃত্যুও তাই। আপনি যদি নিজেকে ঠাকুরের ভক্ত বলেন আর তার সাথে আপনি যদি মৃত্যুকে ভয় পান বা মৃত্যু যদি আপনাকে খুব কষ্ট দেয়, তখন ব্যাপারটা খুবই অযৌক্তিক হয়ে দাঁড়াবে। জীবন যাঁর মৃত্যুও তাঁর। আপনি যদি ঘোর ভৌতিকবাদী হয়ে বলেন আমি জীবনকেই চাই মৃত্যুকে চাই না, তখন সেটা কোন অযৌক্তিক হবে না। আপনি যদি মনে করেন জীবনটাই সব, আমি সুখ চাই, আমি সৌন্দর্য চাই, জীবনকে আমি ভোগ করতে চাই, তাহলে আপনি সেভাবেই জীবন-যাপন করুন, কেউ আপত্তি করতে যাবে না। কিন্তু শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ভৌতিক জগতকে দেখানো হচ্ছে, যারা এই জগতের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সৌন্দর্যকে চাইছে, সেই জগৎ কীভাবে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। কীভাবে চুরমার হয়ে গেছে? শুম্ভ আর নিশুম্ভ এই দুই অসুর মিলে দেবতাদের সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। তখন দেবতারা বুঝতে পারলেন যে এভাবে আর চলবে না। তখন তাঁরা সেই শক্তির আরাধনা করছেন যে শক্তির দৌলতে এই অসুররা তাঁদের প্রিয় স্বর্গরাজ্য থেকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। স্তুতির মূল ভাব হল জগতে যা কিছু আছে সবটাই শক্তির খেলা, দারিদ্র যেখানে সেখানেও শক্তির খেলা আর যেখানে প্রাচুর্য সেখানেও শক্তির খেলা, শান্তি যেখানে সেখানেও শক্তি, অশান্তি যেখানে সেখানেও শক্তির খেলা। শান্তি রূপেও তিনি বিরাজ করছেন, যুদ্ধ রূপেও তিনিই বিরাজ করছেন। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হল মায়ের ঠিক ঠিক যে স্বরূপ, সেই স্বরূপকে নিয়ে আরাধনা করা। স্বরূপের আরাধনা করার পর নিজের যে বিশেষ কিছু কার্যসিদ্ধি করতে হবে, সেই কার্যসিদ্ধির দিকে এবার নিয়ে যাওয়া।

যেমন, ঠাকুর যখন সাধনা করেছেন তখন তিনি সব কিছু ত্যাগ করেই সাধনা করে গেছেন। সিদ্ধির পর তিনি যখন আবার সাধারণ জীবন-যাপন করছেন তখন তাঁকেও কিছু জিনিষকে অবলম্বন করে থাকতে হচ্ছে। যদিও ঠাকুর বলছেন, আমার সাধ ত্যাগের বাদশা হওয়া। ত্যাগের বাদশা মানে, কামিনী-কাঞ্চনের পূর্ণ ত্যাগের কথাই ঠাকুর বলতে চাইছেন, কোথাও কোন কিছু থাকবে না। কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে সাধারণ কিছু জিনিষের দিকেও ঠাকুরের নজর যাচ্ছে, দুধের দেনা বাকি, এত অতিথি আসছে তার জন্য খরচ আছে, ঘরে সবার বসার জন্য মাদুর দরকার, শীত করছে তার জন্য গরম জামা দরকার। এই ধরণের কিছু কিছু চিন্তা থাকবে, একেবারেই যে সব চিন্তা চলে যাবে তা নয়। আবার সিদ্ধির পরেই যে ঠাকুর একটা হত দারিদ্রের ভাব নিয়ে জীবন-যাপন করছেন তাও নয়। আসলে সাধনার জীবন আর সাধনার পরবর্তি জীবন দুটো জীবন আলাদা খাতে প্রবাহিত হয়। সাধনা করা হয় তখন পূর্ণ ত্যাগ, সব কিছুই ছেড়ে দেন। কিন্তু সাধনা যখন পূর্ণ হয়ে যায়, এমনকি যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ তাঁরাও তখন একটা বিশেষ কিছু জিনিষকে অবলম্বন করে থাকেন। তবে অবতাররা হলে অন্য থাকের,

এনারা ভক্তি, জ্ঞান এসব নিয়েই থাকেন। কিন্তু সাধনার সময় সবাইকে হয় সবটাই ত্যাগ করতে হবে আর তা নাহলে পুরোটাই নিতে হবে। সাধনার সময় আবার কোন কিছুর প্রতি গোঁড়ামি ভাব চলবে না। মুসলমানরা যেমন মনে করে আল্লা অর্থাৎ ভগবান শুধু মুসলমানদের জন্য, বাকিরা সবাই কাফের। কাফের সে শিশু হোক, মহিলা হোক যেই হোক না কেন তাকে গুলি মেরে উড়িয়ে দিতে হবে। এ কী ধরণের চিন্তা-ভাবনা বোঝা যায় না, এদের ধর্মগ্রন্থেও এই ধরণের কোন জিনিষ নেই। না আছে সুফিদের কথাতে, না আছে কোরানে। কোরানে সব ধরণের কথাই আছে, কিন্তু এরা অশান্তি জিনিষটাকে নিয়ে এগোচ্ছে। ভগবানকে এই জগতের নিয়মের বাইরে থাকতে হবে। নিত্য আর লীলা, নিত্যে শুধু ভালোটুকু থাকবে, যে ভগবান শুধু মুসলমানদের ভালোটুকু ভাবছেন, সেই ভগবান কিসের ভগবান!

এখানে দেবতারা যে স্তুতি করছেন, এই স্তুতিতে মূলতঃ এই জিনিষটাই দেখান হচ্ছে, মা আপনি সব কিছু। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন, তোমার ক্ষুধার অগ্নিও আমি, তোমার প্রাণ অপানও আমি, তোমার জ্ঞানটাও আমি, তোমার স্মৃতিটাও আমি, আবার তোমার যে জ্ঞানের বিলোপ হয়ে যাচ্ছে সেটাও আমি। এটাই বেদান্তের মূল ভাবনা। আর এখানেও দেবীস্তুতিতে যা কিছু বলা হচ্ছে এও পুরোপুরি বেদান্তের কথাই বলা হচ্ছে। তবে এই মনে করা উচিৎ নয় যে দেবতারা স্তুতি করেছেন আর দেবী তাঁদের সামনে এসে হাজির হয়ে গেছেন। দেবীস্তুতিতে যা কিছু বলা হচ্ছে সবটাই সাধনার ব্যাপার, ধ্যানের গভীরে চিন্তনের বিষয়। এগুলো নিয়ে চিন্তন করতে উৎসাহিত করার জন্য বলে দেওয়া হয়, তুমি যদি এই দেবীস্তুতি নিত্য পাঠ ও ধ্যান কর তাহলে তোমার উপর মায়ের কৃপা হবে। আমাদের শাস্ত্রে বলা হয় যান্ত্রিক ভাবেও করলে এর একটা ফল থাকবে। কিন্তু আসলে তা কখন হয় না, যখন শ্রদ্ধার সঙ্গে করা হয় তখনই ঠিক ঠিক ফল দেয়। শ্রদ্ধা করা মানেই হল আপনি বুঝতে পারছেন এই স্তুতির মাধ্যমে কি বলতে চাওয়া হয়েছে। আর এও বুঝতে পারছেন যে এর বক্তব্য আপনার শরীর ও মনের সাথে এক। শরীর মনের সঙ্গে যখন এক হয়ে যাচ্ছে তখন এই বিদ্যা বীর্যতর ভবতি হয়, তখনই বিদ্যা ঠিক ঠিক ফল দেয়, যান্ত্রিক ভাবে যা কখনই হয় না। ঠাকুর বলছেন কলকাতার নষ্টা মেয়েরা লক্ষ লক্ষ জপ করছে কিন্তু কই কিছুই তো হয় না। বিধবারা সারাদিন খট্ খট্ করে জপ করেই যাচ্ছে তাদেরও তো আসল যে জায়গায় পরিবর্তন হওয়ার কথা সেই মনের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। তাহলে কি তারা জপ করা বন্ধ করে দেবে? কখনই নয়। কিছু না করার থেকে যান্ত্রিক ভাবে জপ করাও অনেক ভালো। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যে কোন সাধনার ফল অবশ্যই হল অন্তর্জগতের পরিবর্তন। আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ছাড়া কোন ফল আসে না। উপনিষদে এই আভন্তরীণ রূপান্তরের কথাই বারবার বলা হচ্ছে। ঈশাবাস্যোপনিষদ বলছে সব কিছুতে তুমি ঈশ্বরকে দেখ, এটাই তোমার সাধনা। এই সাধনার ফল কী হবে? *তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতে*, তোমার একত্ব দর্শন হয়ে যাবে, তোমার অভেদ বুদ্ধি হয়ে যাবে। ঠাকুরও কথামৃতে এই অভেদ বুদ্ধির কথা বারবার বলছেন, তখন আর কোন ভেদ বুদ্ধি থাকবে না। অন্য দিক থেকে বলতে গেলে বহুত্ব ভাবটা চলে যায়। বহুত্ব বোধ চলে গেলে কী থাকবে? যা আছে তাই আছে, এটাকে অদ্বৈতই বলুন, এক বলুন যাই বলুন একই ব্যাপার থাকছে। এর ফল কি হবে? *তত্র কো মোহঃ কঃ শোক*, তোমার কোন মোহ থাকবে না, তোমার কোন শোকও থাকবে না। তোমার কিছু পাওয়ারও ইচ্ছে থাকবে না, কোন কিছু চলে গেলে তোমার দুঃখও হবে না।

মুম্বাইর তাজ হোটেলে পাকিস্থান থেকে এসে সন্ত্রাসবাদীরা যে হামলা করেছিল তার উপর বিদেশ থেকে একটা বই লেখা হয়েছে, অনেক গবেষণা করে বইটি লেখা হয়েছে। সেই বইতে রামমূর্তি নামে এক ভদ্রলোকের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাতে বলছেন, রামমূর্তি ভদ্রলোক একজন ব্যাঙ্কার ছিলেন, তাঁর অনেক টাকা-পয়সা, ফাইভ স্টার হোটেলের মালিক ছিলেন। ভদ্রলোকের উপর সন্ত্রাসবাদীরা প্রচুর অত্যাচার করেছিল। উনি চালাকি করে বলেছিলেন যে উনি একজন শিক্ষক। কিন্তু পাকিস্থানে বসে ওখানকার সন্ত্রাসবাদীরা এদের বলছে তোমার ওর নাম জিজ্ঞেস কর। ভদ্রলোক নাম বলেছে, তারপর ওখান থেকে বাবার নাম জিজ্ঞেস করতে বলা হয়েছে। বাবার নামও বলেছে। ওদিকে পাকিস্থানে বসে ওরা গুগুল্ সার্চ করে মুম্বাইতে ওদের লোকদের বলছে এই ভদ্রলোক মিথ্যা কথা বলছে, শিক্ষক-টিক্ষক কিছু না, এখানে সব বেরিয়ে গেছে। এই লোকটি একজন ব্যাঙ্কার, একে বন্দী করে রাখ, অনেক কাজে লাগবে। তারপর ওরা ওই সত্তর বছরের বয়স্ক লোককে ক্রমাগত দৈহিক নিপীড়ন করেই

গেছে। জামা-কাপড় খুলে, হাত-পা বেঁধে এক নাগাড়ে মেরেই গেছে। বেচারী বয়স্ক লোক পরে সাংবাদিকদের বলছেন – চেন্নাইয়ের রামকৃষ্ণ মঠে তিনি প্রায়ই যেতেন। এরপর সাংবাদিকরা যে কথাটা লিখেছেন সেটা ভুল লিখেছেন, বলছেন – there one old woman had said, আসলে ভদ্রলোক শ্রীশ্রীমায়ের কথা বলতে চাইছিলেন। বিদেশী সাংবাদিকরা সব কথা জানেন না, ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে ভুল লিখেছেন। শ্রীমার যে বিখ্যাত কথা আছে 'যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখ না। এই জগতে কেউ পর নয়, সবাই আপনার লোক'। শ্রীমার এই কথাকে সাংবাদিকরা অনুবাদ করে এইভাবে লিখেছেন – Acceptance is spirituality। ওখানে লিখছেন – He was a regular visitor to Ramakrishna Mission at Chennai and there he heard from one old woman that acceptance is spirituality। কি সুন্দর শ্রীমার কথা – কারুর দোষ দেখো না জগৎকে আপন করে নিতে শেখ। ভদ্রলোক বলছেন ওই সময় যত কষ্ট তাঁর হয়েছে, বুড়ো মানুষটাকে উলঙ্গ করে হাত-পা বেঁধে এত অত্যাচার করেছে কিন্তু তিনি শ্রীমার ওই কথা সর্বক্ষণ মনে করতে করতে এক সেকেণ্ডের জন্যও ওদের প্রতি তাঁর কোন রাগ বা ক্ষোভ হয়নি। ভগবান আমার জন্য যদি মৃত্যুই ঠিক করে থাকেন আমি সানন্দে তা গ্রহণ করছি। এই যে ভদ্রলোকের মধ্যে চেতনা, এই চেতনাই জানিয়ে দিচ্ছে কোথাও তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিকতা জাগ্রত হয়েছে।

আমরা সবাই জগতের ব্যাপারে একটা আলাদা মনোজগৎ সৃষ্টি করে রেখেছি, ওই জগৎ হল সব সময় প্রত্যাশার জগৎ, আমি এই চাই সেই চাই। যেমনি সেই চাওয়া-পাওয়াতে অসামঞ্জস্য হয়ে যাবে তেমনি বাচ্চাদের মত আমরা কান্নাকাটি করতে শুরু করি। আধ্যাত্মিকতা মানেই হল – এই যে বলছেন Acceptance is spirituality। কিসের acceptance? কোন কিছুতে শোক মোহ না হওয়া। কোন কিছু চলে গেছে তার জন্য শোক হচ্ছে না, যেটা পাওয়া যাচ্ছে না তার জন্য কোন মোহ হবে না। তাই বলে কি জীবনকে ত্যাগ করে দিতে হবে? কখনই না। সন্ন্যাসীর ধর্ম হল জীবনের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ নেই আর মৃত্যুকেও সে আকাঙ্খা করে না। যখন জীবন আছে তখন জীবন চালাতে হবে। যখন মৃত্যু আসছে আসুক। সন্ন্যাসী তাই জীবনকেও ভালোবাসবে না মৃত্যুকেও ভালোবাসতে যাবে না। যদি মৃত্যুকে ভালোবাসতে যান তাহলে তিনি fatalist বা pessimist। জীবনকে যদি ভালোবাসেন তাহলে আপনি ঘোর বিষয়ী। জীবনের প্রতি ভালোবাসাকে ওরা বলবে optimist, কিছুই optimist নয়, ঘোর বিষয়ী। যারা ঘোর বিষয়ী, একেবারে পোকা-মাকড়ের মত তারা জীবনকে ভালোবাসে। আর যারা মানসিক ভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত তারা মৃত্যুকে ভালোবাসে। সন্ন্যাসী জীবনকেও ভালোবাসে না, মৃত্যুকেও ভালোবাসে না। আপনার আমার মত জগৎ কখনই চলবে না। বাচ্চারা তাদের নিজস্ব একটা জগৎ তৈরী করে রাখে, সেই জগতে তার লজেন্স চাই, খেলনা চাই, খেলার সাথী চাই, খেলতে চাই, আর এগুলো না পেলে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলে রাখবে। বাচ্চা বয়সে সবাই এই রকমই করে। কিন্তু ষাট সত্তর বয়স হয়ে গেছে, এখনও সেই একই জিনিষের পুনরাবৃত্তি চলছে। আমরা কেউই এই শিশুসুলভ মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি না। আমার সোনার হরিণ চাইই চাই। আমাকে কেউ গাধা বলেছে – এত আস্পর্ধা! আমাকে গাধা বলা! আপনি কি সত্যিই গাধা হয়ে গেছেন? না, তাতো হইনি। তাহলে একটা কথাতেই আপনার শরীরের সমস্ত রক্ত গরম হয়ে যাচ্ছে কেন! পাঁচ বছর বাচ্চার সাথে আপনার কোথায় পার্থক্য রইল!

উচ্চতম আধ্যাত্মিকতা সাধনার ফল সব সময় অন্তর্জগতের বিকাশ। দ্বিতীয় স্তরে, যে কথা উপনিষদে কোথাও কোথাও বলে, খুব কমই বলে আর গীতাতে তো কোথাও বলছে না, সেটা হল জাগতিক অভ্যুদয়। সমগ্র গীতার কোথাও বিদ্যার স্তুতি অর্থাৎ অর্থবাদ করা হয়নি, তবে যেখানেই বিদ্যার স্তুতি করা হয়েছে সেটাও অন্তর্জগতের বিকাশকে নিয়ে। তাই বলে যে আপনি গীতা পাঠ করে রাজা হয়ে যাবেন, বিরাট ক্ষমতাবান কিছু হয়ে যাবেন, এই ধরণের স্তুতি কোথাও করা হয়নি। কিছু দিন ধরে নতুন একটা শব্দ নিয়ে আসা হয়েছে, কিছু দুরভিসন্ধী সাংবাদিকরাই এই শব্দটা নিয়ে এসেছেন তা হল Hindu Terrorism। Hindu Terrorism এই শব্দের কোন অর্থই দাঁড়ায় না। যখন আপনি Muslim Terrorism বলছেন, তখন তার অর্থ পরিষ্কার, ধর্ম তাকে অনুমতি দিচ্ছে ধর্মের নামে তুমি বিধর্মীর গলা কেটে দিতে পার। হিন্দু ধর্মের মূল গ্রন্থ উপনিষদ, গীতা আপনার যে সাংসারিক উত্থান হবে, সেই নিয়েও কোন কথা বলছে না। উপনিষদে কোথাও কোথাও বলে তিনি

ত্রিলোক জয় করেন, এটা অর্থবাদ। কিন্তু গীতাতে এই ধরণের একটি অর্থবাদও কোথাও পাওয়া যাবে না। যে ধর্মের শাস্ত্র নিজের অভ্যুদয় নিয়ে কোন কথা বলে না, সেখানে সে কী করে বলতে পারে তুমি বিধর্মীদের গলা কেটে দাও তাহলে তুমি স্বর্গে যাবে? তার বদলে বার বার বলছেন ধর্ম হল তোমার অন্তর্জগতের রূপান্তর। এই কথা বলার মধ্যে অপরের গলা কেটে দেওয়ার কথা কীভাবে আসতে পারে! আর হিন্দুদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে কেউ দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে বলবে আপনারা সব অযৌক্তিক কথা বলে যাচ্ছেন। যখনই কেউ যদি বলে Hindu Terrorism তখনই এটা contradictory in terms। এই ধরণের কথা বলা মানে ঠাণ্ডা আগুন বা উত্তপ্ত বরফ, আগুন কি করে ঠাণ্ডা হবে আর বরফই বা কী করে উত্তপ্ত হতে পারবে! অনেক এসে বলে উনি একজন ভোগী সাধু, কিন্তু ভোগী সাধুও কখনই হতে পারে না, হয় সে ভোগী নয় তো সে সাধু। বলতে পারেন সাধুর পোষাক পরে ভোগ করছে, সেতো নাটকে সিনেমাতেও কত কিছু করে। সমগ্র হিন্দু ধর্ম একটা কথাই বার বার বলছে – inner transformation, তোমার অন্তর্জগতের রূপান্তর।

বেদে অবশ্য কিছু কিছু অন্য ধরণের কথাও বলা হয়েছে। যেমন তুমি যদি এই যজ্ঞ কর তাহলে তোমার এই হবে সেই হবে ইত্যাদি। তোমার সন্তান হচ্ছে না, ঠিক আছে তুমি যদি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ কর তাহলে তোমার পুত্র সন্তান হবে। আর আমাদের কাহিনীতেও এসে গেছে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম এভাবেই যজ্ঞের দ্বারা হয়েছে। এর মধ্যে কতটা সত্যি কতটা মিথ্যা আমাদের কারুর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু এর অন্য একটা দিকও আছে। যারা কামনা-বাসনায় একেবারে জর্জরিত হয়ে আছে, তারা নিজেদের কামনা-বাসনা ছাড়া কিছু ভাবতে পারে না। এদেরকে তখন টোপ দেওয়ার জন্য বলা হয় তুমি এই যজ্ঞ করো তাহলে তোমার সন্তান হবে, তুমি এই যজ্ঞ করো তাহলে তোমার সাম্রাজ্য ফিরে পাবে। তখন যজ্ঞ করতে করতে একটু একটু করে ধর্মীয় ভাব যখন জাগ্রত হতে থাকে তখন তার কামনা-বাসনার প্রতি তীব্র আসক্তি ভাবটাও কমতে থাকে। বেদের যজ্ঞকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করলে কর্মকাণ্ডীরা আবার তেড়েফুঁড়ে আপনার দিকে তেড়ে আসবে। কিন্তু এটাই যদি সত্য হত তাহলে উপনিষদ কখনই অন্য কথা বলতো না। হিন্দু ধর্মের মূল দর্শন আসে উপনিষদ আর গীতা থেকে, সেই উপনিষদ আর গীতা inner transformation ছাড়া অন্য কোন কথা বলছে না। এখানে যে আট নম্বর মন্ত্র থেকে আশি নম্বর মন্ত্র পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে সবটাই inner transformationএর জন্য। কিন্তু এই কাহিনী বলা হচ্ছে সুরথ আর সমাধিকে, যাঁরা জাগতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত হয়ে জঙ্গলে এসে মুনির আশ্রমে আশ্রয় নিয়েও তাঁদের শোক আর মোহকে ছাড়তে পারছে না।

অন্য দিকে আবার এই স্তুতি করছেন দেবতারা, তাঁরাও জাগতিক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ও শোকগ্রস্ত। তন্ত্র সাধনা বা শক্তি উপাসনাতে সব সময়ই বলা হয়, যারা ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটে চাইছে তাদের শক্তি সাধনা করতে হবে। তবে যাঁরা মোক্ষমার্গী তাঁরাও মায়ের কাছে প্রার্থনা করেন – মা আমার মুক্তির দ্বারটা তুমি ছেড়ে দাও। হ্রীং মন্ত্র হল মায়া মন্ত্র, হ্রীং মন্ত্র জপ করলে মা যদি খুশি হয়ে যান তখন আপনি মায়ের কাছে মোক্ষ চাইলে তিনি মোক্ষ দিয়ে দেবেন আর ধর্ম, অর্থ ও কাম চাইলে তাও দিয়ে দেবেন। এটাই তন্ত্রের প্রচলিত মত। তবে চণ্ডীতে যে মায়ের উদ্দেশ্যে চারটি দেবীস্তুতি আছে, এই চারটি দেবীস্তুতি নিয়মিত পাঠ সবারই করা উচিৎ। আরও ভালো হয় প্রতিদিন চণ্ডীর পারায়ণ করে যাওয়া, আজ প্রথম অধ্যায়, পরের দিন দ্বিতীয় অধ্যায় এইভাবে পুরো তেরটি অধ্যায় প্রতিদিন পারায়ণ করে যাওয়া। আর বছরে কয়েকটি বিশেষ দিনে পুরো চণ্ডী পাঠ করা। যাই হোক দেবতারা স্তুতি করার আগে প্রণাম করে বলছেন –

দেবা উচুঃ।৮(ওঁ ঐঁ)
নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্।।৯

হে দেবী আপনাকে প্রণাম, মহাদেবী শিবাকে সর্বদা প্রণাম। এখানে মায়ের বিভিন্ন নামের কথা বলা হচ্ছে। আমাদের সংশয় হতে পারে যে, দেবী আর মহাদেবীর মধ্যে পার্থক্য কি! ব্যষ্টি স্তরে কিছু জিনিষ আছে আবার সমষ্টি স্তরেও কিছু জিনিষ চলে। ব্যষ্টি আর সমষ্টির মধ্যে তফাৎ করার জন্য আগে একটা 'মহা' 'পরম' ইত্যাদি

শব্দ জুড়ে দেওয়া হয়। যেমন প্রকৃতি, প্রকৃতি মানে স্বভাব, আমার আপনার সবার মধ্যে যে স্বভাব রয়েছে সেটাকে বলছে প্রকৃতি। আবার সমষ্টিতেও প্রকৃতি আছে, সমষ্টির প্রকৃতিকে আলাদা করে বোঝাবার জন্য বলা হয় পরমা প্রকৃতি বা মূলা প্রকৃতি। ঠিক তেমনি মায়া, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে অজ্ঞানের আবরণ রয়েছে তাকে বলছে মায়া, আবার সমষ্টিতেও মায়া আছে, দুটোকে আলাদা করার জন্য বলছেন মহামায়া। মায়া শব্দটি শাস্ত্রের আবার একটি পরিভাষাও। তাই যখন কেউ মায়া শব্দ উচ্চারণ করছে তখন আগে বুঝতে হবে উনি মায়া শব্দ কোন অর্থে বলছেন, ব্যষ্টির অর্থে বলছেন, নাকি সমষ্টির অর্থে বলতে চাইছেন। অজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। সেইজন্য যাঁরা শক্তি সাধনা করেন তাঁরা নামটা পাল্টে বলেন মহামায়া। ঠিক সেই রকম দেবী বলতে অনেক রকম দেবীকে বোঝাবে, দেবতা থাকলেই দেবী থাকবেন। দেবতা আর দেবীকে নিয়ে যাতে কোন সংশয় না হয় আর মূল জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য দেবতার আগে মহা লাগিয়ে দেওয়া হয়। যেমন দেবাদিদেব মহাদেব। ইন্দ্র, মিত্র, অগ্নি, বরুণ এনারা সবাই দেবতা, কিন্তু শিব হলেন দেবাদিদেব মহাদেব। অন্যান্য দেবতারা হলেন জমিদারের মত আর মহাদেব হলেন সব জমিদারেরও রাজা। ঠিক তেমনি বিষ্ণু হলেন দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে একজন সাধারণ দেবতা, সেইজন্য যিনি ভগবান বিষ্ণু তাঁকে বলা হয় মহাবিষ্ণু। কিন্তু পরের দিকে দেখা গেল ছোট বিষ্ণুর রূপটা ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল আর ছোট রূপটা হারিয়ে যাওয়াতে মহাবিষ্ণুর মহা শব্দটা সরিয়ে শুধু বিষ্ণু শব্দটাই থেকে গেল। তাই এখন বিষ্ণু আর মহাবিষ্ণু এক হয়ে গেছে। কিন্তু শুধু দেব যদি বলা হয় তাহলে সংশয় এসে যেতে পারে, তাই বলা হয় মহাদেব। তেমনি অনেক রকমের দেবীরাও আছেন, কিন্তু এখানে যিনি শক্তি, যাঁর স্তুতি করা হচ্ছে তাঁকে বলছেন মহাদেবী। সেই মহাদেবীকে আমরা প্রণাম করছি। এই মহাদেবী থেকে বাকি দেবীদেরও জন্ম। যেমন লক্ষ্মীদেবী, যদিও লক্ষ্মীর উপাসকরা কখনই বলবে না যে তিনি মহাদেবী নন। কিন্তু পৌরাণিক বর্ণনাতে দেখান হচ্ছে সমুদ্র মন্থন থেকে লক্ষ্মীর আবির্ভাব। তাই লক্ষ্মীর আবির্ভাব অনেক পরের দিকে হয়েছে। কিন্তু বৈষ্ণবরা বিষ্ণু আর লক্ষ্মীকে এভাবে কখন মানবে না, তারা বলবে বিষ্ণু আর লক্ষ্মী প্রথম থেকেই একসাথে আছেন, শাক্তরা শিব আর পার্বতীকে যেভাবে দেখেন।

কিন্তু এগুলো সবই ভাবের জগৎ। আমাদের অনেক রকম জগৎ আছে, একটা আছে দৃশ্য জগৎ, যেটা আমরা চোখের সামনে দেখছি। আর দৃশ্য জগতকে প্রমাণের জগতে যখন নিয়ে আসা হয় তখন বেদে কি আছে, পুরাণে কি আছে সব দেখাতে গেলে ব্যাখ্যাগুলো এক রকম হয়ে যাবে, বর্ণনাগুলোও এক রকম হয়ে যাবে। কিন্তু ভাবের জগতে, যেখানে সাধক নিজস্ব একটা ভাবের জগতে বিরাজ করে আছেন। ভাবের জগৎ কখনই চিন্তার জগৎ হয় না, এটা একটা বিশেষ ভাব, সেই ভাবের মধ্যে ডুবে আছে। সেই ভাবের জগতে ভগবান বিষ্ণু আর লক্ষ্মী তাঁরা নিত্য, শিব আর পার্বতী এনারাও নিত্য। অনেকে আবার বলবেন সমুদ্র মন্থনের দিক থেকে দেখলেও লক্ষ্মীদেবী নিত্য। কিন্তু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এই নিয়ে আলাদা দুটো মত তৈরী করে এই লক্ষ্মীকে আলাদা করা হয়েছে। আগেকার বৈষ্ণবরা বলছেন লক্ষ্মী জাত হয়েছেন আবার আরেক দল বলবেন অনাদিকাল থেকে লক্ষ্মী বিষ্ণুর সঙ্গে একসাতজে আছেন, এই সম্প্রদায়ের নামই হল শ্রীবৈষ্ণব। রামানুজাচার্যের শ্রীভাষ্যে মনে করা হয় শ্রীলক্ষ্মী বিষ্ণুর সঙ্গে নিত্য বিরাজমানা। কিন্তু পুরাণের কাহিনীতে কখনই দেখানো হচ্ছে না যে শ্রীলক্ষ্মী প্রথম দিন থেকেই বিষ্ণুর ঘর করছেন। সেইজন্য পুরাণে বিষ্ণু আর লক্ষ্মীর কোন সন্তানের কথাও পাওয়া যায় না।

যাই হোক, এখানে মহাদেবী বলছেন এই কারণে যে যত দেবী আছেন সবার উপরে তিনি। তিনি শিবের ঘরণী তাই বলছেন *শিবায়ৈ নমঃ*। মাকে বার বার প্রণাম করছি, তিনিই মূলা প্রকৃতি, সমস্ত জগতের তিনি মঙ্গল করেন, তাই বলছেন *ভদ্রায়ৈ নমঃ*। আবার ভদ্র মানে শুভ, শ্রুতি বলছে *ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ*, আমরা কান দিয়ে যেন শুভ কথাই শুনি। মাকে যখন ভদ্র বলা হয় তখন তার অর্থ হল মা সবারই শুভ করেন, তিনি শুভস্বরূপা। আর শুধু তাই না মায়ের যে বিভিন্ন রূপ আছে সেই রূপের কথা বর্ণনা করে বলছেন –

রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ।।১০

রৌদ্র মুর্তি, যে মুর্তিতে জগতের সব কিছুর সংহার হয়, সেই রৌদ্র মুর্তিও মায়েরই, রৌদ্র রূপী মাকে প্রণাম। রুদ্র রূপের দুটো অর্থ হয়, একটা হল যিনি যুদ্ধে রুদ্র রূপ ধারণ করেন, আর দ্বিতীয় অর্থ হয় যিনি রুদ্রের

সঙ্গে আছেন। তিনি নিত্যা, গৌরী ও ধাত্রী। নিত্য একটা গুণ, যিনি চিরন্তন, প্রথম থেকেই যিনি আছেন, সেখান থেকে তাঁর একটা নাম হল নিত্যা। ধাত্রী মানে যিনি সব কিছুকে ধারণ করে রাখেন। ভগবান গীতায় বলছেন *গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা*, এই পৃথিবীকে আমি ধারণ করে আছি, তা নাহলে পৃথিবী ছিটকে বেরিয়ে যাবে। কীভাবে ভগবান ধরে আছেন, আমার ওজঃ দিয়ে অর্থাৎ আমার শক্তি দিয়ে একে ধরে আছি। মা হলেন জগদ্ধাত্রী, জগদ্ধাত্রীও তাই, মা জগতকে ধারণ করে আছেন। যে শক্তি দিয়ে এই জগৎ ধারণ করা আছে, যে শক্তির দ্বারা সূর্য নিজের জায়গায় অবস্থিত। আমরা বলতে পারি, এতো খুব সহজ ব্যাপার, নিউটন তো বলেই দিয়েছেন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের জন্য কোন কিছু ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে না। ঠিকই, মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম নিয়ে আমরা কেউ আপত্তি করছি না। মাধ্যাকর্ষণ হল জাগতিক শক্তি, কিন্তু এই জাগতিক শক্তির পেছনে একটা আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, সেই শক্তিকে বলা হচ্ছে জগদ্ধাত্রী, এখানে বলছেন ধাত্রী। মা হলেন জ্যোৎস্নাময়ী, চন্দ্ররূপিণী এবং তিনি সুখস্বরূপা। এই যে চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ, সূর্যের রশ্মি এগুলোর মধ্যেও ওনারা সব সময় চৈতন্যের স্বরূপকে দেখতেন।

পাশ্চাত্যের দার্শনিকরা আমাদের ঋষিদের এই ধরণের চিন্তা-ভাবনাকে নিয়ে খুব সমালোচনা করে। তারা বলে প্রাচ্যের মনীষিরা ঝড়ের মধ্যেও চৈতন্যকে দেখে, ঝড়ের মধ্যে চেতনকে দেখা মানে বালসুলভ দৃষ্টি। তা নয়, এগুলো কোনটাই বালসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী নয়। ভারতীয় গণিতজ্ঞরা তিন-চার দশকেই অঙ্কের সাহায্যে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। তারও প্রায় হাজার বছর পর গ্যালিলিও এই কথা বললেন আর তারও কত বছর পর নিউটন প্রমাণ করলেন পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। নিউটনের বারশ চৌদ্দশ বছর আগে ভারতের ঋষিতুল্য গণিতজ্ঞরা অঙ্কের মাধ্যমে এটাকে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু জনসমক্ষে তাঁরা কিছু প্রকাশ করলেন না, কারণ সাধারণ লোক এগুলো বুঝবে না। যার ফলে এইসব সিদ্ধান্তের প্রমাণ কয়েকজন মুষ্টিমেয় পণ্ডিতদের কাছে থেকে গেল, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কাছে থেকে যাওয়াতে কেউ মানছে কেউ মানতে চাইছে না, ঝগড়া অশান্তি লেগেই থাকছে। অথচ বীজগণিত, শূন্যের ধারণা ভারতীয়রাই প্রথম আবিষ্কার করলেন। এনারা সবাই একদিকে বিজ্ঞানী আবার অন্য দিকে খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। এনারা তাই এই জিনিষগুলোকে পুরোপুরি মানতেন।

এই শরীরের কথা ভাবলে ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাবে, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন একটা শরীর, যদি মনস্তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতে দেখি তাহলে এই শরীর হল নিউরোনসের খেলা, কেমেস্ট্রির দৃষ্টিতে দেখলে শরীরটা হল কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্যের খেলা। কিন্তু আমরা আজকে জানি শ্রীরামকৃষ্ণ এর বাইরে আরও অনেক কিছু ছিলেন। যার জন্য ঠাকুরের শরীর চলে যাওয়ার পর একশ পঁচিশ বছর হয়ে গেছে, যত দিন যাচ্ছে তত বেশি বেশি লোক ঠাকুরের কাছে আসছে। তাহলে এই শরীর, শরীরের নিউরোন, শরীরের রাসায়নিক বাইরেও কিছু একটা আছে। ঠাকুরের শরীরের পেছনে যে গুণ রয়েছে সেটাকে যেমন চৈতন্য বলছেন, ঠিক তেমনি সূর্য, চন্দ্র, তারা এদের পেছনেও যে একটা চৈতন্য সত্তা আছে, সেই চৈতন্যকে এখানে তাঁরা দেখছেন। দেখে তাঁরা বলছেন *জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ*। মানুষের জীবনে যে সুখ আসে, এই সুখ দৈবী শক্তি ছাড়া কখন আসে না, তিনিই সুখস্বরূপা, তিনিই সুখ দেন। যার জন্য দেখা যায় লোকেদের ইদানিং প্রচুর টাকা আছে কিন্তু কারুর জীবনেই সুখ নেই। পেটের গোলমাল, ব্লাড সুগার, হার্টের সমস্যা লেগেই আছে। মানুষ তাই খেয়ে সুখ পায় না, ঘুমিয়ে সুখ পায় না, মাথায় নানা রকম দুশ্চিন্তা তাই রাত্রে ঘুম হয় না, সন্তানরা অবাধ্য। কারুর জীবনেই সুখ নেই। অন্য দিকে যাদের টাকা নেই তাদের দুঃখ অন্য ধরণের, তারাও কেঁদে কেঁদে মরছে। আগেকার দিনে দেখা যেত রাজারাও সন্ন্যাস নিয়ে সংসার থেকে বেরিয়ে যেতেন। সন্ন্যাসীদের মধ্যেও ইদানিং নানা রকমের টেনশান, রোগ-ব্যাধি যেগুলো কোন সন্ন্যাসীরই হওয়ার কথা নয়, দেখা যাচ্ছে। এই যে সুখ, তা তিনি সন্ন্যাসীই হন, গৃহস্থই হন, মায়ের কৃপা যতক্ষণ না থাকে, শক্তির কৃপা যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ সুখ জীবনে আসবে না। সেইজন্য বলছেন *সুখায়ৈ সততং নমঃ*, এই যে সুখস্বরূপিণী দেবী তাঁকে আমরা সতত প্রণাম জানাই। এগুলো প্রত্যেকটি মায়ের নাম, তার মধ্যে যেগুলো বিশেষণ বা গুণ সেগুলোকে বর্ণনা করে দেবতারা স্তুতি করছেন।

স্বামীজী বলছেন All knowledge is within you, all strength is within you, তোমার ভেতরেই সব জ্ঞান, সব শক্তি তোমার ভেতরেই। তবুও তো আমরা জ্ঞান অর্জনের জন্য ছুটোছুটি করছি, সব শক্তি ভেতরে থাকতেও আমরা নিজেদের সব সময় দুর্বল মনে করছি আর শক্তি লাভের জন্য দেবীর আরাধনা করতে হচ্ছে। তাহলে স্বামীজী কেন এই কথা বলছেন? আসলে প্রথমে আপনাকে বিচার করতে হবে আপনি কে বা আপনি কি। আমি যদি নিজেকে শুধু দেহ বলে মনে করি তাহলে যে দেহটা একটা প্রাণশক্তির খেলা, শুধু সেই প্রাণশক্তির খেলার সাথে আমি নিজেকে একাত্ম করে রাখছি। কিন্তু যখন আমি নিজেকে আমার ভেতরে যে সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক চেতনা রয়েছে সেই চেতনার সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছি, তখন দেখছি আমিই সেই পূর্ণব্রহ্ম। পূর্ণব্রহ্ম মানেই সৎ চিৎ ও আনন্দ। তাই যত শান্তি নিজের ভেতরেই আর যত আনন্দ নিজের ভেতরেই। বাংলায় প্রবাদই আছে, সব শান্তি সব সুখ ভেতরে। অথচ আমরা আনন্দের সন্ধানে চারিদিকে দৌড়ে মরছি। আবার সব জ্ঞানও তো আমাদের ভেতরে। স্বামীজীর বিশেষত্ব এটাই, সৎ চিৎ আর আনন্দ, এই তিনটের আনন্দকে নিয়ে প্রবাদে যে বলছে শান্তি তোমার ভেতরে, শান্তি বাইরে কোথাও নেই, স্বামীজী আনন্দ ছাড়া আর দুটো যে দিক সৎ আর চিৎ এই দুটোকেও তিনি নিয়ে এসে বলছেন সব জ্ঞান সব শক্তি তোমার ভেতরে। চিৎ মানে সব জ্ঞানই তোমার ভেতরে আছে। তার থেকে আরও যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, সৎ রূপে তুমি চিরন্তন, তোমাকে কেউ নাশ করতে পারে না। তার মানে, সব শক্তি তোমার ভেতরেই আছে।

কিন্তু একজন লিকলিকে রোগা প্যাটকা লোককে যদি রাবণের মত বড় কোন পালোয়ানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলা হয়, সে কি লড়াই করতে পারবে? কখনই পারবে না। কেন পারবে না? তার কারণ ওর ভেতরের আধ্যাত্মিক শক্তি এখন প্রসুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, বদলে শারীরিক শক্তি প্রাণশক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে। তাই বেশি প্রাণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে কম প্রাণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু ঠিক ভাবে সাধনা করে নিজের আধ্যাত্মিক শক্তিকে প্রাণশক্তির মাধ্যমে যদি কেউ প্রকাশ করতে পারে তখন কিন্তু তার কাছে শারীরিক শক্তির অধিকারী লোকও উল্টে পড়বে। কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন মহাত্মারা এসবের মধ্যে নামতে যান না আর করতেও চান না। এর আবার অনেকগুলো ব্যাপার আছে। সব শক্তি তোমার ভেতরে, এই জিনিষটাকে আমাদের শাস্ত্র অনেক ভাবে দেখিয়েছে, এর মধ্যে কিছু রূপক আছে, কোথাও কাহিনী রূপেও দেখানো হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা একই, সব শক্তি তোমার ভেতরে। যেটা করার তা হল ওই শক্তিকে জাগানো। এটাই সত্য, সব শক্তি তোমার ভেতরে, সব জ্ঞান তোমার ভেতরে আর সব সুখ তোমার ভেতরে। যখনই কেউ বাইরে থেকে শক্তির সন্ধান করছে, বাইরের থেকে জ্ঞানের সন্ধান করছে আর সুখের সন্ধানে বাইরে ছুটে বেড়াচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে তার ভেতরের আধ্যাত্মিক শক্তির এখনও বিকাশ হয়নি। মহাবীর হনুমানের কাহিনীতে এই জিনিষটাই দেখানো হয়েছে। যখন সমুদ্রকে উল্লঙ্ঘন করার কথা হচ্ছে তখন জাম্বোবান হনুমানকে শুধু মনে করিয়ে দিলেন তোমার ভেতরে এই শক্তি আছে। তারপরেই হনুমান সজাগ হয়ে গেলেন।

স্বামীজী বারবার বলছেন তোমার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করো, এই কথা তিনি ব্যক্তি স্তরেও বলছেন, সমাজের স্তরেও বলছেন, দেশের স্তরেও বলছেন। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ ভাবে বলছেন, কারণ ভারতের শক্তি সুপ্ত। এর সঙ্গে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে, আমরা আত্মাকে যেভাবে দেখি, আমার যে শুদ্ধ চৈতন্য স্বভাব, যাঁর সব ক্ষমতা আছে, এই দৃষ্টিভঙ্গী অন্য কোন ধর্মে পাওয়া যাবে না। অন্য ধর্মে দেখে আমি ভগবানের সৃষ্টি বা আমি হলাম ভগবানের সন্তান। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে নিজেকে এক দেখার কথা বলে একমাত্র হিন্দু ধর্ম। আপনি তত্ত্বকে যেভাবে দেখবেন সেভাবেই আপনার শক্তির বিকাশ হবে। যখনই কারুর মধ্যে হীনভাব বা নিরানন্দের ভাব দেখা যাবে তখন একমাত্র কাজ হল তার ভেতরের শক্তিকে যে কোন ভাবে জাগ্রত করা। শক্তি সবারই ভেতরে, বাইরে থেকে শক্তি কখনই আসে না। ছোট সন্তান যখন মায়ের কাছে থাকে তখন তার দুরন্তপনা আর সামলান যায় না। মা যখন কাছে থাকে না, তখন তার শক্তিটা দমে থাকে। আমরা মনে করছি মা তার শক্তি, কিন্তু মা কখনই তার শক্তি নয়। মা কাছে থাকাতে তার সুপ্ত শক্তিটা জেগে ওঠে। আমার আপনার সবার ক্ষেত্রেই তাই হয়, আমরা যখন মন্দিরে ঠাকুরের কাছে যাচ্ছি, তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করছি, তখন কিছুক্ষণের জন্যও ভেতরে একটা বল আসে। যাকে ভালোবাসি তার কাছে গিয়ে বলি 'তোমার কাছে এলেই আমার ভেতরে একটা

বল আসে’। তোমার ভেতরেই বল আছে, বাইরে থেকে কিছুই আসছে না। আমরা কল্পনা করছি তিনি যেন ওই স্পার্কটা দিচ্ছেন আর ভেতরে আগুন জ্বলে উঠছে। তা নয়, ভেতরে আগুন সব সময়ই জ্বলছে। তুমি যে মনে করছ তিনি আসাতে তোমার শক্তি জাগল, তা নয়। যখনই মনে হবে আপনার মধ্যে হীনভাব, দুর্বলতার ভাব আসছে তখন আপনার ভেতরের শক্তিকে জাগাতে হবে।

শক্তিকে জাগানোর জন্য শুধু একটা পথ নেই, অনেক পথ আছে। যেমন অতীতে আপনার দ্বারা যা যা মহৎ কাজ বা ভালো কাজ হয়েছে, সেই কাজগুলোকে চিন্তা করুন তাতেও আপনার ভেতরের শক্তি জেগে যাবে। ভাবা ইনস্টিস্ট্যুট অফ এ্যটমিক রিসার্চের প্রাক্তন ডিরেক্টর কিছু দিন আগে ওনার জীবনের একটা ঘটনা বলছিলেন। একবার ওনার বিদেশে যাওয়ার ছিল। মেডিক্যাল টেস্টে দেখা গেল ওনার ব্লাড প্রেসারটা একটু উপরের দিকে আছে। ডাক্তার ওনাকে এক ঘন্টা পরে আসতে বলে দিলেন। এক ঘন্টা পরে আরেকবার মাপার পর দেখা গেলে টেনশনের জন্য ব্লাড প্রেশার আরও উপরের দিকে চলে গেছে। ডাক্তার ভদ্রলোক খুব সহৃদয় ছিলেন। উনি তাঁকে বলে দিলেন আপনি বাইরে দু ঘন্টা ঘুরে আসুন আর আপনার জীবনের একটা খুব আনন্দ মুহূর্তের ঘটনাকে চিন্তা করতে থাকুন। ডাক্তারের কথা মত উনি রাস্থা দিয়ে হাঁটতে থাকলেন আর চিন্তা করতে লাগলেন। উনি এক সময় ইতালিতে গিয়েছিলেন। ইতালির যে শহরে ছিলেন সেখানে এক নদীর উপর ওখানকার একটা ছোট্ট নৌকা করে নদীবক্ষে ভাসতে ভাসতে চারিদিকের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করেছিলেন। ওই দৃশ্যের কথা ভাবতে ভাবতে ওনার মনটা বিভোর হয়ে গেছে। মনের ওই বিভোরতায় তাঁর শরীরও একেবারে শান্ত হয়ে গেছে। দু ঘন্টা পর ডাক্তারের কাছে এসেছেন, দেখা গেল ব্লাড প্রেসার একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

যদি দেখেন আপনার মন কোন কারণে খুব উত্তেজিত হয়ে গেছে তখন আপনি অতীত থেকে কোন ভালো স্মৃতিকে মনের মধ্যে নিয়ে আসুন, ধীরে ধীরে আপনার মনের উত্তেজনা কখন প্রশমিত হয়ে আপনার মন প্রশান্ত হয়ে গেছে টেরও পাবেন না। স্মৃতিও যা বাস্তবও তাই। আমি যখন আপনার সঙ্গে থাকছি তখন আপনার আকৃতিটাই তো আমার মনের মধ্যে যাচ্ছে, আর স্মৃতিতে যখন আপনার কথা ভাবছি তখনও আপনার আকৃতিটাই আমার মনে যাচ্ছে। আমাদের মনের কাছে দুটোই সমান, এই আকৃতিও যা ওই আকৃতিও তাই, দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। আপনার মনে যখন তাই কোন দুর্বলতার ভাব বা কোন অশুভ ভাব আসছে তখন কিছু সুখস্মৃতিকে যদি নিয়ে আসা যায়, যাতে আপনার শক্তির প্রকাশ পেয়েছিল তখন ওই দুর্বলতার ভাবটা চলে যাবে। কিংবা যদি কোন শুভ জিনিষের চিন্তা করা হয় তাতেও অশুভ ভাবটা কেটে যাবে। দুঃখের সময় অতীতের কোন সুখকর ঘটনার চিন্তা করলে দুঃখের ভাবটা কেটে যাবে। যোগশাস্ত্রে এটাকেই বলছে *বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্*, যে বৃত্তিটা আসছে তার বিপরীত বৃত্তি নিয়ে এসে ওই বৃত্তিটা কেটে দেওয়া।

চণ্ডীতে ভেতরের শক্তিকে বহিঃপ্রকাশ করে সেখান থেকে শক্তিটাকে নেওয়া হচ্ছে। এই শক্তি সাধকের নিজেরই শক্তি, কিন্তু সেই শক্তিকে বাইরে মূর্তরূপে সামনে রেখে তাঁর আরাধনা করা হচ্ছে। নিজের ভেতরের শক্তি জাগরণে এটাও একটা পথ। সেইজন্য ঠাকুরের ছবি বা মা দুর্গা বা মা কালীর ছবি বা মূর্তির সামনে যখন প্রার্থনা করা হয় তখন ভেতরের শক্তিটা জেগে ওঠে। এই কথাই বারবার বলা হচ্ছে, শক্তি কখন বাইরে থেকে আসে না। অদ্বৈত বেদান্তে তো বাইরে থেকে শক্তি আসার ব্যাপারটা আদৌ দাঁড়াবে না। তন্ত্র মতে গেলেও কোন আপত্তি নেই, কারণ যার ভেতরে পূর্ণ চৈতন্য রয়েছে তার ভেতরে শক্তি তো আপনা থেকেই জাগবে। আর যদি আপনি আধ্যাত্মিক দর্শনে না গিয়ে পুরো মনস্তাত্ত্বিক দর্শনে যান তাতেও একই জিনিষ হবে। এক সময় তো আপনি ভালো কিছু করেছিলেন, এক সময় তো আপনার শক্তির প্রকাশ হয়েছিল। এর আগে অনেকবার আপনি অনেক কিছু করেছিলেন যেখানে আপনি আপনার প্রলোভনকে জয় করেছিলেন। যখন আপনার কোন সমস্যা হচ্ছে তখন আপনি যদি অতীতের এই ঘটনাগুলো মনে করেন আবার আপনার শক্তি জেগে উঠবে। ইংরাজীতে নামকরা একটা কবিতা আছে, যেখানে বলছেন এক যুবতীর স্বামী যুদ্ধে মারা গেছে। মেয়েটি আর কাঁদছে না। সব লোক বলে দিল মেয়েটি আর বাঁচবে না, স্বামীর শোকে এই মেয়েটিও মারা যাবে। তখন একজন বয়স্ক মহিলা মেয়েটির ছোট শিশুকে তার কোলে এনে তুলে দিয়েছে। তখনই মেয়েটির চোখ দিয়ে জল বেরোতে শুরু করেছে। মেয়েটির ভেতরে যে ভালোবাসা ছিল, সেই ভালোবাসা এখন বেরোতে শুরু করেছে।

আমাদের ভেতরে সবটাই আছে, সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তি সবটাই আছে। এই জগতে কেউ অভাগা হয় না, যার কিছুই নেই, জন্ম থেকেই আধমরা, তারও জীবনে অনেক ভালো ভালো মুহুর্ত এসে যায়। ওই ভালো মুহুর্তের উপর নিজেকে ধরে রাখলে আস্তে আস্তে তার নেতিমূলক যা কিছু আছে সব চলে যাবে। কথামৃতের পাতায় পাতায় ঠাকুর এই কথা বলছেন – আমি ঈশ্বরের নাম করেছি আমার আবার পাপ কিসের! আমি দুর্গার নাম করেছি আমার আবার বিপদ কিসের। এই শক্তি দুর্গার নাম করার জন্য আসছে না, আপনার ভেতরেই সেই শক্তি আছে, কারণ এর আগে বিভিন্ন সময়ে আপনি এই বিপদকে জয় করেছেন, এইভাবে নিজেকে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাইরে কিছু অবলম্বন অর্থাৎ বহিঃমূর্তি যদি থাকে তখন আরাধনা করাটা সহজ হয়ে যায়। দেবতারাও এখানে ঠিক তাই করছেন, তাঁদের নিজেদের ভেতরে যে শক্তি, সেই শক্তিরই আরাধনা করে জাগাচ্ছেন। চণ্ডী হল পুরাণধর্মী, পুরাণে যে কোন ভাব মূর্ত রূপ ধারণ করে নেয়।

সেই দেবী, যাঁকে এই চোখ দিয়ে কেউ কোথাও দেখতে পাচ্ছেন না, হিমালয়ের কাছে গিয়ে সেই দেবীর উদ্দেশ্যে দেবতারা স্তুতি করছেন। স্তুতিতে দেবীরই কয়েকটি নাম পর পর বলার পর বলছেন আমরা সেই জগদম্বাকে প্রণাম করছি। নামের পরে মায়ের কয়েকটা গুণের বর্ণনাতে চলে যাবেন। বিশেষ্য আর বিশেষণ, নামও এক দিক দিয়ে বিশেষণ হয়। যার যেমন গুণ থাকে সেই গুণ অনুসারে তার নাম করা হয়। মেয়েদের অনেক সময় নাম দেওয়া হত চন্দ্রমুখী, তার মানে সত্যিই মেয়েটিকে দেখতে খুব সুন্দরী, মুখটা তার চাঁদের মত। চন্দ্রমুখী একটা নাম, কিন্তু এই নাম এসেছে তার বৈশিষ্ট্য থেকে। রাম বা কৃষ্ণ এই যে নাম, এই নামগুলোও বিশেষ একটা গুণ থেকেই এসেছে। যেমন শিব, শিব মানে শুভ, শিব হলেন শুভ তাই তাঁর নাম শিব। শেষ পর্যন্ত সবটাই গুণের উপর দিয়ে চলছে, গুণ থেকে সেটা বিশেষ্য হয়ে যায়। আবার ওই বিশেষ্য থেকে আবার বিশেষণে চলে যায়। যেমন শুভ হলেন শিব, যিনি শিবকে আধার করে শিবের সঙ্গে আছেন তার নাম হয়ে গেল শিবা। তারপরের মন্ত্রে স্তুতি করে বলছেন –

কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্মো নমো নমঃ।
নৈর্ঋত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ শর্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ।।১১

শরণাগতের কল্যাণকারিণী, বৃদ্ধি এবং সিদ্ধিরূপা দেবীকে আমরা বারংবার প্রণাম করি। এখানে ব্যাখ্যা করে বলছেন, যারা মায়ের শরণাগত তাদের বৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধি অনেকগুলো অর্থে হয়। ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে যে সুদ পাওয়া যায়, সুদের আরেকটা নাম বৃদ্ধি। এতেও এক প্রকার আয় বৃদ্ধি হচ্ছে। যারা মায়ের শরণ নেয় তাদের আয় বৃদ্ধি হয়। মা হলেন বৃদ্ধিরূপী কল্যাণী, মা যখন লোকের মঙ্গল করেন তখন তিনি বৃদ্ধিরূপী কল্যাণ করেন। কল্যাণও অনেক ভাবে হতে পারে। আমাদের পরম্পরাতে এই ধরণের অনেক কাহিনী আছে, যেমন একবার শ্রীকৃষ্ণ এক ভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে গেছেন। ব্রাহ্মণের একটি মাত্র সন্তান, ব্রাহ্মণের মনটা সন্তানে আটকে আছে। শ্রীকৃষ্ণ গিয়ে অভিশাপ দিলেন তোমার ছেলেটি মারা যাক। শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে পরামার্থ সিদ্ধির রাস্তা পরিষ্কার করে দিলেন। ছেলেটি মরে গেল, এখন ব্রাহ্মণের আর কিছু নেই, এবার ভগবানের দিকে তার পুরো মন যাবে। কিন্তু আমরা কেউ এভাবে ভগবানের কৃপা চাইতে যাব না। কারুর এই ধরণের কোন ক্ষতি বা নাশ হয়ে গেলে অনেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, ভালোই হল এবার তুমি ঈশ্বরের দিকে পুরোপুরি মন দিতে পারবে। এভাবে কখন ঈশ্বরের দিকে মন যায় না। যদিও বা যায় তাহলে সেটা হয়ে যাবে মর্কট বৈরাগ্য। এখানে বলছেন বৃদ্ধিরূপী কল্যাণ, হানিরূপী কল্যাণ নয়। কার কিসে মঙ্গল হবে আমরা কেউ জানি না। কিন্তু তোমার বাড়ি ভেঙে যাক, তোমার টাকা-পয়সা চলে যাক, তোমার স্ত্রী-সন্তান মরে যাক তাহলে তোমার ঈশ্বরের দিকে মন যাবে, আমরা এই রকম কল্যাণ চাই না, আমাদের বৃদ্ধিরূপী কল্যাণ চাই। আর সিদ্ধি, যে কাজগুলো করছি সেই কাজগুলিতে যেন সিদ্ধি পাওয়া যায়। মা এই বৃদ্ধি আর সিদ্ধি দুটোই দেন। এই সিদ্ধির সাথে অষ্টসিদ্ধির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, এখানে কার্যসিদ্ধির কথাই বলা হয়েছে।

আর বলছেন *নৈর্ঋত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ শর্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ*, লক্ষ্মী আমাদের তিন রকমের। রাক্ষসরা তাদের সমৃদ্ধির জন্য যে লক্ষ্মীর আরাধনা করে, সেই লক্ষ্মীকে নৈর্ঋতি বলে, তেমনি রাক্ষসদের এক দেবী আছেন তাঁকে কৃত্যা বলে। গৃহস্থরা তাদের সার্বিক সমৃদ্ধির জন্য যাঁর আরাধনা করে তাঁকে লক্ষ্মীই বলে। দেবতাদের

লক্ষ্মীকে শর্বাণী বলে। দেবতারা তাই বলছেন, মা! তুমিই নৈর্ঋতি, তুমিই লক্ষ্মী আর তুমিই শর্বাণী, তোমাকে আমরা প্রণাম করছি। রাক্ষসদের যে সমৃদ্ধি, মানুষদের যে সমৃদ্ধি আর দেবতাদের যে সমৃদ্ধি হয়, তা তোমার জন্যই হয়।

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ।।১২

দুর্গা শব্দের কতকগুলি অর্থ দিয়ে মায়ের গুণের কথা বলা হচ্ছে। *দুর্গা* মানে যিনি দুরধিগম্যা, *দুর্গপারায়ৈ* মানে যিনি দুর্গম অবস্থা থেকে পার করে দেন। *সারায়ৈ* মানে মা হলেন সারভূতা, যে কোন জিনিষের যে সার, সেটা মা দুর্গা। গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান যেমন বলছেন অমুক জিনিষের মধ্যে আমি অমুক, ঠিক তেমনি এখানে সার বলতে সেটাই বোঝাচ্ছে। যে কোন জিনিষের যে সার, বস্তুর যে essence, সেটা ভগবান। কৃষ্ণও যা কালীও তাই। *সর্বকারিণ্যৈ*, মা সর্বকারিণী, সব কিছুর কারণ মা। ভগবানই তো একমাত্র আছেন, তাই তিনি অগ্নি রূপেও আছেন আবার অগ্নিকে যে শীতল করে, সেই রূপেও তিনি আছেন। হিম রূপেও তিনি আছেন আর সেই হিমকে দূর করবার জন্য যে জিনিষ আছে, সেটাও তিনি। সর্বকারিণী, তিনিই সব। *খ্যাত্যৈ*, খ্যাতি মায়েরই একটি নাম। এখানে খ্যাতির অর্থ হল, যখন কোন জিনিষের নামকরণ করা হয়, সেই অর্থে এখানে খ্যাতি বলছেন। *তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ*, কৃষ্ণা, ধূম্রা এগুলো মায়ের রূপ। বিভিন্ন কাজের সময় মা বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন।

অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ।।১৩

বিদ্যারূপে মা সৌম্যা আবার অবিদ্যারূপে মা রৌদ্রারূপা। *জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ*, এই জগৎকে প্রতিষ্ঠা করে যিনি ধারণ করে আছেন, যে ক্রিয়াশক্তিতে তিনি সব কিছু করেছেন তাঁকে আমাদের প্রণাম। কিন্তু তার আগে বলছেন অতিসৌম্য আবার অতিরৌদ্র রূপ, এই দুটো বিপরীত রূপ মায়ের একসঙ্গে চলে। এই কটি মন্ত্রে মায়ের কয়েকটি নামের বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্তুতি করা হল। নামের পর এবার মায়ের কিছু কিছু গুণ নিয়ে বলছেন। যদিও এই গুণগুলো মাঝে মাঝে মহাজাগতিক স্তরে যাচ্ছে কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের জাগতিক স্তরেই এই গুণগুলিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে মূল্য দেওয়া হয়। সুস্থ স্বাভাবিক জীবন চালাতে যে গুণগুলো আমাদের সবারই মধ্যে থাকা দরকার, যার সাহায্যে আমরা শুভ পথে স্থিত থাকতে পারছি, শুভ হোক আর যাই হোক আমরা একটা ভালো পথে অবস্থান করে থাকছি। সেই গুণগুলোকে এখানে মায়ের নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে স্তুতি করা হচ্ছে। এর আগে বলা হয়েছিল দারিদ্র রূপেও তিনি, দুঃখ রূপেও তিনি, কিন্তু এখান আর সেইভাবে বলা হবে না। মানুষের ভেতরে যা কিছু শুভ, যা দিয়ে আমাদের জীবনযাত্রা চলছে সেগুলোকে নিয়ে মায়ের স্তুতি করা হচ্ছে।

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ(১৪) নমস্তস্যৈ (১৫) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।১৬

ভগবান আছেন আর ভগবানের মায়া আছে। ভগবানের মায়াতেই সৃষ্টি আবার ভগবানের মায়াটাই সৃষ্টি। তাহলে মায়া কার? ঈশ্বরের নাকি যে মায়ার মধ্যে আছে তার? মায়া ঠিক কার বলা খুব মুশকিল। সাংখ্যবাদীদের পক্ষে মায়াকে মানা তো অনেক দূরের কথা, মায়া কি জিনিষ তাই জানে না। বেদান্ত আবার মায়ার কথাই বেশি বলে, আবার মায়াকে নিয়েই অদ্বৈত বেদান্তকে সবাই আক্রমণ করে। মায়া কোথায় আছে? মায়াটা কার? এই প্রশ্ন দিয়েই সবাই বেদান্তের গলা টিপে ধরে। যদি বলেন মায়া প্রকৃতির তাতেও ঠিক ঠিক বলা হবে না। কারণ আপনি যখন পুরো দর্শনের উপর দিয়ে যাবেন তখন মায়া প্রকৃতির এই কথা বলা যাবে না। এই কথা সাংখ্যদর্শন মানবে না আবার যোগদর্শনেও মানবে না, বেদান্তেও মানবে না। বেদান্তের কাছে যেটা মায়া সাংখ্য আর যোগদর্শনের কাছে সেটাই প্রকৃতি। আজকের দিনে আমরা বলি বটে প্রকৃতি যা মায়াও তাই। কিন্তু প্রকৃতির উপাদান আর মায়ার উপাদান পুরো অন্য ধরণের। প্রকৃতি সব সময় চিরন্তন, প্রকৃতিকে আপনি অতিক্রম করতে পারেন কিন্তু প্রকৃতি কখন নাশ হবে না। কিন্তু জ্ঞান হয়ে গেলে মায়া যখন নাশ হয়ে যায় তখন মায়া নেই। তাই মায়ার নাশ হয় কিন্তু প্রকৃতির কখন নাশ হয় না। প্রকৃতি আর মায়ার মধ্যে এটি একটি মৌলিক তফাৎ। বেদান্তীদের যখন অন্যান্য দর্শন

থেকে আক্রমণ করা হয় তাঁরা প্রথমে এই প্রশ্নই করেন, মায়া যখন আছে বলছেন তখন বলুন মায়া কোথায় আছে, মায়া কোথা থেকে এল? এইসব প্রশ্ন যখন আসে তখন আপনাকে পুরো যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করে এর উত্তর দিতে হবে। আপনি যখন বললেন প্রকৃতি নিত্য, তাতে আপনি একটা ব্যাখ্যা করে দিলেন। মায়া যখন বলছেন তখন তাকে তো কোথাও থাকতে হবে। যদি বলেন ব্রহ্মের মধ্যেই মায়া আছে, তাহলে যিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ তাঁর মধ্যে কোথায় মায়া থাকবে! মায়া যদি ব্রহ্মের বাইরে থাকে তাহলে দুটো সত্তা এসে যাচ্ছে, অথচ বেদান্ত মতে ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন সত্তা নেই। তাহলে তো সাংখ্যবাদীরাই ঠিক বলছে, চৈতন্য আর জড় দুটো সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা, দুটো সত্তা অনাদি কাল ধরে পাশাপাশি প্রবাহিত হয়ে চলেছে। দুটো যেখানে মিলছে সেখানেই সৃষ্টি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

মায়া কার? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আচার্য শঙ্করও বলছেন *যস্য দৃশ্যতে তস্য*, মায়াকে যে দেখছে মায়া তার। এই উত্তর দেওয়ার পরেও বিরোধীরা মায়ার ব্যাপারে আচার্যকে ছাড়ছেন না। তখন আচার্য বলছেন মায়ার ব্যাপারে জেনে তোমার কী হবে? বলছে জগতের মঙ্গল হবে। বলছেন লোকের মঙ্গল তুমি ছেড়ে দাও। তখন আবার বলছে আমার মধ্যে অবিদ্যা আছে। তাহলে তো তুমি জেনেই গেলে অবিদ্যা কোথায় আছে। বেদান্তের প্রত্যেকটি যুক্তি একেবারে কাঁটায় কাঁটায়, কিন্তু মায়াতে এসে বেদান্তের যুক্তি অনেক দুর্বল হয়ে যায়। বেদান্তও মায়াকে ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারে না। যার জন্য স্বামীজী বলে দিলেন মায়া হয় statement of fact। Statement of fact মানে, আছে। কিন্তু কেউ যখন বেশি তর্কাতর্কি করে তখন বলেন যে মায়াকে দেখছে তার মধ্যে মায়া আছে। যেমন ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেলে মায়াকে দেখা যায় না, তাই যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁর মধ্যে মায়া নেই। তখন ওরা বলছে, মায়ার ব্যাপার জেনে আমার উপকার হবে কারণ অবিদ্যার নাশ হবে। আচার্য তখন বলছেন, যার অবিদ্যা আছে সে ঠিক করবে তুমি এত মাথা খারাপ করছ কেন। না, আমার মধ্যে আছে। তাহলে তো তুমি জেনেই গেলে তোমার অবিদ্যা আছে। এটাই বুদ্ধির খেলা, আচার্য শঙ্করের তুখোড় বুদ্ধি। তবুও প্রশ্নটা থেকে যায়। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে এইসব বুদ্ধির খেলা ধরা অসম্ভব। গ্রামের লোক যদি প্রশ্ন করে 'মহারাজ! মায়া কি'? তাকে যদি বলা হয় মায়া তুমি বুঝবে না। আমি যদি নাই বুঝি তাহলে আপনারা কথা শুনে আমি কী করব! আর যদি বলা হয় *যস্য দৃশ্যতে তস্য*, তখন বেচারীর মাথাটা আরও খারাপ হয়ে যাবে। ওদেরকে বোঝাবার জন্য এখানে বলছেন ভগবান বিষ্ণুর যে শক্তি সেটাই বিষ্ণুমায়া। কিন্তু আচার্য শঙ্করের কাছে যদি এই কথা বলা হয় তখন উনি এটাকেও উড়িয়ে রেখে দিয়ে বলবেন, ভগবানের মধ্যে মায়া কোথা থেকে এল! কিন্তু সহজ করে বলার জন্য এই ধরণের কথা বলা হয়, ভগবান আর তাঁর মায়া, ঠাকুরও বলছেন ব্রহ্ম আর তাঁর শক্তি, কিংবা ঈশ্বর আর তাঁর মায়া। বেদান্তের দৃষ্টিতে এই কথাগুলোও দাঁড়াবে না। কিন্তু বেদান্তের ব্যাপারে যদি সাধারণ লোকেদের সামনে বলতে যান বেদান্ত ছিটকে বেরিয়ে যাবে। সেইজন্য বেদান্ত এখনও সাধারণ মানুষের মধ্যে ঢুকতে পারল না, অথচ দর্শনের দিক দিয়ে বেদান্তের দর্শনই শ্রেষ্ঠ। অন্য দিকে চণ্ডীর মত গ্রন্থগুলো দর্শনের মর্যাদা পেল না।

ধর্ম তাই সব সময় দুটো স্তরে চলে। প্রথম স্তর হল যেখানে একেবারে উচ্চমানের দর্শন চলছে, কিন্তু কোন দিন এই দর্শন জনগণের মধ্যে জায়গা করে নিতে পারবে না। কিন্তু এই দর্শনই সব কিছুকে নির্দেশ দেয়। আর অন্য দিকে দ্বিতীয় স্তরে এই জনপ্রিয় ধর্মগুলো চলে। কথামৃতে ঠাকুরের ঠিক ঠিক যে ভাব আমরা পাই, সেই ভাবকে যদি সাধারণ মানুষকে বলতে যাওয়া হয়, তারা কেউ নিতে পারবে না, সবাই ছিটকে যাবে। স্বামীজী তুরিয়ানন্দজীকে বলছেন – গৃহস্থদের সামনে তুমি এত ত্যাগের কথা কেন বল! গৃহস্থদের ত্যাগের কথা বেশি বললে তারা ঘাবড়ে যাবে। গৃহস্থদের স্ত্রী, পুত্র, সম্পদ, ঐশ্বর্য সব চাই। এর মধ্যে সে একটু কিছু হয়ত ছেড়ে দিতে রাজী হবে কিন্তু পূর্ণ ত্যাগ কখনই তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেইজন্য চণ্ডীর মত গ্রন্থ সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব জনপ্রিয়, কারণ এর মধ্যে সমৃদ্ধির কথা বেশি আছে, ত্যাগের কথা নেই বললেই চলে। কিন্তু সত্য হল ত্যাগ। সাধারণ মানুষের জন্য ত্যাগ নয়, তাদের জন্য হল ধর্ম, অর্থ আর কাম। তাদের কল্যাণরূপী বৃদ্ধি চাই। এদের জন্য তাই বলা হয় ভগবান বিষ্ণু সর্বশক্তিমান, তাঁর ভেতর থেকে মায়া বেরিয়ে আসে। মায়া বেরিয়ে যেতেই সৃষ্টিও শুরু হয়ে গেল। যাকে বিষ্ণুর মায়া বলা হয়, মা সেটা তুমি।

যখনই মায়ার কথা বলা হয় তখন আমরা বুঝতে পারি যে বেদান্তের কথা বলছে, যখন শক্তির কথা বলবে তখন এই মায়াই ধীরে ধীরে তন্ত্রের দিকে ঢুকে যাবে। বিষ্ণুমায়া যখন বলছেন তখন তন্ত্র পুরাণের মত চলে গেল।

তাহলে কি সব কটা মতকে এক বলা যেতে পারে? হ্যাঁ বলা যায়, যেমন পুরাণের অধ্যাত্ম-রামায়ণে সব কটিকে সমন্বয় করে বলছে – সীতাও যা, লক্ষ্মীও তাই, মায়াও তাই, প্রকৃতিও তাই, শক্তিও তাই, বিষ্ণুমায়াও তাই। কিন্তু যখন নির্দিষ্ট কোন দর্শনের ভিত্তিতে যাওয়া হবে তখন প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা রাখতে হবে। সেইখানে গিয়ে মায়া আর বিষ্ণুমায়া দুটোতে তফাৎ হয়ে যাবে, মায়া মানে মিথ্যা কিন্তু বিষ্ণুমায়া মিথ্যা হবে না, বিষ্ণুমায়া মানে ভগবানের শক্তি। আচার্য শঙ্করও কোথাও মায়াকে মায়া রূপেই বলছেন, আবার কোথাও শক্তি রূপে বলছেন। এই জিনিষগুলো শাস্ত্র পড়ে বা শুনে বোঝা যাবে না, পড়তে পড়তে যখন গভীর চিন্তনের মধ্যে মগ্ন হয়ে যাবেন, তখন জিনিষটা আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। যিনি পূর্ণব্রহ্ম তাঁরই এই নানান রূপ। এই নানান রূপকে আপনি শক্তি রূপেও দেখতে পারেন আবার মিথ্যা রূপেও দেখতে পারেন। যখন মিথ্যা রূপে দেখবেন তখন মায়া, যখন বাস্তবিক রূপে দেখছেন তখন সব কিছু বিষ্ণুরই শক্তি। শক্তি হলে তখন এটাকেই ভক্তরা বলবে লীলা। যাই হোক, এখন এইভাবে পর পর মায়ের বিভিন্ন গুণের বর্ণনা করে স্তুতি করে যাচ্ছেন। এই মন্ত্রে স্তুতি করে দেবতারা বলছেন যিনি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বিষ্ণুমায়া রূপে অধিষ্ঠিতা সেই দেবীকে আমরা বারংবার প্রণাম করি।

যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ(১৭) নমস্তস্যৈ(১৮) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।১৯

সমস্ত প্রাণীর মধ্যে যে চেতনা, যে চেতনা সমস্ত জীবকে সজীব করে রেখেছে, এই চেতনা মা নিজে। গীতাতে চেতনাকে বলছেন, আমাদের মধ্যে যে আমি বোধ হচ্ছে এটাই চেতনা। সমস্ত শরীরে যে বোধ আছে, আঙুলে একটা মশা বসলে আমি বুঝতে পারছি যে একটা মশা বসেছে, এটাই চেতনা। চেতনা বলতে চৈতন্যের চেতনার কথা বলা হচ্ছে না। এই যে আমার চেতনার জন্য আমি বুঝতে পারছি এটা আমার শরীর, নিজের শরীরের প্রতি যে আসক্তি আর নিজের পরিজনদের সাথে যে অভিষ্বঙ্গি, এই যে চেতনা এটা মায়েরই রূপ। বলছেন সেই চেতনারূপী মাকে আমরা বার বার নমস্কার করি।

যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ(২০) নমস্তস্যৈ(২১) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।২২

বুদ্ধি মানে নিশ্চয়াত্মিকা, যার দ্বারা মানুষ ঠিক করে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। শাস্ত্রের কথা ও গুরুবাক্য শ্রবণ করে এবং নিজের যে আত্মশক্তি ও নিশ্চয়াত্মিকা শক্তি, এই শক্তিকে বার বার আঘাত দিয়ে বুদ্ধিকে শাণিত করতে হয়। যতক্ষণ শাস্ত্র অধ্যয়ন না করা হয়, গুরুবাক্য শ্রবণ না করা হয় ততক্ষণ বুদ্ধি জাগ্রত হয় না। আদিবাসী বা উপজাতিদের নিজেদের নিজস্ব কিছু কিছ সহজ ধারণা থাকে, যেখান থেকে ওরা জানে এটা ঠিক এটা ভুল। আমাদের মনে হবে সেই দিক থেকে ওদের মূল্যবোধ অনেক ভালো। কিন্তু তা নয়, এদের চিন্তাধারা ও ভাবনার জগৎ এখনও অনেক অনুন্নত। আমাদের স্তরে চিন্তা-ভাবনা অনেক উন্নত হতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্য আমরা বিভিন্ন রকমের compromise করতে থাকি। Compromise যাতে কম করতে পারি সেইজন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন আর গুরুবাক্যে বিশ্বাস রাখার কথা বলা হয়। শাস্ত্রের কথা আর গুরু বাক্যে বার বার চিন্তন করতে হয়, চিন্তন করলে বুদ্ধি দৃঢ় হয়। এই শক্তি, যে শক্তিতে বুদ্ধি দৃঢ় হয়, এটা মায়েরই রূপ। সেই বুদ্ধিরূপী মাকে আমরা বার বার প্রণাম করছি।

যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ(২৩) নমস্তস্যৈ(২৪) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।২৫

নিদ্রাও একটি শক্তি, মানুষের ঘুম যদি না হয় মানুষ পাগল হয়ে যাবে। ঘুম নিয়ে ইদানিং প্রচুর গবেষণা চলছে। সমুদ্রের গভীরতা তো একেই পাঁচ-ছয় কিলোমিটার, সমুদ্রের সেই তলদেশে যে পাহাড় আছে তাতে যে গুহা আছে সেখানে যে মাছ থাকে তারা তো অন্ধকার ছাড়া কিছু জানেই না, এই মাছেরা ঘুমোয় কিনা তার উপরেও গবেষণা করা হচ্ছে। প্রত্যেকেরই ঘুম খুব দরকারী। সারাদিন আমরা যা কিছু করেছি, যা কিছু চিন্তা-ভাবনা করেছে, ঘুমের সময় আমাদের মস্তিষ্কের কোশগুলো সেগুলোকে সাজাতে থাকে। ঘুমের যদি গোলমাল হয়ে যায়, প্রথমের দিকে মানুষ খিটখিটে হয়ে যায়। তারপর আস্তে আস্তে তাকে পাগল তৈরী করে দেবে। পাগলদেরও

ঘুম হয় না, আর যাদের ঘুম হয় না তারাও কিছু দিন পর পাগল হয়ে যায়। সেইজন্য প্রত্যেকেরই ঘুম খুব দরকার। যখন কারুর খুব মানসিক বিপর্যয় হয় তখন ডাক্তাররা জোর করে ড্রাগস দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, যাতে ওই চেতনাটা চাপা পড়ে যায়। যাঁরা খুব সাধন-ভজন করেন তাঁদের মধ্যে জাগতিক ভাবগুলো ঢুকতে পারে না, না ঢুকতে পারার জন্য অনেক কম ঘুমেও তাঁদের কাজ চলে যায়। সেইজন্য সাধকদের তিন চার ঘন্টা ঘুমেই শরীর তরতাজা থাকে। কিন্তু যাদের মস্তিষ্ক খুব সক্রিয়, তাদের আরেকটু বেশি ঘুম দরকার। মায়ের কৃপা না হলে ঘুম কিন্তু হবে না। অন্য দিক দিয়ে বলা হয় নিদ্রা মায়ের তামসিক রূপ। নিদ্রা রূপে কুম্ভকর্ণকে যে তামসিক করে রেখেছিলেন, অসুরদের যে নিদ্রার দ্বারা ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়, এটাও মায়েরই রূপ। দুটো অর্থেই হয়। তবে আমরা এখানে মেনে চলছি, মানুষের জীবনে যে জিনিষগুলো খুব দরকারী, জীবন চালাতে যে জিনিষগুলিকে বেশি মূল্য দিই, সেগুলোকে নিয়েই এখানে আলোচনা চলছে। এই নিদ্রারূপিণী মাকে আমরা বারংবার প্রণাম করছি।

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ(২৬) নমস্তস্যৈ(২৭) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।২৮

ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়াটাও মনের রোগ। মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে গেলে প্রথমেই জিজ্ঞেস করবে খিদে কেমন। শুধু খাওয়া আর ঘুম এই দুটোকে দিয়েই আমাদের শরীর মন কেমন চলছে জানা যায়। কোন সাধু একবার ঠিক করলেন তিনি মৌন থাকবেন। কিছু দিন পর সেই সাধুর রুমমেট অন্য সাধুদের বলছেন, সারা রাত তাঁর ঘুম হচ্ছে না। কারণ জিজ্ঞেস করে জানা গেল, ওই মৌন সাধু সারা রাত এক নাগাড়ে ঘুমের মধ্যে বক্ বক্ করতে থাকেন। দিনের বেলায় কথা না বলার জন্যে ভেতরে যেটা জমে থাকে সেটাই রাত্রিবেলা ঘুমের মধ্যে ক্রমাগত বেরিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে তার পাশের সাধুটির ঘুমের দফারফা হয়ে গেছে। যাদের মানসিক রোগ হয়, বা মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছে বা শরীর খারাপ, এটা পুরোপুরি ধরা পড়ে তার খিদেটা কেমন আছে। এই ক্ষুধা মায়েরই শক্তি। এই ক্ষুধাকেই ভগবান গীতাতে অন্য ভাবে বলছেন – *অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ*, প্রাণিদের মধ্যে বৈশ্বানর রূপে তিনি, ক্ষুধা রূপে ভগবানই আছেন। মন যখন চঞ্চল থাকবে তখন হয় খাওয়া কমে যাবে আর তা নাহলে বেড়ে যাবে। সেইজন্য যদি দেখা যায় কেউ খুব রোগা কিংবা খুব বেশি মোটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে তার মনের মধ্যে কোন কারণে অস্থিরতা চলছে। মায়ের কৃপা না হলে খিদে হবে না। সেইজন্য কেউ যদি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে মায়ের আরাধনা করে তাহলে এগুলো সব ঠিক হয়ে যায়। এই ক্ষুধারূপিণী মাকে আমরা বার বার প্রণাম করছি।

যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ(২৯) নমস্তস্যৈ(৩০) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।৩১

ছায়া মানুষের চিরন্তন সঙ্গী। কঠোপনিষদে বলছেন *ছায়া তপঃ*, মানুষ যখন ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে এগোয় তখন এই জ্ঞানকে ছায়া আর আলো রূপে দেখে। আলোর সঙ্গে ছায়া স্বাভাবিক, শুধু আলো যদি থাকে তাহলে জীবন আর চলবে না, যেমন সূর্যে জীবন চলতে পারে না। তার থেকেও বড় হল জীবনের সঙ্গে ছায়া অভিন্ন রূপে জড়িয়ে আছে। যেমন ব্রহ্মের সঙ্গে মায়া অভিন্ন রূপে জড়িয়ে আছে কিংবা ব্রহ্মের সঙ্গে শক্তি অভিন্ন রূপে জড়িয়ে আছে, ঠিক তেমনি আলোর সঙ্গে ছায়া বা কায়ার সঙ্গে ছায়া জড়িয়ে আছে। কায়া আর ছায়া সমান, কায়াও যা ছায়াও তাই। শ্রীমাও বলছেন ছায়া কায়া এক, ঠাকুরের ছবি দেখলেই হবে। এই কথা বলে শ্রীমা সাধনার একটা নতুন পদ্ধতি দিলেন। আগের আগের আমাদের স্মৃতি শাস্ত্রে যত সাধনার কথা বলা আছে সেখানে এই সাধনার কথা কোথাও নেই। ঠাকুর আর ঠাকুরের ছবি অভিন্ন। ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকলেই হবে। শিবের ছবি যখন তৈরী করা হয়েছে, পুরাণে যে শিবের বর্ণনা করা হয়েছে সেটাকে মাথায় রেখেই শিবের ছবি আঁকা হয়েছে। শিবের এই ছবি কিন্তু ঠিক ঠিক ছায়া নয়। ঠাকুরের যে ছবি এটাই ঠিক ঠিক ছায়া। আর তখনকার দিনে ছায়াই বলা হত, যেমন চলচ্চিত্রকে ছায়াছবি বলা হয়। ছায়া আর কায়া, একটা আলোর মূর্তি আরেকটা অন্ধকারের মূর্তি। সেই অর্থে বলছেন মা হলেন ছায়ারূপিণী। সেই ছায়ারূপিণী মাকে আমরা প্রণাম করছি।

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ(৩২) নমস্তস্যৈ(৩৩) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।৩৪

মানুষের ভেতরে যে শক্তি তাকে আত্মোন্নতির দিকে নিয়ে যায়, এখানে সেই শক্তির কথা বলা হচ্ছে। যে শক্তি দিয়ে অপরকে জয় করা হয়, আমি অপরের উপর জয়ী হব, বেদান্তে এই ধারণার কোন স্থান নেই। অথচ আমরা যখন কোন কিছু নিয়ে তর্কাতর্কি করি তখন সব সময় আমাদের ইচ্ছে থাকে আমি অপরের উপর জয়ী হব। বাড়িতে ঝগড়া হচ্ছে, পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হচ্ছে, সব জায়গায় ওই একটাই ভাব, আমি জয়ী হব। এই ভাব বেদান্তে নেই। শক্তি হল আত্মোত্থান, নিজেকে ওপরে তোলার জন্য যে শক্তি। গীতায় অর্জুনকে ভগবান বলছেন, *ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ*, তোমার ভেতরে ক্লীব ভাবকে ঘাঁটি গড়তে দিও না। যে শক্তির সাহায্যে ওই ক্লীব ভাব থেকে নিজেকে উত্তিষ্ঠত ও জাগ্রত করা হয়, সেই শক্তির কথাই এখানে বলা হচ্ছে। অপরকে যখন জয় করা হচ্ছে সেখানেও এই একই শক্তি, কিন্তু এখানে যখন শক্তির কথা বলছেন, তখন এনারা শক্তিকে এই অর্থেই নেন, বেদান্তেও শক্তির অর্থ হল নিজেকে নিজের মধ্যে ধরে রাখা বা নিজেকে আত্মজ্ঞানের দিকে ওপরে তুলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা। এই শক্তিকেই যখন আমাদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করা হবে তখন তার অর্থ করবে, যে শক্তি দিয়ে আমরা অপরকে দাবিয়ে রাখতে পারি, কিন্তু বেদান্তের কাছে এই অর্থ হবে না। মা হলেন এই শক্তি, শক্তিরূপিণী মাকে আমরা প্রণাম করি।

যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ(৩৫) নমস্তস্যৈ(৩৬) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।৩৭

তৃষ্ণা আছে বলে আমরা জল পান করি, জল পান করছি বলে আমাদের শরীরের কোশিকাগুলি বেঁচে আছে। জল পান বন্ধ করে দিলে কিছু দিনের মধ্যে মানুষ মরে যাবে। তৃষ্ণা মনের এক বিশেষ অবস্থা, তৃষ্ণাই আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে আমার শরীরের জল কমে গেছে। শরীরে জলের ঘাটতি হলে জল দিয়ে তা পূরণ না করা হলে অনেক রকম সমস্যা আসবে। জল কমে গেলে ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে শৈথিল্য এসে যাবে। জল কমে গেলে, লবণ, আয়ণ এগুলো কমে যাবে, তখন মানুষ ভুলভাল দেখতে শুরু করে। এই তৃষ্ণা মায়েরই একটা রূপ, সেই তৃষ্ণরূপিণীকে মাকে আমরা বার বার প্রণাম করি।

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ(৩৮) নমস্তস্যৈ(৩৯) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।৪০

ক্ষমা ভাব প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই থাকে। প্রিয়জন কেউ ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করে দিই, আবার অনেক কিছু আমরা সহজে ভুলতে পারি না বা মেনে নিতে পারি না। কেউ যদি আমার প্রতি কোন অন্যায় করে থাকে, সেই অন্যায়কে ভুলে যাওয়া বা মেনে নেওয়া অত সহজ নয়। অনেক সময় তাই আমরা ক্ষমা করতে পারি না। যাঁরা খুব উচ্চ সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকত মনস্কতার মানুষ, তাঁরাই একমাত্র ক্ষমা করতে পারেন। সাধারণ স্তরের মানুষ কখনই ক্ষমা করতে পারে না। দুর্বল প্রকৃতির লোকেদের মধ্যেও ক্ষমার ভাব থাকবে না। খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক পুরুষই ক্ষমা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এনাদের থেকে এক ধাপ নীচে যিনি যত সাধুভাবাপন্ন হন তিনি তত ক্ষমাশীল হন। খুব সাধারণ স্তরেও ক্ষমার ভাব থাকে কিন্তু ক্ষমার পরিধিটা সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। বেশ কিছু লোক আছে, যাদের আপনি হয়ত কোন অপমান করেছেন দশ বছর কুড়ি বছর মনে রেখে দেবে, সহজে ভুলে যাবে না। মানুষের মধ্যে যে ক্ষমার ভাব এই ক্ষমা মা নিজে। সেই ক্ষমাস্বরূপিণি মাকে আমরা বার বার প্রণাক করছি।

যা দেবী সর্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ(৪১) নমস্তস্যৈ(৪২) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।৪৩

এখানে জাতি মানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কর্মকার, ছুতোর, মুচি ইত্যাদি এদের বোঝাচ্ছে। আজীবিকা রূপে (Trade Guild) রূপে যে জাতি, সেই জাতির কথা বলা হচ্ছে। বাল্মীকি রামায়ণেই আমরা প্রথম অনেক জাতির বর্ণনা পাই। মানুষ যখন কোন পরিবারে জন্ম নিচ্ছে, সেখান থেকে দুটো জিনিষ সে পাচ্ছে, একটা পাচ্ছে আজীবিকা, এই আজীবিকার জন্য তার মধ্যে একটা নিরাপত্তা এসে যেত। শিশু জন্ম নেওয়ার পর তার বাপ-

ঠাকুর্দা যে পেশায় কাজ করে আসছে সেই কাজে সেও প্রশিক্ষণ পেতে থাকে। ছোটবেলা থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়ার জন্য ওই পেশার কাজে স্বাভাবিক ভাবে দক্ষতা এসে যেত। ডাক্তার পরিবারের সন্তানদের সব সময় ডাক্তারি পড়ার ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ, কারণ সে ওই ডাক্তারি পরিবেশের মধ্যে বড় হচ্ছে। ব্রাহ্মণের সন্তান জন্ম থেকে বেদের উচ্চারণ শুনছে, পূজোপাঠ দেখছে, তার মনও স্বাভাবিকভাবেই সেইভাবে তৈরী হয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু যে ব্যাতিক্রম হত না তা নয়, শতকরা পাঁচ ছয় জন একটু অন্য ধরণের হয়ে যেত। তখন তার জন্য অন্য ব্যবস্থা করে দিলেই হয়। আগেকার দিনেও নিজের জাতির কাজ ছেড়ে অন্য কাজ গ্রহণ করতে দেখা যেতে। নিজের জাতির পেশাতে কাজ করার জন্য কিছু সুবিধাও ছিল আবার কিছু সমস্যাও হয়েছিল। সুবিধা হল, বাল্মীকি রামায়ণের সময় যেভাবে কাজকর্ম হত আজও ঠিক সেইভাবেই কাজকর্ম হয়ে আসছে, যার ফলে কোন বিদ্যাই লুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা ছিল না। নিজের জাতির পেশাতে থাকলে কেউ না খেয়ে মরবে না। কিছু হলে জাতির লোকেরাই তাকে সামলে রাখবে। অসুবিধা হল, কারিগরি বিদ্যায় তাকে উন্নত করার সুযোগ খুব কম ছিল। নিজের জাতিতে যে পদ্ধতি ও কৌশলকে অবলম্বন করে কাজ করে এসেছে সেই পদ্ধতি ও কৌশলের বাইরে গিয়ে কারিগরি বিদ্যার আধুনিক উন্নত বিদ্যাটা গ্রহণ করতে চাইত না। একজন মুচি কাজ করার সময় তার পরম্পরার পদ্ধতির বাইরে যেতে চাইবে না। কিন্তু এখন কত রকম কোম্পানি এসে গেছে, তারা নানান রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নতুন নতুন পদ্ধতি বার করছে, যার ফলে কম সময়ে অল্প খরচে অনেক উন্নত মানের জিনিষ তৈরী করা সম্ভব হচ্ছে।

আসলে আমাদের জীবন-দর্শনকে যদি নিরুপণ না করা হয়, জীবনটা কী, কোথা থেকে আমরা এসেছি, কেন এসেছি, এই প্রশ্নগুলির যদি পরিষ্কার সঠিক উত্তর না জানা থাকে, তখন কিন্তু অনেক রকম সংশয় আসবে। হিন্দুদের পরিষ্কার উত্তর হল – ভাই! তুমি হলে শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, কিন্তু কোন কারণে অজ্ঞানের জন্য তুমি এই পরিস্থিতিতে পড়ে গেছ, এখান থেকে তোমাকে এবার বেরোতে হবে। বেরোনর জন্য প্রথম কাজ হল তুমি নতুন করে মায়াতে আর জড়িয়ো না। যারা জড়াতে চায় জড়াক, তাদের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমিও তাদের টেনে নিয়ে আসতে পারবে না। মায়াতে নতুন করে না জড়ানোর জন্য তোমাকে কি করতে হবে? যতটুকু দরকার ততটুকু কাজ করবে, যতটুকু অর্থ দরকার ততটুকুই আয় করবে আর শরীর রক্ষার জন্য যতটুকু ভোগের দরকার ততটুকুই ভোগ করবে। তোমার স্বামী মারা গেছে, তুমি বিধবা হয়ে গেছে ঠিক আছে। তোমাকে বিয়ে করার একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোন কারণে তোমার স্বামী মারা গেছে। আমাদের এখানে ছেলের সংখ্যা অনুপাতে এমনিতেই কম, একটা সুযোগ দেওয়ে হয়েছিল, আর নয়, এবার তুমি পুরো মন ভগবানের দিকে দাও। আপনি বলবেন, এটাতো অত্যন্ত নিষ্ঠুর ফতোয়া। মানছি, এটা অত্যন্ত রুঢ়। কিন্তু যেমনি আপনি জীবন-দর্শনকে নেবেন, সেই জীবন-দর্শনকে যখন সচল দেখবেন তখন আপনার এতটা রুঢ় মনে হবে না। আমাদের সমাজে ছেলের সংখ্যা অনুপাতের দিক থেকে বরাবরই কম, মেয়েদের সংখ্যা অনেক বেশি থাকে। ফলে, একটা সুযোগের পর আর সুযোগ দেওয়া যায় না, অন্যদের কথাও তো ভাবতে হবে। যারা একেবারে কিছু পায়নি এবার তাদের সুযোগ দিতে হবে, রেশনিং হয়ে যাচ্ছে। ইদানিং পরিস্থিতি অন্য রকম হয়ে গেছে, আগেকার দিনের মত এখন আর যুদ্ধ-বিগ্রহ, মহামারী এসব নেই বলে এখন ছেলে আর মেয়ের সংখ্যা সমান সমান হয়ে গেছে, অনেক জায়গায় মেয়ের সংখ্যা পুরুষের অনুপাতে কমতে শুরু হয়ে গেছে। এখন তাই আগের মত কল্পনাই করা যায় না, বিধবা হয়ে গেলে সহজেই ছেলে পেয়ে যাবে। কিন্তু ওর পেছনে যে দর্শন রয়েছে তা হল জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ধার্মিক জীবন-যাপন করা। কাজকর্ম করার উদ্দেশ্যও তাই, ভোগের উদ্দেশ্যও তাই।

জীবন-দর্শনের এই যে আদর্শ, জাতি আমাদের এই আদর্শের মধ্যে বেঁধে রাখে – ভোগও বেশি হতে দেবে না আবার একটা স্তরের নীচে আপনাকে যেতেও দেবে না, এইভাবে আপনাকে আধ্যাত্মিক ভাবে বিকাশ লাভ করার সুযোগ এনে দিচ্ছে। যার জন্য দেখা যায় অতি সাধারণ, খুব নিম্ন বর্ণের অশিক্ষিতদের সবার রামায়ণ মহাভারতের শ্রেষ্ঠ চরিত্রদের নামে নামকরণ করা হত। এর উদ্দেশ্যটা হল ভগবদ্‌মুখী হওয়া। এখানে জাতি মানে তখনকার দিনে বিভিন্ন বর্ণের লোকেরা যে পেশায় নিযুক্ত থাকত। ভারতবর্ষে হাজার হাজার জাতি, যত রকমের কাজ তত রকমের জাতি। আর প্রত্যেকটি জাতি চারটে বর্ণের কোন একটা বর্ণের সঙ্গে যুক্ত আছে। এই জাতি রূপেও মা। পুরুষসূক্তে বলছেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটে বর্ণ ভগবানের অঙ্গ থেকেই বেরিয়েছে।

পুরুষসূক্তের এই ভাবটাই এখানে বলা হচ্ছে, জাতি রূপে মায়ই সব হয়ে রয়েছেন। পরম্পরাতে এই ব্যাপারটা খুব দৃঢ় ভাবে সবারই বসে ছিল – সমাজে যে এত বিভাজন, এই বিভাজন ভগবানেরই করা, গীতাতে ভগবানও বলছেন *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*, সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণানুসারে আমিই চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেছি। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই দেবতারা বলছেন জাতিরূপে মাকে আমরা বারংবার প্রণাম করছি।

যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ(৪৪) নমস্তস্যৈ(৪৫) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।৪৬

এখানে লজ্জার একটা বিশেষ অর্থ। এই লজ্জা থাকলে মানুষ কখন কোন ভুল বা অধর্ম কাজ করতে চাইবে না। লজ্জা আমাদের অধর্ম কর্ম করা থেকে আটকে দেয়। ঠাকুর বলছেন, পাপকর্ম করতে করতে ঘেন্নাটা চলে যায়। পাপকর্ম করতে করতে প্রথমে চক্ষুলজ্জাটা চলে যায়, তারপর তার ঘেন্নাটাও চলে যায়। ইদানিং দেখা যাচ্ছে ভারত থেকে লজ্জা ভাবটাই হারিয়ে গেছে। ছেলে মেয়ে সবাই যেখানে যাচ্ছে সেখানেই কুকুর বেড়ালের মত নেমে পড়ছে। এই লজ্জা, যে লজ্জা ভাব আমাদের নোংরা কাজ, অধর্ম কাজ, পাপকর্ম করা থেকে টেনে আনে, এই লজ্জাও ভগবানের। মাতৃশক্তির হ্রাস হলে প্রথমে মানুষের ভেতর থেকে চক্ষুলজ্জাটা চলে যাবে। যে কাজগুলো মানুষ লোকচক্ষুর আড়ালে দরজা বন্ধ করে করতে চায়, সেগুলোকে এখন নিউজপেপারে, ম্যাগাজিনের পাতায় পাতায় ছাপিয়ে যাচ্ছে। এই লজ্জা ভাব মায়েরই শক্তি। সেই লজ্জারূপিণী মাকে আমরা বার বার প্রণাম করছি।

যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ(৪৭) নমস্তস্যৈ(৪৮) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।৪৯

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশ সর্বস্তরে যদি শান্তি বিরাজ করে সেটা মায়েরই শক্তি। দেশের চারিদিকে যে এত অশান্তি, গোলমাল, এগুলোই বলে দিচ্ছে মাতৃশক্তির হ্রাস হতে হতে কোথায় নেমে এসেছে। ভারতে প্রত্যেক চার মিনিটে একজন করে আত্মহতা করে। যাদের দুঃখ-কষ্ট আছে তাদের কথা শোনার কেউ নেই, সেইজন্য নাকি এত আত্মহত্যা হচ্ছে। আগেকার দিনে যৌথ পরিবার ছিল, সবার সাথে সবার নানা রকমের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, বড়রা তাই পরিবারের ছেলে-মেয়েদের চোখ-মুখ দেখলেই বুঝতে পারতেন এর কিছু গোলমাল হয়েছে। তখন সবাই তাকে নিয়ে নেমে পড়ে নানান রকম করে সান্ত্বনা দেওয়া, বোঝানর কাজ চালাতে শুরু করে দিতেন। তাতেও দু-একজন মরত। কিন্তু এখনতো কেউ নেই। বাপ-মা এক জায়গায় পড়ে আছে, ঠাকুর্দা-ঠাকুরমা অন্য জায়গায় পড়ে আছে, মেয়ে বা ছেলে আরেক জায়গায় চাকরী করছে। বাইরে চাকরী করতে গিয়ে কোথায় কার সাথে কি হয়ে যাচ্ছে, বাপ-মা কেউ জানছেও না আর নিজেরাও জানতে দেয় না, যার পরিণতি হল গলায় দড়ি নয়তো ট্রেনের তলায় গলা। এই যে পর পর যে অশান্তির কথা বলা হল, মাতৃশক্তির সাধনা না হলে একটা সমাজ কীভাবে পতনের দিকে যেতে শুরু করে, এগুলো তারই পূর্বাভাষ। শান্তি যে বিরাজ করবে তার জন্য দরকার মায়ের আরাধনার মাধ্যমে মাতৃশক্তির জাগরণ, শান্তিও মায়েরই বিশেষ কার্যকরী শক্তি। শান্তিস্বরূপিণী মাকে আমরা বারংবার প্রণাম করছি।

যা দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ(৫০) নমস্তস্যৈ(৫১) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।৫২

গীতাতে ভগবান শ্রদ্ধাকে নিয়ে খুব সুন্দর ভাবে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন। শ্রদ্ধা হল মনের ভাব, যে জিনিষটাকে আপনি মানেন, যেটা হল আপনার ব্যক্তিত্বের আবরণ। এখানে শ্রদ্ধা বাংলা শ্রদ্ধার অর্থে হবে না, বাংলা শ্রদ্ধা মানে গুরুজন বা শ্রেষ্ঠ কারুর সামনে মাথা নত করা। শ্রদ্ধা হল যে জিনিষটার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যেমন যাঁরা ঠাকুরকে বিশ্বাস করেন তাঁদের ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, যাঁর মধ্যে এই বিশ্বাস আছে যে আমি এই কাজ করতে পারবো, এটাই তখন আত্মশ্রদ্ধা। যার কথাকে আমি বিশ্বাস করছি, যার ব্যক্তিত্বকে বিশ্বাস করছি, তখন আমি বলছি এর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। বাচ্চাদের শিক্ষা দেওয়ার সময় বলা হয় তোমার যারা বড় তাদের প্রণাম করবে, যিনি তোমার শিক্ষক তাঁকে প্রণাম করবে। পারস্পরিক সম্পকর্কে ধরে রাখার জন্য শৈশবকাল থেকে এই ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু আমার আপনার ক্ষেত্রে এসে এটা পাল্টে যায়। একটা আছে আনুষ্ঠানিক,

যেখানে কাউকে কাউকে প্রণাম করতে হয়। কিন্তু তার থেকেও বেশি গুরুত্ব হল আমি যেমনটি, সেটাই শ্রদ্ধা। আপনি ঠিক ঠিক যা, সেটা দিয়েই আপনার জীবন পরিচালিত হয়। এই শ্রদ্ধাও মা, সেই শ্রদ্ধাস্বরূপিণী মাকে আমরা বারংবার প্রণাম করি।

যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ(৫৩) নমস্তস্যৈ(৫৪) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।৫৫

কান্তি হল চেহারার শ্রী, চেহারার মধ্যে এমন একটা লাবণ্য যে সব সময় চেহারা ঝকঝক করছে। কয়েকজনের ঘটনা আছে, যাদের ঠাকুর দেখা হলে বলছেন 'তোমার চেহারার কান্তি কমে গেছে'। স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে একদিন ঠাকুর বলছেন 'তোর চেহারায় কালো দাগ পড়েছে'। ঠাকুরই আবার বলছেন 'তোকে চাকরি করতে গিয়ে অনেক কর্ম করতে হয় তো তাই কালো দাগ পড়ে গেছে'। ঠিকই, কাজকর্ম করতে গেলেই পাঁচ রকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়, পাঁচ রকম লোকের কথা শুনতে হচ্ছে, আরও কত কি করতে হয়, তাই চেহারাতে তার একটা ছাপ পড়তে বাধ্য। সাধু সন্ন্যাসীরা জগতের বাইরে থাকেন তাই তাঁদের চেহারতেও সব সময় কান্তি থাকে। কোন কোন মানুষকে দেখলেই বোঝা যায় তার কান্তি কমে গেছে। কিন্তু এই কমে যাওয়াটা কি ক্লান্তির জন্য নাকি তার ভেতরে আধ্যাত্মিক শক্তি হ্রাসের জন্য, আমরা ধরতে পারি না। ঠাকুর একদিন রাজা মহারাজকে বলছেন 'তোর মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না'। আসলে ওই একই কথা, রাখালের মুখে ছায়ার আবরণ পড়েছে। তারপর জানা গেল কারুর সঙ্গে মজা করতে গিয়ে রাখাল মিথ্যে কথা বলেছিলেন। যাঁদের মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য, সৎ পথে থাকেন, তাঁরা একটু কিছু উল্টোপাল্টা করলেই চেহারাতেই ধরা পড়ে যাবেন। যার মনটাই পুরো কালো, তার চেহারা দিয়ে কিছু বোঝা যাবে না। গীতায় বলছেন, যেখানেই দেখবে বিশেষ শক্তি, যাঁকে অনেকে গণে মানে, বুঝবে তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি আছে। চেহারার কান্তিটাও ঈশ্বরেরই শক্তি। কেউ যদি স্নান করার পর নিয়মিত গীতা বা চণ্ডী পাঠ করেন কিছু দিনের মধ্যে দাড়ি না কামালেও তার চেহারা ঝকঝক করতে শুরু করবে, চেহারা দেখেই বোঝা যাবে যে এর ভেতরে একটা তেজ এসেছে। একমাত্র ভেতরে যখন আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ হয় তখন চেহারা দেখেই বোঝা যায় যে তার মধ্যে তেজ আছে। তার চেহারা যেমনই হোক, ফর্সা না হয়ে কালো হতে পারে, দেখতে সুশ্রী না হতে পারে কিন্তু চেহারা দূর থেকে আলোর বিকিরণ ছড়ায়। এই কান্তি ঈশ্বরীয় শক্তি ছাড়া হয় না। শুধু মুখটুকু নয়, চেহারার সামগ্রিকতার মধ্যে যে কান্তি হয় এটা ঈশ্বরের কৃপাতেই হয়। সেই কান্তিরূপিণীকে মাকে আমরা প্রণাম করছি।

যা দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ(৫৬) নমস্তস্যৈ(৫৭) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।৫৮

মানুষের কাছে যে টাকা-পয়সা, সম্পদ আসে, অর্থাৎ শ্রী, যেখান থেকে ঐশ্বর্য হয়, সেটা মায়েরই রূপ। ঠাকুর যখন টাকা মাটি, মাটি টাকা বলে টাকাকে ত্যাগ করেছিলেন তখন ঠাকুর টাকাকে বস্তু রূপে ত্যাগ করেছিলেন। ঠাকুর অবশ্য বস্তু রূপে কোন জিনিষকেই গ্রহণ করতে পারতেন না। টাকাকে ওই ভাবে ত্যাগ করার পর ঠাকুরের আবার চিন্তা হল, টাকা হল মা লক্ষ্মী, এই ভেবে দুশ্চিন্তা হল মা যদি খ্যাঁট বন্ধ করে দেন। তখন ঠাকুর বলছেন 'মা! তুমি হৃদয়ে থাক'। লক্ষ্মী না থাকলে সংসার যাত্রা নির্বাহ করা যাবে না, তাই ঠাকুরকেও বলতে হচ্ছে মা তুমি অবশ্যই থাক কিন্তু হৃদয়ে থাক। আমাদের একটা ভুল ধারণা হয়ে আছে যে, যেহেতু ঠাকুর বলেছেন কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে তাই টাকা-পয়সাও ত্যাগ করতে হবে। প্রতাপচন্দ্র ঠাকুরকে বলছেন 'আপনি যাকে কাঞ্চন বলছেন বিদেশে দেখলুম তারই পূজো হয়'। তারাও মা লক্ষ্মীর পূজো করছে তবে লক্ষ্মীকে বস্তু রূপে পূজো করছে। যখন টাকাকে বস্তু রূপে পূজা করা হয় তখন সেটা কাঞ্চন হয়ে যায়। ঠাকুর এটাকেই বারণ করছেন। লক্ষ্মী রূপে পূজো করলে জিনিষটা অন্য রকম হয়ে যায়। আগেকার দিনে ভারতে যত বৈশ্য ছিলেন, তাঁরা টাকা-পয়সাকে লক্ষ্মী রূপে দেখতেন। টাকা-পয়সা থাকলে তাঁরা আজেবাজে কাজে আমোদ-ফুর্তিতে কখনই খরচ করতেন না। কিছু দিন আগে একটা খবরে জানা গেল কোন এক বড় কোম্পানি কানপুরের আইআইটির বারো জন ছেলেকে এক কোটি টাকার চাকরিতে নিয়েছে। বছরে এক কোটি মানে মাসে প্রায় দশ লাখ টাকা মাইনে। সবে গ্রাজুয়েট হয়েছে আর এখনই দশ লাখ টাকা করে পাবে। এরা কি এই টাকাকে লক্ষ্মী রূপে দেখছে?

কখনই দেখছে না, বস্তু রূপেই দেখছে। ঠাকুর এই বস্তু রূপকে ত্যাগ করছেন আর লক্ষ্মীকে হৃদয়ে থাকতে বলছেন। শ্রীমা আবার অন্য ভাবে লক্ষ্মীকে নিচ্ছেন। জয়রামবাটীতে যখন মনি-অর্ডার আসত তখন তিনি টাকাটা নিয়ে মাথায় লক্ষ্মী রূপে স্পর্শ করে সযত্নে তুলে রাখতেন। কারণ শ্রীমাকে সংসার চালাতে হচ্ছে। স্বামী গম্ভীরানন্দজী মায়ের জীবনীতে লিখছেন – ঠাকুর যে টাকাকে বস্তু রূপে ত্যাগ করেছিলেন, মা সেই টাকাকেই ব্রহ্ম রূপে গ্রহণ করেছেন।

যে কোন জিনিষকেই ব্রহ্ম রূপে গ্রহণ করা যায়। গীতাতেও ভগবান বলছেন, যখনই কোন বস্তুকে গ্রহণের সময় সেই জিনিষের শুচিতা নিয়ে সংশয় থাকে তাহলে ওঁ তৎ সৎ বলে দিলেই সব কিছু শুদ্ধ হয়ে যায়। ঠাকুর ছিলেন অবতার, তিনি শুচি অশুচির পারে। কিন্তু ঠাকুরও এক জায়গায় গেছেন, সেখানে তাঁকে যখন বসার জন্য তাকিয়া লাগানো গদি দেওয়া হয়েছে, তখন ঠাকুর বলছেন 'বিষয়ী লোকেরা এসে এই সব বিছানাপত্র ব্যবহার করে', তখন ঠাকুর বিছানাকে স্পর্শ করে বলছেন 'ওঁ তৎ সৎ'। ওঁ তৎ সৎ বলে দেওয়ার পর ওই বস্তুকে ব্রহ্ম রূপে গ্রহণ করা হয়ে গেল। টাকা-পয়সার ক্ষেত্রেও সব সময় লক্ষ্মীরূপেণ এই ভাব নিয়ে গ্রহণ করতে হয়। মা দুই রূপেই আছেন, লক্ষ্মী রূপেও তিনি আর দারিদ্র রূপেও তিনি। সুখটাও তাঁর দুঃখটাও তাঁর, আপনাকে ঠিক করতে হবে আপনি কোনটা চাইবেন। আপনি স্বাভাবিক ভাবেই বলবেন আমি দারিদ্র চাই না। আমাদের সবার নামের আগে শ্রী থাকে বিশ্রী কখনই থাকে না। টাকাকে সব সময় তাই লক্ষ্মী রূপে দেখতে হয়। আর আপনি যদি ধর্মপ্রাণ না হন তাহলে বস্তু রূপে দেখতে থাকুন।

স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন আমাদের সবটাই Superstition, যখন ধর্মের কথা বলছে তখন সেটাও যেমন Superstition, তেমনি যখন জ্ঞানের কথা বলছেন সেটাও Superstition। বেশির ভাগ মানুষ যারা বিজ্ঞানমনস্কতার কথা বলে তারা বিজ্ঞান কি তাই বোঝে না। যখন কোন ঋষির নাম করে বলা হয় অমুক ঋষি এই কথা বলেছেন, তখন এই ধরণের বিজ্ঞানমনস্কতার লোকগুলো নাক সিঁটকে আপত্তি করে। কিন্তু যখনই ডারউইন বা আইনস্টাইন বা নিউটনের নামে বলা হয় তিনি এই কথা বলেছেন তখন এরা এক বাক্যে মেনে নিতে কোন আপত্তি করবে না। এটাও তো Superstition। তুমি কি করে জান যে ডারউইন ঠিক বলছেন! ডারউইন বলছেন মানুষ বানর থেকে এসেছে। এখন আবার নতুন থিয়োরী এসেছে যেখানে বলছে, একটা বানর একটা শূয়োরের সঙ্গে কীভাবে কীভাবে সমাগম হয়ে গিয়েছিল, আর সেখান থেকেই নাকি মানব জাতির জন্ম হয়েছে। এখন আপনি কোনটাকে ঠিক বলবেন, আপনি শিম্পাঞ্জীর বিবর্তন থেকে এসেছেন, নাকি শিম্পাঞ্জী আর শূয়োরের মিলনের ফলে এসেছেন! এই তো বিজ্ঞানের অবস্থা! বিজ্ঞানের এই সব থিয়োরীও Superstition।

তাহলে আপনি কোন থিয়োরী নেবেন? খুব সহজ হল, যে জিনিষ আমাদের কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত করে সেই জিনিষ আমরা কখনই নেব না। বিজ্ঞানের Superstitionকে যদি চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিই তাহলে আমরা ক্রমাগত কামিনী-কাঞ্চনের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে যাব। বর্তমান যুগের দিকে তাকালেই এই কথার সত্যতা যাচাই হয়ে যাবে। কিন্তু ধর্মের superstition আমাদের আরও ভালো মানুষ তৈরী করছে। বিজ্ঞানের দৌলতে দেশে যত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হচ্ছে তত মানুষ কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হচ্ছে। আসক্তি যেমন মানুষকে লোভী, হিংসুকে পরিণত করছে, তেমনি আসক্তি পূরণের জন্য ঘুষ নিতে হচ্ছে, দুর্নীতিপরায়ণ হতে হচ্ছে। আর এর পরিণতি কি দেখছি? চারিদিকে শুধু অশান্তির আগুন জ্বলছে, আত্মহত্যার সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে, দিন দিন কত রকম আইন তৈরী করা হচ্ছে। দেশে আজ এত আইন হয়ে গেছে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলেই যে কেউ চাইলে আমাদের নামে পাঁচ খানা মামলা দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। দিনে দিনে আমরা পশু হয়ে যাচ্ছি। এর একমাত্র কারণ যে জিনিষকে যেভাবে বোঝা উচিৎ আমরা সেভাবে বুঝতে চাইছি না। যার ফলে মা হয় দারিদ্র রূপে ঢুকে যাচ্ছেন, আর তা নাহলে সমৃদ্ধিকে আমরা কাঞ্চন রূপে গ্রহণ করছি। ধন-সম্পদকে যখনই লক্ষ্মী রূপে গ্রহণ করা হবে তখন সেই সম্পদ কখনই আমাদের বিপথে নিয়ে যাবে না, লক্ষ্মী রূপে গ্রহণ করা মানে সম্পদ আমাদের মা হয়ে যাচ্ছেন। বাচ্চারা অন্য বাচ্চাদের নিজের মাকে দেখিয়ে বেড়ায়, আমার মাকে দেখতে কি সুন্দর দেখেছিস। একটু বড় হয়ে গেলে মাকে নিয়ে আর আলোচনা করে না, কারণ মা তখন তার কাছে অত্যন্ত dignified ব্যক্তিত্ব রূপে মনে হয়। টাকা-পয়সাও সেই রকম, প্রথমের দিকে একটু দেখিয়ে বেড়াবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মী

রূপে, মা রূপে যদি না নেওয়া হয় তখন এই সম্পদই বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মা সবারই ভেতরে আছেন, তাই আমরা যে অর্থে অভাগা বলি সেই রকম অভাগা কেউই হয় না, সবারই মধ্যে কিছু না কিছু শ্রী থাকবেই। শ্রী থাকা মানে লক্ষ্মী আছেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই লক্ষ্মী থাকেন।

এখানে যত মন্ত্র নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে সব কটিই সিদ্ধ মন্ত্র। এই মন্ত্রও যদি কেউ জপ করে তাতেও মায়ের কৃপাতে তার ঐশ্বর্য এসে যাবে। যার খুব টাকা-পয়সার অভাব তাকে বলুন দিনে হাজারবার করে এই মন্ত্র জপ করতে, কিছু দিন পরে দেখবেন তার অনেক কিছু ভালো হতে শুরু করেছে। স্বামী-স্ত্রী দিনরাত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ঝগড়া করছে, পাড়াপড়শীরা জেনে যাচ্ছে, তার মানে এদের লজ্জা ভাবটা চলে গেছে। মায়ের বাড়িতে একবার একজন ভক্ত মহিলা জোরে কথা বলেছিলেন। শুনে মা নিষেধ করে বলছেন 'মেয়েদের অমন চেঁচিয়ে কথা বলতে নেই'। ভক্ত মহিলা আবার রাগ করছেন বুঝতে পেরে মা আবার বলছেন 'মেয়েদের অত রাগ ভালো না'। লজ্জার ভাব না থাকা, লক্ষ্মী না থাকা এগুলো দৈবী শক্তির অভাব। কিন্তু যে কোন একটা দৈবী গুণ এসে গেলে বাকি গুণগুলোও আস্তে আস্তে এসে যাবে। ঠিক তেমনি এর উল্টোটাও হয়, একটা দুর্গুণ যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে আস্তে আস্তে বাকি দুর্গুণ গুলিও এসে যাবে। এখানে যে কোন একটা মন্ত্র জপ করলে সব ঠিক হয়ে যাবে। যার মনে হচ্ছে সে আর কিছু পারবে না, হতাশায় মরে যেতে চাইছে, তাকে বলুন তুমি দিনে একশবার করে *যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা* জপ করতে। সে হয়ত জপ করতে চাইবে না, একটা সিডিতে ওই মন্ত্রটা রেকর্ড করে সারাটা দিন ও যাতে শুনতে পায় সেইভাবে বাজিয়ে যান, দেখবেন আস্তে আস্তে তার মনের সব হতাশার ভাবে চলে যাবে। চণ্ডীর প্রত্যেকটি মন্ত্রই সিদ্ধ মন্ত্র। এর যে কোন মন্ত্র যদি এক বছর বা অন্তত ছ-মাস নিষ্ঠার সঙ্গে জপ করা হয় তাহলে যেটার অভাব সেটা এসে যাবে, তার সাথে অনেক সমস্যাও চলে যাবে।

ভগবানের শক্তিকে আমরা এভাবেও কল্পনা করতে পারি, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে শক্তি আছে, সেই শক্তিকেই মূর্ত রূপে বাইরে নিয়ে আসা হচ্ছে। এই ব্যাপারটা আমরা পরে পরে দেখতে থাকব। এরপর আমরা কল্পনা করতে পারি তিনি একটা সাকার রূপ ধারণ করে শক্তি রূপে আমার সামনে আছেন, এটা যে পুরোটাই কল্পনা হবে তা নয়। ঠাকুর তাঁর সাধনার অবস্থা বর্ণনা করার সময় বলছেন, তিনি যখন সাধনা করতেন তখন উনি দেখছেন ওনার ভেতর থেকে একজন গেরুয়াধারী বেরিয়ে এসে ঠাকুরকে একাগ্র চিত্তে ধ্যান করতে বলছেন। আবার একদিন দেখছেন ঠাকুরের ভেতর থেকে কালো রঙের একজন পাপ পুরুষ বেরিয়ে এসেছে। ঠাকুরের তো এগুলো কোন কল্পনা নাও, তিনি বাস্তবিক দেখছেন। তারপরেই দেখছেন একজন গেরুয়াধারী তাঁর শরীর থেকে বেরিয়ে এসে সেই পাপ পুরুষকে ত্রিশূল দিয়ে শেষ করে দিলে। ঠাকুর হলেন শুদ্ধসত্ত্ব, একেবারে অপাপবিদ্ধ পুরুষ, পাপের লেশ পর্যন্ত তাঁর মধ্যে নেই। ঠাকুরের দিব্যদর্শনকে তাই আমরা কোন প্রশ্ন করতে পারি না। আগেকার দিনের কোন ঋষিদেরও হয়ত কোন দিব্যদর্শন বা অনুভূতি হয়েছিল, সেই অনুভূতিকে আধার করেই হয়ত এইভাবে বলছেন, ভগবানের যিনি শক্তি তিনি যখন মূর্ত রূপ ধারণ করছেন তাঁকেই আমরা মা বলে ডাকছি। ব্রহ্মা মায়ের স্তুতি করলেন, মা তখন বিষ্ণুকে দিয়ে মধু আর কৈটভকে বধ করিয়ে দিলেন। তারপর দেবতারা সেই মায়ের যখন স্তুতি করলেন তখন তিনি মহিষাসুরকে বধ করে দেবতাদের কার্য সিদ্ধি করলেন। এবার শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্যদের আবির্ভাবে দেবতারা তাদের সব অধিকারচ্যুত হয়ে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে গেছেন। মধু কৈটভ বধ প্রথম অধ্যায়তেই শেষ হয়ে যায়। তারপরে মহিষাসুর বধে দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই দুটো অধ্যায় নেওয়া হয়েছে। শুম্ভ ও নিশুম্ভ বধে আরও বেশি অধ্যায় নেওয়া হয়েছে। মনে হয় যেমন যেমন সময় যাচ্ছে তেমন তেমন অসুরদের শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে। ইদানিং কালের অসুরদের হয়তো আরও বেশি ক্ষমতা হবে।

শুম্ভ আর নিশুম্ভের এত ক্ষমতা হয়ে গেছে যে দেবতাদের সাধ্যি নেই যে এদের দাবিয়ে দেবে। এর আগে মহিষাসুর বধের পর দেবতারা দেবীকে স্তুতি করে প্রসন্না করাতে মা প্রসন্ন হয়ে বর দিয়েছিলেন, দেবতারা যখন তাঁর স্মরণ করবে তখনই তিনি দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য আবির্ভূতা হবেন। তাই দেবতারা এখন স্তুতি করছেন। দেবতারা যে এখানে দেবীর স্তুতি করছেন সেখানে দেবীর রূপের কোন বর্ণনা নেই। এখানে ঈশ্বরের শক্তিকে নিরাকার রূপেই স্তুতি করা হচ্ছে। চিৎ আর জড়ের গ্রন্থি যে মানুষ, সেই মানুষের মধ্যে যা কিছু শুভ আছে, যে শুভ

শক্তির জোরে মানুষের জীবন চলছে, সেই শুভ শক্তিই দেবীশক্তি। সেই দেবীশক্তির এক একটি শুভ শক্তিকে উল্লেখ করতে করতে এরপর বলছেন –

যা দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ(৫৯) নমস্তস্যৈ(৬০) নমো নমঃ।।৬১

বৃত্তির একটা অর্থ হয় আমাদের মনের মধ্যে যে হাজার হাজার বৃত্তি উঠছে সেই বৃত্তি। কিন্তু এখানে বৃত্তি বলতে বোঝাচ্ছেন আজীবিকা। এর আগে এক জায়গায় দেবীকে স্তুতি করে বলা হয়েছিল *বার্তা চ সর্বজগতাম্*, বৃত্তি হল যেটা দিয়ে মানুষ কোন কাজে প্রবৃত্ত হয়, কোন কাজে লাগা বা একটা দিকে যাওয়া। সবারই মধ্যে কাজের প্রতি একটা স্পৃহা থাকে, এই কাজের প্রতি স্পৃহার জন্যই মানুষের জীবিকা নির্বাহ সম্ভব হয়, এটাকেই বলছেন বৃত্তি। কোন কিছুতে প্রবৃত্ত হওয়ার যে স্পৃহা এটাও মায়েরই শক্তি। ঠাকুর বলছেন পঞ্ছী আর দরবেশ সঞ্চয় করে না, কিন্তু পঞ্ছীরও যখন ডিম থেকে বাচ্চা হয় তখন পঞ্ছী মুখে করে বাচ্চার জন্য দানা নিয়ে আসে। এটাকেই বলছেন বৃত্তি। পাখির মধ্যে বৃত্তি আছে যে আমার বাচ্চাকে রক্ষা করতে হবে, তাকে স্বাবলম্বী করতে হবে, কিন্তু দরবেশের মধ্যে তাও থাকে না। সাধু সন্ন্যাসী কখন কামিনী-কাঞ্চনের ধারে কাছে যাবেন না। দেহ ধারণের জন্য যতটুকু দরকার, তাও এলো তো এলো, না এলেও কোন চিন্তা করবেন না। চণ্ডী মূলতঃ গৃহস্থদের ধর্মগ্রন্থ, সেইজন্য বলছেন সংসারীদের জীবন ধারণের জন্য যে বৃত্তি অবলম্বন করতে হয় সেই বৃত্তি মায়েরই শক্তি। সংসারে যাদের মধ্যে বৃত্তি থাকে না তাদেরকেই বলা হয় অপদার্থ, ঠাকুর বলছেন কুমড়ো কাটা বট্ঠাকুর, সারাদিন কোন কাজ করবে না বাড়িতে বসে ভুড়ুর ভুড়ুর করে তামাক খাচ্ছে, মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নেই তাই বট্ঠাকুরকে খবর দেয় কুমড়ো কাটতে হবে। এরাই হল বৃত্তিহীন, এদের দেবীশক্তির অভাব হয়ে গেছে। যে সংসারেই দেখবেন ছেলে মেয়েগুলো অকর্ম্য, পাষণ্ড, অপদার্থ বুঝবেন এদের সংসারে দেবীশক্তির অভাব, দারিদ্রতা আর অশান্তি লেগেই থাকবে। কারণ বৃত্তি মায়েরই রূপ, এই বৃত্তিরূপিণী মাকে দেবতারা বার বার প্রণাম করছেন।

যা দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ(৬২) নমস্তস্যৈ(৬৩) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।৬৪

স্মৃতি মানে কোন কিছুকে মনে রাখা। এখানে একটা জিনিষকে মাথায় নিয়ে চলতে হবে, আমরা যে জগতে আছি এই জগৎ হল আপেক্ষিক জগৎ, এই জগৎ দেশ, কাল ও পাত্রে আবদ্ধ। এখানে কোন কিছুই চিরন্তন নয় আর কোন কিছুই অনন্ত হবে না। সব কিছুকেই একটা সময়, দেশ ও পাত্রে সীমিত থাকতে হয়। যেমন, আমি মাকে লক্ষ্মী রূপে আরাধনা করতে পারি কিন্তু তাই বলে আমার কোন দিনই অনন্ত ধনরাশি হয়ে যাবে না। অনন্ত সমৃদ্ধির সন্ধানে কখন লেগে থাকা যায় না এবং উচিতও নয়, সব কিছুরই একটা সীমা থাকে। এই সীমা থাকার জন্য জীবনযাত্রা অনেক সহজ হয়। স্মৃতি হল অতীতের জিনিষকে মনে রাখা। কিন্তু এনারা স্মৃতি বলতে সাধারণতঃ বোঝান শাস্ত্র অধ্যয়ন করে শাস্ত্রবাক্যকে মনের মধ্যে ধরে রাখা। স্মৃতি দুটো ক্ষেত্রেই আসে আর দুটো একই সাথে আসে। উপনিষদে বলছেন *আহারোশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধি সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতি*, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা কিছু আহরণ করা হচ্ছে, আমি কি খাচ্ছি, কি দেখছি, কি শুনছি এর দ্বারা নির্ধারিত হয় আমাদের বুদ্ধি কি রকম হবে। যদি আহরণীয় বস্তু শুদ্ধ বস্তু হয় তাহলে বুদ্ধিটা শুদ্ধ হয়। বুদ্ধি শুদ্ধি হলে তাই দিয়ে স্মৃতি ধ্রুব হয়। উপনিষদে যে স্মৃতির কথা বলছেন এই স্মৃতি অতীতকে মনে রাখার কথা বলছেন না। এই স্মৃতি মানে শাস্ত্রের কথাগুলো স্মৃতিতে একেবারে স্পষ্ট হয়ে জেগে আছে। কোন পরিস্থিতিতেই তার শাস্ত্র বাক্যের স্মৃতিটা চলে যাবে না।

সৈন্যবাহিনীতে যখন প্রশিক্ষণাদি দেওয়া হয় তখন বিভিন্ন অস্ত্র চালনার যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার সাথে অনেক মূল্যবোধের শিক্ষাও দেওয়া হয়। কিছু দিন আগে আফগানিস্থানের শান্তি রক্ষী বাহিনী একজন আহত তালিবানী লোককে গুলি করে মেরেছে। মারার সময় সে আবার ম্যাকবেথ থেকে কবিতা আবৃত্তি করছিল। তার এক বন্ধু সেই মুহুর্তের দৃশ্যটা মুভি ক্যামেরায় বন্দী করে নিয়েছিল। সেই ছবি কীভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়াতে শান্তি রক্ষী বাহিনীর সেই লোকটিকে বড় ধরণের সাজা দেওয়া হয়েছে। কারণ জেনেভা চুক্তির নিয়ম অনুযায়ী এই ধরণের নৃশংস কাজ করা যায় না। ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, একটা চরম মুহূর্তে লোকটির স্মৃতি নষ্ট

হয়ে গেছে। ট্রেনিং নেওয়া আছে, পড়াশোনা করেছে ঠিকই, কিন্তু আসল মুহুর্তে লোকটির স্মৃতি কাজ করল না। এই যে বলা হয় বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি, এই বিপরীত বুদ্ধি মানে বুদ্ধি তাকে ছেড়ে দিয়েছে, বুদ্ধি ছেড়ে দেওয়া মানে তার স্মৃতি কোন কাজ করছে না। গীতাতেও ভগবান ঠিক একই কথা বলছেন, *স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো*, আগে স্মৃতিটা চলে যাবে। শাস্ত্রে যা অধ্যয়ন করেছে, গুরুমুখে যে তত্ত্ব কথা শুনেছে, শোনার পর সেগুলোকে আধার করে এবার তার একটা আদর্শ তৈরী হয়েছে। এই আদর্শে তার কোন কিছুই লুকোচুরির ব্যাপার নেই, সবাই জানে তার এই আদর্শ। এরপরের কাজ হল ওই স্মৃতিকে ধরে রাখা, কোন পরিস্থিতিতেই ওই স্মৃতিটা যেন না টলে যায়। টাকার প্রলোভন, মেয়েমানুষের প্রলোভন আর কত কিছুর প্রলোভন আসছে, বিষম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু কোন কিছুতেই তার স্মৃতি টলে যাবে না। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় তার দিনকাল হয়তো খারাপ যাচ্ছে, তখন তার স্মৃতি পুরো ঠিক আছে, ঠাকুরের প্রতি তখন খুব নিষ্ঠা। আর যেমনি দিনকাল পাল্টে গিয়ে ভালো কিছু হয়ে গেল, তখন সবাই বলবে এর চোখ পাল্টে গেছে। আবার এর উল্টোও আছে, যার প্রচুর ধন-সম্পদ আছে সে বলছে আমার কিছু না, সব ঠাকুরের। আর পরিস্থিতি যখন অন্য রকম হয়ে গেল তখন ঠাকুর সহ সব দেব-দেবীদের গালাগাল দিতে শুরু করে দিল – ঠাকুর দেবতাদের এত ভক্তি করলাম শেষে আমার এই দুরবস্থা! আমাদের শাস্ত্রে কোথাও বলছে না যে ভক্তি করলে তোমার কখন বিপরীত পরিস্থিতি আসবে না। শুভ ও অশুভ যে কোন পরিস্থিতিতে স্মৃতিকে ধরে রাখা, এটা মায়ের কৃপাতেই হয়। গীতাতেও ভগবান বলছেন, *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ*, মানুষের যে স্মৃতি বিভ্রম হয়ে যায় সেটাও আমার থেকেই হয়। অন্য দিকে এটাও সত্য যে, আপনি যদি সব কথা না ভুলে যান আপনার জীবন চলবে না। শোক, দুঃখ, আঘাত সবারই জীবনে আসবে, কিন্তু শোক, আঘাতকে যদি একটা সময় না ভুলে যেতে পারে মানুষ তাহলে পাগল হয়ে যাবে। এই স্মৃতিটা মায়ের, তাই হে স্মৃতিরূপিণী মা তোমাকে আমরা বারংবার প্রণাম করছি।

যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ(৬৫) নমস্তস্যৈ(৬৬) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।৬৭

ঠাকুর বলছেন সবার ভেতরেই দয়া আছে। কুকুরের যখন বাচ্চা হয় তখন নিজের বাচ্চাগুলির প্রতি কুকুরেরও দয়া থাকে। এই দয়ার ভাব, করুণার ভাব দিয়েই সৃষ্টি চলছে। ঠাকুর আবার বলছেন নিজের লোকেদের প্রতি ভালোবাসার নাম মায়া, সবাইকে ভালোবাসার নাম দয়া। এর technical term হল করুণা। এই করুণা বাংলার করুণা নয়, এই করুণা ধর্মের একটি পরিভাষা। করুণা মানে সমস্ত জীবের প্রতি সমান ভালোবাসা। ঠিক ঠিক করুণার ভাব এলে, কেউ অপরাধ করলেও তার প্রতি কোন বিরূপ ভাব আসে না। যেমন মা, নিজের সন্তানের প্রতি সব সময় দয়ার ভাব। এখানে দয়া মানে বাংলা দয়া নয়, এই দয়া সংস্কৃতের দয়া। দয়া মানে সবার প্রতি সমান ভালোবাসা। আমাদের শাস্ত্র বলছে, যখন তুমি জীবন চালাবে তখন হয় তুমি অদ্বৈত জ্ঞানে জগতকে দেখবে আর তা নাহলে দ্বৈত জ্ঞানে দেখবে। দ্বৈত জ্ঞানে সৃষ্টি হল ভগবানের। সৃষ্টি যদি ভগবানের হয় তাহলে সৃষ্টিতে যত প্রাণী আছে সবাই ভগবানেরই সন্তান। তাহলে আমরা সবাই ভাই-বোন হয়ে গেলাম, নিজের ভাই-বোনের প্রতি সবারই ভালোবাসা থাকবে। অদ্বৈত জ্ঞানে যদি দেখেন তাহলে সর্বভূতে আপনিই আছেন। তাহলে স্বাভাবিক ভাবে সবারই প্রতি আপনাকে দয়ার ভাব রাখতেই হবে। যার মধ্যে দয়ার ভাব নেই, তার মানে তার মধ্যে এখনও কোন আধ্যাত্মিক বিকাশ হয়নি। গীতাতে এই দুটো কথা কয়েকবার এসেছে – *সর্বভূতহিতে রতাঃ*। *সর্বভূতহিতে রতাঃ* এই ভাব দয়ার ভাব থেকেই আসে। কারণ, আমিই তো সব কিছু হয়ে আছি, তাহলে আমি কাকে ছোট করব আর কাকেই বা কষ্ট দিতে চাইব। এই দয়ার ভাব মায়ের কৃপা ছাড়া হয় না, আর দয়াটা মায়েরই। তাই দয়ারূপিণী মাকে আমরা বার বার প্রণাম করছি।

যা দেবী সর্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ(৬৮) নমস্তস্যৈ(৬৯) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।৭০

তুষ্টি মানে সব কিছুতে সন্তুষ্টির ভাব। এখন চারিদিকে সবারই মধ্যে কেমন খাই খাই ভাব। মনে হয় পুরো শরীরটাই তার পেট আর মুখটা ছোট্ট একটুখানি। যতই দিয়ে যান তুষ্টি আর হচ্ছে না। এর পরের অধ্যায়েই মা চামুণ্ডার বর্ণনা আসবে, মা রাক্ষসগুলকে ভক্ষণ করে যাচ্ছেন, তার হাতি, ঘোড়া, অস্ত্র-শস্ত্র সব খেয়েই যাচ্ছেন।

অথচ মায়ের পেট বলে কিছু নেই, মায়ের চেহারার আবার বর্ণনা করা হচ্ছে *শুষ্কমাংসাতিভৈরবা*, মায়ের শরীর অস্থিচর্মসার, কিন্তু সমস্ত রাক্ষসকে তাদের হাতি, ঘোড়া, অস্ত্র সহ ভক্ষণ করে যাচ্ছেন, কিন্তু কোথায় যে চলে যাচ্ছে কল্পনাই করা যায় না। মানুষ টাকা-পয়সা, ভোগ্যোপকরণ সব পেয়েই যাচ্ছে, তবুও আরও চাই আরও চাই করে যাচ্ছে, কোথাও এতটুকু কোন সন্তুষ্টির ভাব কারুর মধ্যে নেই! আগেকার দিনে ব্যাঙ্ক ছিল না, তখন রূপোর টাকা ছিল, বেশি টাকা হয়ে গেলে মাটিতে পুতে রাখত। তাতে আবার অনেক সমস্যা হত, মাঝরাতে টাকার দরকার হলে মাটি খুঁড়তে হবে, আবার কোথায় পোতা আছে সেটাও মনে রাখতে হবে। কদিন আগে বিহারের কোন এক জায়গায় কি একটা খোঁড়াখুড়ি করতেই প্রচুর রূপোর টাকা বেরিয়ে এসেছে। এখন ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়ে গেছে, ব্যাঙ্কে টাকা ঢেলে যাচ্ছে, কেউ জানতেও পারছে না। চণ্ডী ভালো করে অধ্যয়ন করলে বোঝা যায়, মায়ের শক্তিকে দেবতারা যে যে রূপে স্তুতি করছেন, ধীরে ধীরে আজ এর সব কটি রূপের অভাব হতে শুরু করেছে। এটাই আসুরিক শক্তির বিকাশের লক্ষণ। যখনই দেখা যাবে মানুষের মধ্যে সন্তুষ্টি নেই বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে, মায়ের শক্তির অভাব হতে শুরু হয়ে গেছে।

অনেক দিন আগেকার ঘটনা, এক আমেরিকান ভদ্রলোক ভারতের এক শহরে থাকার সময় বুট পালিশ করিয়েছে, তখনকার দিনে বুট পালিশ করতে দশ পয়সা লাগত। ভদ্রলোক দশ পয়সার বদলে তাকে একটি টাকা দিয়ে বলছেন বাকিটা তুমি রেখে নাও। লোকটি ভদ্রলোকের মুখের উপর না করে দিয়েছে – আমি তো দশ পয়সারই কাজ করেছি, দশ পয়সার বেশি আমি নিতে পারি না। ভদ্রলোক বলছেন এটা টিপস্। টিপস্ কি জিনিষি বেচারী জানেই না। শেষ পর্যন্ত লোকটি কিছুতেই নিল না। পরে সেই আমেরিকান ভদ্রলোক লিখছেন – ভারতে যেভাবে তুষ্টি দেখা যায় বিশ্বের অন্য কোথাও এই জিনিষ কল্পনাই করা যায় না। এখন দিনকাল পুরো বিপরীত হয়ে গেছে, এখন তো সন্তুষ্টি নেই উপরন্তু ঘুষ নিয়েই যাচ্ছে। এই তুষ্টির ভাব মায়েরই শক্তি। যার মধ্যে সন্তুষ্টির ভাব আছে বুঝতে হবে তার উপর মায়ের অশেষ কৃপা। সেই তুষ্টিরূপিণী দেবীকে আমরা প্রণাম করছি।

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ(৭১) নমস্তস্যৈ(৭২) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।৭৩

মাতৃভাব পুরুষ নারী সবারই মধ্যে থাকবে, তবে কারুর ভেতর কম, কারুর ভেতর বেশি। মাতৃভাব মানে স্নেহের ভাব। বাবারা যখন নিজের সন্তানদের ভালোবাসছেন তখন তাঁদের মধ্যে মায়ের মতই ভালোবাসা থাকে। এর আগে যে করুণা বা দয়ার ভাবের কথা বলা হল, দয়া, স্নেহ সবই মাতৃভাব থেকে আসে, ভেতরে মাতৃভাব না থাকলে এই ভাবগুলো আসবে না। সাধক যখন সিদ্ধির অবস্থায় চলে যান তখন তাঁর ভেতরটাও মাতৃভাবে পূর্ণ হয়ে যায়। কারণ তখন তিনি দেখেন পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর ভেতর থেকেই বেরিয়েছে। সেইজন্য জগতের সবাইকে তিনি নিজের সন্তান ভাবে দেখেন। যাঁরা বিয়েথা করেননি তাঁদের মধ্যেও মাতৃভাব থাকে। মেয়েরা যখন সাধিকা বা ঋষিকা হন তখন তাঁদের মধ্যে এই মাতৃভাব প্রবল হয়ে যায়। গঙ্গোত্রী যাওয়ার পথে একজন এই রকম সাধিকা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল গঙ্গামাঈ। তাঁর অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সকাল বিকেল যখনই ওনার কাছে যে কেউ পৌঁছে গেলে সঙ্গে সঙ্গে রান্নাবান্না করে খাওয়াতেন, কিছু না হলেও অন্তত এক কাপ চা করে খাওয়াবেনই খাওয়াবেন। সব্বাইকে অকাতরে খাওয়াতেন। সন্তান অনেক দিন পরে বাড়ি এলে মায়েরা যেভাবে দেখাশোনা করে ঠিক সেইভাবে তিনি সবাইকে যত্ন করতেন। এই মাতৃভাব মায়েরই বিশেষ রূপ, মাতৃরূপিণী মাকে আমাদের বারংবার প্রণাম।

যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ(৭৪) নমস্তস্যৈ(৭৫) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।৭৬

সমষ্টি স্তরে যাকে মায়া বলছেন, সেটাই ব্যষ্টি স্তরে ভ্রান্তি বলছেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবান থেকেই বেরিয়েছে। বেদান্ত মতে এটাই মায়া, কারণ ভগবান তিনিই নিজেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপে দেখাচ্ছেন, সেটাই যখন মানুষের স্তরে আসে তখন তাকেই ভ্রান্তি রূপে বলে। যিনি ভগবান তাঁকেই জগৎ রূপে দেখছি, যিনি ভগবান তাঁকেই জীব রূপে দেখছি, এটাই মায়া। এই ভ্রান্তিই যখন চরমে চলে যায় তখন যোগশাস্ত্রে বলছে বিকল্প বিপর্যয়,

বস্তু নেই কিন্তু বস্তু রূপে দেখাচ্ছে, এটাই ভ্রান্তি। খুব যৌক্তিকতা দিয়ে বিচার করলে প্রত্যেকটি কবিই ভ্রান্ত, আকাশের চাঁদ কবি তাকে দেখছেন ঝলসানো রুটি। কিন্তু চব্বিশ ক্যারেট দিয়ে গয়না তৈরী করা যাবে না, গয়না তৈরী করতে গেলে একটু খাদ মেশাতে হবে। ঠিক সেই রকম ভ্রান্তি না থাকলে জগৎ চলবে না। এই জগৎ যে চলছে, ভ্রান্তি আছে বলেই চলছে, না হলে চলত না। নিদ্রা, ক্ষুধা, কোন কিছু ভুলে যাওয়া এগুলো ভগবানের বর, এই বর যদি না থাকে মানুষ বাঁচতে পারবে না। দুদিন ঘুম না হলে মাথা খারাপ হতে শুরু করবে, ক্ষুধা যদি না থাকে খাওয়া-দাওয়াই হবে না, খাওয়া-দাওয়া না হলে মানুষ বাঁচবে কী করে! ঠিক তেমনি ভ্রান্তি যদি একটু না থাকে তাহলে জীবন চলবে না। এই জগতে কে কার, কারুরই কেউ নয় কিন্তু ভ্রান্তি আছে বলে বলছি তুমি যে আমার আমি যে তোমার, আর এই ভ্রান্তিটুকু থাকার জন্য জগৎ আরামসে চলে যাচ্ছে। এই ভ্রান্তি সবারই ভেতরে আছে, কেউ কক্ষণ বলতে পারবে না যে আমার ভেতরে কোন ভ্রান্তি নেই। জগৎ মানেই সত্ত্বগুণ, রজোগুণ আর তমোগুণ। এই তিনটে গুণের একটা গুণ কখন একা থাকবে না, তিনটে গুণ সব সময় এক সঙ্গে থাকবে। ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণ এনারা অবতার, কিন্তু তাঁরাও মায়াকে একটু অবলম্বন করে রেখেছিলেন, তা নাহলে জীবন চলবে না। যেমনি মায়াকে অবলম্বন করলেন তেমনি তমোগুণ এসে গেল, তমোগুণ এসে যাওয়া মানেই ভ্রান্তি এসে গেল। ভ্রান্তিকে থাকতেই হবে, ভ্রান্তি ছাড়া জগৎ চলবে না। এই ভ্রান্তিও মায়েরই। সেই ভ্রান্তিরূপী মাকে আমাদের বার বার প্রণাম।

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চখিলেষু চ।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ।।৭৭
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ(৭৮) নমস্তস্যৈ(৭৯) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।৮০

আমাদের একাদশ ইন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় আর মন। এই একাদশ ইন্দ্র হল অধিষ্ঠান। মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রিণী দেবী, তিনিই সব ইন্দ্রিয়ের মালিক। বেদান্ত মতে প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের একজন করে অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা দেবতা আছেন। সেই দেবী বা দেবতা যদি কোন কারণে কুপিত হয়ে যান তখন সেই ইন্দ্রিয়টি ঠিক ভাবে কাজ করবে না। সেইজন্য আমাদের অনেক কিছু ছিল, চোখের দৃষ্টি কম তাহলে চোখের দেবতা সূর্যের পূজা করুন। কোন একটা ইন্দ্রিয় খারাপ হওয়া মানে সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কুপিত হয়ে গেছেন, সেই দেবতার আরাধনা করে দিলে ইন্দ্রিয়টা ঠিক হয়ে যাবে। এখানে মায়ের আরাধনা করা হচ্ছে, সেইজন্য বলছেন আপনি হলেন সব কটি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী। আপনি আছেন বলেই ইন্দ্রিয়গুলো খেলা করছে। আর প্রত্যেকটি জীবের মধ্যে ইন্দ্রিয় থাকতে হবে, তাই মা রূপে আপনি সমস্ত জীবের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন।

এই দুটো মন্ত্রকে যখন মেলানো হয় তখন এর আরেকটি অর্থ বেরিয়ে আসবে। চেতনা দুই প্রকার, একটা হল সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে চৈতন্য ব্যাপ্ত হয়ে আছে। সেটাকেই পরের মন্ত্রে বলছেন *চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ*। পুরো জগতে যিনি চৈতন্য রূপে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। ওই চৈতন্যই আমার আপনার মধ্যে আসছে আপাদমস্তক আমাদের আমি বোধের মাধ্যমে। এই যে আমি আছি, আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমি বোধ, এটাকেই আগের মন্ত্রে সীমিত করে বলছেন *ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ*, আমার যে আমি বোধ হচ্ছে এটা মায়ের জন্যই হচ্ছে। মানুষ যখন নিজের ব্যষ্টি সত্তার অস্তিত্ব বোধ থেকে সমষ্টি সত্তার অস্তিত্ব বোধে যায় তখন দেখে এই যে চৈতন্য যাকে আমার মধ্যে আবদ্ধ দেখছিলাম সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ওই একটি জিনিষই ব্যাপ্ত রয়েছে, তখনই তার জ্ঞান হয়ে যায়। যখন আপনি শরীর পর্যন্ত ওই জিনিষকে ব্যাপ্তিদেবী রূপে রেখেছেন, তখন আপনি অজ্ঞানী রূপে রয়েছেন। ব্যাপ্তি দেবী আর চিতি দেবী দুজন একই দেবী। সাধারণ মানুষ নিজের পা থেকে মাথা পর্যন্ত এই কাঠামোকেই আমি বলে মনে করে। কিন্তু যোগী যখন ধ্যান করে গভীরে যান তখন তিনি দেখেন তাঁর হৃদয়গুহাতে এক জ্যোতি রয়েছে, এই জ্যোতিই চৈতন্য জ্যোতি। তখন যোগী নিজেকে মনে করেন আমি এই চৈতন্য জ্যোতি। তারপরের স্তরে দেখেন – আরে তাইতো! এই চৈতন্য জ্যোতিই তো সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। তারই কথা চণ্ডীতে বলছেন *চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ*। চৈতন্যের প্রথম ব্যাপ্তি অনুভূত হচ্ছে শরীরের মধ্যে আর দ্বিতীয় ব্যাপ্তি হল পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। আমি বোধ রূপে যখন দেখছে সেটাও মা আর চিতি

রূপে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আছেন সেটাও মা। ব্যষ্টির অস্তিত্বে যিনি অধিষ্ঠাত্রী তিনি আবার সমষ্টির অস্তিত্বের অধিষ্ঠাত্রী, দুটোতে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষের মনে আর একজন জ্ঞানী পুরুষের মনে দুটোতে তফাৎ আছে। সাধারণ মানুষ দেখে আমার শরীরের মধ্যেই তিনি ব্যাপ্ত আর জ্ঞানী দেখেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তিনিই ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। সেই চিতিরূপী মাকে দেবতারা স্তুতি করে বলছেন আপনাকে আমরা বার বার প্রণাম করছি।

দেবতারা হিমালয়ে দেবীর এই স্তুতি করছেন, যেখানে কেউ নেই। কারণ দেবতাদের ধারণা মা শিবের সঙ্গে থাকেন বলে তিনি হিমালয়েই আছেন। কিন্তু এখানে পরিষ্কার করে এত কিছু বলা নেই। তবে হিমালয় হল ঋষিদের বাসস্থান, ঋষিরা হিমালয়ে থাকেন বলে দেবতারাও হিমালয়ে থাকেন। সেইজন্য বলা হচ্ছে দেবতারা হিমালয়ে গিয়ে মায়ের স্তুতি করছেন। তারপর বলছেন –

স্তুতা সুরৈঃ পূর্বমভীষ্টসংশ্রয়াৎ
তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা।
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী
শুভানি ভদ্রাণ্যাভিহন্তু চাপদঃ।।৮১

বেদান্তের দৃষ্টিতে 'ঈশ্বরী' শব্দের কোন অর্থ হয় না, কিন্তু যিনি ঈশ্বর তাঁর শক্তিকে ঈশ্বরী বলে সম্বোধন করা হচ্ছে। দেবতারা বলছেন, আগে আগে দেবতারা মায়ের স্তুতি করে যে অভিষ্ট ফল পেয়েছিলেন, ইন্দ্র যাঁর নিত্য আরাধনা করেছিলেন, আর যিনি এই বর প্রদান করেছিলেন যে, যখনই কোন আপদ-বিপদ হবে তখন আমাকে স্মরণ করলে আমি আবির্ভূতা হয়ে তোমাদের সমস্ত বিপদ বিনাশ করে দেব। তাই এখন আবার বিপদ এসেছে, আমরা প্রার্থনা করছি তিনি যেন কৃপা করে আমাদের শুভ ও মঙ্গল করেন। আরও বলছেন –

যা সাম্প্রতং চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈ-
রস্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্যতে।
যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্তিভিঃ।।৮২

আমরা দেবতারা বলদর্পী ঔদ্ধত দৈত্যদের দ্বারা উৎপীড়িত, বিতাড়িত। আমরা সব দেবতারা যে পরমেশ্বরী জগদম্বাকে সম্প্রতি স্তব করছি, এই জগদম্বার বিশেষ কী গুণ? *যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ*, যাঁরা সৎ পুরুষ, যাঁদের অন্তরে ভক্তির ভাব আছে, যাঁরা বিনম্র তাঁরা যখন সেই জগদম্বাকে ভক্তিবিনম্র মুর্তিতে স্মরণ করেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁদের সমস্ত আপদ বিপদের নাশ করে দেন, সেই দেবী জগদম্বার আমরা স্তুতি করছি তিন যেন আমাদের এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করেন। প্রথম অধ্যায়ে যে স্তুতি ছিল সেই স্তুতি এক ধরণের, এখানের স্তুতিতে প্রত্যেক মানুষ ও প্রত্যেক জীবের মধ্যে তিনি একটা শক্তি রূপে আছেন, সেই শক্তির আরাধনা ও দেবীকে প্রণাম করে বলা হচ্ছে তিনি যেন আমাদের রক্ষা করেন। এর জন্য দেবতারা আগের আগের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন, এর আগে আগে দেবতারা যখন মায়ের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন তখন মা তাঁদের অভিষ্ট ফল প্রদান করেছিলেন আর *তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা*, দেবতাদের রাজা ইন্দ্র অনেক দিন ধরে মায়ের সেবা আরাধনা করে আসছেন।

এই মন্ত্রগুলো শোনার পর আমাদের মনে একটা ধারণা জন্মায় যে, আমাদের টাকা-পয়সা নেই মায়ের এই স্তুতি করলে আমাদের অনেক টাকা এসে যাবে, আমাদের অনেক দুঃখ-কষ্ট, মায়ের এই স্তুতি করলে সব দুঃখ-কষ্ট চলে যাবে। কিন্তু এই অর্থে এই মন্ত্রগুলিকে দেখা হয় না। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় হাজরা মশাই থাকতেন আর লোকেদের উপদেশ দিতেন। হাজরা বলতেন ঈশ্বর হলে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, তাঁর কাছে সব ঐশ্বর্য আছে, তিনি চাইলে টাকা-পয়সাও দিয়ে দিতে পারেন। ঠাকুর শুনে বলতেন – পূর্বজন্মে হাজরা হয়তো কাঙাল ছিল সেইজন্য খালি টাকা টাকা করে। আবার ঠাকুর একটা গল্পের মাধ্যমে বলছেন – দুই বন্ধু জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছিল। রাত হয়ে গেছে, বাঘ ডাকছে। এক বন্ধু বলল চল ভাই! আমরা ঈশ্বরকে ডাকি। অন্য বন্ধু বলছেন 'ঈশ্বরকে ডেকে কী হবে! চল আমরা গাছে উঠে রাতটা কাটিয়ে দিই'। আমাদের জাগতিক জীবন জাগতিক উপায় দিয়েই নির্বাহ করতে হয়।

স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, যে কোন সমস্যার সমাধান সেই বস্তুর মধ্যেই খুঁজতে হয়। যদি সেই বস্তু থেকেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, এই সমাধান সব সময় সেই সমাধানের থেকে শ্রেষ্ঠ হবে যে সমস্যার সমাধান বাইরে থেকে পাওয়া গেছে। যেমন, গাছ থেকে আম পড়ছে। আমরা দেখছি আম উপরে না গিয়ে নীচে পড়ছে। এখন এই সমস্যা সমাধানের দুটো পথ আছে। আপনি বলতে পারেন কোটি কোটি দৈত্য আছে, আম গাছ থেকে পড়তেই ওরা সেই আমকে ধরে নীচে নামিয়ে দেয়। এখানে আপনি বাইরে থেকে একটা সমাধান নিয়ে আসছেন। আম আছে আর পৃথিবী আছে, এরমধ্যে বাইরে থেকে আরেকটা শক্তি এসে গেল দৈত্য, যে শক্তিটা আপনি নিয়ে এসছেন। নিউটন বললেন Law of gravitationএর জন্য গাছ থেকে আপেল মাটিতে পড়ে। মাধ্যাকর্ষণের একটা শক্তি আছে, যে শক্তিতে পৃথিবী আমকে নিজের দিকে টানছে আর আম পৃথিবীকে নিজের দিকে টানছে। ফলে আম উপরে না গিয়ে নীচে নেমে আসছে। এখানেও একটা গোলমাল আছে। পৃথিবী আর আমের মাঝখানে আরেকটা তৃতীয় শক্তি এসে যাচ্ছে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। যে কোন বস্তুর মধ্যেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির এই গুণ থাকে। এটাকে মাথায় রেখে এবার যদি নিউটনের Law of gravitation forceএ যাওয়া হয় তখন সেখানে gravitation forceটাও চলে যাচ্ছে। তখন সেখানে শুধু পিওর জিওমেট্রি। পিওর জিওমেট্রি আরেক ধাপ এগিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কোন না কোন ভাবে রাখতে হয়। ঠিক তেমনি আমাদের যে কোন সমস্যা, যেমন লোকের সঙ্গে একটুতেই আমার ঝগড়া হয়ে যায়। এই সমস্যার সমাধান এখন কোথায় খুঁজবো? একটা বলা যেতে পারে ঠাকুরের ইচ্ছা, দ্বিতীয় সমাধান আনতে পারি কর্ম। ঠাকুরের ইচ্ছার তুলনায় কর্মের সমাধান অনেক ভালো, কারণ ব্যাপারটা আমার উপরেই চলে আসছে আর ঠাকুরের ইচ্ছা যখন বলছি তখন বাইরে চলে যাচ্ছে। সমস্যার সমাধান সব সময় খুঁজতে হবে ওই বস্তুর মধ্যে। যদি সমাধান না পাওয়া যায় তখন বাইরে যেতে হবে। কিন্তু যখনই অন্য অনেক সমাধানের মধ্যে সমাধানটা বস্তুর ভেতরে পাওয়া যাবে তখন জানবেন যে ওই সমাধান সব সময়ই শ্রেষ্ঠ সমাধান হবে। তুমি জীবনে এত মার খাচ্ছ কেন? আমি অপদার্থ তাই। এটাই ঠিক ঠিক ভালো সমাধান। আর যদি বলেন ঠাকুর মারছেন তাই মার খাচ্ছি। এই সমাধান কখনই ভালো সমাধান হবে না। আপনার কর্মের জন্য মার খাচ্ছেন, এটা হল মাঝারি সমাধান। আমার টাকা-পয়সার অভাব। এর তিনটে সমাধান হতে পারে। একটা হল, এই জন্মে আমি সেইভাবে পরিশ্রম করিনি। দ্বিতীয়, এর আগের আগের জন্মে আমি অনেক গোলমাল করেছি। তৃতীয় ভগবানের ইচ্ছা। স্বামীজী যে বিধান দিয়েছেন তা হল যে সমস্যাটা ওই বস্তু থেকে আসছে, ওটাই সঠিক সমাধান। তার মানে এই জীবনে আপনি ঠিক ভাবে কাজ করেননি। কিন্তু জীবনে ঠিক ভাবে কাজ করেছেন, সব কিছু ঠিক ঠিক ভাবে চলেছে, সব কিছুই ঠিক আছে কিন্তু তাও ভালো হচ্ছে না। তখন আরেক ধাপ পেছনে যেতে হবে, পূর্বজন্মে যেতে হবে। যারা পূর্বজন্ম বিশ্বাস করে না, যেমন মুসলমান, খ্রিশ্চানরা, তারা বলবে আল্লা বা গডের ইচ্ছা, আমি তো কোন দোষ করিনি তাও খারাপ হচ্ছে মানে আল্লার ইচ্ছা। একটা বাচ্চা ছেলে জন্ম থেকেই অন্ধ। বাচ্চার তো কোন কাজ করাই শুরু হয়নি তাহলে তার দোষ কোথা থেকে এল? বাচ্চা তো কোন দোষ করেনি, তাও তাকে অন্ধ হয়ে কেন জন্ম নিতে হল। ডাক্তাররা বলবে জেনেটিক ত্রুটি ছিল। যদি এটাও না বলে তখন বলবে আল্লা বা গডের ইচ্ছা। তখন বাচ্চার বাবা-মা সবাই সেটাই মেনে নেবে। এখন কাল যদি এর কোন উত্তর এসে যায় যে, বস্তুর মধ্যেই এর সমাধান আছে তখন ওই সমাধানটাই ভালো হবে। আমাদের যা কিছুই হচ্ছে, জীবনে সাফল্য আসছে, অসাফল্য আসছে সব কিছুর সমাধান খুঁজতে হয় বস্তুর ভেতরে। এখানে যখন বলছেন সৎ পুরুষ যাঁরা, সাধু মহাত্মা যাঁরা তাঁরা মনে করলেই তাঁদের সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, তখন এই কথাকে কখনই কামিনী-কাঞ্চনের অর্থে নিতে নেই। এটাকে সব সময় নিতে হয়, যে বৈষয়িক চিন্তাগুলো হয় সেই চিন্তাগুলোকে নাশ করে দেন।

যোগশাস্ত্রে এই ধরণের কোন কিছু আলোচনা করবে না। যোগে দুটি জিনিষ চলে, চৈতন্য আছে আর জড় আছে। চৈতন্য জড়ের সঙ্গে মিশে আছে। জড় কাছে থাকার জন্য চৈতন্যের প্রচুর অশান্তি। জড় বা প্রকৃতির নৃত্য দেখে চৈতন্য মুগ্ধ হয়ে সেও নৃত্য করছে। প্রকৃতির খপ্পড় থেকে তাঁকে যদি বেরোতে হয় তাঁকে তাহলে ভাবতে হবে আমি পুরুষ, আমি চৈতন্যবান, আমার সাথে কারুর কোন সম্পর্ক নেই। প্রকৃতিও তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাঁকে ছেড়ে দেবে। এখানে যে বলা হয়েছে মহাত্মারা মনে করলেই তাঁরা সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসেন, এই

কথাকে যদি আক্ষরিক অর্থে নিতে যান তখন এর অর্থ হবে – তাঁর মধ্যে যে সাংসারিক বৃত্তিগুলি আসছে সেগুলোকে নাশ করে দেন। আর যদি এর অর্থ করেন তাঁর জাগতিক ভালো হয়, তাহলে বলতে হয় এই ধরণের দৃষ্টান্ত বিশ্বের ইতিহাসে আমরা কোথাও পাই না, যিনি নিজেকে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ সমর্পিত করে রেখেছেন আর তাঁর সব ধরণের জাগতিক মঙ্গল হয়ে গেছে। যিশুকে ক্রুসিফাইড করে দেওয়া হল, ঠাকুর একজন অকিঞ্চন ব্রাহ্মণ, শেষে তাঁর খাওয়ার পয়সাও জুটতো না, এমনই করুণ অবস্থায় ছিলেন। ভগবান বুদ্ধ সাম্রাজ্য ছেড়ে একটা ভিক্ষাপাত্র নিয়ে কাঙালীর মত ঘুরে বেড়ালেন। যাঁরাই ভগবানের পথে যান তাঁদের জাগতিক ঐশ্বর্য হয়ে গিয়েছিল, এই ধরণের দৃষ্টান্ত আমরা কোথাও পাই না। তবে অনেক সময় শাস্ত্রে অর্থবাদ করা হয়, অর্থবাদ মানে বিদ্যার স্তুতি করা। আর উপনিষদেও অর্থবাদ পাওয়া যায়, যেখানে বলছেন তিনি স্বর্গলোককেও জয় করেন। কেউ কেউ বলেন যে সন্ত মহাত্মাদের এমন ক্ষমতা হয়ে যায় যে তাঁরা যেটা বলে দেন সেটা হয়ে যায়। কারণ শেষ পর্যন্ত সব শক্তিই হল চৈতন্যের, তাই চৈতন্য যখন যেটা মনে করবে ঠিক করে নেয় তখন প্রকৃতি তা মেনে নেয়। কিন্তু যাঁরা সত্যিকারের উচ্চমানের আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁরা কখনই এদিকে মন দেন না। ঠাকুর এগুলোকে তুলনা করছেন প্রৌঢ়া বেশ্যার মলমূত্রের সঙ্গে। ঠাকুরের মত পুরুষ কি কখন বলবেন মা আমাকে কটি টাকা দাও? কাশীপুরে গলার ক্যান্সারে যখন ঠাকুর কষ্ট পাচ্ছেন তখন তাঁর শিষ্যরা বলছেন আপনি মায়ের কাছে বলুন শরীরটা যাতে মা ভালো করে দেন। ঠাকুর লজ্জায় প্রার্থনা করতে পারছেন না। শেষে বলছেন – মা! খেতে পারছি না। মা জগজ্জননী তখন ঠাকুরকে শিষ্যদের দেখিয়ে বলছেন – এদের মুখ দিয়ে তো খাচ্ছিস। ওখানেই সব কিছু শেষ। ঠাকুর বলছেন লজ্জায় আমি মাকে বলতে পারলাম না। মা হলেন রাজরাজেশ্বরী, তাঁর কাছে প্রার্থনা করে যদি কিছু পেতে চান আপনাকে তাহলে তাঁর কাছে গিয়ে সরাসরি বলতে হবে। বড়লোকের কাছে যদি একবার হাত পেতে কিছু চাইলে দ্বিতীয়বার আর আপনি তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারবেন না। বড়লোকেরা তাদের বাড়িতে কাঙালীদের ঢুকতেই দেয় না। আমরা হলাম বালবুদ্ধি সম্পন্ন, ছোট্ট মনের বলে ভাবি ঠাকুরর কাছে চাইলে তিনি টাকা-পয়সা সব দিয়ে দেন।

কিন্তু সমাধাণ বলতে যা বোঝায়, আপনার জীবনের যা কিছু দরকার বলুন, আপনার কী সমস্যা বলুন? আমার টাকা দরকার। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ, ব্যবসায় নেমে পড়ুন টাকা আসবে। ব্যবসায় আবার মন্দা তেজী সব রকম আছে, টাকা নিলে মন্দা তেজীকেও নিতে হবে। আপনার শরীর খারাপ, আপনি ডাক্তারের কাছে যান, আপনার অশান্তি চলছে তাহলে ভালো কোন পরামর্শদাতার কাছে যান। এগুলোর জন্য ভগবানের কাছে যাওয়া কেন! কিন্তু এখানে পরিষ্কার বলছেন *সর্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্তিভিঃ*, যাঁদের মধ্যে ভক্তি আছে, বিনম্রতা যাঁদের মধ্যে আছে, তাঁরা যদি স্মরণ করেন তাহলে তাঁদের কষ্টের নাশ হয়ে যাবে। তাই বলে কেউ যদি তাঁর গলা কাটতে আসে তাঁর কি খুব কষ্ট হবে? একটুও না, এগুলোকে তাঁরা কোন গ্রাহ্যই করেন না। মুসলিম পরিব্রাজক ইবনবতুতার একটি বর্ণনা আছে। তিনি অনেক সতিদাহ দেখেছিলেন। তাঁর চোখের সামনে সতিদাহ হচ্ছে ওই দেখে তিনি নিজে বমি করতে শুরু করেছেন। দেখছেন যাকে স্বামীর সঙ্গে চিতায় পুড়িয়ে মারা হবে তাকে কত সুন্দর করে সাজিয়ে-গুজিয়ে শ্মশানে নিয়ে আসছে, আর যারা সতিদাহ করাবে তারা আগুনকে ঢেকে রেখেছে। ইবনবতুতা দেখছেন, মেয়েটি তাদের বলছে 'আপনারা আগুনকে ঢেকে রেখেছেন এই ভেবে যে আমি ভয় পেয়ে যাব? আমি তো আমার চিরসঙ্গীর সাথে এক হতে যাচ্ছি'। আরও মজার যে, আশেপাশের সবাই বলছে 'তুমি তো স্বর্গে যাচ্ছ, সেখানে আমার মাকে সংবাদ দিও, আমার বাবাকে সংবাদ দিও'। উপলব্ধির একটা জায়গায় যখন মানুষ পৌঁছে যায় তখন সংসারের যে পরিণামগুলির কথা ভেবে আমরা ভয়ে মরছি, সেগুলো থেকে তাঁর কোন ভয় থাকে না। যাই হোক, আমরা আবার চণ্ডীর আলোচনা ফিরে যাই। দেবতারা এইভাবে স্তুতি করার পর ঋষি আবার কাহিনীতে ফিরে আসছেন –

ঋষিরুবাচ।৮৩
এবং স্তবাদিযুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্বতী।
স্নাতুমভ্যাযযৌ তোয়ে জাহ্নব্যা নৃপনন্দন।।৮৪

সুরথ রাজা আর সমাধি বৈশ্যকে ঋষি এই কাহিনী বলছিলেন। ঋষি বলছেন – হে নৃপনন্দন! এইভাবে দেবতারা যখন স্তব করছিলেন সেই সময় মা পার্বতী গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় সেইখান দিয়েই যাচ্ছিলেন। মা পার্বতীকে এখানে মানবী রূপে দেখান হচ্ছে। তিনি গঙ্গাস্নানের জন্য বেরিয়েছেন। একদিক দিয়ে গঙ্গার মাহাত্ম্যের উল্লেখ হয়ে গেল, স্বয়ং জগদম্বা গঙ্গা নদীতে অবগাহন করতেন। আর যদি লীলা রূপে দেখেন তাহলে বলবেন, মায়ের স্তুতি হচ্ছে শুনে তিনি আবির্ভূতা হয়ে গেছেন, আর গঙ্গাস্নানের নাম করে তিনি যেন দেবতাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এসেছেন।

সাব্রবীত্তান্ সুরান্ সুভ্রূর্ভবদ্ভিঃ স্তূয়তেহত্র কা।
শরীরকোষতশ্চাস্যাঃ সমুদ্ভূতাহব্রবীচ্ছিবা।।৮৫

সুভ্রূর্ভবদ্ভিঃ, সুন্দর ভ্রূ বিশিষ্টা দেবী পার্বতী দেবতাদের জিজ্ঞেস করছেন আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে কার স্তুতি করে যাচ্ছেন। পার্বতী হয়তো ব্যাপারটা জানতেন না, কিন্তু যিনি ঈশ্বরী তাঁর তো জানার কথা। কিন্তু তার থেকেও আরও আশ্চর্জনক যে, *শরীরকোষতশ্চাস্যাঃ সমুদ্ভূতাহব্রবীচ্ছিবা*, পার্বতীর শরীর থেকে শিবা নামে দেবী আবির্ভূতা হলেন। আবির্ভূতা হয়ে সেই শিবা দেবী পার্বতীকে বলছেন –

স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তে শুম্ভদৈত্যনিরাকৃতৈঃ।
দেবৈঃ সমেতৈঃ সমরে নিশুম্ভেন পরাজিতৈঃ।।৮৬

পার্বতীর শরীর থেকে আরেকটি শক্তি বেরিয়ে এসেছে, সেই শক্তিকে এখানে বলা হচ্ছে শিবা। সে শিবা দেবী বলছেন 'এরা সবাই আমারই স্তুতি করছে। শুম্ভ আর নিশুম্ভ নামে অসুরদের কাছে পরাজিত ও বিতাড়িত হয়ে এরা আমারই স্তুতি করছে'। এখানে বলা হচ্ছে পার্বতীর শরীরের কোষ থেকে শিবা দেবী বেরিয়ে এসেছেন। তার ফলে কী হচ্ছে?

শরীরকোষাৎ যত্তস্যাঃ পার্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা।
কৌশিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে।।৮৭

মা পার্বতীর শরীরের কোষ থেকে যেহেতু তিনি আবির্ভূতা হয়েছেন সেইহেতু তাঁর নাম হল কৌশিকী। কৌশিকী মা দুর্গারই রূপ। মায়ের এই রূপ আগেও ছিল, মহিষাসুর বধের সময়েও এই রূপ এসেছিল আর শুম্ভ নিশুম্ভ বধের সময়েও এই রূপ আসছে। বলছেন, তিনি মা পার্বতীকে আশ্রয় করে ছিলেন আর তিনি এখন মায়ের শরীরের কোষ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। মা দুর্গারই একটি রূপ দেবতাদের চোখের সামনেই পার্বতীর শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছে, তাঁর নাম কৌশিকী। সমস্ত জগতে তিনি 'কৌশিকী' নামে অভিহিতা হন।

তস্যাং বিনির্গতায়াস্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া।।৮৮

মায়ের শরীর থেকে বেরিয়ে আসাতে মা পার্বতীর কান্তিটাও শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছে। এর পেছনে যেটা থেকে গেল সেটা কালো রূপ হয়ে থেকে গেল। তাই বলে আমরা যে অর্থে কালো বলি সেই রকম কালো নয়, কিন্তু মায়ের একটা তেজ বেরিয়ে এসেছে। এর আগেও আমরা দেখেছি সব দেবতাদের যে তেজ সেই তেজ দিয়েই মায়ের শরীর তৈরী হয়েছিল। যাই হোক, যেটা পেছনে থেকে গেল তাঁর নাম হল কালী। মায়ের এখন দুটো রূপ হয়ে গেল – একটা কৃষ্ণবর্ণা আরেকটি শুক্লবর্ণা। শুক্লবর্ণার নাম দুর্গা আর শুক্লবর্ণার আরেকটি নাম কৌশিকী। এর পেছনে যে পার্বতী থেকে গেলেন তাঁর নাম হয়ে গেল মা কালী। তখন মা পার্বতী হিমালয়ে অধিষ্ঠান করে কালিকাদেবী নামে খ্যাত হয়ে গেলেন। মায়ের শক্তি এখন দুটো ভাগে চলে গেল, তাই বলে যে, কোন ভাগ কমে গেল আর কোন ভাগ বেশি হয়ে গেল তা নয়। এই যে মায়ের শুক্লবর্ণের সুন্দর রূপটা বেরিয়ে এসেছে, সেখান থেকেই কাহিনী শুরু হয়।

প্রথমটা হল, দেবতারা এসে স্তুতি করেছেন, সেই সময় পার্বতী অবাক হয়ে ভাবছেন এরা কার স্তুতি করছে। তখন তাঁরই শরীরের কোষ থেকে একটি শরীর বেরিয়ে এসে বলছেন – এরা আমারই স্তুতি করছে। এর

আগেও আমরা আলোচনা করেছিলাম যে ঠাকুরেরও এই ধরণের দিব্য দর্শন হয়েছিল, যেখানে তিনি দেখছেন তাঁর ভেতর থেকে অন্য এক শরীর বেরিয়ে আসছে। একবার দুবার নয়, বিভিন্ন সময় উনি দেখেছেন। শেষের দিকে একদিন দেখছেন ঠাকুরের শরীর থেকে ঠাকুরের মতই একজন বেরিয়ে এসেছেন, তিনি দেখছেন তাঁর পুরো পিঠে ঘা। চমকে উঠে ঠাকুর বলছেন – এটা কী? সেই শরীর বলছেন – এই যে সবারই পাপ নিতে হয়েছে, তাই এই ঘা। ঠাকুরের যে এই দিব্য দর্শন হত, এখন আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে এগুলোর পেছন কোন বিশেষ আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ছিল কিনা। আবার তিনি অনেকের ব্যাপারে বলছেন, আমি তোমাকে যিশু খ্রিষ্টের দলে দেখেছি, তাকে চৈতন্যের দলে দেখেছি। পরে দেখা যাচ্ছে তাঁদের আধ্যাত্মিক ভাবধারা ঠিক সেই ধারাতেই চলেছিল। ঋষি যে এখানে বর্ণনা করছেন মায়ের শরীর থেকে আরেকটি শক্তি বেরিয়ে এসেছে, হয়তো তিনি নিজে এই রকম কিছু দেখেছিলেন। যাই হোক, এখান থেকেই শুম্ভ নিশুম্ভের কাহিনী শুরু হচ্ছে।

ততোঽম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্।
দদর্শ চণ্ডো মুণ্ডশ্চ ভৃত্যৌ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।।৮৯

তাভ্যাং শুম্ভায় চাখ্যাতা সাতীব সুমনোহরা।
কাপ্যাস্তে স্ত্রী মহারাজ ভাসয়ন্তী হিমাচলম্।।৯০

নৈব তাদৃক্ ক্বচিদ্রূপং দৃষ্টং কেনচিদুত্তমম্।
জ্ঞায়তাং কাপ্যসৌ দেবী গৃহ্যতাঞ্চাসুরেশ্বর।।৯১

স্ত্রীরত্নমতিচার্বঙ্গী দ্যোতয়ন্তী দিশস্ত্বিষা।
সা তু তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্র তাং ভবান্ দ্রষ্টুমর্হতি।।৯২

শুম্ভ নিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ড ও মুণ্ড একদিন হিমালয়ে গিয়ে সেই সুমনোহর মূর্তিধারিণী অম্বিকাদেবীকে দেখতে পেল। শুধু সুমনোহর নয়, অতীব সুমনোহর, এই রকম সুন্দর জিনিষ জগতে কখন এর আগে দেখা যায়নি। চণ্ড মুণ্ড ফিরে গিয়ে তাদের প্রভু শুম্ভকে বলছে – হিমালয়ে গিয়ে দেখে এলাম পরমা সুন্দরী এক নারী তার দিব্য অঙ্গশোভায় সমস্ত হিমালয়কে আলোকিত করে বিরাজ করে আছেন। এই রকম অপূর্ব রূপ কেউ কোথাও কখনও দেখেইনি। এই সুন্দরী একমাত্র আপনারই যোগ্য, আপনি আরও অনুসন্ধান ও খোঁজ করে তাঁকে গ্রহণ করুন, এটা আপনার অধিকার।

এখানে একটা মজার ব্যাপার হল, সব জিনিষ সবার জন্য উপযুক্ত হয় না। উপযুক্ত মানে, যে জিনিষটাকে আপনি replace করতে পারবেন। যে জিনিষকে আপনি replace করতে পারবেন, সেই জিনিষ ছাড়া কোন জিনিষ রাখতে নেই। যে জিনিষের আপনি replace করতে পারবেন না, সেই জিনিষ কখনই আপনার জন্য উপযুক্ত হবে না। যেমন আমাদের সবারই জামা-কাপড় আছে, বেশির ভাগ জামা-কাপড়ই আমরা replace করতে পারব। যদি বাসন চুরি হয়ে যায়, আরেকটা বাসন আমি কিনে নিলেই মিটে যাবে। এটাই হল ঠিক ঠিক standard। অন্য দিকে আমরা অনেক কষ্ট করে ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য কিছু জিনিষ সঞ্চিত রাখি। মেয়েরা আগেকার দিনে তাদের জীবন কীভাবে চলবে এই ব্যাপারে কাউকেই ঠিক ঠিক ভরসা করতে পারতো না। সেইজন্য মনু তৈরী করে দিলেন স্ত্রীধন। বিয়ের সময় স্ত্রীরা যা গয়না, বিভিন্ন যে উপহার সামগ্রী পেয়েছে, বিয়ের পরেও বাবা, ভাইরা যদি কিছু দিয়ে থাকে সেটা তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি, এটাকেই মনু স্ত্রীধন হিসাবে চিহ্নিত করে দিলেন। কিন্তু মেয়েরা এত সম্পত্তি রাখবে কোথায়! তাই ওরা গয়না বানিয়ে রেখে দিত। গয়না বানিয়ে শরীরেই সেগুলো ধারণ করে রাখত, তারা আশা করত যে বাড়িতে থাকলে বাড়ির লোকেরা কেউ ছিনতাই করবে না। এটা তার নিজের সম্পত্তি। কিন্তু এগুলো ছিল তার reserve, বাইরে যখন যেতে হবে তখন এমন জিনিষই পড়বে যেটা হারিয়ে গেলে বা ছিনতাই হয়ে গেলে আবার একটা বানিয়ে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু গয়না যদি হারিয়ে যায় তাহলে কেঁদে মরতে হবে। এখন আপনার যা কিছু আছে সব বিক্রী করে একটা হীরের নেকলেস বানালেন, কিন্তু হীরের এই নেকলেসটা আর replaceable হল না, ওটা একবারই কেনা যায়। হারিয়ে গেলে, চুরি হয়ে গেলে আপনার সর্বস্ব চলে যাবে। এই কাজ কখনই করতে নেই। সেইজন্য এমন জিনিষ রাখতে নেই

যেটা চলে গেলে আমাদের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়ে যাবে, সেই ক্ষতিপূরণ করা কখনই আর সম্ভব হবে না। সব কিছুই, গাড়ি, বাড়ি, ঘড়ি, মোবাইল, টিভি আমাকে এমন ভাবে রাখতে হবে যাতে করে কোন কারণে যদি সেই জিনিষ চলে যায় আমার যেন সঙ্গে সঙ্গে replace করার ক্ষমতা থাকে।

কিং ফিশার এয়ারলাইনস্ কোম্পানীতে যখন গোলমাল হল তখন ওদের অনেকেই আত্মহত্যা করতে শুরু করল। সবাই অবাক হয়ে ভাবছে কী এমন বিপর্যয় হল যে সবাই আত্মহত্যা করতে শুরু করল। কিছু দিন বাদে ব্যাপারটা বোঝা গেল, যাদের এক লাখ টাকা বেতন ছিল হঠাৎ এক লাফে ওরা সবাই দশ লাখ করে মাইনে পেতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই তাদের লাইফ স্টাইলটাই পাল্টে দিয়েছে। আগে যারা টু-রুমের ফ্ল্যাটে ছিল সঙ্গে সঙ্গে তারা পাঁচ রুমের ফ্ল্যাটে চলে গেছে, দামী দামী গাড়ি কিনতে শুরু করে দিয়েছে। মাঝখান থেকে একদিন কিং ফিশার হয়ে গেল বন্ধ। সবার চাকরি চলে গেল। এবার যারা দু কোটি, তিনি কোটি টাকা ধার করে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছে, গাড়ি কিনেছে তারা আর ইএমআই দিতে পারছে না। যার ফলে উঁচু থেকে নীচে নেমে আসতে হচ্ছে, সবাই কেঁদে মরছে। কেঁদেও তো অত টাকা শোধ করতে পারবে না। সেইজন্য যখনই মাইনে বেড়ে যায় তখন নিজেকে সামলে রাখতে হয়। স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে বাড়ির লোকেরা যাই বলুক আপনাকে সব সময় মাথায় রাখতে হবে যেটাই রাখি না কেন সেটা যেন replaceable হয়।

এখানে যে কৌশিকী দেবীর কথা বলা হচ্ছে, যিনি সুমনোহরা, এই অসাধারণ রূপসী নারী যদি কোন লোকের কাছে চলে আসে তখন সবটাই mismatch হয়ে যাবে। স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও একই জিনিষ প্রযোজ্য। ছেলেরা সবাই চায় ফিল্মস্টারকে বিয়ে করতে। এক নামকরা ফিল্মস্টারকে বিয়ে করার কয়েক দিনের মধ্যেই একজনকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হয়েছে। সবারই ক্ষেত্রে এই একই পরিণতি হতে বাধ্য। ফিল্ম হিরোইনকে ফিল্ম হিরোই বিয়ে করতে পারে, হিরোইন যদি ছেড়ে যায় হিরো আরেকটা হিরোইনকে নিয়ে আসবে। চণ্ড আর মুণ্ড এই কথাই শুম্ভকে বলছে যে, কৌশিকী দেবী এতই সুমনোহরী যে তিনি এই জগতে নারীদের মধ্যে একটি অমূল্য রত্ন, তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ অতীব সুন্দর আর তাঁর শ্রীঅঙ্গের প্রভায় দশ দিক আলোকিত হয়ে গেছে। এই জগতে কেউই তাঁকে পাওয়ার জন্য উপযুক্ত নয়। আপনি উপযুক্ত কিনা জানি না কিন্তু অন্য কেউই উপযুক্ত নয়। কিন্তু হে মহারাজ! আমি জানি আপনি উপযুক্ত। কেন উপযুক্ত? তখন বলছেন –

যানি রত্নানি মণয়ো গজাশ্বাদীনি বৈ প্রভো।
ত্রৈলোক্যে তু সমস্তানি সাম্প্রতং ভান্তি তে গৃহে।।৯৩

চণ্ড আর মুণ্ড বলতে চাইছে না যে আপনি এই স্ত্রীরত্নের জন্য উপযুক্ত, বরং বলতে চাইছে জগতে যা কিছু ভালো ও মূল্যবান মণিমাণিক্যা, হাতীঘোড়া ইত্যাদি যত রত্ন আছে সবই আপনার হেফাজতে। কি কি মূল্যবান জিনিষ আপনার প্রাসাদে শোভা পাচ্ছে?

ঐরাবতঃ সমানীতো গজরত্নং পুরন্দরাৎ।
পারিজাততরুশ্চায়ং তথৈবোচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ।।৯৪

গজরাজ ঐরাবত, পারিজাত বৃক্ষ এবং উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, যা আপনি ইন্দ্রের কাছ থেকে পেয়েছেন। এরা এমন কিছু বলতে চাইছে না যে replaceable, বলতে চাইছে আপনি যোগ্য কিনা জানি না, কিন্তু জগতে আর কেউই যোগ্য নয়। এই স্ত্রীরত্নকে যদি কাছে রাখতে হয় একমাত্র আপনিই রাখতে পারবেন।

আগেকার দিনে যারা মণিমুক্তার কারবার করত তারা স্বভাবেই খুব ধূর্ত হত। বসরা থেকে তাদের মুক্তা, পাথর এইসব নিয়ে আসতে হত। কোথায় সেই বসরা আর সেখান থেকে দিল্লী আসতে হত। রাস্থায় কোথায় চুরি হয়ে যাবে, ছিনতাই ডাকাতি হয়ে যাবে, বিরাট ঝুঁকি নিয়ে চলতে হত। কোন রকমে এসে ওরা আবার দিল্লীর বাদশার কাছে পৌঁছে যেত। বাদশার কাছে পৌঁছানও তখন খুব মুশকিল ছিল। কিন্তু ওদের অনেক রকম ব্যবস্থা করা থাকত। কায়দা করে ঠিক বাদশার কাছে পৌঁছে যেত। বাদশার কাছে একই রকম হা হুতাশ করে নাটক করতে থাকত – কী ভুল করে যে আমি দিল্লী এলাম, আমার কাছে এমন জিনিষ আছে একে সম্মান দেওয়ার মত একটি লোকও পেলাম না, এর মূল্য দিতে পারবে একটি লোকও পেলাম না, হুজুর আপনি যদি একে সম্মান দেন।

বলেই একটা মুক্তার মালা বার করত। বাদশা হয়ত জিজ্ঞেস করল কত দাম। দাম হয়ত পঞ্চাশ হাজার, বলবে নয় লাখ টাকা। বাদশাও জানে ওরা এই রকম কায়দা করে। বাদশার মুশকিল হল তিনি বেশি দরদাম করতে পারবেন না, বাদশা বলে কথা। তখন বাদশা কাউকে দিয়ে খাজানা থেকে একটা মুক্তোর মালা এনে দেখিয়ে বলল, এই দেখো, এই মুক্তা আমি দু লাখ টাকায় পেয়েছিলাম। বাদশাকে এই মুক্তোর মালা বেচার সময়েও বোকা বানানো হয়েছিল। শেষে ওই দু লাখ টাকাতেই ওরা দিয়ে দেবে। বাইরে যার দাম পঞ্চাশ হাজার সেটাকে দু লাখ টাকা দিয়ে গচিয়ে তার আখেরে অনেক লাভই হল। এরা সব সময় এই কায়দাই করবে। চণ্ড মুণ্ডও ঠিক এই একই জিনিষ করছে, এই অতীব সুন্দরী নারীকে একমাত্র আপনিই রাখতে পারেন, অন্যের কাছে replaceable নয়, বাকিরা যোগ্যই নয়। এই নিয়ে প্রবাদই আছে ছুচুন্দর কে শর্ মে চামেলী কা তেল, ছুঁচোর মাথায় চামেলী তেল। চামেলী তেল অনেক দামী তেল, সেই দামী তেল ছুঁচোর মাথায় মাখা হলে কী অবস্থা হবে! কৌশিকী হলেন সেই রকম যাকেই বিয়ে করবে সেটা হয়ে যাবে ছুঁচোর মাথায় চামেলী তেল। কিন্তু আপনিই একমাত্র উপযুক্ত। কেন উপযুক্ত বলতে গিয়ে চণ্ড ও মুণ্ড তাদের প্রভুকে আরও অনেক কিছুই বলছে –

বিমানং হংসসংযুক্তমেতৎ তিষ্ঠতি তেহঙ্গনে।
রত্নভূতমিহানীতং যদাসীদ্ বেধসোহদ্ভুতম্।।৯৫

নিধিরেষ মহাপদ্মঃ সমানীতো ধনেশ্বরাৎ।
কিঞ্জল্কিনীং দদৌ চাব্ধির্মালামম্লানপঙ্কজাম্।।৯৬

ছত্রং তে বারুণং গেহে কাঞ্চনস্রাবি তিষ্ঠতি।
তথায়ং স্যন্দনবরো যঃ পুরাসীৎ প্রজাপতেঃ।।৯৭

মৃত্যোরুৎক্রান্তিদা নাম শক্তিরীশ ত্বয়া হৃতা।
পাশঃ সলিলরাজস্য ভ্রাতুস্তব পরিগ্রহে।।৯৮
নিশুম্ভস্যাব্ধিজাতাশ্চ সমস্তা রত্নজাতয়ঃ।
বহ্নিরপি দদৌ তুভ্যমগ্নিশৌচে চ বাসসী।।৯৯

এবং দৈত্যেন্দ্র রত্নানি সমস্তান্যাহৃতানি তে।
স্ত্রীরত্নমেষা কল্যাণী ত্বয়া কস্মান্ন গৃহ্যতে।।১০০

আপনার কাছে হংসযুক্ত আশ্চর্য বিমান আছে, যে বিমান আগে ব্রহ্মার অধিকারে ছিল। মহাপদ্ম নামক নিধি আপনি কুবের থেকে জয় করে এনেছেন। সমুদ্রও আপনাকে কিঞ্জল্কিনী মালা উপহার দিয়েছে, যে মালা অম্লান পদ্ম দিয়ে রচিত হয়েছে। সুবর্ণ বর্ষণকারী বরুণের ছত্র ও প্রজাপতির শ্রেষ্ঠ রথ এখন আপনার অধিকারে। যমরাজার কাছ থেকে আপনি উৎক্রান্তিদা নামে শক্তি অস্ত্র অধিকার করে এনেছেন। বরুণের পাশ আর সমুদ্রের বিভিন্ন রত্ন আপনার ভাই নিশুম্ভের অধিকারে রয়েছে। অগ্নিদেবের কাছ থেকে আপনি এমন দুটি বস্ত্র পেয়েছেন যা একমাত্র অগ্নি দ্বারাই শুদ্ধ হয়ে যায়। আপনি এই সব কিছু নিজে অধিকার করেছেন। সুতরাং স্ত্রীদের মধ্যে রত্নস্বরূপ এই নারীকে কেন আপনি অধিকার করবেন না? এই সব শোনার পর শুম্ভ বলছে –

ঋষিরুবাচ।১০১
নিশম্যেতি বচঃ শুম্ভঃ স তদা চণ্ডমুণ্ডয়োঃ।
প্রেষয়ামাস সুগ্রীবং দূতং দেব্যা মহাসুরম্।।১০২

ইতি চেতি চ বক্তব্যা সা গত্বা বচনান্মম।
যথা চাভ্যেতি সংপ্রীত্যা তথা কার্যং ত্বয়া লঘু।।১০৩

স তত্র গত্বা যত্রাস্তে শৈলোদ্দেশেহতিশোভনে।
সা দেবী তাং ততঃ প্রাহ শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা।।১০৪

চণ্ড ও মুণ্ডের মুখে এই কথা শোনার পর শুম্ভ সুগ্রীব নামে এক মহাসুরকে দূত করে কৌশিকী দেবীর কাছে পাঠাল, সুগ্রীবকে বলে দেওয়া হল – তুমি আমার নির্দেশে আমার জবানীতে তাকে গিয়ে এই এই বলবে

আর এমন ব্যবস্থা করবে যাতে সে খুশি মনে শীঘ্রই এখানে চলে আসে। তখন সুগ্রীব দূত হয়ে হিমালয়ের যে রমণীয় স্থানে দেবী কৌশিকী বিরাজ করছিলেন সেখানে গিয়ে খুব মধুর স্বরে বলছে –

দূত উবাচ।১০৫
দেবি দৈত্যেশ্বরঃ শুম্ভস্ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বরঃ।
দূতোহহং প্রেষিতস্তেন ত্বৎসকাশমিহাগতঃ।।১০৬
অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্বাসু যঃ সদা দেবযোনিষু।
নির্জিতাখিলদৈত্যারিঃ স যদাহ শৃণুষ্ব তৎ।।১০৭

হে দেবী! আমি হলাম ত্রিভুবনের অধিকারী দৈত্যেশ্বর শুম্ভর দূত। আমি আপনার কাছেই এসেছি। তিনিই এখন এই ত্রিলোকের পরমেশ্বর, তাঁর আদেশ শুধু দেবতারই না, এই জগতে কেউই অমান্য করতে পারে না, তিনি সমস্ত দেবকুলকে পরাজিত করেছেন। তিনি আমার মাধ্যমে আপনার জন্য যে বার্তা পাঠিয়েছেন তা আমি বলছি আপনি ভালো করে শুনুন।

মম ত্রৈলক্যমখিলং মম দেবা বশানুগাঃ।
যজ্ঞভাগানহং সর্বানুপাশ্নামি পৃথক্ পৃথক্।।১০৮
ত্রৈলোক্যে বররত্নানি মম বশ্যান্যশেষতঃ।
তথৈব গজরত্নং চ হৃতং দেবেন্দ্রবাহনম্।।১০৯
ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতমশ্বরত্নং মমামরৈঃ।
উচ্চৈঃশ্রবসসংজ্ঞং তৎ প্রণিপত্য সমর্পিতম্।।১১০
যানি চান্যানি দেবেষু গন্ধর্বেষূরগেষু চ।
রত্নভূতানি ভূতানি তানি ময্যেব শোভনে।।১১১
স্ত্রীরত্নভূতাং ত্বাং দেবি লোকে মন্যামহে বয়ম্।
সা ত্বমস্মানুপাগচ্ছ যতো রত্নভুজো বয়ম্।।১১২
মাং বা মমানুজং বাপি নিশুম্ভমুরুবিক্রমম্।
ভজ ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি রত্নভূতাসি বৈ যতঃ।।১১৩
পরমৈশ্বর্যমতুলং প্রাপ্স্যসে মৎপরিগ্রহাৎ।
এতদ্বুদ্ধ্যা সমালোচ্য মৎপরিগ্রহতাৎ ব্রজ।।১১৪

সমস্ত ত্রিলোক আমার বশে, দেবরাজ ইন্দ্র আমার বশীভূত। দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে যে আহুতি দেওয়া হয় সেই যজ্ঞভাগ আমিই এখন ভোগ করে থাকি। ত্রিলোকে যত শ্রেষ্ঠ রত্ন আছে সবই আমার দখলে। দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত এখন আমার অধিকারে, ক্ষীরসমুদ্রমন্থনোত্থিত উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বরত্ন দেবতারা আমাকে সমর্পণ করেছে। হে সুন্দরী! দেবতা, গন্ধর্ব ও সর্পদের অধিকারে যত রকমের রত্ন হতে পারে সবই এখন আমার অধিকারে। আমরা আপনাকে এই স্ত্রীজগতে শ্রেষ্ঠ রত্ন মনে করি, সুতরাং আপনি আমার কাছে চলে আসুন, কারণ আমিই এই জগতে শ্রেষ্ঠ রত্নসমূহের উপভোগের একমাত্র যোগ্য পাত্র। তাই আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন এবং আপনি আমাকে অথবা মহাপরাক্রমশালী আমার ভাই নিশুম্ভকে বরণ করে নিন। আমাদের যে কোন একজনকে বরণ করে নিলে আপনি অতুলনীয়া মহা ঐশ্বর্য লাভ করবেন। এবার বুদ্ধি দিয়ে ভালোভাবে বিচার করে আপনি আমার পত্নী হয়ে যান।

ঋষিরুবাচ।১১৫
ইত্যুক্তা সা তদা দেবী গম্ভীরান্তঃস্মিতা জগৌ।
দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্যতে জগৎ।।১১৬

তখন ঋষি বলছেন, দূতের মুখে সব বার্তা শোনার পর ভদ্রা, যিনি কল্যাণময়ী, যিনি এই জগৎকে ধারণ করে রয়েছেন তিনি মনে মনে ভেতর থেকে খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন কিন্তু বাইরে মুখে তাঁর মিষ্টি হাসি। এই হাসি দেবীর শক্তিকে প্রকাশ করছে। মানুষ যদি ভেতরে খুব গম্ভীর থাকে আর মুখে মিষ্টি হাসে লেগে থাকে তাহলে বুঝবেন তার ভেতরে শক্তি আছে। যে হাসছে না তার যেমন শক্তির অভাব, যে বেশি হাসছে তারও শক্তির অভাব। কিন্তু যেখানে একটা বিরাট লড়াই হতে যাচ্ছে তখন কেউ যদি মিষ্টি করে হাসি দেয়, তখন বুঝতে হবে এখানে সাংঘাতিক শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে। বড় বড় ওস্তাদ কুস্তিবীর, বক্সার এরা সব সময় খুব গম্ভীর হয়। যে দেখছে সামনের প্রতিদ্বন্দ্বী আমার কাছে কিছুই না, সে গম্ভীরও থাকবে না আবার জোরে হাসবেও না, শুধু হাল্কা করে একটা মিষ্টি হাসি দেবে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীকে যে একেবারে খেলো মনে করে উড়িয়ে দিচ্ছে তাও নয়। কিন্তু এখানে একটা sense of humour আনা হয়েছে, সেইজন্য বলছেন মিষ্টি মুখে দেবী দূতকে বলছেন –

দেব্যুবাচ।।১১৭

সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিৎ ত্বয়োদিতম্।
ত্রৈলোক্যাধিপতি শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাপি তাদৃশঃ।।১১৮

কিন্ত্বত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথম্।
শ্রূয়তামল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা।।১১৯

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি।।১২০

তদাগচ্ছতু শুম্ভোঽত্র নিশুম্ভো বা মহাসুরঃ।
মাং জিত্বা কিং চিরেণাত্র পাণিং গৃহ্ণাতু মে লঘু।।১২১

দেবী তখন দূতকে বলছেন – তুমি যা বলছ এতে কোন সন্দেহ নেই যে শুম্ভ ত্রিলোকের অধিপতি এবং নিশুম্ভও তার সমান পরাক্রমশালী। তবে কি জানো, আমি এক নারী কিনা, তাই ছেলেমানুষী করে একটা প্রতিজ্ঞা করে বসে আছি। কিসের প্রতিজ্ঞা করেছেন দেবী? আমার ভর্তা কে হবেন, আমার স্বামী কে হবেন? *যো মাং জয়তি সংগ্রামে*, সংগ্রামে যিনি আমাকে জয় করবেন, *যো মে দর্পং ব্যপোহতি*, যিনি আমার দর্পচূর্ণ করবেন, *যো মে প্রতিবলো লোকে*, এই ত্রিলোকে যে আমার সমতুল্য শক্তিশালী হবে তাঁকেই আমি আমার স্বামী রূপে বরণ করব। দর্প হল, আমি শ্রেষ্ঠ এই ভাব। আমার এই দর্পকে যে চূর্ণ করবে আর আমার যে সমান সমান লড়াই করতে পারবে সেই আমার স্বামী হবে। এটা খুব পুরনো সমস্যা। মেয়েরা সব সময় চায়, তার যে স্বামী হবে সে যেন তার থেকে শ্রেষ্ঠ হয়। পুরুষ মানুষও সব সময় চাইবে তার স্ত্রী যেন সব দিক দিয়ে তার থেকে নীচে থাকে, যত নীচেই হোক তাতে তার কিছু আসে যায় না। কিন্তু মেয়েরা সব সময় নিজের থেকে শ্রেষ্ঠকে পেতে ইচ্ছে করে। আমাদের সমাজে সামাজিক বিবাহের বিবাহিত জীবনে যে এত অশান্তি হত তার অন্যতম একটি কারণ এটাই ছিল। বিয়ের পর মেয়েরা দেখত আমার স্বামী একটা অপদার্থ। কিন্তু সামাজিক ও ধর্মের বন্ধনের কারণে মেয়েরা মেনে নিত বাধ্য থাকত। কিন্তু ঠিক ঠিক বিয়ে হল ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ার। স্ত্রীকে যদি একটা ঘোড়ার মত মনে করা হয়, তার মানে ঘোড়া হল শক্তিমান, সেই শক্তিমানের উপর যে সওয়ার হবে তাকে আরও শক্তিমান হতে হবে। কখন সখন উল্টোটা হতেও দেখা গেছে। মেয়ে এত শক্তিশালী আর বুদ্ধিমতী আর রূপসী যে মেয়েটি জানে যে আমার মত উপযুক্ত পুরুষ পাওয়া যাবে না। তখন সে মেনে নেয় একজন কাউকে বিয়ে করলেই হল। এই ধরণের ঘটনা খুব কম দেখা যায়।

এই নিয়ে Evolutionary Psychologyতে নানা রকমের থিয়োরী আছে, তার মধ্যে একটা থিয়োরীতে বলে যে, একটি মেয়ে জানে জীবনে আমি কটি আর সন্তান দিতে পারব, খুব হলে দশ থেকে বারোটা, তার বেশি তো আর পারা যাবে না। আর স্বাভাবিক অবস্থায় তিনটে কি চারটে সন্তান দিতে পারবে। আমি তো তিন চারটে সন্তানই দিতে পারব, তাই আমি শ্রেষ্ঠ একজনকেই চাই। এখন কোন লেখিকা হয়ত চাইবেন আমার স্বামী আমার থেকে আরও বড় লেখক হবেন। মেয়েরা যারা চাকরি করে তারা চাইবে আমার স্বামী যেন আমার থেকে

বেশি আয় করে বা আমার থেকে উঁচু পদে থাকে। এই জিনিষ মানুষের স্বভাবেই আছে। আমরা যতই সমান অধিকার, সমান ক্ষমতা যত যাই বলি না কেন, ওই জায়গাতে গিয়ে কোথাও একটা তফাৎ হয়ে যায়। দেবীও যেন মজা করার ছলে নারীজাতির মনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে বলছেন, যে আমাকে সংগ্রামে পরাজিত করবে, যে আমার দর্পচূর্ণ করবে ইত্যাদি। এই কথা শুনে তখন সুগ্রীব বলছে –

দূত উবাচ।।১২২
অবলিপ্তাসি মৈবং ত্বং দেবি ব্রূহি মমাগ্রতঃ।
ত্রৈলোক্যে কঃ পুমাংস্তিষ্ঠেদগ্রে শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।।১২৩

অন্যেষামপি দৈত্যানাং সর্বে দেবা ন বৈ যুধি।
তিষ্ঠন্তি সম্মুখে দেবি কিং পুনঃ স্ত্রী ত্বমেকিকা।।১২৪

ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবাস্তস্থুর্যেষাং ন সংযুগে।
শুম্ভাদীনাং কথং তেষাং স্ত্রী প্রযাস্যসি সম্মুখম্।।১২৫

সা ত্বং গচ্ছ ময়ৈবোক্তা পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
কেশাকর্ষণনির্ধূতগৌরবা মা গমিষ্যসি।।১২৬

আপনি নিজে খুব গর্বিত হয়ে রয়েছেন বলে এই রকম কথা বলছেন। আমার সামনে আর এই রকম কথা বলবেন না। এই ত্রিলোকে এমন কে আছে যে শুম্ভ আর নিশুম্ভের সামনে দাঁড়াবে! শুম্ভ ও নিশুম্ভের কথা ছেড়ে দিন সাধারণ অসুরদের সামনেই দেবতারা দাঁড়াতে পারে না। দৈত্যেশ্বর শুম্ভের সামনে দেবতাদের কথা ছেড়ে দিন ত্রিভুবনের কেউই দাঁড়াতে পারে না, আর আপনি একা স্ত্রী হয়ে কী করে এই কথা বলছেন! আপনি যে মনে করছেন শুম্ভ নিশুম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করবেন, এদের সামনে তো দেবতারাই দাঁড়াতে পারে না, আপনার চুল ধরেই শুম্ভ ও নিশুম্ভ টেনে নিয়ে যাবে। এখন তো তাও আপনাকে সম্মান দিয়ে আপনাকে স্ত্রী হয়ে আসতে বলছেন, এরপরে আপনার চুল ধরে টেনে নিয়ে গিলে সেটা কখন গৌরবের হবে না। তাই ভালোয় ভালোয় আপনি শুম্ভ নিশুম্ভের কাছে চলে যান। সব কথা শোনার পর মা আবার সেই একই কথা পুনরাবৃত্তি করে বলছেন –

দেব্যুবাচ।।১২৭
এমমেতদ্ বলী শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাতিবীর্যবান্।
কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে যদনালোচিতা পুরা।।১২৮

স ত্বং গচ্ছ ময়োক্তং তে যদেতৎ সর্বমাদৃতঃ।
তদাচক্ষ্বাসুরেন্দ্রায় স চ যুক্তং করোতু যৎ।।১২৯

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে দেব্যা দূতসংবাদো নাম পঞ্চমোহধ্যায়।

তুমি ঠিকই বলছ, শুম্ভ আর নিশুম্ভের মত বীর্যবান এই জগতে আরে কেউ নেই। কিন্তু কী করবো বল, আমি আগে কারুর সাথে আলোচনা না করেই এই ধরণের পণ করে রেখেছি। বুঝতে পারছি আমার ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু এখনতো আমার কাছে আর কোন পথ নেই। আমার যা বলার বলে দিলাম, তুমি শুম্ভের কাছে যাও, তাকে গিয়ে আমার কথা বল, তারপর সে যা ভালো মনে করে করবে। এটা হল দেবীর একপ্রকার challange দিয়ে দেওয়া, তুমি এস, এসে আমার সাথে লড়াইয়ে নামো। এইখানে পঞ্চম অধ্যায় শেষ হয়ে যায়। মানুষের ভেতরে যে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ রয়েছে, সেই ভাবগুলো মা নিজেই কীভাবে হয়েছেন পঞ্চম অধ্যায়ে মূলতঃ সেটাকেই দেখানো হয়েছে। সেখান থেকে আবার কাহিনীতে ঢুকে পড়ছে। দৈত্য শুম্ভ আর তার ভাই নিশুম্ভ এখন স্বর্গে রাজত্ব করছে। দুজনে এক সঙ্গেই থাকে। দুজন দৈত্যকে নিয়ে আমাদের পুরাণে একাধিক কাহিনী রচিত হয়েছে। যেমন এর আগে মধু আর কৈটভ এক সঙ্গে ছিল। এখানে শুম্ভ আর তার ভাই নিশুম্ভ এক সঙ্গে রাজত্ব করছে। তারপরে আছে সুন্দ আর অসুন্দদের কাহিনী, এরাও দুজনে একসাথে থাকত। দেবতাদের মধ্যে যেমন যমজ দেবতা আছে, তেমনি অসুরদের মধ্যেও অনেকগুলো যমজ অসুরের কাহিনী আছে।

চণ্ড ও মুণ্ডের কাছে দেবীর বর্ণনা শুনে শুম্ভের দূত দেবীকে রাজী করাতে গিয়েছিল যাতে শুম্ভ আর নিশুম্ভের যে কোন একজনকে দেবী পতি রূপে বরণ করে নেন। কিন্তু দেবী বললেন আমাকে যে সংগ্রামে পরাজিত করতে পারবে তাকেই আমি বরণ করব। দেবীর কথা শুনে দূত অবাক হয়ে গেছে। এরপর দূত ফিরে এসেছে। এখান থেকেই শুরু হয় ষষ্ঠ অধ্যায়। এরপর আগামী যে পাঁচটি অধ্যায় – ছয়, সাত, আট, নয় ও দশ এতে পুরো শক্তির বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়, এই পাঁচটি অধ্যায় নিয়মিত পাঠ করলে ভেতরে অন্য ধরণের শক্তি আসে। যখন মা দুর্গার পূজা হয় তখন সেখানে জাঁকজমক, ঐশ্বর্যই বেশি থাকে, কিন্তু কালী পূজা পুরোপুরি মন্ত্ররূপিণী পূজা। কালী পূজায় মন্ত্র একেবারে শুদ্ধ থাকতে হবে। দুর্গাপূজাতে মন্ত্র একটু ভুলভাল হয়ে গেলে দেবী তার জন্য কিছু মনে করবেন না। কিন্তু কালী পূজা পুরোপুরি মন্ত্রের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক ঠিক শক্তি আরাধনা বলতে তাই কালী পূজা। আগামী পাঁচটি অধ্যায় পুরো শক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, এটাই মা কালীর আরাধনা। সমগ্র চণ্ডীই মন্ত্ররূপা, চণ্ডীর প্রত্যেকটি শ্লোক এক একটি সিদ্ধ মন্ত্র। যে কোন মন্ত্রের জপ যদি কেউ করে তাতেই তার সিদ্ধি হয়ে যাবে। মন্ত্রের শক্তিকে কেউ অস্বীকার করছে না। ইসলাম ধর্মের আল্লার নিরানব্বুইটা নামের কথা বলা হয়েছে, মুসলমানরা মালাতে আল্লার এই নিরানব্বুইটা নাম জপ করে। খ্রিশ্চানরা, বিশেষ করে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও মন্ত্র জপের প্রচলন আছে। মন্ত্র শক্তি মানেই শব্দের শক্তি। যাদের মনে কামনা-বাসনা আছে, এই সব মন্ত্র জপ করে তাদের অনেক কামনা-বাসনার পূরণ হতেও দেখা যায়। তবে এসবের দিকে বেশি নজর না দেওয়াই ভালো। কর্মের গতিতে সব আসছে আবার কর্মের গতিতেই সব কিছু মিটে যাবে। যত তাড়াতাড়ি এগুলো থেকে মন বেরিয়ে আসে তত ভালো। তবে তন্ত্র মতে বলা হয়, যে সঙ্কল্প করে মন্ত্র জপ বা পাঠ করা হবে, সেই সঙ্কল্পটা সফল হয়ে যায়। যারা ভোগ ঐশ্বর্য চাইছে সেও ওই একই মন্ত্র দিয়ে ঐশ্বর্য পেয়ে যাবে। আবার কেউ মুক্তি যদি চায়, সেটাও ওই একই মন্ত্র দিয়েই পেতে পারে। শুধু সঙ্কল্পটা পাল্টে দিতে হবে। বেদে এই রকম হয় না। যেমন ধরুন আপনি গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছেন, তাতে আপনার মনটা শুদ্ধ হবে। টাকা-পয়সা যে আসবে না তা নয়, আসতে পারে। গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে আপনার মন শুদ্ধ হয়ে শক্তিশালী হয়ে গেছে, এবার এই শক্তিশালী মন হয়ে যাওয়াতে অন্যান্য আনুষাঙ্গিক ফলের সাথে টাকা-পয়সাও এসে যেতে পারে। কিন্তু তন্ত্র মতে বলবে, মন্ত্র জপের ফল সরাসরি রূপেই আসবে, সঙ্কল্প আপনি যেমন করবেন সেই অনুসারেই ফল আসবে।

এবার আমরা ষষ্ঠ অধ্যায় শুরু করছি। ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম ধুম্রলোচন-বধ, ধুম্রলোচন অসুরদের এক সেনাপতির নাম। যদি কল্পনা করেন তাহলে দেখতে পাবেন ওর চোখ থেকে যেন সব সময় ধুয়ো বেরচ্ছে।

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

(ধুম্রলোচন-বধ)

ঋষিরুবাচ।।১

ইত্যাকর্ণ্য বচো দেব্যাঃ স দূতোঽমর্ষপূরিতঃ।
সমাচষ্ট সমাগম্য দৈত্যরাজায় বিস্তরাৎ।।২

তস্য দূতস্য তদ্বাকমাকর্ণ্যাসুররাট্ ততঃ।
সক্রোধঃ প্রাহ দৈত্যানামধিপং ধূম্রলোচনম্।।৩

হে ধূম্রলোচনাশু ত্বং স্বসৈন্যপরিবারিতঃ।
তামানয় বলাদ্ দুষ্টাং কেশাকর্ষণাবিহ্বলাম্।।৪

তৎপরিত্রাণদঃ কশ্চিদ্ যদি বোত্তিষ্ঠতেঽপরঃ।
স হন্তব্যোঽমরো বাপি যক্ষো গন্ধর্ব এব বা।।৫

দেবীর সব কথা শুনে সেই দূতের খুব ক্রোধ হয়ে গেছে। সে ক্রোধান্বিত হয়ে দৈত্যরাজ শুম্ভের কাছে ফিরে গিয়ে সব কথা সবিস্তারে জানিয়ে দিল। দূতের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে শুম্ভও খুব রেগে গিয়ে দৈত্য সেনাপতি ধূম্রলোচনকে বলল – হে ধূম্রলোচন! তোমার সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে যাও আর সেই দুষ্টাকে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে এখানে নিয়ে এস। আগেই দূত দেবীকে বলেছিল – তোমাকে শুম্ভ রানী করে রাখবে, কত সম্মান দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তুমি চলো। আর তুমি যদি না যাও তাহলে তোমার চুল ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। ধূম্রলোচনকে অসুররাজ ওই একই আদেশ করছেন – *তামানয় বলাদ্ দুষ্টাং কেশাকর্ষণ বিহ্বলাম্*, এই মেয়েটি দুষ্টা, তুমি এর চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে এস। আর তাই না, একে রক্ষা করতে কেউ যদি এগিয়ে আসে, সে দেবতাই হোক আর যক্ষ কিংবা গন্ধর্বই হোক, যে কেউই হোক না কেন, তাকে অবশ্যই বধ করে দেবে।

ঋষিরুবাচ।।৬

তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ শীঘ্রং স দৈত্যো ধূম্রলোচনঃ।
বৃতঃ ষষ্ট্যা সহস্রাণামসুরাণাং দ্রুতং যযৌ।।৭

স দৃষ্ট্বা তাং ততো দেবীং তুহিনাচলসংস্থিতাম্।
জগাদোচ্চৈঃ প্রযাহীতি মূলং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।।৮

ন চেৎ প্রীত্যাদ্য ভবতী মদ্ভর্তারমুপৈষ্যতি।
ততো মন্নয়াম্যেষ কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্।।৯

ঋষি বলছেন, শুম্ভের আদেশ পেয়ে ধূম্রলোচন সঙ্গে সঙ্গে ষাট হাজার অসুর সৈন্যে পরিবৃত হয়ে সেখান থেকে দ্রুতবেগে বেরিয়ে পড়ল। শুম্ভ বলে দিয়েছে তোমার পুরো সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে ওকে ধরে নিয়ে এস। সেনাপতিদের একটা করে টিম থাকত, ধূম্রলোচন এখন তার নিজের পুরো টিমকে নিয়ে যাচ্ছে। ওখানে পৌঁছে ধূম্রলোচন সেই হিমাচলবাসিনী দেবীকে দেখতে পেল। দেবীকে দেখার পর সে খুব জোরে চেঁচিয়ে বলছে – রে দুষ্টা! তুমি যদি খুশীমনে শুম্ভ নিশুম্ভের কাছে চলে যাও খুব ভালো আর যদি না যেতে চাও তাহলে আমি জোর করে তোমার চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাব, এটাই আমার প্রতি আদেশ হয়েছে। সব শুনে তখন দেবী ধূম্রলোচনকে বলছেন –

দেব্যুবাচ।।১০

দৈত্যশ্বরেণ প্রহিতো বলবান্ বলসংবৃতঃ।
বলান্নয়সি মামেবং ততঃ কিং তে করোম্যহম্।।১১

অসুররাজ তোমাকে পাঠিয়েছে আমাদের ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তুমি নিজেও খুব শক্তিমান আর তোমার সাথে রয়েছে বিশাল সৈন্যবাহিনী, এই অবস্থায় তুমি যদি আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাও তো আমি আর তোমার কি করতে পারি! এস, আমাকে ধরে নিয়ে যাও। এর আগে আমরা আলোচনা করেছি, যাদের মধ্যে শক্তি ও ক্ষমতা আছে তারা ঠিক এভাবেই কথা বলে। তারা কখনই রেগে গিয়ে নিজের শক্তি প্রদর্শন করতে যাবে না। কেনোপনিষদেও ঠিক এই রকম একটি বর্ণনা আছে, দেবতা আর অসুরদের এক যুদ্ধে দেবতারা বিজয়ী হওয়ার পর ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি এরা সব গর্ব করে বলছে আমাদের শক্তিতে আমরা এই যুদ্ধ জয় করলাম। সেই সময় হঠাৎ তাদের সামনে এক বিচিত্র জিনিষের আবির্ভাব হয়েছে। দেবতারা কখন এই ধরণের অদ্ভুত বস্তু দেখেননি। তখন দেবতারা এক এক করে সেই বিচিত্র জিনিষটা কি দেখার জন্য গেছেন। বায়ু দেবতা গেছেন। বায়ুর পরিচয় জানতে চেয়েছেন, আমি বায়ু সব কিছুকে আমি উড়িয়ে দিতে পারি। তখন সেই বস্তু তার সামনে একটা ঘাসের টুকরো দিয়ে বলল এই ঘাসের টুকরোটা উড়িয়ে দেখাও তো! বায়ু সেই ঘাসের কুটোকে উড়াতে পারলো না। এরপর অগ্নি এল, তাকেও ঘাসের একটি টুকরো দিয়ে বললেন, এটাকে পুড়িয়ে দাও তো। অগ্নি দগ্ধ করতে পারলেন না। আর ইন্দ্র যখন এল, সে তখন কথাও বলল না, সেখান থেকে উধাও হয়ে গেলেন, ইন্দ্রকে কোন পাত্তাই দিলেন না। শক্তিমানরা এভাবেই আচরণ করেন। তারপরেই তিনি শক্তিটা দেখিয়ে দেন।

ঋষিরুবাচ।।১২
ইত্যুক্তঃ সোঽভ্যধাবৎ তামসুরো ধূম্রলোচনঃ।
হুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম সা চকারাম্বিকা ততঃ।।১৩

যাই হোক, দেবীর এই কথা শুনতেই ধূম্রলোচন দেবীর দিকে ধেয়ে গেছে। ধূম্রলোচন দৌড়ে আসছে দেখে মা একটা হুঙ্কার দিয়েছেন। এই হুঙ্কার শব্দটি বাংলায় অতি সাধারণ একটি শব্দ, জোর গর্জন। কিন্তু তন্ত্রের ভাষায় হুম্ হল একটা বীজ, হুম্ হল শক্তির বীজমন্ত্র। তন্ত্র পূজায় বিভিন্ন মুদ্রাতে হুম্ বীজমন্ত্রের প্রয়োগ করতে হয়। হুম্ বীজ হল বিনাশকারী, এই হুম্ থেকে হুঙ্কার শব্দ তৈরী হয়েছে। যে মন্ত্রে প্রণব থাকে অর্থাৎ 'ওঁ' আছে সেই মন্ত্রকে প্রণবমন্ত্র বলে। হিন্দু ধর্মে বেশির ভাব মন্ত্র ওঁ দিয়েই শুরু হয়। যাঁরা শক্তির আরাধনা করেন সেখান অনেক রকম বীজ মন্ত্র দিয়ে আরাধনা করতে হয়। বীজ বলতে, আমাদের বর্ণমালায় যত অক্ষর আছে, অক্ষরের মিশ্রণ দিয়ে বীজ তৈরী হয়। তন্ত্র মতে বলে এক একটি বীজ মায়েরই শক্তির এক একটি দিককে ইঙ্গিত করে। যেমন হুম্ বীজ বিনাশকারি শক্তিকে ইঙ্গিত করছে। যিনি এই হুম্ বীজকে সিদ্ধ করেছেন তিনি যদি একবার হুম্ করেন তার সামনে যে থাকবে তার বিনাশ হয়ে যাবে। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে একজন পণ্ডিত এসে জোর গলায় হা রে রে রে লম্বো নিরালম্বো মন্ত্রোচ্চারণ করতে শুরু করতেন। যখন হা রে রে করছেন তখন তার সঙ্গে যাঁরা তর্ক করতে আসতেন তাঁদের সব শক্তি চলে যেত। একদিন এসে সেই পণ্ডিত হা রে রে শুরু করেছে, সেই সময় ঠাকুর চাইছেন না কিন্তু ওনারও ভেতর থেকে হা রে রে করতে শুরু করেছেন। দু দিক থেকে এখন হা রে রে শুরু হয়েছে। পণ্ডিত যত জোরে করছে, ঠাকুর আরও দ্বিগুণ জোরে করছেন। ঠাকুরের এসব সিদ্ধাইয়ের দিকে কখনই নজর ছিল না, কিন্তু এই শব্দটা ভেতর থেকে যেন আপনা থেকেই বেরিয়ে আসছে। শেষে ঠাকুর এত জোর হা রে রে করছেন যে মন্দির কাঁপছে। কিন্তু শেষ অবস্থায় ঠাকুর যত জোরে হা রে রে করছেন ওই জায়গাতে পণ্ডিতের গলার জোর পৌঁছাতে পারল না। তখন ধীরে ধীরে পণ্ডিতের শক্তিটা দমে গেল। হা রে রেটাও একটা সিদ্ধ মন্ত্র, এই মন্ত্র দিয়ে সামনের লোককে দাবিয়ে দেওয়া হয়। তবে সব জায়গাতে দেখা যায়, যে যত গলাবাজি করবে তার তত জয় হয়। এখানে হুম্‌এর সাথে এর কোন মিল নেই, হুম্ সিদ্ধ বীজমন্ত্র, যাঁরা তপস্যা করে এই বীজমন্ত্রকে সিদ্ধ করে নিয়েছেন, তাঁরা যদি একবার হুম্ বলে দেয় তখন সামনের লোক কেঁচো হয়ে যাবে। এই হুম্ আমার আপনার মত কোন সাধারণ লোকের মুখ দিয়ে বেরোবে না, এর মধ্যে একটা শক্তি আছে, ওই শক্তিই অন্যকে বিবশ করে দেবে। মা হলেন শক্তিস্বরূপিণী, তিনি হুম্ করতেই ধূম্রলোচন ওখানেই ভস্ম হয়ে মরে গেল।

অথ ক্রুদ্ধং মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকাম্।
ববর্ষ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈস্তথা শক্তিপরশ্বধৈঃ।।১৪

ততঃ ধূতশটঃ কোপাৎ কৃত্বা নাদং সুভৈরবম্।
পপাতাসুরসেনায়াং সিংহো দেব্যাঃ স বাহনঃ।।১৫

কাংশ্চিৎ করপ্রহারেণ দৈত্যানাস্যেন চাপরান্।
আক্রান্ত্যা চাধরেণান্যান্ জঘান স মহাসুরান্।।১৬

কেষাঞ্চিৎ পাটয়ামাস নখৈঃ কোষ্ঠানি কেশরী।
তথা তলপ্রহারেণ শিরাংসি কৃতবান্ পৃথক্।।১৭

বিচ্ছিন্নবাহুশিরসঃ কৃতাস্তেন তথাপরে।
পপৌ চ রুধিরং কোষ্ঠাদন্যেষাং ধূতকেশরঃ।।১৮

ক্ষণেন তদ্বলং সর্বং ক্ষয়ং নীতং মহাত্মনা।
তেন কেশরিণা দেব্যা বাহনেনাতিকোপিনা।।১৯

ধূম্রলোচনকে ভস্ম হয়ে যেতে দেখেই অসুরদের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী ক্রোধে দেবীর প্রতি উন্মত্ত হয়ে তীক্ষ্ণ শর, শেল ও কুঠার প্রভৃতি অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল। তখন দেবীর বাহন সিংহও প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে কেশর ফুলিয়ে ভয়ংকর গর্জন করতে করতে অসুরদের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে লাফিয়ে পড়েছে। এখন সে একাই কাউকে আঘাতে, কাউকে কামড়ে, কাউকে মাটিতে ফেলে হিঁচড়ে, অনেক সৈন্যকে তার ধারালো নখ দিয়ে, আবার অনেককে পেট চিরে ফেলে, কিছু সৈন্যকে থাবার প্রহারে শরীর থেকে মাথা দু টুকরো করে সব সৈন্যকে বিনাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। আবার বলছেন কোনও অসুরের হাত, কোন অসুরের মাথা শরীর থেকে আলাদা করে দিয়েছে, কোন সৈন্যের পেট চিরে দেবীর বাহন রক্তপান করতে শুরু করেছে। দেবীর বাহন সেই মহাসিংহ ক্ষণকালের মধ্যে সমস্ত অসুর সৈন্যকে সংহার করে ফেলল। এখানে আরেকটা ব্যাপার হল, আগেকার দিনে যখন যুদ্ধ হত তখন নিয়ম ছিল যিনি কমাণ্ডার হতেন তিনিই প্রধান যোদ্ধা থাকতেন, যেমন মহাভারতের যুদ্ধে অর্জুনই ছিল মূল যোদ্ধা। অর্জুন কখন সাধারণ সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করতেন না। কোন কারণে কমাণ্ডার যদি নিহত হয়ে যায় বা যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তার সব সৈন্যরাও পালিয়ে যেত। আমাদের সাধারণ সৈন্যরা চিরদিনই খুব কাপুরুষ ছিল, তাই কমাণ্ডার যদি মারা যায় তারা এমনিই পালিয়ে যাবে, তাদেরকে আলাদা করে আর কিছু করতে হত না। ইদানিং কালে যুদ্ধের এই ছবিটা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। আগের ছবি হল কমাণ্ডার সামনে থাকত আর তার বিরাট সৈন্য বাহিনী তাকে অনুসরণ করত। কমাণ্ডার ছিল পুরো সৈন্যবাহিনীর শোভা, তাকে দেখেই সবাই যুদ্ধ করত। এখনকার যুদ্ধে কমাণ্ডার সব সময় পেছনের দিকে থাকে। এখন যে যুদ্ধ হয় তাতে নিয়মই আছে যুদ্ধে কোন কারণে যদি কর্ণেল মারা যায়, সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রেই লেফটনেন্ট কর্নেল চার্জ দায়ীত্ব নিয়ে নেবে, সে যদি মরে যায় তখন তার নীচে যে মেজর আছে সে দায়ীত্ব নিয়ে নেবে, মেজর মারা গেলে ক্যাপ্টেন নিয়ে নেবে। শেষে যদি দুটো সৈন্যও থেকে যায় তখন তাদের মধ্যে যে সিনিয়র সে দায়ীত্ব নিয়ে নেবে। যুদ্ধের পুরো প্রথাটাই এখন পাল্টে গেছে।

এখানে দেখানো হচ্ছে ধূম্রলোচন মারা যেতেই সিংহ একাই ষাট হাজার সৈন্যদের সাবাড় করে দিল। সিংহের যে ক্ষমতা ছিল না তা নয়, ক্ষমতা ঠিকই ছিল। কিন্তু তখনকার দিনে এটাই প্রথা ছিল, সেনাপতি মারা গেলে তার সৈন্যরা প্রাণ ছেড়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পালিয়ে যাবে। দেবী একবার হুম্ করলেন তাতেই ধূম্রলোচন ভস্ম হয়ে গেল। সেনাপতি মরে গেছে, এখন তার যে ষাট হাজার সৈন্য এদের পালিয়ে যাওয়ার জন্যও একটা সময় লাগবে। দেবীর বাহন যখন নেমে গেল তখন তারা এদিক সেদিক পালিয়ে গেছে।

শ্রুত্বা তমসুরং দেব্যা নিহতং ধূম্রলোচনম্।
বলঞ্চ ক্ষয়িতং কৃৎস্নং দেবীকেশরিণা ততঃ।।২০

চুকোপ দৈত্যাধিপতিঃ শুম্ভঃ প্রস্ফুরিতাধরঃ।
আজ্ঞাপয়ামাস চ তৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ।।২১

হে চণ্ড হে মুণ্ড বলৈর্বহুলৈঃ পরিবারিতৌ।
তত্র গচ্ছতং গত্বা চ সা সমানীয়তাং লঘু।।২২

কেশেষ্বাকৃষ্য বদ্ধা বা যদি বঃ সংশয়ো যুধি।
তদাশেষায়ুধৈঃ সর্বৈরসুরৈর্বিনিহন্যতাম্।।২৩

তস্যাং হতায়াং দুষ্টায়াং সিংহে চ বিনিপাতিতে।
শীঘ্রমাগম্যতাং বদ্ধা গৃহীত্বা তামথাম্বিকাম্।।২৪

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
শুম্ভনিশুম্ভসেনানীধূম্রলোচনবধো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।।

শুম্ভ যখন খবর পেল যে দেবী ভগবতী ধূম্রলোচনকে বধ করেছেন আর তাঁর বাহন সিংহ সব অসুর সেনাদের শেষ করে দিয়েছে, তখন এমন ক্রুদ্ধ হয়ে গেল যে রাগে তার ঠোঁট কাপতে লাগল। তখন শুম্ভ দুই অসুর সেনাপতি চণ্ড আর মুণ্ডকে ডেকে আদেশ করল তোমরা আর ধূম্রলোচনের মত ভুল করো না, দুজনে বিরাট সংখ্যায় সৈন্য নিয়ে ওখানে যাও আর সেই দেবীকে চুলের মুঠি ধরে আর নয়ত বেঁধে নিয়ে এস, আর যদি তোমাদের একটুও সন্দেহ হয় ওকে ধরে আনা যাবে না, তাহলে ওখানেই ওর গলাটা কেটে দিয়ে আসবে। ভেবেছিল একটা সামান্যা সুন্দরী মেয়ে তাই প্রথমে অল্প কিছু সৈন্য দিয়ে পাঠিয়েছে, এবার তার থেকে আরেকটু বেশি সৈন্য নিয়ে যেতে বলছে। এরপর সপ্তম অধ্যায় শুরু হয়। আমরা আগেও বলেছি এখানে যে শুধু যুদ্ধের বর্ণনা করা হচ্ছে তা নয়, দেবী শক্তিকে এখানে দেখান হচ্ছে। এই অধ্যায় কটি পাঠ করলে আমাদের নিজেদের ভেতরে, সমাজের, পরিবারের শক্তি জাগরণ হয়।

অথ সপ্তমোহধ্যায়ঃ

(চণ্ড ও মুণ্ড বধ)

ঋষিরুবাচ।।১

আজ্ঞাপ্তাস্তে ততো দৈত্যাশ্চণ্ডমুণ্ডপুরোগমাঃ।
চতুরঙ্গবলোপেতা যযুরভ্যুদ্যতায়ুধাঃ।।২

ধুম্রলোচন বধের খবর পেয়ে শুম্ভ এবার আরও সতর্ক হয়ে গেছে। তাই এবার একজন নয়, অসুরদের দুজন সেনাপতিকে শুম্ভ এবার দেবীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করছে। শুম্ভের আদেশ পেয়ে চণ্ড আর মুণ্ড এই দুই মহাসুর চতুরঙ্গ সেনায় সজ্জিত হয়ে আর নানা রকম অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করে দেবীর উদ্দেশ্যে রওনা হল। হাতী, ঘোড়া, রথ আর পদাতিক বাহিনী এই চারটে একসাথে থাকলে বলা হয় চতুরঙ্গ বাহিনী। ভারতের ইতিহাস নিয়ে যত কাহিনী আছে, পুরাণ বলুন, মহাভারত বলুন কোথাও নৌবাহিনী নিয়ে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। কিন্তু বিদেশের কাহিনীতে নৌবাহিনীর বিরাট ভূমিকা দেখা যায়। আগেকার দিনে ভারতে রথের বিশাল ভূমিকা ছিল। তখনকার দিনে রথে সাধারণতঃ দুটি চাকা থাকত, কিছু কিছু ক্ষেত্রে চার চাকার রথও থাকত। অর্জুনের রথের যে ছবি দেখা যায় তাতে চারটে চাকা। গ্রীক আর রোমান সৈন্যদের সব রথেরই দুটো চাকা থাকত। চার চাকার রথের অসুবিধা হল, অল্প জায়গার মধ্যে প্রয়োজনের সময় ডানদিক-বামদিকে ঘোরানোর ক্ষিপ্রতা কমে যায়। এ্যটাকিং আর্মিরা রথ নিয়ে কখনই যুদ্ধ করতে পছন্দ করত না। আলেকজাণ্ডারের সময় ইরানে ড্যারিয়াস বলে এক রাজা ছিল, তার খুব নামকরা রথী বাহিনী ছিল। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের কাছে তাকেও নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। আলেকজাণ্ডারের যে এত সুনাম হল তার প্রধান একটি কারণ হল ড্যারিয়াসকে হারানো। তখনকার দিনে ড্যারিয়াসকে কেউ হারাতে পারত না। রথে বসে যারা যুদ্ধ করে রথে তাদের প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র মুজত থাকে। যারা ঘোড়ার পিঠে, হাতীর পিঠে লড়াই করত তাদের অস্ত্র সীমিত থাকত। তবে যুদ্ধের মধ্যে তাদের অস্ত্রের যোগান এসে যেত। চতুরঙ্গী মানে হাতী, ঘোড়া, রথী আর পদাতিক এই চার ধরণের যোদ্ধারা থাকবে।

তখন নিয়ম ছিল হাতী হাতীর সঙ্গে, পদাতিক পদাতিকের সঙ্গে লড়াই করবে। কিন্তু সব কিছু নির্ভর করত কমাণ্ডার কি করছে। সবাই রথের পতাকাটা লক্ষ্য রেখে সেই অনুসারে তাদের গতিবিধি ঠিক করত। পরে দেখা গেল রথ নিয়ে যুদ্ধ করতে অনেক সমস্যা এসে যাচ্ছে। আলেকজাণ্ডার আর পোরাসের সঙ্গে যখন যুদ্ধ হল তখনও বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছিল। পোরাসের হেরে যাওয়ার প্রধাণ কারণ ছিল তার রথ। পোরাসের কাছে প্রচুর রথ ছিল, কিন্তু কীভাবে জলের মধ্যে ফেঁসে যায়, আর রথকে সাহায্য করার জন্য যারা আসবে তারা ছিল হাতীর উপর। ওরা হাতীগুলোকে আক্রমণ করতে সব হাতী প্রাণ ছেড়ে পালাতে শুরু করে। পালাতে গিয়ে নিজেদের লোকগুলোকেই পিষে দিয়ে চলে গেছে। পোরাসের যুদ্ধের পুরো কৌশলটাই তাই মার খেয়ে গিয়েছিল। চণ্ড আর মুণ্ড এই চতুরঙ্গী সেনা নিয়ে দেবীকে আক্রমণ করেছে, দেবী এখানে একা। সেখানে গিয়ে দেখছে –

দদৃশুস্তে ততো দেবীমীষদ্ধাসাং ব্যবস্থিতাম্।
সিংহস্যোপরি শৈলেন্দ্র-শৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে।।৩

চণ্ড আর মুণ্ড সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছে দেখছে আমাদের মা দুর্গা হিমালয়ের এক চূড়ায় তাঁর বাহন সিংহের উপর বসে আছেন। আর তিনি মিষ্টি মিষ্টি হাসছেন। মায়ের অনেকগুলো নাম আছে, তিনি হিমালয়ের পুত্রী বলে তাঁর নাম শৈলসূতা, আবার সিংহের উপর আরূঢ়া বলে তাঁর নাম সিংহবাহিনী ইত্যাদি।

তে দৃষ্ট্বা তাং সমাদাতুমুদ্যমঞ্চক্রুরুদ্যতাঃ।
আকৃষ্টচাপাসিধরাস্তথান্যে তৎসমীপগাঃ।।৪

কমাণ্ডর যখন সঙ্গে থাকে তখন সৈন্যদের খুব উৎসাহ থাকে। মা সঙ্গে থাকলে বাচ্চার যেমন শক্তি বেড়ে যায়, কমাণ্ডার সাথে থাকলে সৈন্যদেরও শক্তি বেড়ে যায়। দেবীকে দেখেই দৈত্য সৈন্যরা প্রচণ্ড উৎসাহে তাঁকে ধরবার জন্য এগিয়ে গেছে। কেউ ধনুক, কেউ খড়্গ আর অন্যান্য সবাই মিলে দেবীর দিকে ধাওয়া করল, দেবীকে

এইবার বেঁধে নিয় যেতে হবে এই যেন তাদের ভাব। কিন্তু যারা খবর পেয়েছে যে ধূম্রলোচন মায়ের এক হুঙ্কারেই ভস্ম হয়ে গেছে, তারা এভাবে বোকার মত দৌড়ে যাচ্ছে কী করে, এটাই আশ্চর্যের। অন্তত একটা ব্যূহ রচনা করে এগোবে, তাও করছে না।

ততঃ কোপঞ্চকারৌচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি।
কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূৎ তদা।।৫

অসুরদের দৌড়ে আসতে দেখে দেবী একটু যেন রেগে গেছেন। দেবীর একটু অল্প যে রাগ হয়েছে তাতেই মায়ের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণের হয়ে গেছে। মসী মানে কালী, সেইজন্য বলছেন *মসীবর্ণমভূৎ তদা*। এর আগে যে বলা হয়েছিল *যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা*, শরীরের যে কান্তি, এই কান্তি মা নিজে। মানুষের মনে যে কোন emotion এসে গেলে সেই emotionaএ সব সময় চেহারাটা কালো হয়ে যাবে। শুধু একমাত্র ভালোবাসার সম্পর্ক যখন তৈরী হয় তখনই চেহারাটা উজ্জ্বল হয়। মায়েদের যখন সন্তান হয়, সন্তানের যখন পরিপালন করছে, তখন মনের মধ্যে একটা সুখ আর সন্তুষ্টির ভাব থাকে বলে মায়ের চেহারাতে ঔজ্জ্বল্য এসে যায়। Sense of satisfaction কোন emotion নয়। Emotion মানে, আপনার মনে চাঞ্চল্য এসে গেছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছটি রিপুর যে কোন একটি রিপু যদি থাকে চেহারা তার কালো হয়ে যাবে। সন্তুষ্টি হল পূর্ণতার ভাব আর রিপু হল অপূর্ণতার ভাব। মায়ের ভেতরে এখন ক্রোধ সঞ্চার হয়েছে, সেই ক্রোধের জন্য মায়ের মুখমণ্ডলও মসীবর্ণের হয়ে গেছে।

ভ্রুকুটিকুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাদ্দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।।৬

ক্রোধে মায়ের ভ্রুটা কুঁচকে গেছে। মায়ের ওই সুভ্রু, সেই ভ্রু কুঁচকে যেতেই সেখান থেকে *কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী*, সঙ্গে সঙ্গে মায়ের শরীর থেকে এক ভয়ঙ্করা করালবদনা মুর্তি বেরিয়ে এসেছে। আমাদের হয়ত মনে হতে পারে যিনি এত সুমনোহরা, তাঁর ভেতর থেকে কী করে এই ভয়ঙ্করা চেহারার মুর্তি বেরিয়ে আসতে পারে! আসলে এগুলো শক্তিরই এক একটি রূপের অভিব্যক্তি। শক্তিপূজায় একটা মন্ত্রই আছে ওঁ ক্রীং করালবদনা ঘোরা, একেই করালবদনা তার উপর ঘোরা, দেখলেই ভয় করবে। মায়ের শরীর থেকে যে কালী করালবদনা বেরিয়ে এসেছেন, তিনি হস্তে অসি ও পাশ ধারণ করে আছেন। তাঁর আরও বিচিত্র রূপের বর্ণনা করে ঋষি বলছেন –

বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।।৭

ঋষি যিনি এই কালীর বর্ণনা করছেন, মনে হচ্ছে তিনিও যেন এই বিচিত্র অস্ত্রধারিণী এই ভয়ঙ্করা রূপের বর্ণনা করতে পারছেন না। *বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা*, মায়ের হাতে একটা বিচিত্র ধরণের তলোয়ার, তিনি *নরমালাবিভূষণা*, মায়ের গলায় নরমালা। মায়ের এখন সংহার মূর্তি। গ্রীক পৌরাণিকের এক কাহিনীতে যেখানে মৃত্যুকে আহ্বাণ করা হচ্ছে সেখানেও এই রকম এক বর্ণনা পাওয়া যায়, কিন্তু তার স্পর্শ বরফের মত ঠাণ্ডা। বিদেশে মৃত্যুকে সব সময় ঠাণ্ডা স্পর্শের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এখানে তা নয়। এই করালবদনা ভয়ঙ্করা, ভয়ঙ্করা বলছেন কারণ সব কিছুকে তিনি গ্রাস করে যাচ্ছেন। মৃত্যু মানেই সব কিছুকে গ্রাস করে নেওয়া। এক একটা করে যে অসুর পর পর আসবে, এদের এক একটাকে শেষ করার জন্য মা বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করবেন। ধূম্রলোচনকে যেমন হুম্ বীজ মন্ত্রে ভস্ম করে দিলেন। এই ক্ষেত্রে মায়ের কোপ থেকে ভীষনামূর্তি কালী জন্ম নিচ্ছেন।

দ্বীপিচর্মপরীধানা, চিতা বাঘের চামড়া পরিধান করে আছেন। *শুষ্কমাংসাতিভৈরবা*, মা কালীর শরীরে মাংস বলে কোন পদার্থ নেই, হাড় আর চামড়া ছাড়া কিছু নেই। চামড়াও শুষ্ক বলে ঝুলছে। এটাই Face of Death। মহাভারতেও একটা বর্ণনা আছে যেখানে ব্রহ্মা মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন। মৃত্যুকে সৃষ্টি করার পর মৃত্যু কাঁদছে এই ভেবে যে সবাইকে আমায় মারতে হবে। কিন্তু মৃত্যুর বর্ণনা খুব একটা জমে না। কিন্তু মায়ের এই বর্ণনা আমরা শুধু চণ্ডীতেই পাই, মায়ের এই বর্ণনাকে আধার করেই মা কালীর মূর্তি তৈরী করা হয়। হিন্দু ধর্মের অনেক কিছু বৌদ্ধ

ধর্মে ঢুকে যায়, সেখান থেকে সেগুলো তিব্বতে চলে যায়, তিব্বতের যে তন্ত্র সাধনা সেটা আবার ঘুরে ভারতে এসেছে। ফলে মায়ের অনেক রকম রূপের ধারণা আমাদের মধ্যে এসে গেছে। এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে, মা চিতা বাঘের চামড়া পরিধান করে আছেন, গলায় নরমালা, নরমালা দিয়ে মৃত্যুকে দেখান হয়েছে, শরীরে কোন মাংস নেই শুধু অস্থি আর চর্ম। আরও ভয়ঙ্করা লাগছে কারণ তিনি –

অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপুরিতদিঙ্মুখা।।৮

মা কালী বিশাল বদনা। বিশ্বরূপদর্শনেও অর্জুন দেখছেন ভগবানের মুখ বিশাল আর তার মধ্যে সব কিছু সরাসরি ঢুকে যাচ্ছে। এখানেও মায়ের মুখ বিশাল। তাঁর জিহ্বা সাপের জিহ্বার মত লক্ লক্ করছে, দেখলেই ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে। মায়ের চোখ দুটো ভেতরের দিকে ঢুকে আছে, কোটরাগতনয়না। চোখটাও স্বাভাবিক না। *নাদাপুরিতদিঙ্মুখা*, মা যে আওয়াজ করছেন, সে সাংঘাতিক আওয়াজ, মায়ের সেই গর্জন দশ দিক ছেয়ে ফেলেছে। স্বামীজী লিখছেন – নাচে তাহাতে শ্যামা। শ্যামার যে নৃত্য, কালিকাদেবীর যে নৃত্য, তা এই রকমই হবে। শরীরে মাংস নেই, শুধু হাড় আর শুকনো চামড়া আর বিরাট মুখ, জিহ্বা সব কিছুকে গ্রাস করে নেওয়ার জন্য লক্ লক্ করছে, চোখ দুটো ভেতরের দিকে ঢুকে আছে আর তাঁর যে বিকট গর্জন, সেই গর্জনে দশ দিক কাঁপছে। এটাই সত্যিকারের ভয়ঙ্কর মূর্তি, এই মূর্তিকেই বলা হয় সংহারমূর্তি। এই ধরণের মূর্তি বা ছবি বাড়িতে রাখতে নেই। গৃহস্থদের জন্য শ্যামা রূপ, যে রূপ অনেক শান্ত।

সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাসুরান্।
সৈন্যে তত্র সুরারীণামভক্ষয়ত তদ্বলম্।।৯

এই ভয়ঙ্করা কালিকাদেবী যুদ্ধ-টুদ্ধ কিছুই করছেন, তিনি শুধু অসুর সৈন্যদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সব কটাকে ভক্ষণ করতে শুরু করলেন। এর কিছুটা সামঞ্জস্য পাওয়া যাবে লঙ্কায় রাম-রাবণের যুদ্ধে, যেখানে কুম্ভকর্ণ বিশাল আকৃতি নিয়ে যুদ্ধ করতে এসে কোন অস্ত্র চালাচ্ছে না, সব বানরসেনাকে ধরে ধরে সরাসরি মুখের মধ্যে চালান করে দিচ্ছে। মা কালী *অতিবিস্তারবদনা*, তিনি শুধু অসুর সৈন্যগুলোকে ধরে ওই বিশাল মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। অগ্নিকে যা দিয়ে দেবেন সব নিয়ে নেবে, অগ্নির ক্ষুধা কখনই নিবৃত্তি হয় না। সেইজন্য যখন প্রলয় বা সংহারের কথা বলা হয় তখন প্রায় ক্ষেত্রেই অগ্নির কথা নিয়ে আসা হয়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সংহার মানে সব কিছু ব্ল্যাকহোলে চলে যাওয়া, ব্ল্যাকহোল মানে তেজঃশক্তি। সেইজন্য হিন্দুরা যে সংহার মূর্তির কথা বলতে গিয়ে বলে সব কিছু আগুনে চলে যাবে, সেখানে ভুল কিছু বলছে না। অগ্নি এমনই এক বিচিত্র জিনিষ যে, না খাওয়ালে ঠিক থাকবে, কিন্তু খাওয়া দিলেই তার ক্ষুধা বেড়ে যাবে। যযাতি বলছেন, অগ্নিতে ইন্ধন দিলে অগ্নি যেমন কমে যায় না, তেমনি ভোগ করে কখন ভোগের ইচ্ছাকে নিবৃত্ত করা যায় না। ভোগ করলে ভোগের স্পৃহা আরও বেড়ে যায়, এই কথাটা কতটা ঠিক বলা মুশকিল। ঠাকুরও বলছেন, মন কোন কিছুর জন্য চঞ্চল হয়ে আছে, তখন একটু ভোগ করে নিলে কেটে যায়। কিন্তু যারা ভোগের মধ্যেই ডুবে আছে তাদের ভোগ থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন। অগ্নিকে যত ইন্ধন দেওয়া হবে অগ্নির শক্তি তত বাড়বে, এখানে অগ্নির এই ধারণাটাই নেওয়া হয়েছে। মা এখন সংহার মূর্তি ধারণ করেছেন, এখন যতই ভক্ষণ করুন মায়ের পেট আর ভরবে না। আমার আপনার পেট ভরে যাবে কিন্তু মা কালীর উদরের পুর্তি কখনই হবে না।

পার্ষ্ণিগ্রাহাঙ্কুশগ্রাহি-যোধ-ঘণ্টা-সমন্বিতান্।
সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্।।১০

চণ্ড ও মুণ্ড চতুরঙ্গী সেনা নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছে। চতুরঙ্গী সেনাতে রথ আছে, হাতী আছে, ঘোড়া আছে, হাতীর পিঠে যে অঙ্কুশ নিয়ে বসে আছে, হাতীর গলায় যে ঘণ্টা ঝুলছে, মা সবশুদ্ধু এক হাতের মধ্যে নিয়ে তাঁর ওই বিশাল মুখের ভেতরে চালান করে দিতে লাগলেন। কোন বাছবিচার নেই। আসলে খাওয়া তো নয়, অগ্নির ক্ষেত্রে যেমন হয়, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে তাতে কলাগাছ দিলে সেটাও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মা

কালীও আর ওই বিচার করছেন না। কোনটা খাদ্য কোনটা অখাদ্য কিছুই দেখছেন, অস্ত্র-শস্ত্র, ঘণ্টা সব কিছু এক হাতে ধরে মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। ঢুকিয়ে কী করছেন?

তথৈব যোধং তুরগৈঃ রথং সারথিনাসহ।
নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চর্বয়ত্যতিভৈরবম্।।১১

এইভাবে ঘোড়া, রথ আর রথী, অশ্বারোহী যোদ্ধা কোন বিচার না করে সব কিছুকে এক সঙ্গে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে মুখের মধ্যে সরাসরি ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। তাই না, সব কিছুকে তিনি শুধু ঢুকিয়ে গিলে ফেলছেন না, সেগুলোকে আবার দাঁত দিয়ে ভীষণ ভাবে চর্বণ করতে লাগলেন। কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য, এটাই Dance of Death, মা কালীর সংহার নৃত্য চলছে।

একং জগ্রাহ কেশেষু গ্রীবায়ামথ চাপরম্।
পাদেনাক্রম্য চৈবান্যমুরসান্যমপোথয়ৎ।।১২

মা আবার কাউকে চুল ধরে, কাউকে গলা টিপে, আবার কাউকে পায়ের তলায় পিষে, কাউকে বুকের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে বধ করতে থাকলেন। এই জিনিষটাকে আমরা পাগলা হাতীর সাথে কিছুটা কল্পনা করতে পারি। হাতী যখন মাথা খারাপ হয়ে ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে তখন কাউকে পা দিয়ে পিষে চলে যাচ্ছে, কাউকে শুড় দিয়ে ছুড়ে মারছে, কাউকে লাথি মেরে ছিটকে দিচ্ছে। মা কালীর সংহার নৃত্যের দৃশ্যকে এর বেশী আমরা কল্পনা করতে পারব না।

তৈর্মুক্তানি চ শস্ত্রাণি মহাস্ত্রাণি তথাসুরৈঃ।
মুখেন জগ্রাহ রুষা দশনৈর্মথিতান্যপি।।১৩

অসুররাও তো ছাড়বে না। এদিকে ওদের কমাণ্ডার চণ্ড আর মুণ্ড দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখে যাচ্ছে। অসুররাও বড় বড় অস্ত্র-শস্ত্র মা কালীর উপর নিক্ষেপ করে যাচ্ছে। তখনকার দিনে তীর-ধনুক ছিল প্রধান অস্ত্র, তীর-ধনুক ছাড়াও তাদের আরও অন্য ধরণের অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যেত, যেমন বল্লম, বড়শি, কুঠার, খড়্গ ইত্যাদি। অসুরগুলো মা কালীর দিকে তাদের অস্ত্রগুলো নিক্ষেপ করে যাচ্ছে। মা কী করছেন? সব অস্ত্র-শস্ত্রগুলোকে তিনি মুখের মধ্যে নিয়ে দাঁতি দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে একেবার চূর্ণ করে দিচ্ছেন। একটা বিরাট অগ্নি ভেতরে জ্বলছে আর সবটাই সেখানে গিয়ে ভস্মীভূত হয়ে যাচ্ছে।

বলিনাং তদ্বলং সর্বমসুরাণাং মহাত্মনাম্।
মমর্দাভক্ষয়চ্চান্যানন্যাংশ্চাতাড়য়ৎ তদা।।১৪

এর ফলে কি হয়েছে, দেবী সব বলবান ও দুরাত্মা সৈন্যদের নিমেষের মধ্যে বিধ্বংস করে দিলেন, কিছু সৈন্যকে ভক্ষণ করে আর কিছু সৈন্যকে প্রচণ্ড আঘাতের দ্বারা নিহত করে সব শেষ করে দিলেন।

অসিনা নিহতাঃ কেচিৎ কেচিৎ খট্বাঙ্গতাড়িতাঃ।
জগ্মুর্বিনাশমসুরা দন্তাগ্রাভিহতাস্তথা।।১৫

ক্ষণেন তদ্বলং সর্বমসুরাণাং নিপাতিতম্।
দৃষ্ট্বা চণ্ডোঽভিদুদ্রাব তাং কালীমতিভীষণাম্।।১৬

সব সৈন্য কীভাবে মারা যাচ্ছে? কাউকে মা খড়্গা দিয়ে কেটে দিচ্ছেন, কেউ কেউ খট্টাঙ্গের প্রহারে মারা যাচ্ছে, কাউকে মা দাঁতের অগ্রভাগ দিয়ে আঘাত করে টুকরো করে দিচ্ছেন। এইভাবে মা ক্ষণকালের মধ্যে সমস্ত সৈন্যকুলকে শেষ করে ফেললেন। এই দৃশ্য দেখে চণ্ড রেগে সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি মা কালীর দিকে তেড়ে গেছে। কমাণ্ডার মরে গেলে বা হেরে গেলে সৈন্যরা পালিয়ে যাবে কিন্তু সৈন্য শেষ হয়ে গেলে কমাণ্ডার কখন পালাবে না।

শরবর্ষৈর্মহাভীমৈর্ভীমাক্ষীং তাং মহাসুরঃ।
ছাদয়ামাস চক্রৈশ্চ মুণ্ডঃ ক্ষিপ্তৈঃ সহস্রশঃ।।১৭

মা কালীর এই মূর্তির আরেকটি নাম ভীমাক্ষী, তাঁর নেত্রদ্বয় বিশাল তাই বলছেন ভীমাক্ষী, তিনি মহাশক্তিশালিনী। মুণ্ডও তখন সহস্র সহস্র ভয়ানক বাণ ও চক্র মায়ের প্রতি নিক্ষেপ করতে শুরু করেছে। এত অস্ত্র বর্ষণ করেছে যে দেবীকে অস্ত্র দিয়ে একেবারে ঢেকে ফেলেছে। কিন্তু তাতেও মায়ের কিছু আসে যায় না।

তানি চক্রাণ্যনেকানি বিশমানানি তন্মুখম্।
বভূর্যথার্কবিম্বানি সুবহূনি ঘনোদরম্।।১৮
ততো জহাসাতিরুষা ভীমং ভৈরবনাদিনী।
কালী করালবক্ত্রান্তর্দুর্দর্শদশনোজ্জ্বলা।।১৯

এত যে হাজার হাজার বাণ আর চক্র মায়ের প্রতি নিক্ষেপ করেছে তার সব কটিকে মা নিজের মুখের মধ্যে নিয়ে খেয়ে ফেলেছেন। অসুরদের অস্ত্রেরও শক্তি আছে, বলছেন মায়ের মুখে সব অস্ত্রগুলো এসে থেমে গেছে, সেই অস্ত্রের এত তেজ ও জ্যোতি যে, দেখে মনে হচ্ছে মায়ের মুখে যেন একই সঙ্গে অনেকগুলো সূর্যের উদয় হয়েছে। ওখান থেকে সব অস্ত্রগুলো মায়ের পেটে ঢুকে যাচ্ছে, তাই বলছেন – মনে হচ্ছে যেন বহু সূর্য কালো ঘন মেঘের মধ্যে প্রবেশ করে যাচ্ছে। এরপর মা কালিকা দেবী এক ভয়ানক ক্রোধ উৎপন্ন করে বিকট অট্টহাস্য করতে লাগলেন। অট্টহাস্য করার জন্য মায়ের মুখের দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে, বলছেন, ওই ভয়ঙ্কর মুখের মধ্যে ওই মায়ের দাঁতগুলো এমন ঝক্ ঝক্ করতে লাগল যে যেন তীব্র আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে, সেই আলোর এমন তেজ যে চোখ ঝলসে যাচ্ছে, আর দাঁতের আলোর প্রভায় মায়ের চেহারা আরও তেজোময় হয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

উত্থায় চ মহাসিং হং দেবী চণ্ডমধাবত।
গৃহীত্বা চাস্য কেশেষু শিরস্তেনাসিনাচ্ছিনৎ।।২০
অথমুণ্ডোহপ্যধাবৎ তাং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্।
তমপ্যপাতয়দ্ভূমৌ সা খড়্গাভিহতং রুষা।।২১

এইবার মা 'হং' বীজ নিয়ে এলেন। হং বীজ হল সংহার বীজ। এর আগে ধূম্রলোচনকে হুম্ বীজ মন্ত্রে ভস্ম করে দিয়েছিলেন। হং আর হুম্ দুটোই সংহার বীজ। মা এক বিশাল খড়্গ হাতে নিয়ে এই 'হং' বীজমন্ত্র বিকট জোরে আওয়াজ করে চণ্ডের দিকে ছুটে গিয়ে তার চুলের মুঠি ধরে সেই খড়্গ দিয়ে চণ্ডের মুণ্ডুটা কেটে দিয়েছেন। চণ্ড মারা গেছে দেখে মুণ্ডও দেবীর দিকে তাড়া করে গেছে। তখন দেবী তাকেও সেই খড়্গের আঘাতে ভূতলশায়ী করে দিলেন।

হতশেষং ততঃ সৈন্যং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্।
মুণ্ডঞ্চ সুমহাবীর্যং দিশো ভেজে ভয়াতুরম্।।২২

মহাবিক্রম চণ্ড আর মুণ্ড নিহত হয়ে যেতে দেখে বাকি যেটুকু অবশিষ্ট অসুর সৈন্য ছিল, সব কটা এবার প্রাণভয়ে ওখান থেকে পালিয়ে গেছে। এভাবে পালিয়ে যাওয়া নতুন কিছু নয়, এর আগেও আমরা বলেছি, এটাই প্রথা ছিল, কমাণ্ডার যদি মারা যায়, ওর সৈন্য সব সময় পালিয়ে যেত। কারণ সব সৈন্য তার সেনাপতির জন্যই লড়ছে আর সেনাপতির জন্যই সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে। যদিও সবাই ক্ষত্রিয় ছিল আর ক্ষত্রিয় ধর্মের আদর্শই ছিল যুদ্ধে কখন তারা পিঠ দেখাবে না, হয় যুদ্ধে জয় নয়তো যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যু। কিন্তু আসল সময় এরা এই আদর্শকে ধরে রাখতে পারত না। তাদের পক্ষে পারার কথাও নয়, তারা দেখছে আমাদের সেনাপতি এত শক্তিমান হয়ে সে নিজেই উল্টে পড়েছে, সেখানে আমরা আর কী!

শিরশ্চণ্ডস্য কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেব চ।
প্রাহ প্রচণ্ডাট্টহাসমিশ্রমভ্যেত্য চণ্ডিকাম্।।২৩
ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ।
যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি।।২৪

তখন সেই মা কালিকাদেবী চণ্ড ও মুণ্ডের কাটা মস্তক দুটো হাতে নিয় মা অম্বিকার কাছে গিয়ে অট্টহাস্য করে বলছেন – এই যে যুদ্ধযজ্ঞ, এই যুদ্ধযজ্ঞে আহুতির জন্য আমি চণ্ড আর মুণ্ডের মুণ্ডু আপনাকে উপহার দিলাম। আর শুম্ভ আর নিশুম্ভের বধ আপনি নিজেই করবেন। এনাদের কাছে যুদ্ধটাও একটা যজ্ঞ, যুদ্ধে যত বলি হচ্ছে এগুলো সব আহুতি রূপে পড়ছে। মহাভারতে অনেকগুলো বর্ণনা আছে যেখানে যুদ্ধকে যজ্ঞ রূপে দেখানো হয়েছে। একটা কাব্যিক রূপ দিয়ে দেখানো হচ্ছে যুদ্ধযজ্ঞে হোতা কে, অদ্বর্যু কে, আহুতি কি, ঘৃত কোনটা। হিন্দুদের কাছে সব কিছুই যজ্ঞ, খাওয়াটাও যজ্ঞ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়াটাও যজ্ঞ, বিবাহও যজ্ঞ, সন্তানোৎপত্তিও যজ্ঞ। যুদ্ধ যখন হচ্ছে তখন যুদ্ধকেও যজ্ঞ রূপে নিচ্ছেন। মা কালীর পূজাতে পশুবলি দেওয়া হয়। বলছেন এই যুদ্ধযজ্ঞে দুটো মহাপশুকে অর্পণ করলাম। তখন মেধা ঋষি বলছেন –

ঋষিরুবাচ।।২৫
তাবানীতৌ ততো দৃষ্ট্বা চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ।
উবাচ কালীং কল্যাণী ললিতং চণ্ডিকা বচঃ।।২৬

যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি।।২৭

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে চণ্ডমুণ্ডবধো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ।।

অম্বিকা দেবীরই নাম কৌশিকী, চণ্ডী ইত্যাদি, একই শক্তি। মেধা ঋষি বলছে, চণ্ড আর মুণ্ডের মস্তক দুটি হাতে নিয়ে কালিকাদেবী অম্বিকার কাছে নিয়ে আসতে দেখে সেই কল্যাণময়ী চণ্ডিকাদেবী কালিকাদেবীকে বলছেন – হে দেবী! এই যে তুমি চণ্ড আর মুণ্ডকে সমরে নিহত করে আমার কাছে নিয়ে এসেছ, সেইজন্য জগতে তুমি চামুণ্ডা নামে বিখ্যাত হবে। চণ্ডী বলতে মা দুর্গা আর চামুণ্ডা হলেন মা কালী, যিনি চণ্ড ও মুণ্ডের বধ করেছিলেন। মূল বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় শক্তিই সব কিছু। কিন্তু শক্তি বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রকম কার্য করেন। এরপরের অধ্যায় অষ্টম অধ্যায়ে রক্তবীজ বধে আবার শক্তির অনেক রূপের বর্ণনা আসবে।

অথ অষ্টমোহধ্যায়ঃ

(রক্তবীজ বধ)

ওঁ ঋষিরুবাচ।।১

চণ্ডে চ নিহতে দৈত্যে মুণ্ডে চ বিনিপাতিতে।
বহুলেষু চ সৈন্যেষু ক্ষয়িতেষ্বসুরেশ্বরঃ।।২

ততঃ কোপপরাধীনচেতাঃ শুম্ভঃ প্রতাপবান্।
উদ্‌যোগং সর্বসৈন্যানাং দৈত্যানামাদিদেশ হ।।৩

এই অধ্যায়ের নাম রক্তবীজ বধ, যদিও রক্তবীজের কথা পড়ে আসবে, কিন্তু তার আগে বলছেন, চণ্ড আর মুণ্ড সহ অগণিত অসুর সৈন্যের নিহত হওয়ার খবর দৈত্যরাজ শুম্ভের কাছে পৌঁছে গেছে। স্বাভাবিক ভাবে শুম্ভ এখন প্রচণ্ড ক্রোধে বশীভূত হয়ে গেছে। তখন শুম্ভ তার কয়েকজন বড় বড় সেনাপতিকে ডেকে আরও বড় সংখ্যায় অসুর সৈন্য নিয়ে যুদ্ধসজ্জা করার আদেশ দিল।

অদ্য সর্ববলৈর্দৈত্যাঃ ষড়শীতিরুদায়ুধাঃ।
কম্বূনাং চতুরশীতির্নির্যান্তু স্ববলৈর্বৃতঃ।।৪

কোটিবির্যাণি পঞ্চাশদসুরাণাং কুলানি বৈ।
শতং কুলানি ধৌম্রাণাং নির্গচ্ছন্তু মমাজ্ঞয়া।।৫

কালকা দৌর্হৃদা মৌর্যাঃ কালকেয়স্তথাসুরাঃ।
যুদ্ধায় সজ্জা নির্যান্তু আজ্ঞয়া ত্বরিতা মম।।৬

ইত্যাজ্ঞাপ্যাসুরপতিঃ শুম্ভো ভৈরবশাসনঃ।
নির্জগাম মহাসৈন্যসহস্রৈর্বহুভির্বৃতঃ।।৭

অসুরদের অনেকগুলো বংশ ছিল, তাদের একটি বংশের নাম উদায়ুধ, এই বংশের ছিয়াশিজন সেনাপতি, এই রকম কম্বুবংশের চুরাশি জন্য সেনাপতি। শুম্ভ আদেশ করছে উদায়ুধের যে ছিয়াশিজন সেনাপতি আছে আর কম্বুবংশের চুরাশি জন্য সেনাপতি, এরা সবাই আজই নিজেদের সৈন্য পরিবেষ্টিতে হয়ে যুদ্ধের জন্য যাত্রা করুক। এই রকম কোটিবীর্য বংশের অসুরদের পঞ্চাশটি দল, ধৌম্রকুলের অসুরদের একশ দল, কালক, দৌর্হৃদ, মৌর্য ও কালকেয় অসুররাও যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে আমাদের আদেশে যুদ্ধযাত্রা করুক। দোর্দণ্ড শাসক শুম্ভের আদেশে তখন হাজার হাজার উত্তম সেনাদের সঙ্গে সব সেনাপতিরা যুদ্ধের জন্য যাত্রা করল।

আয়াতং চণ্ডিকা দৃষ্ট্বা তৎসৈন্যমতিভীষণম্।
জ্যাস্বনৈঃ পূরয়ামাস ধরণীগগনান্তরম্।।৮

ভয়ঙ্কর বিশাল অসুর সৈন্যবাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখে দেবী চণ্ডিকা তাঁর ধনুকে টংকার দিতে শুরু করেছেন। ধনুকের ব্যাপারে আমাদের অনেক বিচিত্র রকমের ধারণা হয়ে আছে। বেশির ভাগ লোকের ধারণা যে ধনুক হাতে নিয়ে তীর ছোঁড়া হয়, আসলে আমরা যেভাবে জানি সেভাবে তীর ছোঁড়া হয় না। শ্রীরামচন্দ্রের যে ছবি আমরা সচরাচর দেখতে পাই সেখানে দেখা যায় ধনুকের উচ্চতা শ্রীরামচন্দ্রের উচ্চতার সমান। এটাই আসল ধনুক, যুদ্ধে এত বড় ধনুক নিয়েই যুদ্ধ করা হত। ঘোড়া বা হাতীর পিঠে বসে যারা যুদ্ধ করত তাদের ধনুক স্বাভাবিক ভাবেই ছোট থাকত। কিন্তু মূল যুদ্ধ যেটা হত সেটা এই বিরাট ধনুক নিয়েই যুদ্ধ করা হত, আর প্রত্যেক দেশেই ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করার রেওয়াজ ছিল। ধনুক মানে পুরো একটা বাঁশ বা ওই ধরণের বিরাট লম্বা কাঠ, যোদ্ধার উচ্চতার সমান হত। যোদ্ধা বাঁ পায়ের আংঠা দিয়ে ধনুকের নীচের অংশটা চেপে রাখত, অনেক সময় মাটিতে গেঁথেও দিত, তারপর ধনুকের ছিলা বা দড়ি ধরে টান দিত। তীর ছোঁড়ার সময় মধ্যমা আর তর্জনীর মাঝখানে ধরেই তীর ছাড়া হয়, বুড়ো আঙুল দিয়ে ধরে কখনই ছাড়া হয় না। এবারে আমরা কল্পনা করতে পারি, ওই বিরাট লম্বা ধনুক, তার দড়িতে টান দিচ্ছে তার আওয়াজ কীরকম হবে! সেতারের তারে টান দিলেই টং করে আওয়াজ হয়, আর এই ধনুকের আওয়াজ তার থেকে আরও জোর হবে। চণ্ডিকাদেবীর ধনুক, সেই ধনুক আবার

দিব্য ধনুক, দেবী অসুরদের এগিয়ে আসতে দেখেই সেই ধনুকে যে টঙ্কার দিয়েছেন তার আওয়াজেই সমগ্র পৃথিবীলোক আর সমস্ত আকাশ অনুরণিত হয়ে ছেয়ে গেছে।

ততঃ সিংহো মহানাদমতীব কৃতবান্ নৃপ।
ঘণ্টাস্বনেন তান্ নাদানম্বিকা চোপবৃংহয়ৎ।।৯

ধনুর্জ্যাসিংহঘণ্টানাং শব্দাপূরিতদিঙ্মুখা।
নিনাদৈর্ভীষণৈঃ কালী জিগ্যে বিস্তারিতাননা।।১০

এদিকে দেবীর বাহন সিংহও ভীষণ গর্জন করতে শুরু করেছে, তার সঙ্গে দেবী অম্বিকা নিজের ঘণ্টাধ্বণি যোগ করে সেই শব্দকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। একদিকে ধনুকের টংকার, সিংহের গর্জন, আর দেবীর ঘণ্টার ধ্বণি সব মিলিয়ে সমস্ত দিক কম্পিত হতে শুরু করেছে। ওই সব দেখে দেবীর রজোগুণ আরও বেড়ে গেছে। যার ফলে একেই ওই বিশাল করালবদনা তার উপর এখন সেই মুখকে আরও বিস্তার করে দিলেন। তাই না, তার সাথে তিনি এমন তীব্র হুঙ্কার নাদ দিতে শুরু করলেন যে সেই নাদে ধনুকের টংকার, সিংহের গর্জন, ঘণ্টার ধ্বণি সব চাপা পড়ে গেল।

তন্নিনাদমুপশ্রুত্য দৈত্যসৈন্যৈশ্চতুর্দিশম্।
দেবী সিংহস্তথা কালী সরোষৈঃ পরিবারিতাঃ।।১১

এতস্মিন্নন্তরে ভূম বিনাশায় সুরদ্বিষাম্।
ভবায়ামরসিংহানামতিবীর্যবলান্বিতাঃ।।১২

ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণুনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ।
শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাং যযুঃ।।১৩

ওই বিশাল মহাশব্দ শোনার পর দৈত্যসেনারা রেগে গিয়ে চারিদিক থেকে এবার চণ্ডিকাদেবী, সিংহ ও কালিকা দেবীকে ঘিরে ফেলেছে। এরপর একটা মজার ব্যাপার হয়ে গেল। অসুরদের বিনাশ ও দেবতাদের বিজয়ের জন্য ব্রহ্মা, শিব, কার্তিকেয়, বিষ্ণু এবং অন্যান্য দেবতারা যারা অসুরদের দ্বারা উৎপীড়িত ও বিতাড়িত, মাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। এখানে মায়ের সাহায্য মানে মা যে দুর্বল ছিলেন বা তিনি কারুর শক্তির অপেক্ষা রাখছেন তা নয়, এটা শুধু দেখানো হচ্ছে যে, ওই যুদ্ধে কীভাবে সবাই বিভিন্ন ভাবে অংশগ্রহণ করে দেবীকে সহায়তা করেছিলেন। যদিও দেবতারা অসুরদের দ্বারা পরাজিত কিন্তু তাই বলে তাঁদের তেজের তো কোন ঘাটতি হয়ে যায়নি। কথা আছে, I am down but not out।, আমি মাটিতে পড়ে গিয়ে থাকতে পারি কিন্তু তাই বলে শেষ হয়ে যাইনি। অসুরদের কাছে মার খেলেও দেবতাদের তেজ তো আছে, তেজটা শুম্ভ নিশুম্ভের তুলনায় দমে আছে। এখন যে পরিস্থিতি হয়েছে, তাতে সমস্ত দেবতারা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ এনাদেরও দেবতা রূপেই নিচ্ছে, সাধারণত পুরাণে এভাবে দেবতা রূপে দেখান হয় না। তবে মার্কণ্ডেয় পুরাণ ব্রহ্মাপুরাণের অন্তর্গত। যেহেতু ব্রহ্মাপুরাণ তাই বিষ্ণু ও মহেশকে যদিও এখানে সম্মান দেওয়া হয়েছে, তবে বিষ্ণু পুরণে বিষ্ণুকে যেভাবে সম্মান দেওয়া হয় সেইভাবে ব্রহ্মাপুরাণ দেবে না। বলছেন এই দেবতাদের ভেতর থেকে তেজঃপুঞ্জ বেরিয়ে এসেছে। পার্বতী আর অম্বিকার ক্ষেত্রে যেভাবে হয়েছিল সেইভাবে হয়নি, দেবতাদের ওই তেজটা একটা মূর্ত রূপ ধারণ করল। তেজরাশি বেরিয়ে এসে প্রত্যেক দেবতাদের যেমন যেমন পরাক্রম, যেমন যেমন শক্তি, ঠিক সেই রকম তাঁরা বেরিয়ে এসেছেন।

আমাদের যে স্থূল শরীর আর সূক্ষ্ম শরীরের ধারণা চলে আসছে, যেখানে বলা হয় আমাদের ভেতরে আমাদেরই মত একজন আছেন, তিনি চাইলে বেরিয়ে আসতে পারেন। পরিস্থিতিতে এমন হতে পারে যে আপনার স্থূল শরীর যেমন থাকার আছে কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরটা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। ঠাকুরের জীবনেও এই ধরণের ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। ঠাকুরের ভাগনে বলেছিল শিওড়ে তাদের বাড়িতে দুর্গাপূজা করবেন। শুনে ঠাকুর বলেছিলেন তাহলে আমিও সেখানে যাব। কিন্তু কোন কারণে ঠাকুর সেবার শিওড়ে যেতে পারেননি। কিন্তু সন্ধিপূজার সময় হঠাৎ হৃদয়রাম দেখছেন ঠাকুর এসে উপস্থিত হয়েছেন। আবার বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরকে বাংলাদেশে দেখলেন,

তিনি আবার ঠাকুরের গা টিপে টিপে দেখেছেন। এই ধরণের অনেক ধারণা আমাদের অনেক আগে থেকেই আছে, যেমন ব্যূহকায়, একজন একসাথে অনেকগুলো শরীর ধারণ করে নিতে পারেন। সূক্ষ্ম শরীরে বেরিয়ে আসা মানে, এবার তার সীমাবদ্ধতার বাঁধনটা খুলে গেল। ওই এক সূক্ষ্ম শরীর থেকে এবার অনেক সূক্ষ্ম শরীর করে নেওয়াটা কিছুই না। এটাকেই যোগশাস্ত্রে ব্যূহকায় বলছে। একজন যোগী নিজের কর্মক্ষয় করার জন্য অনেকগুলো শরীর তৈরী করে নেন। আর এই অনেকগুলো শরীর দিয়ে যোগীর সব কর্ম ক্ষয় হয়ে যায়। ভৌতিক জগৎ থেকে যখন উপাদান নিতে শুরু করে তখনই সূক্ষ্ম শরীর তৈরী হয়। যখন দেখে এই শরীর দিয়ে আর কাজ করা যাবে না, তখন শরীরটা ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাবে। সে চাইলে দুটো পাঁচটা শরীর দাঁড় করিয়ে নিতে পারে। কিন্তু যোগী ছাড়া এই ক্ষমতা কারুর হবে না। এখানে দেবতারাও ওই রকম শরীর নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। যে শরীর নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন, সেই শরীরের বৈশিষ্ট্য কি রকম ছিল?

যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণবাহনম্।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ।।১৪

তাঁদের বৈশিষ্ট্য হল, যে দেবতার যেমনটি রূপ, যেমনটি বেশভূষা, যেমনটি তাঁর আয়ুধ, তাঁর যেমন বাহন ঠিক তেমনটি রূপ, তেমনটি বেশভূষা, সেই একই আয়ুধ আর একই বাহন নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। এনারাও সবাই এক একটি বিরাট শক্তি। পরে শুম্ভ মাকে বলবে, তুমি তো অন্যের বলবীর্যকে আশ্রয় করে যুদ্ধ করেছ। তখন মা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রে বলছেন, আমি ছাড়া এই জগতে কে আছে, এই দেখো সব আমার ভেতরে চলে যাচ্ছে। এই একটি মন্ত্রকে দাঁড় করাবার জন্যই এত বড় কাহিনী বলা হচ্ছে। এখানে প্রথমে দেখান হচ্ছে সব দেবতাদের শক্তিগুলি যে যে দেবতাদের যেমন আভূষণ, যেমন তাঁদের রূপ, যেমন তাঁদের অস্ত্র, যেমন তাঁদের বাহন নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে মাকে সাহায্য করছেন। পরে তাই শুম্ভ এসে বলবে, তুমি তো অন্যের সাহায্য নিয়ে লড়াই করছ, কিন্তু শুম্ভ নিজেও তো অন্যের সাহায্য নিয়ে লড়ছে। এত কিছু যে হচ্ছে শুধু এই একটি জিনিষকে দেখানো – *একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা*, আমি ছাড়া এই জগতে আর কে আছে! আমিই একমাত্র আছি। শুম্ভকে মায়ের বক্তব্য হল, তুমি যেটা আমাকে দেখছ এটা শক্তির মূর্তরূপ, কিন্তু শক্তিরূপে আমিই তো আছি। শুধু দেবতাদের ভেতরেই যে আমি আছি তা নয়, তোমার ভেতরে যে শক্তি সেটাও আমি, *দ্বিতীয়া কা মমাপরা*। মায়ের এই উক্তি দশম অধ্যায়ে আসবে। কিন্তু *দ্বিতীয় কা মমাপরা* বলার আগে প্রেক্ষাপট তৈরী করার জন্য দেখান হচ্ছে মায়ের যে শক্তি সেই শক্তি সব দেবতাদের মধ্যেই আছে।

এখন দেবতাদের নিজেদের শক্তি বাইরে বেরিয়ে এসে দেবীশক্তি রূপে আবির্ভূতা হয়েছে। এর ফলে মায়ের যে আলাদা করে কোন শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে তা নয়, কারণ এই রূপ এই শক্তি সবই তো মায়েরই রূপ, মায়েরই শক্তি। এতে তাই মায়ের অতিরিক্ত শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার কোন ব্যাপারই নেই। এই যে চামুণ্ডাদেবী বা কালিকাদেবী যে এসেছেন, এখানে চামুণ্ডাও যা কালীও তাই, কালীও যা পার্বতীও তাই, পার্বতী যা দুর্গাও তাই। আবার পার্বতী থেকেই দুজন বেরিয়েছেন। এই ভাবকে ধারণা করা খুব কঠিন বলে শক্তি আরাধনাও খুব কঠিন ও জটিল হয়ে যায়। যাঁরা শুধু উপনিষদ নিয়ে থাকেন তাঁদের পক্ষে ভগবান বিষ্ণুর ব্যাপারটা বোঝা কঠিন হয়ে যায়, আবার শুধু ভগবান বিষ্ণুর যিনি উপাসক তাঁর পক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা করা কঠিন হবে। আর শক্তি আরাধনার ক্ষেত্রে সব কিছু আরও জটিল হয়ে যায়, কারণ মায়ের এতগুলো রূপ, কোনটা থেকে তিনি কোন রূপ নিয়ে নিচ্ছেন ধরতে গেলে সব গুলিয়ে যায়। কিন্তু মা একজনই আছেন কিন্তু তিনিই আবার দশ বারোটা রূপে দেখাচ্ছেন। যাই হোক এখানে বলছেন, মা অম্বিকাকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন দেবতাদের যে শক্তি সেই সেই দেবতাদের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এবারে কোন কোন দেবতারা কি কি নামে বেরিয়ে এসেছেন তার বর্ণনা করা হচ্ছে –

হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাঽভিধীয়তে।।১৫

ব্রহ্মা হংসের উপরে বিরাজ করেন আর তিনি অক্ষসূত্র ধারণ করে থাকেন আর হস্তে সব সময় কমণ্ডলু থাকে। তাই বলছেন প্রথমে অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু ধারণ করে হংসযুক্ত বিমানে করে ব্রহ্মার শক্তি বেরিয়ে এসে

সেখানে হাজির হয়ে গেলেন। ব্রহ্মা হলেন পিতামহ, তিনি সব দেবতাদের উপরে, তিনি পিতামহ, তাই সর্বাগ্রে ব্রহ্মা এসে হাজির হলেন। যে শক্তি ব্রহ্মা থেকে বেরিয়ে এসেছেন সেই শক্তির নাম হয়ে গেল ব্রহ্মাণী। ব্রহ্মার ভেতর থেকে শক্তি বেরিয়ে এসেছেন তাই বলে ব্রহ্মা যে শক্তি থেকে চ্যুত হয়ে গেলেন তা নয়।

মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা।।১৬

কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবরবাহনা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকা গুহরূপিণী।।১৭

তথৈব বৈষ্ণবীশক্তির্গরুড়োপরি সংস্থিতা।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ।।১৮

মহাদেবের শক্তি মাহেশ্বরী হাতে প্রকাণ্ড ত্রিশূল, ললাটে শিবের মত অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত, হাতে মহানাগের বালা ধারণ করে বৃষভের উপর আরোহিতা হয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। শিব যেমনটি দেখতে মাহেশ্বরীও ঠিক সেই রকমটি দেখতে। কার্তিকেয়র নাম কুমার, তিনি দেবতাদের সেনাপতি। গীতায় বিভূতিযোগে ভগবান বলছেন *সেনানীনামহং স্কন্দঃ*, সেনাপতিদের মধ্যে আমি কার্তিকেয়। কার্তিকেয় থেকে যে শক্তি বেরিয়ে এলেন তাঁর নাম কৌমারী। কৌমারী দেবীও কার্তিকেয়র মত ময়ূরের উপরে বসে হাতে শক্তি অস্ত্র নিয়ে দৈত্যদের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছেন। ভগবান বিষ্ণুর ভেতর থেকে বিষ্ণুর শক্তি বৈষ্ণবী বেরিয়ে এলেন। ভগবান বিষ্ণুর মত তিনিও গরুড়বাহনা, তাঁর বিভিন্ন হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গধনুক ও খড়্গ।

যজ্ঞবারাহমতুলং রূপং যা বিভ্রতো হরেঃ।
শক্তিঃ সাপ্যাযযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তনুম্।।১৯

নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ।
প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপক্ষিপ্তনক্ষত্রসংহতিঃ।।২০

বজ্রহস্তা তথৈবৈন্দ্রী গজরাজোপরি স্থিতা।
প্রাপ্তা সহস্রনয়না যথা শক্রস্তথৈব সা।।২১

ভগবান যখন বরাহ অবতার রূপ ধারণ করে পৃথিবীকে তুলে এনেছিলেন, সেই বরাহ অবতারের শক্তির নাম বারাহী। বারাহী দেবী বরাহ শরীর ধারণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন। যখন ভগবান নৃসিংহ রূপ ধারণ করেছিলেন, সেই নৃসিংহের শক্তির নাম হল নারসিংহী, এটিও মায়েরই শক্তির আরেকটি নাম। সেই নারসিংহী নৃসিংহ রূপ শরীর ধারণ করে যুদ্ধ করতে এলেন। বলছেন, নারসিংহীর কেশরের সঞ্চালনে আকাশের নক্ষত্রগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। ঠিক সেই রকম দেবরাজ ইন্দ্রের শক্তি ঐন্দ্রী গজরাজ ঐরাবতের পিঠে বসে এসেছেন, ইন্দ্রের হাতে যেমন বজ্র তেমনি তাঁর হাতেও বজ্র। ইন্দ্রের মত তিনিও সহস্রনয়না। বেদেই বর্ণনা আছে, ইন্দ্রের সব জায়গায় চোখ আছে, অর্থাৎ সবাই যা কিছু করে ইন্দ্র সব জানতে পারেন। পুরুষসূক্তে বর্ণনা আছে *সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাতঃ*। আবার পুরাণে একটা মতে বলা হয় ইন্দ্রের উপর কোন কারণে অভিশাপ হয়েছিল যে তাঁর সারা শরীরে চোখ হয়ে যাবে। আবার বাল্মীকি রামায়ণে আছে গৌতম মুনি ইন্দ্রকে অভিশাপ দিয়ে বললেন তুমি নির্বীজ হয়ে যাবে। অন্য রামায়ণে আবার অন্য রকম, অহল্যার সাথে গোলমাল করাতে গৌতম মুনি খুব রেগে গিয়ে অভিশাপ দিলেন 'তোমার মেয়েদের প্রতি এত আসক্তি তাই তোমার সারা শরীরে মেয়েদের অঙ্গ হয়ে যাবে'। ইন্দ্র তখন লজ্জায় কোথাও মুখ দেখাতে পারছেন না। তখন তিনি দেবতাদের গিয়ে বলছেন 'আমি তো তোমাদেরই কাজ করছিলাম, গৌতম মুনির যে এত তপস্যা সেই তপস্যার বলে স্বর্গ নড়ে যেত তাই গৌতম মুনির স্ত্রীকে প্রলোভিত করে আমি গৌতম মুনিকে রাগিয়ে দিয়েছি, ওই রাগে তাঁর তপস্যা নষ্ট হয়ে গেল। সেইজন্য তোমরা সবাই মিলে আমার জন্য কিছু একটা কর'। দেবতারা সবাই ইন্দ্রের কথা মেনে নিল। এখন তাহলে কী করা যাবে? ইন্দ্রের শরীরে যত মেয়েদের অঙ্গ হয়েছিল তার সব কটিতে চোখ বসিয়ে দেওয়া হল। সেখান থেকে ইন্দ্রের গায়ে হাজারটা চোখ হয়ে গেল। ইন্দ্রের শক্তি ঐন্দ্রীরও হাজারটা চোখ, সেইজন্য বলছেন *প্রাপ্তা সহস্রনয়না*।

ততঃ পরিবৃতস্তাভিরীশানো দেবশক্তিভিঃ।
হন্যন্তামসুরাঃ শীঘ্রং মম প্রীত্যাহ চণ্ডিকাম্।।২২
ততো দেবীশরীরাত্তু বিনিষ্ক্রান্তাতিভীষণা।
চণ্ডিকাশক্তিরত্যুগ্রা শিবাশতনিনাদিনী।।২৩

এরপর সব দেবশক্তি দ্বারা পরিবৃত হয়ে মহাদেব তখন চণ্ডিকাদেবীকে বললেন 'আমার প্রীতির জন্য তুমি শীঘ্র সব অসুরদের বধ কর'। এই বলতেই দেবী চণ্ডিকার শরীর থেকে এক বিরাট শক্তি বেরিয়ে এসেছেন। আর সেই অতি উগ্রা শক্তি *শিবাশতনিনাদিনী*, শিবা মানে শৃগাল, শত শত শৃগাল একসঙ্গে চিৎকার করলে যেরকম একটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ হবে, সেই দেবী মুখ দিয়ে সেই রকম আওয়াজ করতে শুরু করলেন। এখানে আগে সাতটি শক্তির কথা বলা হয়েছে – ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী ও ঐন্দ্রী এই সাতজন শক্তি এবং আর দেবীর শরীর থেকে যে শিবা শক্তি বেরিয়েছে এই অষ্টশক্তি এবার অসুর নিধনের জন্য যুদ্ধ করবেন। তখন অপরাজিতা দেবী শিবকে গিয়ে বলছেন –

সা চাহ ধূম্রজটিলমীশানমপরাজিতা
দূতত্ত্বং গচ্ছ ভগবন্ পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।।২৪
ব্রূহি শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ দানবাবতিগর্বিতৌ।
যে চান্যে দানবাস্তত্র যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ।।২৫
ত্রৈলোক্যমিন্দ্রো লভতাং দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ।
যূয়ং প্রয়াত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ।।২৬

অপরাজিতা দেবী ধূম্রজটাধারী মহাদেবকে বললেন 'আপনি দূত হয়ে শুম্ভ-নিশুম্ভের কাছে যান আর অন্যান্য যেসব দানবরা এখানে যুদ্ধের জন্য একত্রিত হয়েছে তাদেরও বলুন – দৈত্যরা! তোমরা যদি জীবিত থাকতে চাও তবে পাতালে প্রবেশ কর আর দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিভুবনের অধিকার লাভ করুন এবং যজ্ঞাহুতি ভোগ করুন'। দৈত্যদের বাসস্থান আগে থাকতেই ঠিক করা আছে, সব দৈত্যরা পাতাললোকে থাকবে, সেইজন্য বলছেন তোমরা তোমাদের বাসস্থান পাতাললোকে চলে যাও। আমরা এর আগেও অনেকবার আলোচনা করেছি যে, যে কোন শক্তিই হোক না কেন, ভগবানের শক্তিই হোক আর যে শক্তিই হোক, সব সময় এই শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখা হয়। ভগবান কোন কিছুর বিনাশ সহজে হতে দিতে চান না। দেবতাদেরও শক্তি আছে আবার দৈত্যদেরও শক্তি আছে। এই দুই মেরুর শক্তির ভারসাম্য যখন বিঘ্ন হয়ে যায় ভগবান তখন নিজে এসে শক্তির ভারসাম্য ঠিক করে দেন। মায়ের শক্তি ভগবানরই শক্তি, তিনিও শক্তির এই ভারসাম্যতা ফিরিয়ে আনার জন্য আবির্ভূতা হয়েছেন। কীভাবে ফিরিয়ে আনছেন? দেবতারা তাঁদের স্বর্গরাজ্য যেন ফেরত পায় আর দৈত্যরা পাতাল লোকের অধিবাসী তারা যেন পাতাল লোকে ফেরত চলে যায়। পাতাল বলতে খারাপ কিছু নয়, সূর্যলোক, চন্দ্রলোকের মত পাতালও একটি লোক। পাতাল লোকের বাসিন্দাদেরও প্রচুর ভোগের ঐশ্বর্য আছে। পাতাল বলতে অনেকের ধারণা নরক, তা কিন্তু কখন নয়।

বলাবলেপদথ চেদ্ ভবন্তো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
তদাগচ্ছত তৃপ্যন্তু মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ।।২৭
যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্।
শিবদূতীতি লোকেঽস্মিংস্ততঃ সা খ্যাতিমাগতা।।২৮
তেঽপি শ্রুত্বা বচো দেব্যাঃ শর্বাখ্যাতং মহাসুরাঃ।
অমর্ষাপূরিতা জগ্মুর্যতঃ কাত্যায়নী স্থিতা।।২৯

আর যদি তা না করে, অহঙ্কার আর দর্প বশতঃ যদি তোমরা যুদ্ধ করতে চাও, তাহলে এসো, এসে যুদ্ধ কর আর আমার যোগিনী শিবারা তোমাদের কাঁচা মাংস খেয়ে তৃপ্তি লাভ করুক। মা এখানে অসুরদেরও একটা সুযোগ দিলেন যাতে কোন রকম সংহার না হয়ে অসুররা জীবিত অবস্থায় পাতাললোকে ফিরে যেতে পারে।

বলছেন এই যে ভগবান শিবকে দূত রূপে পাঠানো হল, সেইজন্য জগতে তাঁর নাম হয়ে গেল শিবদূতী। শিবদূতী গিয়ে শুম্ভকে সন্দেশ দিয়েছেন, তোমরা তোমাদের পাতাললোকে চলে যাও আর দেবতারা স্বর্গে রাজত্ব করুক। ভগবান শিবের মুখে সব কথা শুনে শুম্ভ ক্রোধে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে কাত্যায়নী দেবী যেখানে ছিলেন সেখানে গেলেন। তখন বলছেন –

ততঃ প্রথমমেবাগ্রে শরশক্ত্যৃষ্টিবৃষ্টিভিঃ।
ববর্ষুরুদ্ধতামর্ষাস্তাং দেবীমমরারয়ঃ।।৩০

সা চ তান্ প্রহিতান্ বাণাঞ্ছূলচক্রপরশ্বধান্।
চিচ্ছেদ লীলয়াধ্মাতধনুর্মুক্তৈর্মহেষুভিঃ।।৩১

তস্যাগ্রতস্তথা কালী শূলপাতবিদারিতান্।
খট্বাঙ্গপ্রোথিতাংশ্চারীন্ কুর্বতী বাচরৎ তদা।।৩২

তখন দেবতাদের শত্রু অসুররা প্রথমেই দেবীর প্রতি শর, শক্তি ও খড়্গ ইত্যাদি অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল। তখন দেবীও যেন খেলার ছলে অতি অনায়াসে ধনুকের টঙ্কার দ্বারা আর সেই ধনুকের তীক্ষ্ণ তীর দিয়ে অসুরদের সব নিক্ষিপ্ত অস্ত্রগুলোকে কেটে ফেললেন। তারপর সেই মা কালী, যে মা কালীর চেহারা আগে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি শুম্ভের সামনেই অসুরদের শূল দিয়ে বিদীর্ণ করতে লাগলেন আর খট্বাঙ্গ দিয়ে অসুরদের প্রহার করতে করতে রণক্ষেত্রে বিচরণ করতে লাগলেন। কিন্তু আরও মজার ব্যাপার হল –

কমণ্ডলুজলাক্ষেপহতবীর্যান্ হতৌজসঃ।
ব্রহ্মাণী চাকরোচ্ছত্রূন্ যেন যেন স্ম ধাবতি।।৩৩

ব্রহ্মার শক্তি হলেন ব্রহ্মাণী। ব্রহ্মা কখন যুদ্ধ করেন না, তিনি স্রষ্টা। ব্রহ্মাণীর হাতে একটি কমণ্ডলু আছে আর তাতে মন্ত্রপূতঃ জল আছে। তিনি সেই মন্ত্রপূতঃ জলকে কমণ্ডলু থেকে নিয়ে অসুরদের উপর ছিটিয়ে দিচ্ছেন। ছিটিয়ে দেওয়ার ফলে অসুরদের *হতৌজসঃ*, অসুরদের যে ওজস অর্থাৎ তেজ নিস্তেজ হয়ে যেতে লাগল। মানুষ যা কিছু করে সব করছে কিসের জোরে? ভেতরে যে তেজ আছে সেই তেজের জন্যই সব কিছু করতে পারছে। কোন লোককে যদি শেষ করে দিতে হয় তাহলে আপনি আগে তার তেজকে শেষ করে দিন, এরপর তার সব কিছু থাকতেও সে শেষ হয়ে যাবে। তার হয়তো প্রচুর টাকা-পয়সা আছে, প্রচুর লোকবল আছে, খুব বুদ্ধি আছে, প্রচুর শক্তি আছে, কিন্তু তার তেজকে যদি শেষ করে দেওয়া হয়, তার আর কিছু করার থাকবে না, ওখানেই সে শেষ। আমাদের সবারই জীবন চলে তেজের উপর। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, একজন বক্তা খুব সুন্দর অলঙ্কৃত ভাষায় ভাষণ দিচ্ছে, কথাগুলো মুখ থেকে যখন বেরোচ্ছে মনে হবে যেন খই ফুটছে, শুনতে কত ভালো লাগছে, কিন্তু আপনার মনে কোন দাগ কাটছে না, আবার আরেকজন বক্তা ভাষণ দিচ্ছেন, তাঁর ভাষাতে কোন অলঙ্কার নেই কিন্তু প্রত্যেকটি কথা আপনার হৃদয়কে যেন স্পর্শ করে যাচ্ছে। অত দূর যেতে হবে না, ঠাকুরের কথাগুলো দেখুন, কত সহজ সরল ভাষায় বলছেন, আর অন্য দিকে তখনকার সময় যাঁরা বড় বড় বক্তা ছিলেন, তাঁদের বক্তৃতা, তাঁদের লেখা প্রবন্ধগুলোর সাথে ঠাকুরের ভাষাতে কত তফাৎ। যিশুর ভাষা কত সহজ সরল। কিন্তু ঠাকুরের কথা, যিশুর কথা সবার হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। এর কারণ কি? এনাদের কথার পেছনে ওজ ছিল।

ব্রহ্মচর্যের কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী বলছেন, যাঁরা ব্রহ্মচর্য পালন করেন তাঁদের ওজ বৃদ্ধি পায়। যদিও স্বামীজী ব্রহ্মচর্যের ব্যাপারে যা বলছেন এটা স্বামীজীর নিজস্ব মত, আমাদের শাস্ত্রের পরম্পরার যে মত সেটাই স্বামীজী অন্য আঙ্গিকে বলছেন। ওজের বৃদ্ধি হ্রাস নির্ভর করে মনের যে কোন আবেগের নিয়ন্ত্রণের উপর। মনের আবেগগুলি যার যত নিয়ন্ত্রণে থাকবে তার তত ওজ বৃদ্ধি পাবে। ক্রোধও মনের একটা আবেগ, ক্রোধ দেখানোটা ওজের মধ্যে আসে না। মহাভারতে যুধিষ্ঠির এক জায়গায় দ্রৌপদীকে বলছেন – লোকেরা ভুল করে ক্রোধকে মনে করে তেজ। দ্রৌপদী আসলে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন যে আপনার মধ্যে তেজ নেই। তখন যুধিষ্ঠির এই কথা বলেছিলেন। অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা ক্রোধকে মনে করে তেজ। ক্রোধ আর তেজ দুটো আলাদা। উল্টে ক্রোধ

তেজকে নাশ করে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এগুলোকে তাই ষড় রিপু বলা হয়। যে কোন একটি রিপুই তেজকে নাশ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কর্ণের সাথে যখন অর্জুনের যুদ্ধ হতে যাচ্ছে, তখন যুধিষ্ঠির গিয়ে শল্যকে বলছেন – মামা! আপনি আমাকে বর দিয়েছিলেন, পরিস্থিতি সেরকম হলে যুদ্ধে আপনি আমাদের সাহায্য করবেন, সেই সময় এখন এসে গেছে। আগামীকাল অর্জুনের সাথে কর্ণের যুদ্ধ হতে যাচ্ছে, কর্ণের তেজকে আপনার নাশ করে দিতে হবে। কী ভাবে নাশ করতে হবে? কর্ণকে রাগিয়ে দিতে হবে। কারুর তেজ নাশ করতে হলে শুধু ওকে রাগিয়ে দিলেই হবে, রেগে গেলে ওর তেজ নাশ হয়ে যাবে। ঠিক তাই হল, পরের দিন শল্য কর্ণকে এমন এমন বিদ্রূপ করতে শুরু করে দিল যে কর্ণ রেগে উত্তেজিত হয়ে গেল। মহাভারতে এই অংশটা সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। শল্য শুধু বলে যেতে লাগলেন তুমি অর্জুনের সঙ্গে পারবে না। একই কথা শুনে শুনে কর্ণ এত রেগে যাচ্ছে সেও শল্যকে ছাড়বে না। এরপর দুজন দুজনদের দেশের মহিলাদের চরিত্র নিয়ে বিদ্রূপ করতে শুরু করে দিয়েছেন। শেষে কর্ণ এত রেগে গেছে যে, শল্যকে বলছে অর্জুনকে তো পরে বধ করা যাবে আগে আপনাকেই আমি বধ করছি। ওখানেই কর্ণের সব তেজ শেষ হয়ে গেল।

ঠিক তেমনি ক্রোধের মত কামও এমনই এক দোর্দণ্ড শক্তি যে, সে একাই সব তেজকে নাশ করে দিতে পারে। রাবণ হল এর জ্বলন্ত উদাহরণ। কাম রাবণকে এমন ভাবে গ্রাস করে নিয়েছে যে ওতেই রাবণের সব তেজ নষ্ট হয়ে গেল। কামের মোহে এমন ভাবে হারিয়ে গেছে যে, রাবণ সেখান থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারল না। আপনার সাথে এমন কোন লোকের যদি শত্রুতা হয়ে যায়, সে হয়ত আপনার থেকে টাকা-পয়সা, বিদ্যা সব দিক দিয়ে বলবান, এবার তাহলে দেখুন এই ছটি রিপুর মধ্যে কোন রিপুটা তার সব থেকে দুর্বল। কারণ সে হয়ত একটুতেই রেগে নাও যেতে পারে। শরৎ মহারাজের ভেতর কোন রাগ ছিল না। ব্রহ্মজ্ঞানী ছাড়া কোন মানুষ নেই যে এই ছটি রিপুর মধ্যে কোন একটিতে তার দুর্বলতা থাকবে না। আপনাকে খুঁজতে হবে কোন রিপুতে আপনার শত্রুর বিশেষ দুর্বলতা আছে, এবার ওকে শুধু ওই রিপুকে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য টোপ খাইয়ে যেতে হবে। ওই রিপুতে গিয়ে এবার সে ফাঁসবেই ফাঁসবে। ফেঁসে যাওয়া মানে তার তেজটাও নাশ হয়ে গেল।

তেজ বৃদ্ধি করার দুটো উপায়, সংযম আর ঈশ্বরে নির্ভরতা। ঠাকুর একটা ঘটনা বলছেন, সেই সময় হনুমান সিং নামে একজন পালোয়ান ছিল। মুলতান দেশ থেকে এক বড় মুসলমান পালোয়ান এসেছে। তার সাথে হনুমান সিংএর কুস্তি হবে। হনুমান সিং দেখল লোকটির সঙ্গে কুস্তিতে পারবে না। তারপর সে অনেক দিন ধরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যাচ্ছে আর খুব সংযমিত জীবন যাপন করে যাচ্ছে। এতেই হনুমান সিংএর ওজ বেড়ে গেছে। তার প্রতিদ্বন্দ্বীর ওজ কমে যায়নি, অপরের ওজ সে কমাবে কি করে! কিন্তু হনুমান সিংএর ওজ বেড়ে গেছে। সবাই জানত হনুমান সিং এর সাথে পারবে না। কিন্তু যেদিন লড়াই হল সেদিন হনুমান সিং জিতে গেল। আমাদের মনে হতে পারে যে, কুস্তির সঙ্গে এর কি সম্পর্ক আছে। শুধু কুস্তি নয়, সব কিছুর সাথে সম্পর্ক আছে। ওজ সহজ ভাষায় হল মনের শক্তি। একটা বাচ্চাকে তার মায়ের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিলে বাচ্চার ভেতরের তেজটা কমে যাবে। মায়ের কাছে রেখে দিলে তেজের মাত্রাটা বেড়ে যাবে। এটাই কোন ইয়ং ছেলে যখন তার বান্ধবীর সঙ্গে থাকে তার তেজের মাত্রাটা অনেক উপরে চলে যাবে। কোন ছেলে যদি কোন মেয়ের সঙ্গে থাকে তখন তার সাথে কখন আজেবাজে কথা বলতে যাওয়া উচিত হবে না। তখন তেজ তার বিরাট, যে কোন ঝামেলা করে দিতে পারে। যখন বয়স হয়ে যায়, তখন স্ত্রী, পুত্র, নাতিপোতাদের সাথে থাকলে তার তেজ থাকবে। বৃদ্ধ মানুষ কোন কারণে যদি একাকী হয়ে যায়, স্ত্রী যদি মারা যায়, ছেলে-মেয়েরা যদি আলাদা হয়ে যায়, তার তেজটা নষ্ট হয়ে একেবারে ভেঙে পড়বে। এগুলো হল তেজের উৎস। কিন্তু তেজের আসল উৎস হল ভগবান, ভগবানের উপর যে নির্ভর করে আছে তার তেজ বৃদ্ধি হবে। পূজা-পাঠ করার পর বা জপ-ধ্যান করার পর যখন বেরিয়ে আসে তার চেহারার চাকচিক্যটাই অন্য রকম হয়ে যায়। ভগবানের উপর নির্ভরতার বাইরে আরেকটা সহজ পথ হল, যেটা শারীরিক ক্রিয়াদির দ্বারা বাড়ানো যায়, জগন্নাথের আটকে প্রসাদ, গঙ্গাজল, তুলসী পাতা রোজ নিয়মিত খেলে তেজ বেড়ে যাবে। গঙ্গাজলে একটু আচমন করে ওঁ অপবিত্রো বা পবিত্রঃ সর্বাবস্থান গতঃ বলে জল ছিটিয়ে দিলে তেজ বেড়ে যাবে, যে অবস্থায় যা কিছু হয়েছে সব পবিত্র হয়ে যাবে, সব অপবিত্র জিনিষ পবিত্র হয়ে যাওয়া

মানে এবার আপনার তেজ বেড়ে গেল। যদি জল ছিটিয়েই তেজ বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে তাহলে উল্টো ভাবে অপরের তেজটা কমিয়েও দেওয়া যেতে পারে। ব্রহ্মাণী এখানে ঠিক তাই করছেন। ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী এখানে উল্টোটা করলেন। মন্ত্র এমন করে নিলেন তাতে যার তেজ আছে তার তেজটা কমে যাবে। তেজ যেমন বাড়িয়ে দেওয়া যায় আবার তেজ কমিয়েও দেওয়া যায়। এখানে নর্দমার জল এনে যদি একটু ছিটিয়ে দেওয়া হয় আমাদের সবার তেজ সঙ্গে সঙ্গে কমে যাবে। ব্রহ্মাণী নোংরা কিছু ছিটাচ্ছেন না, তিনি মন্ত্রপূতঃ জল এনে ছিটিয়ে দিচ্ছেন। মুহুর্তের মধ্যেই একজনের তেজকে যেমন বাড়িয়ে দেওয়া যায় আবার মুহুর্তের মধ্যে তেজ কমিয়েও দেওয়া যায়। ব্রহ্মাণী ব্রহ্মার শক্তি তাই তিনি হিংসাতে কখন প্রবৃত্ত হবেন না। তিনি অস্ত্র ব্যবহার করবেন না, তিনি শুধু জল ছিটিয়ে অসুরদের তেজকে নাশ করে দিচ্ছেন। তেজ শেষ হয়ে গেছে, এখন পড়ে আছে শুধু দৈহিক বল। দৈহিক বল দৈহিক বলের সাথে লড়াই করবে, এর কোন দামই নেই।

ব্রহ্মাণী শুধু জল ছিটিয়ে যাচ্ছেন, যার শরীরে জলের ছিটা পড়ছে তার তেজ শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অসুরদের সংখ্যা এত বিশাল ছিল যে সবার গায়ে তো জলের ছিটা পৌঁছাতে পারছে না। এখানে তেজ বাড়ানো আর তেজ কমানোটা দেখান হল। তেজ বা ওজ বাড়ানো ব্যাপারটা যদি জানা থাকে তখন বুঝবেন তেজটা কমে যায় কি করে। যেমন ব্রহ্মচর্য পালন করে, ষড়রিপুকে সংযম করে ওজ বাড়ানো যায় তেমনি গঙ্গাজল ছিটিয়ে, তুলসী পাতা খেয়ে, যার যেমন উপাচার আছে সেই উপাচার পালন করে তেজ বাড়ানো যায়। যেমন গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলে অপবিত্রকে পবিত্র বলে মনে করে, আচমন করলে যেমন পবিত্র মনে করে, ঠিক তেমনি দিব্য শক্তি দিয়ে জল ছিটিয়ে দিলে অপরের তেজ কমিয়ে দেওয়া যায়। চণ্ডীতে ব্রহ্মাণী যেভাবে জল ছিটিয় অসুরদের ওজ নাশ করছেন, এই জিনিষটাই পরের দিকের কাহিনীগুলিতে খুব সমাদৃত হয়ে গেছে। যেমন কোন সাধুবাবা রেগে গিয়ে জল ছিটিয়ে অভিশাপ দিয়ে বললেন পুনর্মুশিক ভব, সঙ্গে সঙ্গে সে ইঁদুর হয়ে গেল। আসলে এভাবেই শাস্ত্রের ছোট ছোট জিনিষগুলো দেশের সমস্ত লোকের মানসিকতার মধ্যে বসে যায়। এখান থেকে যেমন সবার মানসিকতা তৈরী হয়ে গেল যে, কাউকে শুদ্ধ করতে হলে মন্ত্রপূতঃ জল ছিটিয়ে দাও, আর মন্ত্রটা পাল্টে ছিটিয়ে দিলে তার তেজ নাশ হয়ে যাবে, এমনকি তার মানব শরীরটাই শেষ হয়ে যাবে। ব্রহ্মাণীর সাথে মায়ের অন্যান্য যে শক্তি আছে তাঁরাও অন্য ভাবে অসুরদের সঙ্গে লড়াই করছেন –

মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন তথা চক্রেণ বৈষ্ণবী।
দৈত্যান্ জঘান কৌমারী তথা শক্ত্যাতিকোপনা।।৩৪

ঐন্দ্রীকুলিশপাতেন শতশো দৈত্যদানবাঃ।
পেতুর্বিদারিতাঃ পৃথ্ব্যাং রুধিরৌঘপ্রবর্ষিণঃ।।৩৫

শিবের শক্তি মাহেশ্বরী ত্রিশূল নিয়ে আর বিষ্ণুর বৈষ্ণবী শক্তি চক্র নিয়ে, কার্তিকেয়র শক্তি কৌমারী দৈত্যদের বিনাশ করতে লাগলেন। ইন্দ্রের শক্তি ঐন্দ্রী তাঁর বজ্র দিয়ে এমন প্রহার করতে শুরু করলেন যে শত শত দৈত্যসৈন্যদের শরীর বিদীর্ণ হয়ে যেতে লাগল, তাদের শরীর থেকে রক্তের ধারা বেরিয়ে আসছে, সেই রক্তধারার মধ্যেই সৈন্যরা ভূমিশয্যা গ্রহণ করছে। দেবতাদের মধ্যে সবার উপরে আছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ, দেবাসেনাপতি কার্তিকেয় আর দেবতাদের রাজা ইন্দ্র।

তুণ্ডপ্রহারবিধ্বস্তা দংষ্ট্রাগ্রক্ষতবক্ষসঃ।
বরাহমূর্ত্যা ন্যপতংশ্চক্রেণ চ বিদারিতাঃ।।৩৬

নখৈর্বিদারিতাংশ্চান্যান্ ভক্ষয়ন্তী মহাসুরান্।
নারসিংহী চচারাজৌ নাদাপূর্ণদিগম্বরা।।৩৭

চণ্ডাট্টহাসৈরসুরাঃ শিবদূত্যাভিদূষিতাঃ।
পেতুঃ পৃথিব্যাং পতিতাংস্তাংশ্চখাদাথ সা তদা।।৩৮

ইতি মাতৃগণং ক্রুদ্ধং মর্দয়ন্তং মহাসুরান্।
দৃষ্ট্বাভ্যুপায়ৈর্বিবিধৈর্নেশুর্দেবারিসৈনিকাঃ।।৩৯

তেত্রিশ থেকে সাঁইত্রিশ এই পাঁচটি মন্ত্র খুবই ব্যতিক্রমী মন্ত্র। চণ্ডী ছাড়া এই ধরণের comprehensive idias of Indian Spiritual Tradition অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। হিন্দুদের দেবতাদের দিক থেকে গুরুত্বের বিচারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ সবার উপরে, এর নীচে আসছে দেবতাদের সেনাপতি কার্তিকেয় আর দেবতাদের রাজা ইন্দ্র – এদের সবারই বর্ণনা এখানে পর পর এসে গেছে। কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ও মজার ব্যাপার হল, ভগবান বিষ্ণুর শক্তিতে বা বিষ্ণুর অংশে যাঁরা অবতার হন, বিশেষ করে বরহাবতার, নৃসিংহাবতারের মত নামকরা অবতারদের সবার শক্তির বর্ণনা এই কটি মন্ত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। দেবতাদের ধারণা আর অবতারের ধারণা এক জায়গাতে এসে মিলিত হয়েছে। আগে আগে শক্তির বর্ণনা যেমন থাকার তেমন আছে, কিন্তু এখানে তাঁরা সবাই ক্রিয়াশীল। কি রকম ক্রিয়াশীল? বারাহীর মুখের আঘাতেই অনেক অসুর বিনষ্ট হয়ে গেল, বারাহীর দাঁতের অগ্রভাগ দিয়ে বহু অসুরের বুক চিরে গেল আর বাকি অনেক অসুর মায়ের চক্রের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আর শিব যখন দূত হয়ে শুম্ভকে খবর দিয়েছিলেন, সেখান থেকে শিবের যে বিশেষ শক্তি বেরিয়ে এসেছে সেই শিবদূতি এমন অট্টহাস করছেন যে তাতেই অনেক অসুর মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, মাটিতে পড়তেই দেবী সেই অসুরগুলোকে ভক্ষণ করে নিচ্ছেন। এইভাবে ক্রুদ্ধা মাতৃকাগণ বিভিন্ন ভাবে অসুরদের মর্দন করতে থাকাতে সব অসুরসৈন্যরা চারিদিকে পালাতে শুরু করে দিয়েছে। মধু কৈটভ বধের সময় ভগবান বিষ্ণুর মধ্যে সাক্ষাৎ শক্তিকে দেখা গেছে, তারপর মহিষাসুরকে বধ করার জন্য যখন প্রার্থনা করা হয়েছে তখন সেই শক্তি আবির্ভূতা হয়েছেন, তৃতীয় ক্ষেত্রে এখানে এসে সেই শক্তিই আরও বিস্তার লাভ করে গেছে।

দেবীর এই আটজন শক্তিকে এখানে মাতৃকাগণ বলছেন। আগেকার দিনে মাতৃকা পূজার প্রচলন ছিল। এখনও শীতলামাতার পূজাদির প্রচলন আছে, এগুলোকেই মাতৃকা পূজা বলে। আচার্য শঙ্কর সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে গীতার শ্লোক *যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াহন্বিতাঃ*, আস্তিকপূর্বক ভক্তি সহকারে অন্যান্য দেবতাদের যে পূজা করা হয় সেখানে তারা অজ্ঞানে আমারই পূজা করে, এই শ্লোকের উপর ভাষ্য লিখতে গিয়ে আচার্য অন্যান্য দেবতাদের কথা বলতে গিয়ে মাতৃকাগণাদির কথাও উল্লেখ করেছেন। ভগবান বলছেন এই মাতৃকাদির পূজাও যারা করে সেই পূজা আমার কাছেই আসে। কারণ চৈতন্য রূপে ভগবানই একমাত্র আছেন। পণ্ডিতরা পুরাণাদির কথা বলতে গিয়ে বলেন অমুক সময়ে এই পুরাণ রচিত হয়েছে। রচনা যে সময়েই হয়ে থাকুক না কেন, এই ভাব ভারতে চিরদিনই ছিল। আমরাও অনেক সময় দেখি কোন এক সময় কোন এক দেবীর নাম খুব বেশি করে উপরে চলে আসে। যেমন কয়েক বছর আগে সন্তোষীদেবীর পূজা খুব জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিল। কোন এক সিনেমাতে সন্তোষী মায়ের কিছু দেখাবার পর থেকে সবাই সন্তোষী মায়ের পূজা করতে শুরু করে দিল। কিন্তু একটা সময়ের পর থেকে ধীরে ধীরে এইসব পূজার প্রভাবটা কমতে শুরু করে।

মাতৃকাগণের পূজা বা বিভিন্ন রূপে শক্তি আরাধনার ভাবধারা ভারতে চিরদিনই ছিল। কিন্তু আচার্য শঙ্কর মাতৃকাগণের পূজাকে বেশি প্রাধান্য দেননি। চণ্ডীতেই প্রথম দেখানো হচ্ছে যে এই মাতৃকাগণ মায়েরই অংশ, মায়ের শরীর থেকেই এনারা বেরিয়েছেন। কোন সাধক কবি যদি কোন দেবীর বর্ণনা করে দেন, তাঁর অনুগামীরা কিছু দিন সেই দেবীর পূজা করবে ঠিকই কিন্তু এই পূজা চিরস্থায়ী ভাবে বেশি দিন চলতে পারবে না। ধর্ম এমনই একটি জিনিষ, আধ্যাত্মিক উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত কেউ যদি কিছু ধর্মীয় ভাবকে নিয়ে আসেন, সেই ভাব বেশি দিন সমাজে চলতে পারবে না। বুদ্ধির জোরে, কবিত্বের জোরে কোন ধর্মীয় জিনিষ চলবে না। এর খুব জ্বলন্ত উদাহরণ রূপে আকবরের প্রবর্তিত নতুন ধর্ম 'দিনে ইলাহির' নাম করা যেতে পারে। আকবর মারা যাবার পর দেখা গেল মাত্র তিন জন এর অনুগামী। কেশব সেন ও আরও কয়েকজন মিলে ব্রাহ্ম সমাজ তৈরী করলেন, কিন্তু কবে যে ব্রাহ্ম সমাজের চেহারাটা আমাদের মন থেকে হারিয়ে গেল টেরই পাওয়া গেল না। সাধক কবি বা বুদ্ধির অনুশীলনকারি ব্যক্তিরা যে নতুন চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আসেন, সনাতন ধর্মে সেগুলি বেশি দিন চলতে পারে না। অনেক মনে করে মার্কণ্ডেয় পুরাণ দশম শতাব্দীতে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে, হতে পারে আবার নাও হতে পারে। কিন্তু চণ্ডীতে যে মাতৃকাগণের একটা ধারণা নিয়ে আসা হয়েছে, এই ধারণা অনেক প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। যেসব ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় ধারণা সমূহ প্রাচীন কাল থেকে সমাজের বুকে চলে আসছে, সেগুলোকেই তুলে এনে চণ্ডীতে কাহিনীর মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বলছেন মাতৃগণ যেভাবে অসুরদের বিনাশ করতে

শুরু করেছেন, ওই দেখে অসুররা সব পালাতে শুরু করেছে। অসুর সৈন্যদের পলায়নপর দেখে যুদ্ধক্ষেত্রে এক মহাসুর এসে হাজির হয়েছে –

পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ মাতৃগণার্দিতান্।
যোদ্ধুমভ্যযযৌ ক্রুদ্ধো রক্তবীজো মহাসুরঃ।।৪০

প্রথম থেকে যদি লক্ষ্য রাখা হয় তাহলে দেখা যাবে একটার পর একটা যত সেনাপতিরা আসছে তাদের ক্ষমতা তত বাড়ছে। সেনাপতিরা একে একে শেষ হয়ে যখন রাজা আসছে তখন সে আরও শক্তিমান রূপে আবির্ভূত হচ্ছে। মুঘল আমলে দিল্লীর বাদশা যখন কোথাও যুদ্ধের জন্য সেনা পাঠাতেন তখন তার সাথে একজন বড় সেনাপতিকে পাঠাতেন। কিন্তু রাজা যদি নিজে যুদ্ধে নামেন তখন সেটা মারাত্মক ব্যাপার, তখন সে বিরাট সৈন্য নিয়ে চলত। এখানে মাতৃকাদের দ্বারা নিষ্পেশিত হয়ে সৈন্যদের পালাতে দেখে এবার রক্তবীজ নামে এক মহাসুর এসেছে মাতৃকাগণদের সাথে যুদ্ধ করতে।

রক্তবিন্দুর্যদা ভূমৌ পতত্যস্য শরীরতঃ।
সমুৎপততি মেদিন্যাস্তৎপ্রমাণস্তদাসুরঃ।।৪১

রক্তবীজের বৈশিষ্ট্য হল, রক্তবীজের শরীর থেকে এক বিন্দু রক্ত যদি মাটিতে পরে যায়, যদিও *ভূমৌ* বলছেন কিন্তু রক্তবীজের শরীরের এক বিন্দু রক্ত যদি যে কোন আধার পেয়ে যায় তাহলে সেই রক্তবিন্দু থেকে আরেকটি রক্তবীজ দাঁড়িয়ে যাবে, যে সব দিক দিয়ে আসল রক্তবীজের মতই সমান শক্তিশালী হবে। এই যে রক্তবীজ তৈরী হল, তারও শরীর থেকে যদি এক বিন্দু রক্ত মাটিতে পড়ে সেই রক্তবিন্দু থেকে আরেকটি মহা শক্তিশালী রক্তবীজ তৈরী হয়ে যাবে। স্বামীজী ভারতের গরীব জনসংখ্যার নামই দিয়েছিলেন রক্তবীজ – এরা সবাই রক্তবীজের সন্তান। অসুরের রক্তে নয়, আসলে ভারতে দরিদ্র জনসংখ্যার প্রাণশক্তি এত বেশি যে এই শক্তিকে শেষ করা যায় না। আমাদের মনের বৃত্তির একটা বৃত্তিকে দাবাতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আরও দশটা বৃত্তি তৈরী হয়ে যাবে। ওর মধ্যে একটা বৃত্তিকে কাটুন, সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে আরও দশটা বৃত্তি বেরিয়ে আসবে। জপ-ধ্যান করতে বসলে এই একই ব্যাপার ঘটে। দ্বিতীয়তঃ আরেকটা ব্যাপার এর সাথে জড়িয়ে আছে, তা হল বীজ। আমেরিকা থেকে এক সময় ভারতে গম আসত, সেই গমের সাথে পার্থেনিয়াম জাতীয় গাছের বীজও এসেছিল। পার্থেনিয়ামের বীজের কুপ্রভাব মারাত্মক, এখনও এর কুপ্রভাব থেকে ভারত মুক্ত হতে পারেনি। প্রায় তিরিশ চল্লিশ বছর আগে এসেছিল কিন্তু এখনও পার্থেনিয়াম গাছকে নাশ করা যাচ্ছে না, এমনই এর প্রাণশক্তি। এর বীজ যেখানেই পড়ুক, উর্বর অনুর্বর যে মাটিই হোক একটি গাছ যদি হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে সেই গাছের বীজ থেকে আরও দশটা গাছ হয়ে যাবে, তাদের থেকে আবার আরও গাছ হয়ে পুরো এলাকাটা পার্থেনিয়ামের জঙ্গল হয়ে যাবে। একদিকে মাতৃগণের ধারণা যেমন অনেক প্রাচীন তেমনি এই কাহিনী যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা বাস্তব জীবনে অনেক কিছুকে দেখে রক্তবীজের এই ধারণাটা এখানে কাহিনীর মাধ্যমে প্রয়োগ করেছেন। মনের মধ্যে যে নানা রকম অশান্তি, একটা অশান্তিকে শান্ত করতে গিয়ে আরও হাজারটা অশান্তিকে ডেকে আনছি, এই ব্যাপারটা মায়ের শক্তি ছাড়া হয় না। এই রকম বিভিন্ন জিনিষকে পর্যবেক্ষণ করে রচয়িতাদের মনে রক্তবীজের ধারণাটা এসেছে।

যদিও এখানে বলছেন *রক্তবিন্দুর্যদা ভূমৌ*, মাটিতে এক বিন্দু রক্ত পড়লে সেই রক্তবিন্দু থেকে আরেকটি রক্তবীজ দাঁড়িয়ে যাবে, কিন্তু আসলে যে কোন আধার পেলেই রক্তবীজ তৈরী হয়ে যাবে। কারণ একটু পরেই বর্ণনা আসবে যেখানে বলবে, মায়ের মুখে রক্ত পড়ছে তাতে মায়ের জিহ্বাতেই রক্তবীজের জন্ম হয়ে যাচ্ছে। ইদানিং ক্লোনিংএর যে চিন্তা-ভাবনা এসেছে, একটা সেল থেকে পুরো একটা শরীর দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এখানে সেইভাবে ভাবা হয়নি, এখানে শরীরের মধ্যেকার রক্তকে বীজরূপে ভাবা হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনীগুলো যিনি রচনা করেছিলেন, তিনি হয়তো কিছু ভেবে বা কল্পনা করে রচনা করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তিকালে এই ধরণের বিচিত্র ধারণা গুলিকে বিভিন্ন মননশীল মানুষ বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন অনেকে ব্যাখ্যা করেন, মন কামনা-বাসনার আগাছায় ভরে আছে, একটা কামনা থেকে আরও দশটা কামনার জন্ম নিচ্ছে, কামনা-বাসনার এই

আগাছাকে প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তি ছাড়া কখনই নাশ করা যাবে না। ফুলের বাগান করেছেন, ভালো ভালো গাছ লাগিয়েছেন, জল সার দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আগাছাগুলো ওই জল ও সার টেনে নিয়ে তরতর করে বাড়তেই থাকবে। এদের প্রাণশক্তি এত বেশি যে ধীরে ধীরে অন্য গাছগুলোকেও শেষ করে দেয়।

স্বামীজী যে রক্তবীজের সন্তান বলছেন, তিনি খারাপ অর্থে বলছেন না, প্রাণশক্তির কথা বলতে গিয়ে বলছেন। তাই না, বলছেন, এক মুঠো ছাতু খেয়ে জগৎ জয় করে নেওয়ার ক্ষমতা এদের মধ্যে আছে। চণ্ডীতে যে রক্তবীজের ধারণা নিয়ে আসা হয়েছে, এখানে সেই প্রাণশক্তিকেই দেখানো হয়েছে, যে প্রাণশক্তিকে দাবানো যায় না। প্রাণশক্তি ভালো মন্দ কোনটাই বোঝে না। একটা বাড়ি তৈরী করার পর সেই বাড়ির উপর অনবরত সূর্যের আলো পড়ছে, বাতাস এসে ধাক্কা মারছে, বাতাসে জলীয় কণা আছে, বৃষ্টির সময় জল পড়ছে, এগুলো সব প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তি নতুন বাড়িকে ক্রমাগত ক্ষয় করে করে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা সবাই প্রাণশক্তির মহাসমুদ্রের মধ্যে বাস করছি। শক্তির এই মহাসমুদ্র থেকে বাঁচার জন্য আমাদের খুব অল্প একটু শক্তি লাগাতে হচ্ছে। পরিমিত খাওয়া-দাওয়া, নিয়মিত প্রাণায়াম আর তার সাথে শরীরের জিন্‌গুলো যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে দুমদাম্ করে যে প্রাণশক্তি অনবরত আমাদের এসে পড়ছে, তাতেই এই প্রাণশক্তি থেকে রক্ষা হয়ে যাচ্ছে।

প্রাণশক্তি দুই রকমের, আমাদের ভাষায় একটাকে Pattern Energy আরেকটাকে Unpattern Energy বলতে পারি। আমরা সবাই Unpattern Energyর মহাসমুদ্রের মাঝখানে পড়ে আছি। এই Unpattern Energyর সঙ্গে লড়াই করার জন্য আমাদের দরকার Pattern Energyর। যদি জিজ্ঞেস করেন Pattern Energy কি রকম হতে পারে, তাহলে এভাবে জিনিষটাকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একজন ইঞ্জিনিয়ার পড়াশোনা করে ইঞ্জিনিয়ারিংএর ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করেছে। সেই জ্ঞান দিয়ে তিনি এক ধরণের বিশেষ সল্যুশান দিয়ে একটা রঙ আবিষ্কার করলেন, এই রঙ যদি বাড়ির দেওয়ালে লাগিয়ে দেওয়া যায় তাহলে পুরো বাড়িটা ঝড়, বৃষ্টি, রোদ থেকে সুরক্ষিত থাকবে। এই যে দুমদাম্ প্রাণশক্তি বাড়ির উপর অনবরত পড়ছে, সেই প্রাণশক্তিকে সামলাবার জন্য দরকার Pattern Energy। আমাদের জীবনটাও হল Pattern Energy আর Unpattern Energyর লড়াই। লড়াইয়ের কিছু নেই, আমরা শক্তির এই মহাসমুদ্রের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে আছি, আর শক্তি আমাদের সব সময় পিষে যাচ্ছে। এই পিষে যাওয়া থেকে বাঁচার জন্য এই শক্তির মহাসমুদ্র থেকেই কিছু শক্তি নিয়ে সেই শক্তিকে Pattern Energyতে convert করে আমাদের লড়াই করতে হচ্ছে। Pattern Energy মানেই ওর মধ্যে একটা knowledge লাগানো আছে। যেমন যিনি ইট তৈরী করছেন, তিনি শিখেছেন কীভাবে ইট বানাতে হয় বা সিমেন্ট কীভাবে বানাতে হয়, ওর মধ্যে একটা knowledge আছে। ওই সিমেন্ট আর ইটকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় সেই knowledgeকে ইঞ্জিনিয়ারদের আয়ত্ত করতে হয়েছে। তার মানে, Unpattern Energyকে কীভাবে Pattern Energyতে convert করতে হয় তার জন্য একটা knowledge দরকার। এই knowledgeর নাম দেওয়া হয়েছে information। আপনি ওই knowledgeকে আত্মস্থ না করেও অপরকে pass on করতে পারেন। আমরা সবাই এক অপরকে সব সময় information pass on করতে থাকি। এভাবেই ইদানিং কালে গড়ে উঠেছে Information Technology। একদিক দিয়ে information আসছে আরেক দিক দিয়ে information বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। ওর মধ্যে আমাদের নতুন করে add করার কিছু নেই। আপনি যদি ওর মধ্যে কিছু meaningful information add করতে চান তখন informationএর value একটু বেড়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু হয় না, সাধারণ ক্ষেত্রে এমনিতে কমে যায়। কিন্তু information flow করতে থাকে। ছোট বয়স থেকে যা কিছু শিক্ষা-দীক্ষা আমরা সবাই পেয়ে আসছি, এর সবটাই হল flow of information। Informationটাও energy, কারণ আমাদের টেলিফোন, মোবাইল ফোন সব Information Technologyর উপর চলছে। Information নিজেই একটা energy, ওই energyটাই informationএ convert হয়, হয়ে সেই convert energy আবার সাহায্য করে Unpatter Energyকে Pattern Energyতে convert করতে। যে জায়গাতে information একটা মেশিনের মত কাজ করে, যেখানে Unpattern Energyকে Pattern Energyতে convert করে তার নাম

Info Energy। যেমন একটা গরু ঘাস খাচ্ছে, ঘাসকে গরু দুধে convert করে দেয়, সেদিক দিয়ে গরুও একটা মেশিন।

আমরা সবাই একটা মেশিন, মেশিন মানে একটা বিশেষ কাজের জন্যই এই মেশিন দাঁড়িয়ে আছে। কি কাজ? এই মেশিন দিয়ে আমরা ঈশ্বর জ্ঞান পর্যন্ত পেতে পারি। একটা গরু সেদিক দিয়ে গোবর আর দুধ দেওয়া ছাড়া আর কিছু দিতে পারবে না। ঠাকুর যে বলছেন মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন, কারণ মানব জীবনটা একটা মেশিন, যেখানে বিশেষ ভাবে info energyকে অনবরত মন্থন করা হচ্ছে। একটা জিনিষের মূল্য কতখানি সেটা নির্ভর করে তার Info Energyর উপর। আপনার info energy যেমন আছে তেমন আপনার দাম। যেমন একটা রকেটের কোন মেশিন যখন খারাপ হয়ে যায় তখন আপনি যতই energy দিতে থাকুন, উল্টোপাল্টা ভাবে দিলে পুরো রকেটটাই নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু যদি অকেজো মেশিনকে কাজে লাগাতে হয় তাহলে একটা Pattern Energy দিতে হবে, কাজে লাগানো মানেই Pattern Energy, Pattern Energyর জন্য দরকার information। তাই যে জিনিষের info energy যত উচ্চমানের হবে সেই জিনিষ তত মূল্যবান হবে। যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে তিনি সব informationকেই পার করে গেলেন, তার মানে তাঁর info energy চরমে চলে গেছে, ওখান থেকে info energyর আর কমা বাড়ার আর কোন প্রশ্নই আসবে না।

প্রাণশক্তি হল পুরোপুরি Unpattern Energy, এই Unpattern Energyর ধর্মই হল সব সময় অনিয়ন্ত্রিত ভাবে দুমদাম্ কাজ করে যাবে, ভালোমন্দের কোন বিচার করবে না। এই Unpattern Energyকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বা আটকানোর জন্য বা নাশ করার জন্য দরকার Pattern Energy। Pattern Energyর চরমতম অবস্থা হল আধ্যাত্মিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিক জ্ঞান অবশ্য কোন energyই নয় পুরো আলাদা জিনিষ। আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে নানান ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, যেমন কোন কিছু থেকে আপনার অসুবিধা হচ্ছে সেই জিনিষ থেকে আপনি দূরে চলে গেলেন কিংবা কিছু ধরণের অনুশীলন করেও মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু রক্তবীজের অবস্থায় পুরো জিনিষটা যদি চলে যায় তখন আর info energy দিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে না, তখন আপনার দরকার beyond energy, যেটা qualititavely different, সেটা হল চৈতন্য সত্তা বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান। এই যে রক্তবীজ, শুম্ভ নিশুম্ভ সব রয়েছে এরা সবাই হল Unpattern Energyর শীর্ষ, শীর্ষ মানে আমরা সব কিছুকে যে দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত, এখানে সব কিছু একটা নিয়মের মধ্যে চলবে, এটা দেবতাদের লোক, এটা অসুরদের লোক, এটা মনুষ্যজাতির লোক, তোমরা এক অপরের লোক দখল করতে চাইবে না, এভাবেই আমরা সব কিছু নিয়মের মধ্যে দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু যখন এ তার জায়গায়, সে ওর জায়গায় অধিকার কায়েম করতে শুরু করে দিল তখনই Unpattern Energyর বন্য খেলা শুরু হয়ে গেল। এবার এই Unpattern Energyকে আটকাতে হলে Pattern Energyকে আনতে হবে। কিন্তু Pattern Energy এই বিশাল Unpattern Energyর সঙ্গে কত দূর লড়াই করবে! একটা সীমিত স্তর পর্যন্তই তার লড়াই করার ক্ষমতা, ওর পরে Pattern Energyকে দিয়ে আর Unpattern Energyর বিরুদ্ধে লড়াই করানো যায় না। সেইজন্য দেবতা আর অসুরদের যত লড়াই হয় সব সময় অসুররাই জয়ী হয়। তখন ভগবানকেই আসতে হয়, তার মানে beyond energy আধ্যাত্মিক সত্তাকে নিয়ে আসতে হয়। যার জন্য দেখা যায় যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে যায় তাঁর কাছে Pattern আর Unpattern সব Energyই গুরুত্বহীন হয়ে যায়। দুদিন ঠিক ভাবে খাওয়া-দাওয়া না করলে কিংবা অতিরিক্ত খাওয়া-দাওয়া করার ফলে দেখা যাবে শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমরা সবাই শক্তির সমুদ্রের মধ্যে পড়ে আছি, এখানে শক্তিগুলো বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের উপর ক্রমাগত আঘাত করে চলেছে। এই আঘাতকে প্রতিহত করার জন্য আমাদের ভেতর থেকে একটা শক্তি দরকার। সেটাও শক্তি, আর এই শক্তি বাইরের শক্তি থেকেই সংগ্রহ করা হচ্ছে, কিন্তু বাইরের শক্তিকে মেশিনের সাহায্যে convert করতে হয়।

একজন রাত্রিবেলা সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল, সাইকেলে আলো ছিল না বলে তাকে পুলিশে ধরেছে। সাইকেল আরোহী তখন পুলিশকে বলছে, চারিদিকে তো আলো জ্বলছেই আমার আলোর আর কি দরকার। পুলিশটি তখন তার সাইকেলের হাওয়া খুলে দিয়েছে। খুলে দিয়ে পুলিশ লোকটিকে বলছে চারিদিকে তো এত

বাতাস রয়েছে চাকাতে আর বাতাসের দরকার নেই। বাতাস চারিদিকেই আছে কিন্তু ওই বাতাসকে চাকার মধ্যে বিশেষ ভাবে কাজে লাগিয়ে আপনাকে সাইকেল চালাতে হবে। ঠিক তেমনি আমাদের জীবনে যত আগাছা আছে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বিশেষ ভাবে আপনাকে একটা Pattern Energy দিতে হবে। কিন্তু ওই Unpattern Energy একটা সীমার বাইরে যদি চলে যায় তখন এই Pattern Energy দিয়ে আর কোন Unpattern Energyকে সামলানো যাবে না, একমাত্র আধ্যাত্মিক শক্তি ছাড়া এই সমস্যার সমাধান আর কেউ করতে পারে না।

রক্তবীজ মানে প্রাণশক্তি এখন পুরো wild হয়ে গেছে, এই প্রাণশক্তিকে আর কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা যাবে না। রক্তবীজকে যদিও বা নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিন্তু তার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে শুম্ভ নিশুম্ভ, যাদের শক্তি আরও ভয়ঙ্কর। দেবতাদের সেই ক্ষমতাই নেই যে এই শক্তির লাগাম ধরবে, এখন দরকার আধ্যাত্মিক শক্তি। যাই হোক এই রক্তবীজ এবার যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছে মাতৃগণদের সাথে যুদ্ধ করতে, তখন বলছেন –

যুযুধে স গদাপাণিরিন্দ্রশক্ত্যা মহাসুরঃ।
ততশ্চৈন্দ্রী স্ববজ্রেণ রক্তবীজমতাড়য়ৎ।।৪২

কুলিশেনাহতস্যাশু তস্য সুস্রাব শোণিতম্।
সমুত্তস্থুস্ততো যোধাস্তদ্রূপাস্তৎপরাক্রমাঃ।।৪৩

রক্তবীজ এখন মাতৃগণদের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছে, কিন্তু মাতৃগণরা রক্তবীজের এই বিশেষ ক্ষমতার ব্যাপারে পুরোপুরি অবগত ছিলেন না, জানতেন একজন বড় অসুর। প্রথমে রক্তবীজ গদা দিয়ে ইন্দ্রের শক্তি ঐন্দ্রীর সাথে যুদ্ধ করতে লাগল। ইন্দ্রের প্রধাণ অস্ত্র বজ্র, ঐন্দ্রী দেবীও বজ্র দিয়ে রক্তবীজকে আঘাত করেছেন। রক্তবীজের শরীরে বজ্র চালাতেই যা হয়ে থাকে, যে কোন শরীরে শক্তি সঞ্চালিত হয় একটা তরল পদার্থের ভেতর দিয়ে, গাছের যেমন কষ, জীবজন্তু মানুষের সেটা হল রক্ত, শক্তিকে বহন করার জন্য একটা বাহন দরকার, রক্ত হল তার বাহন। শরীর থেকে এবার প্রচুর রক্তপাত হতে শুরু হয়েছে। রক্ত বেরিয়েই যাচ্ছে। আর সেই রক্তবিন্দু মাটিতে পড়তেই দেখা যাচ্ছে রক্তবীজের মত দেহধারী ও তারই মত পরাক্রমশালি অসংখ্য যোদ্ধা উৎপন্ন হতে থাকল।

এক থেকে বহুর জন্ম এই ধারণাকে আধার করে অনেকেই অনেক কাহিনী দাঁড় করিয়েছেন। হ্যারি পটারের কাহিনীতেও এই জিনিষটাকে ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে ওদের একটা তলোয়ার আছে, সেই তলোয়ারকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। সেই তলোয়ারকে বার করতে হবে। তলোয়ারকে বার করতে গিয়ে তলোয়ারের সুরক্ষার জন্য ওর চারিদিকে সোনার ঘটি রাখা আছে। যেমনি তলোয়ারটা বার করতে গেছে হাত লেগে সোনার ঘটিটা পড়ে ভেঙে গেছে, ভেঙে যেতেই অনেকগুলো সোনার ঘটি দাঁড়িয়ে গেছে আর সব কটি ঘটিই প্রচণ্ড গরম। ওটাকে যখন সামলাতে গেছে তখন দেখছে আরও কটি ঘটি পড়ে গিয়ে ভেঙে গেছে সেখান থেকে আরও অনেক ঘটির জন্ম হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে পুরো ঘরটা সোনার ঘটিতে ভর্তি হয়ে গেছে। ওই ঘটি গুলো এখন গায়ে, হাতে, পায়ে লাগতে শুরু হয়ে গেছে, আর প্রচণ্ডে গরমের ছেঁকায় শরীরের সব অঙ্গে জ্বালা ধরে গেছে। ঘর থেকে যে বেরিয়ে যাবে বেরোতে গিয়ে হাতে পায়ে লেগে আরও কিছু ঘটি ভেঙে যাচ্ছে তার ফলে ঘটি বেড়েই চলেছে। ধীরে ধীরে ঘটির স্তূপেই চাপা পড়ে যেতে শুরু করেছে। এক থেকে বহুর সৃষ্টি হওয়া আর পুরো ব্যাপারটাই খুব বিপজ্জনক, এই ধারণা আমাদের জীবনে খুব কাছাকাছি যেটা দেখা যায় তাহল আগাছা রূপ সংস্কার রাশি আর আমাদের নিজেদের মন।

যাবন্তঃ পতিতাস্তস্য শরীরাদ্ রক্তবিন্দবঃ।
তাবন্তঃ পুরুষা জাতাস্তদ্বীর্যবলবিক্রমাঃ।।৪৪

তে চাপি যুযুধুস্তত্র পুরুষা রক্তসম্ভবাঃ।
সমং মাতৃভিরত্যুগ্রশস্ত্রপাতাতিভীষণম্।।৪৫

যেমন যেমন রক্তবীজের শরীর থেকে যত রক্তের ফোঁটা মাটিতে পড়ছে তেমন তেমন ঠিক তত তারই মত বলবীর্য সম্পন্ন মহাসুর উৎপন্ন হতে থাকছে। এরাও উৎপন্ন হয়ে সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সব অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করে মাতৃকাগণদের সাথে ঘোরতর যুদ্ধ করতে লাগল। কম্প্যুটারে যেমন একটা চিঠি তৈরী করে সেটাকে যত খুশী কপি বানিয়ে দেওয়া যায়। কম্প্যুটারের ভাইরাসগুলোও এই রকম। একটা ভাইরাসে যদি হাত দিয়েছেন আরও একশ খানা ভাইরাস তৈরী হয়ে যাবে। এখানেও একই জিনিষ হচ্ছে। ছবিকে জেরক্স করলে যেমন দেখায় ঠিক তেমনি, এর অস্ত্র যেমন তারও অস্ত্র তেমন। দেবতাদের শক্তি মূর্ত রূপ ধারণ করে যখন মায়ের কাজে সহয়তার করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তখন বর্ণনা করে বলা হয়েছিল, যে দেবতার যেমন শক্তি সেই দেবীর তেমনই শক্তি, যে দেবতার যে অস্ত্র সেই দেবীরও ঠিক সেই অস্ত্র। রক্তবীজও একেবারে ঠিক তাই। দেবতাদের যেমন ক্ষমতা আছে, তাঁদের ভেতর থেকেই তাঁদের শক্তি বেরিয়েছিল, রক্তবীজও এখন সেই ক্ষমতা দেখাচ্ছে। এখানে তার শরীরের একটা ফোঁটা রক্ত থেকে আরেকটা রক্তবীজ তৈরী হয়ে যাচ্ছে। দৈবী আর আসুরিক শক্তির এটাই তফাৎ, ভগবান বিষ্ণুর ওই একটাই বৈষ্ণবী শক্তি বেরিয়েছেন আর রক্তবীজের প্রত্যেকটি ফোঁটা থেকে রক্তবীজ তৈরী হয়ে যাচ্ছে, শুধু তাই না, রক্তবিন্দু থেকে যে রক্তবীজ জন্ম নিচ্ছে তারও রক্তের ফোঁটা মাটিতে পড়লে সেখান থেকেও রক্তবীজ উৎপন্ন হয়ে যাচ্ছে।

পুনশ্চ বজ্রপাতেন ক্ষতমস্য শিরো যদা।
ববাহ রক্তং পুরুষাস্ততো জাতাঃ সহস্রশঃ।।৪৬

বৈষ্ণবী সমরে চৈনং চক্রেণাভিজঘান হ।
গদয়া তাড়য়ামাস ঐন্দ্রী তমসুরেশ্বরম্।।৪৭

বৈষ্ণবীচক্রবিন্নস্য রুধিরস্রাবসম্ভবৈঃ।
সহস্রশো জগদ্ব্যাপ্তং তৎপ্রাণৈর্মহাসুরৈঃ।।৪৮

শক্ত্যা জঘান কৌমারী বারাহী চ তথাসিনা।
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন রক্তবীজং মহাসুরম্।।৪৯

স চাপি গদয়া দৈত্যঃ সর্বা এবাহনৎ পৃথক্।
মাতৃঃ কোপসমাবিষ্টো রক্তবীজো মহাসুরঃ।।৫০

আরও যুদ্ধ হচ্ছে, বজ্রের প্রহারে রক্তবীজের মাথা ফেটে রক্তের ধারা বইতে শুরু করল, সেই রক্ত থেকে হাজার হাজার মহাসুর জন্ম হতে থাকল। বৈষ্ণবী দেবী চক্র দিয়ে রক্তবীজকে আঘাত করলেন, ঐন্দ্রী দেবী তাকে গদা দিয়ে আঘাত করলেন, তাতে রক্তবীজের শরীর থেকে যে রক্তস্রাব হল তা থেকে তার মতন আরও শত শত হাজার হাজার মহাসুর উৎপন্ন হয়ে সমস্ত জগৎ রক্তবীজে ছেয়ে গেছে। এখন এত রক্তবীজ হয়ে গেছে, তাদের উপর মাতৃকাগণ আঘাত করছে, তাদের থেকে আবার হাজার হাজার রক্তবীজ উৎপন্ন হয়ে যাচ্ছে। দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র শক্তী কৌমারী শক্তি অস্ত্র দিয়ে, বারাহী দেবী তরোয়াল দিয়ে এবং মাহেশ্বরী ত্রিশূল দিয়ে রক্তবীজকে আঘাত করলেন। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে রক্তবীজও আলাদা আলাদা ভাবে মাতৃগণদের উপর আঘাত করতে শুরু করেছে। মহাভারতের যুদ্ধে অশ্বত্থামা পাণ্ডবদের উপর বৈষ্ণবী শক্তি প্রয়োগ করেছিল। সেখানেও বৈষ্ণবী শক্তির বৈশিষ্ট্য ছিল, যদি কেউ বৈষ্ণবী শক্তির সাথে লড়াই করতে যায় তখন সেই বৈষ্ণবী শক্তির তেজ আরও বেড়ে যাবে। যত লড়াই করতে যাবে তত সে শক্তিমান হয়ে উঠবে। বৈষ্ণবী শক্তি যখন অর্জুনের কাছে এগিয়ে এসেছে তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন 'অর্জুন! তুমি এক্ষুণি সমস্ত অস্ত্র পরিত্যাগ করে রথ থেকে নেমে মাটিতে এই অস্ত্রকে প্রণাম করে এর শরণাগত হয়ে যাও'। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের আদেশ মান্য করে তাই করলেন। কিন্তু ভীম মানতে চাইছে না, দৈহিক বল বেশি হয়ে গেলে যা হয়, মাথাটা গোঁয়ার গোবিন্দের মত হয়ে যায়, ভীমেরও তাই ছিল। ভীম তাঁর গদা নিয়ে সেই বৈষ্ণবীর সাথে লড়াই করতে শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে বৈষ্ণবী শক্তির তেজ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে ভীমকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। শ্রীকৃষ্ণ তখন জোর করে ভীমকে রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র সব ফেলে দিয়েছে। হাতীর পিঠে, ঘোড়া পিঠে বা রথে যদি কেউ বসে থাকে কিংবা হাতে যদি কোন অস্ত্র থাকে তাহলে ওই তেজ তাকে পুড়িয়ে দেবে, মাটিতে নেমে হাতজোড় করে অস্ত্রের শরণাগত হয়ে গেলে

বৈষ্ণবী শক্তির তেজ আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে যাবে। এখানে রক্তবীজের ক্ষেত্রে কতকটা তাই হচ্ছে, যত রক্তবীজের উপর আক্রমণ হচ্ছে তত সে শক্তিমান হয়ে উঠছে। তখন পরের মন্ত্রে বলছেন –

তস্যাহতস্য বহুধা শক্তিশূলাদিভির্ভুবি।
পপাত যো বৈ রক্তৌঘস্তেনাসঞ্চতশোহসুরাঃ।।৫১

মাতৃকাগণ নিজের নিজের শূল, শক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে রক্তবীজের উপর আঘাত করে যাচ্ছেন। বার বার আঘাতে রক্তবীজের শরীর থেকে রক্তের ধারা নেমে আসছে। ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রক্তবীজে ছেয়ে গেছে। আটচল্লিশ নম্বর মন্ত্রে বলছেন *সহস্রশো জগদ্ব্যাপ্তং তৎপ্রমাণৈর্মহাসুরৈঃ*, সমস্ত জগৎ রক্তজাত মহাসুরে ব্যপ্ত হয়ে গেছে। ভাইরাসগুলোকে যখন কম্প্যুটারে ছাড়া হচ্ছে তখন মুহুর্তের মধ্যে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যাচ্ছে, এই আইডিয়াটাই এখানে দেখানো হচ্ছে। এইসব দেখে পরের মন্ত্রে বলছেন –

তৈশ্চাসুরাসৃক্সম্ভূতৈরসুরৈঃ সকলং জগৎ।
ব্যাপ্তমাসীৎ ততো দেবা ভয়মাজগ্মুরুত্তমম্।।৫২

রক্তবীজের অশুভ শক্তি সারা জগতে ছেয়ে গেছে। ওদের রক্ত বেরোচ্ছে আর সেই রক্ত থেকে রক্তবীজের জন্ম হচ্ছে, তাদের উপর মাতৃকারা অস্ত্র চালাচ্ছে, সেখান থেকে আবার রক্তপাত হচ্ছে, সেই রক্ত থেকে আবার সহস্র সহস্র রক্তবীজ উৎপন্ন হচ্ছে, এইভাবে মুহুর্তের মধ্যে সমস্ত জগৎ রক্তবীজে ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। এই দেখে দেবতারা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন।

তান্ বিষণ্ণান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাহসত্ত্বরা।
উবাচ কালীং চামুণ্ডে বিস্তরং বদনং কুরু।।৫৩

দেবতারা ভীত হয়ে গেছে দেখে মা চণ্ডিকা, মা দুর্গা সেই কালিকা দেবীকে বললেন – *চামুণ্ডে বিস্তরং বদনং কুরু*, হে চামুণ্ডে! তুমি তোমার মুখ আরও বড় করে বিস্তার কর। মা কালিকাকে সর্বগ্রাসী সংহার মূর্তি ধারণ করতে বললেন। মুখ আরও বিস্তার করে কী করতে বললেন?

মচ্ছস্ত্রপাতসম্ভূতান্ রক্তবিন্দূন্ মহাসুরান্।
রক্তবিন্দোঃ প্রতীচ্ছ ত্বং বক্ত্রেণানেন বেগিতা।।৫৪

তুমি তোমার মুখটাকে এত বড় কর যাতে আমি বা মাতৃকাগণ যখন রক্তবীজের উপর অস্ত্র চালাব তখন তার রক্ত যেন মাটিতে না পড়ে তোমার মুখে গিয়ে পড়ে। দেবীর এখন সংহার মূর্তি, আগেই তাঁর রূপের বর্ণনা করা হয়েছে, মনে হচ্ছে পেট বলে তাঁর কিছু নেই, শুধু মুখটাই আছে, সেই মুখ আবার যেন সব কিছুকে গ্রাস করার জন্য সর্বদা হাঁ করে আছে। ওই বিশালাকৃতি মুখ দিয়ে যা কিছু প্রবেশ করছে, ভেতরে যাবার আগেই সব হজম হয়ে যাচ্ছে। কথা কাহিনী যখন তৈরী তখন এভাবেই তৈরী হয়। ভীমের নাম ছিল বৃকোদর, উদর মানে পেট, মানে নেকড়ের পেট, ভীম যা খেত সঙ্গে সঙ্গে হজম হয়ে যেত। সেইজন্য ভীমের পেটে সব সময় খিদে পেয়েই থাকত। অগ্নির সঙ্গে এর ভালো তুলনা করা যায়, অগ্নিতে যা কিছুই দিয়ে দেওয়া হোক না কেন, দেওয়ার সময় একটু হয়ত ধুয়ো হল, তারপর আর কোন চিহ্নই থাকবে না। এই যে দেবী সর্বগ্রাসী সংহার মুর্তি ধারণ করে জগৎ গ্রাস করছেন এখন সব কিছুই অগ্নিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এখানে আবার উল্টো, এণার্জিটাই দেবীর খাবার শক্তিতে আরও বেড়ে যাচ্ছে। মা কালিকা দেবী এখানে তাঁর মুখকে আরও বিস্তার করে যাচ্ছেন। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যেন তিনি নিজের মুখের মধ্যে নিয়ে নিতে পারেন। যত খাচ্ছেন তত তাঁর মুখ বড় হতে থাকছে। তখন বলছেন –

ভক্ষয়ন্তী চর রণে তদুৎপন্নান্মহাসুরান্।
এবমেষ ক্ষয়ং দৈত্যঃ ক্ষীণরক্তো গমিষ্যতি।।৫৫

রক্তবীজের বধ করার একটাই পথ তার রক্তের প্রবাহকে ক্ষীণ করে দেওয়া। এই যে এখানে বলা হচ্ছে রক্তবীজের শরীর থেকে এক বিন্দু রক্ত মাটিতে পড়লে সেই রক্তবিন্দু থেকে আরেকটি রক্তবীজ উৎপন্ন হয়ে যাবে।

তাহলে অনেকে হয়ত বলতে পারেন যে, মা তো জানতেন রক্তবীজের কী ক্ষমতা, রক্তবীজ যখন লড়াই করতে এসেছে তখন তাকে গলায় পাশ দিয়ে ফাঁসিয়ে মেরে ফেললেই তো সব ঝামেলা চুকে যেত। কোন রক্তপাতও হত না আর এত রক্তবীজের জন্মও হত না। আসলে চণ্ডীর মত গ্রন্থে শত্রুর উপর বিজয় প্রাপ্ত করার বর্ণনা করাটা কোন গুরুত্ব নয়, গুরুত্ব হল কিছু কিছু ধারণাকে জনমানসে তুলে ধরা। আমাদের মনে বাসনার বীজ রয়েছে। একটা বাসনাকে যতক্ষণে কোন রকমে চরিতার্থ করে দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণে দেখা যাবে সঙ্গে সঙ্গে আরও দশটা বাসনার বীজ তৈরী হয়ে গেছে। আমাদের মনে হাজার রকমের কামনা-বাসনা গিজ্গিজ্ করছে। প্রতি মুহূর্তে আমরা সেই বাসনা পূরণের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। একটা বাসনা পূরণের জন্য যখন কাজ করছি, সেই কর্ম থেকে আরও হাজারটা বাসনার বীজ তৈরী হয়ে যাচ্ছে। আমাদের পক্ষে বাসনার বীজকে নাশ করা কখনই সম্ভব নয়। একমাত্র মা যদি নিজে থেকে সব বীজকে গ্রাস করে নাশ না করে দেন ততক্ষণ এই বীজের নাশ কারুর দ্বারাই সম্ভব নয়। রক্তবীজকে পাশ দিয়ে মা বধ করে দিলে আমাদের মনে এই ধারণাটা দেওয়া যেত না।

এর থেকেও গুরুত্ব হল, মায়ের দুটো রূপকে দেখানো। মায়ের একটি রূপ হল মা হলেন ভয়ঙ্করী রূপা। স্বামীজী বলছেন জগতে সংহার প্রতি মুহূর্তে চলছে, প্লেগ, কলেরার মহামারীতে যখন গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য হয়ে যাচ্ছে তখন এই রূপটাও মায়েরই। কিছু দিন আগে উত্তরাখণ্ডে যে ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হাজার হাজার লোক মারা গেল, ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে এটাও তো মায়েরই রূপ। জীবন যদি মায়ের হয় তাহলে মৃত্যুটাও মায়েরই। আমি মৃত্যুকে চাইছি না, আমি চাইছি না যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সব ধুলিসাৎ হয়ে যাক, এটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু জীবন ও মৃত্যু, সুখ দুঃখ সবই তো মায়ের। মায়ের এই ভয়ঙ্করা রূপ, যেখানে তিনি মৃত্যু রূপে সব কিছুকে গ্রাস করে যাচ্ছেন। কাকে গ্রাস করছেন? যাকে পাচ্ছেন তাকেই গ্রাস করে যাচ্ছেন তখন তাঁর কোন বিচার থাকে না। পরের দিকে কাহিনী যখন তৈরী করা হয়েছে তখন দেখান হচ্ছে মা এমন সংহার করতে শুরু করেছেন যে তাঁকে আর কেউ থামাতে পারছে না। মাকে আটকানোর জন্য শিব তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকলেন। সংহার নৃত্য করতে করতে যখন শিবের গায়ে মায়ের পা লেগে গেল তখন মা আঁৎকে উঠে থেমে গেলেন। এখানে চণ্ডীতে রক্তবীজের যে বর্ণনা করা হচ্ছে, এতে রক্তবীজকে বধ করাটা উদ্দেশ্য নয়। গলায় ফাঁস দিয়ে সহজেই মা রক্তবীজকে বধ করে দিতে পারতেন, কেননা মায়ের কাছে পাশ অস্ত্র মজুত ছিলই। ওই ভাবে রক্তবীজকে বধ করে দিলে, মায়ের যে এই ভয়ঙ্কর বিশ্ব সংহার মূর্তি, যেখানে তিনি সব কিছুকে গ্রাস করে দিচ্ছেন, যা কিছু মায়ের মুখে ঢুকে যাচ্ছে সেটা ওখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, ওখান থেকে আর সৃষ্টি হবে না, এই প্রাঞ্জল বর্ণনা পাওয়া যেত না। প্রথমত রক্তবীজের যে বৈশিষ্ট্য, একটা থেকে আরেকটা, সেটা থেকে আরও অনেকগুলো এইভাবে ক্রমাগত যে একটা জিনিষ বৃদ্ধি পেতে পারে এই ধারণাটা দেওয়া যেত না আর দ্বিতীয়ত মায়ের এই ভীষনা ভয়ঙ্করী সর্বগ্রাসী মূর্তির বর্ণনা পাওয়া যেত না। রক্তবীজকে বধ করে দেওয়াটা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য এই দুটো জিনিষকে আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া।

ভক্ষ্যমাণাস্ত্বয়া চোগ্রা ন চোৎপৎস্যন্তি চাপরে।
ইত্যুক্ত্বা তাং ততো দেবী শূলেনাভিজঘান তম্।।৫৬
মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতম্।
ততোঽসাবাজঘানাথ গদয়া তত্র চণ্ডিকাম্।।৫৭
ন চাস্যা বেদনাঞ্চক্রে গদাপাতোঽল্পিকামপি।
তস্যাহতস্য দেহাত্তু বহু সুস্রাব শোণিতম্।।৫৮

মা এখন চামুণ্ডাকে বলছেন, তুমি এইভাবে রক্ত থেকে উৎপন্ন মহাসুরদের ভক্ষণ করতে থাকবে আর রক্তপান করতে করতে যখন বিচরণ করতে থাকবে তখন ধীরে ধীরে ওর রক্তও শেষ হয়ে যাবে, রক্ত যখন শেষ হয়ে যাবে তখন রক্তবীজের খেলাও শেষ হয়ে যাবে। এইভাবে ভয়ঙ্কর অসুরদের ভক্ষণ করতে থাকলে নতুন করে আর কোন অসুর উৎপন্ন হবে না। মা কালীকে এই কথা বলার পর মা চণ্ডিকা রক্তবীজকে শূল দিয়ে আঘাত করেছেন। শূল দিয়ে আঘাত করতেই রক্তবীজের শরীর থেকে রক্তপাত হতে শুরু করেছে আর মা কালী সেই রক্ত নিজের মুখের মধ্যে নিয়ে পান করতে শুরু করেছেন, এক ফোঁটা রক্তও মাটিতে পড়তে দিচ্ছেন না। তার আগে

বলেছিলেন মা কালীর বাকি যত চর আছে তারাও রক্তপান করবে। মা কালীর মূর্তি সচরাচর আমরা যেমন দেখি সেখানে একটা শিবা মুখ হাঁ করে আছে, কোন কারণে রক্ত যদি বাইরে পড়ে সে বাকিটা পান করে নেবে। যাই হোক, রক্তবীজ এরপর গদা দিয়ে মা চণ্ডিকাকে প্রহার করতে শুরু করেছে। কিন্তু সেই গদার আঘাতে মায়ের শরীরে বিন্দুমাত্রও কোন ব্যাথা অনুভব হল না।

যতস্ততস্তদ্‌বক্ত্রেণ চামুণ্ডা সম্প্রতীচ্ছতি।
মুখে সমুদ্‌গতা যেঽস্যা রক্তপাতান্মহাসুরাঃ।।৫৯
তাংশ্চখাদাথ চামুণ্ডা পপৌ তস্য চ শোণিতম্।
দেবী শূলেন বজ্রেণ বাণৈরসিভির্ঋষ্টিভিঃ।।৬০
জঘান রক্তবীজং তং চামুণ্ডাপীতশোণিতম্।
স পপাত মহীপৃষ্ঠে শস্ত্রসঙ্ঘসমাহতঃ।।৬১

মা কালী এখন মুখ ব্যাদান্ করে আছেন, আর সেই মুখের ভেতর মায়ের জিহ্বার উপর রক্তবীজের রক্ত পড়ছে ওখানেই শত শত রক্তবীজের জন্ম হতে শুরু করেছে। মা কালী তো অবিরাম ভক্ষণ করে যাচ্ছেন, তাই যত অসুর জন্মাচ্ছে সেগুলোও মায়ের গলা দিয়ে পেটের ভেতরে চলে যাচ্ছে। ঠাকুর বলছেন সন্দেশ গলার নীচে চলে গেলে আর সন্দেশের কিছু স্বাদ বোঝা যায় না। মায়েরও তাই হচ্ছে, মুখে আসছে আর মুখ থেকে যতক্ষণে কণ্ঠে আসছে ততক্ষণে অসুরগুলোও শেষ। মা চামুণ্ডা যখন রক্তবীজের রক্ত পান করতে শুরু করেছেন তখন আস্তে আস্তে রক্তবীজের রক্তও কমে আসতে শুরু হয়েছে। আর রক্তবীজ একটা দুটো তো নয়, কোটি কোটি রক্তবীজ দাঁড়িয়ে গেছে। মা চামুণ্ডার এত বিশাল মুখ যে, যার ভেতর পুরো অসুর সেনারা একসাথে ঢুকে যাচ্ছে, এই দৃশ্য আমরা গীতার বিশ্বরূপদর্শনেও পাই। রক্তবীজের রক্ত মা কালী ক্রমাগত পান করে যাচ্ছেন আর অন্য দিকে রক্তবীজের শক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। রক্তবীজ দুর্বল হয়ে গেছে, এবার মা বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে রক্তবীজকে আক্রমণ করেছেন। রক্ত মাটিতে পড়লে নতুন রক্তবীজের জন্ম হবে, কিন্তু মা চামুণ্ডা রক্ত মাটিতে পড়তেই দিচ্ছেন না।

নীরক্তশ্চ মহীপাল রক্তবীজো মহাসুরঃ।
ততস্তে হর্ষমতুলমবাপুস্ত্রিদশা নৃপ।।৬২
তেষাং মাতৃগণো জাতো ননর্তাসৃঙ্মদোদ্ধতঃ।।৬৩

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
রক্তবীজবধো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

এই কাহিনী মেধা ঋষি সুরথ আর সমাধিকে বলছেন। এই ভাবে মা চামুণ্ডা রক্তপান করতে থাকার ফলে রক্তবীজ একেবারে রক্তহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। হে নৃপ! তখন দেবতারা হর্ষোৎফুল্ল হয়ে পরমানন্দ লাভ করল আর মাতৃগণ সেই রক্তবীজের রক্তপান করতে করতে মদোন্মত্ত হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। মদ পান করলে যেমন মদোন্মত্ত হয়, রক্তবীজের রক্তপান করে ঠিক সেই রকম মদে উন্মত্ত হয়ে মাতৃগণ নৃত্য করছেন। স্বামীজী যে বলছেন, নাচে তাহাতে শ্যামা, এখানে ঠিক তাই হচ্ছে। বাস্তবিকই তাই হয়, ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে, রক্ত এমন এক জিনিষ যে, বাঘ সিংহও যখন রক্তের স্বাদ পায়, মাথাটা ওর অন্য রকম হয়ে যায়। হাতী যদি কোন কারণে জঙ্গলে বা সার্কাসে কাউকে মেরে দেয়, মেরে দেওয়ার পর রক্তের গন্ধে হাতীর মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। হাতী আসলে নিরামিষাশি প্রাণী, কিন্তু তারও রক্তের গন্ধে মাথাটা বিগড়ে যায়। অন্য দিকে বাঘ সিংহ যখন প্রথম রক্তের আস্বাদ পায় তখন সে হুঙ্কার দিতে শুরু করে, তার মানে মন তার আর নিয়ন্ত্রণে নেই। সেখান থেকে এনারা এই থিয়োরি নিয়ে এলেন, মাছ মাংস খাওয়ার মধ্যে রক্তের ব্যাপার জড়িয়ে আছে, যার জন্য আমিষ খাদ্য খেলে মানুষের মনে চাঞ্চল্য আসে। রক্ত রক্তই, মানুষের রক্ত আর অন্য প্রাণীর রক্তে কোন তফাৎ থাকে না। রক্তের মধ্যে জীবনী শক্তি জড়িয়ে আছে। বলা হয় রক্তস্রাব দেখে যাদের মন কখন বিচলিত হয় না, তারা মানসিক ভাবে অত্যন্ত ক্রুঢ় হয়। সেইজন্য আগেকার দিনে কোন বিচারে সালিশীর সময় সেখানে কোন কষাইকে রাখা হতো না। পশু হত্যা করে করে কষাইদের মন এত নির্মম হয়ে যায় যে, যার জন্য আগেকার দিনে গ্রামের কোন বিচারে রায়

দেওয়ার জায়গায় কশাইদের রাখা হত না। রক্ত যে কোন পশু পাখিকে পাগল বানিয়ে দেবে। রক্ত দেখেও যদি কিছু না হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার কিছু গোলমাল আছে। অনেকেই মাংস খায় কিন্তু যেখানে ছাগল বা মুরগী কাটা হয়, সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছাগল কাটা মুরগী কাটা এগুলো দেখতে পারে না। মাতৃগণ এখন সংহার মূর্তিতে আছেন, রক্তবীজের রক্ত পান করতে করতে তাঁরা নৃত্য করছেন।

স্বামীজী বলছেন, মায়ের এই রূপকে যে ভালোবাসে, সেই ঠিক ঠিক মাকে ভালোবাসে। মায়ের এই রূপকে আধার করে বাংলায় প্রচুর মাতৃসঙ্গীত রচিত হয়েছে। যেখানে কোন খুব আপদ-বিপদ হচ্ছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কাটাকাটি যেখানে চলছে, সেখানেই মায়ের এই রূপকে চিন্তা করতে হয়, এটাই তো মা কালীর মৃত্যুর নৃত্যকলা। এর একটা আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও আছে, কারণ আমাদের কাছে আধ্যাত্মিকতা ছাড়া কিছু নেই, আধ্যাত্মিকতার বাইরে জাগতিক বলে কিছু নেই। স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু বেছে বেছে বয়স হলে নিয়ে যায়, কিন্তু সংহারে কোন বাছ বিচার নেই, লাইন করে সবাইকেই নিয়ে চলে যাবে। যোগে বলছে, যখন আত্মজ্ঞান হয়ে যায় তখন দগ্ধবীজ হয়ে যায়। এমনিতে বীজের নাশ কখন হবে না। অধ্যাত্ম বোঝার জন্য যোগ হল ঠিক ঠিক শাস্ত্র। দগ্ধবীজে সমস্ত বীজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। যেমন ছোলা ভাজা, ছোলার আকার সবই ঠিক আছে, কিন্তু ছোলাকে ভেজে নেওয়া হলে সেই ছোলা দিয়ে আর নতুন ছোলা গাছ হবে না। রক্তবীজকে নিরক্ত করে দেওয়া হয়েছে, রক্তবীজ শারীরিক ভাবে আছে কিন্তু আর নতুন কোন রক্তবীজের জন্ম দিতে পারবে না।

আধ্যাত্মিক সাধনায় ঠিক তাই হয়, সাধনা করে যখন জ্ঞান হয়ে গেল তখন দগ্ধবীজ হয়ে গেল, তার আকারটুকু আছে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ সবই থাকবে। একজন আত্মজ্ঞানীকে দেখে মনে হবে তিনি তো আমাদের মতই আচরণ করছেন, তাহলে আমার সাথে তাঁর তফাৎ কোথায়? না, তফাৎ আছে। একটা দড়ি পুড়ে গেছে, কিন্তু দড়ির আকারটা থেকে গেছে, সেই দড়ি দিয়ে আর বন্ধনের কাজ হবে না। ঠাকুর, স্বামীজীর যে কাম, ক্রোধ এই দিয়ে সংসার কার্য আর চলবে না। ওর আকারটুকু থেকে গেছে, এই আকারটুকু যদি না থাকে তাহলে শরীর আর চলবে না। সেইজন্য বলে, নির্বিকল্প সমাধি হলে একুশ দিনে শরীর চলে যায়। শরীর যদি চালাতে হয় তাহলে কাম ক্রোধের একটু আকারকে ধরে রাখতে হয়। ওই কাম ক্রোধ দিয়ে কারুর কোন ক্ষতি হয় না। রক্তবীজের সব রক্ত পান করে নেওয়া হয়েছে, ওর আসল শক্তিটাই নষ্ট হয়ে গেছে, এবার তার শরীরটা প্রাণহীন হয়ে শুধু পড়ে থেকে গেল। এখানেই অষ্টম অধ্যায় শেষ হয়ে যাচ্ছে।

অথ নবমোহধ্যায়ঃ

(নিশুম্ভ-বধ)

রাজোবাচো।।১

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন্ ভবতা মম।
দেব্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যং রক্তবীজবধাশ্রিতম্।।২

ভূয়শ্চেচ্ছাম্যহং শ্রোতুং রক্তবীজে নিপাতিতে।
চকার শুম্ভো যৎ কর্ম নিশুম্ভশ্চাতিকোপনঃ।।৩

মেধা ঋষি এই কাহিনী রাজা সুরথ আর বৈশ্য সমাধিকে বলছেন। সব শোনার পর রাজা সুরথ ঋষিকে বলছেন – আপনি আমাদের রক্তবীজের বধের কথা বলতে গিয়ে দেবীচরিত্রের বিচিত্র মাহাত্ম্যের বর্ণনা করলেন। এখানে বিচিত্র মানে বাংলার বিচিত্র নয়, এই বিচিত্র মানে অদ্ভূত। বাংলায় উদ্ভট একটি খুব মজার শব্দ। বাংলার উদ্ভট মানে যার কোন মাথামুণ্ডু নেই, কিন্তু সংস্কৃতে উদ্ভট মানে যাকে কোন কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। যদি বলে উদ্ভট কবি, তার অর্থ দাঁড়াবে তাঁর সমকক্ষ আর কোন কবি পাওয়া যাবে না। উদ্ভট শব্দের অর্থের ভাবটা বাংলা আর সংস্কৃতে একই সূত্র থেকে এসেছে। ভাবটা হল যে জিনিষকে আর কোন কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। মাথামুণ্ডু নেই যখন অর্থ করা হচ্ছে তখনও ভাবটা হল কোন কিছুর সঙ্গে মেলানো যাবে না। মহৎ কবিকেও যখন উদ্ভট বলা হচ্ছে সেখানেও একই ভাব আসছে, কবিকে কারুর সাথে মেলানো যাবে না। কবির ক্ষেত্রে প্রশংসার অর্থে বলা হচ্ছে, আর বাংলার অর্থটা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে নেতিমূলক অর্থের দিকে চলে গেছে। বিচিত্র শব্দকেও খারাপ অর্থে নেওয়া যায়, কিন্তু এখানে অদ্ভূত অর্থাৎ প্রশংসার অর্থে নেওয়া হয়েছে। সেটাই রাজা সুরথ বলছেন, দেবীর এই অদ্ভূত মাহাত্ম্যের কথা শোনার পর আমার আরও অনেক কিছু শোনার ইচ্ছে হচ্ছে। রক্তবীজ বধ হয়ে যাওয়ার পর শুম্ভ ও নিশুম্ভ এখন নিশ্চয়ই আরও প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে গেছে, অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে এরপর তারা কী করল আমাদের শোনার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। তখন ঋষি এক এক করে বিস্তারিত ভাবে যুদ্ধের বিভিন্ন বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন। শুম্ভ ও নিশুম্ভ দুজনেই এসেছে মায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, প্রথমে নিশুম্ভের বধ হবে, অধ্যায়ের নামও তাই নিশুম্ভ-বধ।

ঋষিরুবাচ।।৪

চকার কোপমতুলং রক্তবীজে নিপাতিতে।
শুম্ভাসুরো নিশুম্ভশ্চ হতেষ্বন্যেষু চাহবে।।৫

হন্যমানং মহাসৈন্যং বিলোক্যামর্ষমুদ্বহন্।
অভ্যধাবন্নিশুম্ভোহথ মুখ্যয়াসুরসেনয়া।।৬

তস্যাগ্রতস্তথা পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োশ্চ মহাসুরাঃ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্ধা হন্তুং দেবীমুপাযযুঃ।।৭

আজগাম মহাবীর্যঃ শুম্ভোহপি স্ববলৈর্বৃতঃ।
নিহন্তুং চণ্ডিকাং কোপাৎ কৃত্বা যুদ্ধন্তু মাতৃভিঃ।।৮

এখন পর পর যুদ্ধের বর্ণনা চলছে। রক্তবীজ ও অন্যান্য অসুরদের দেবী যুদ্ধে বধ করে দিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই শুম্ভ ও নিশুম্ভ প্রচণ্ড ক্রোধে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে গেছে। অসুরদের এই বিশাল সৈন্যবাহিনী এভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দেখে নিশুম্ভ ক্রোধে অধীর হয়ে বাকি প্রধান সেনাপতিদের সাথে নিয়ে দেবীকে বধ করার জন্য তেড়ে গেছে। নিশুম্ভের আশেপাশে এখন অনেক মহাসুরগণ উপস্থিত হয়ে গেছে। রাগে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে সবাই দেবীকে বধ করবার জন্য উপস্থিত হয়েছে। অসুরদের রাজা মহাপরাক্রমশালী শুম্ভও নিজের সৈন্যবাহিনীর দ্বারা বেষ্টিত হয়ে মাতৃগণের সাথে যুদ্ধ করে ক্রোধে আরক্তিম হয়ে দেবী চণ্ডিকাকে বধ করতে এগিয়ে এসেছে।

ততো যুদ্ধমতীবাসীৎ দেব্যা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
শরবর্ষমতীবোগ্রং মেঘয়োরিব বর্ষতোঃ।।৯

চিচ্ছেদাস্তাঞ্শরাংস্তাভ্যাং চণ্ডিকা স্বশরোৎকরৈঃ।
তাড়য়ামাস চাঙ্গেষু শস্ত্রৌঘৈরসুরেশ্বরৌ।।১০
নিশুম্ভো নিশিতং খড়্গং চর্ম চাদায় সুপ্রভম্।
অতাড়য়ন্মূর্ধ্নি সিংহং দেব্যা বাহনমুত্তমম্।।১১
তাড়িতে বাহনে দেবী খুরপ্রেণাসিমুত্তমম্।
নিশুম্ভস্যাশু চিচ্ছেদ চর্ম চাপ্যষ্টচন্দ্রকম্।।১২

তখন শুম্ভ ও নিশুম্ভের সাথে দেবীর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। শুম্ভ নিশুম্ভ দুজনেই দেবী চণ্ডিকার প্রতি এমন বাণ বর্ষণ করতে শুরু করেছে যে দেখে মেনে হচ্ছে মেঘ থেকে বারি বর্ষণ না হয়ে শুধু বাণ বর্ষণ হয়ে চলেছে। কিন্তু দেবী নিজের বাণ দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে অসুরদ্বয়ের নিক্ষিপ্ত সমস্ত বাণ কেটে দিলেন আর শস্ত্রের আঘাতে শুম্ভ ও নিশুম্ভ দুজনকেই জর্জরিতে করে দিলেন। নিশুম্ভ তখন তীক্ষ্ণ এক ধারালো এবং উজ্জ্বল খড়্গ দিয়ে দেবীর বাহন সিংহের মাথায় আঘাত করল। দেবী তাঁর বাহনকে আহত হতে দেখে ক্ষুরাগ্র নামের এক বাণ দিয়ে নিশুম্ভের ওই উজ্জ্বল খড়্গটা সঙ্গে সঙ্গে কেটে দিলেন আর অষ্টচন্দ্র শোভিত ঢালটিও খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছেন।

ছিন্নে চর্মণি খড়্গে চ শক্তিং চিক্ষেপ সোঽসুরঃ।
তামপ্যস্য দ্বিধা চক্রে চক্রেণাভিমুখাগতাম্।।১৩
কোপাধ্মাতো নিশুম্ভোঽথ শূলং জগ্রাহ দানবঃ।
আয়ান্তং মুষ্টিপাতেন দেবী তচ্চাপ্যচূর্ণয়ৎ।।১৪
আবিধ্যাথ গদাং সোঽপি চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি।
সাপি দেব্যা ত্রিশূলেন ভিন্না ভস্মত্বমাগতা।।১৫
ততঃ পরশুহস্তং তমায়ান্তং দৈত্যপুঙ্গবম্।
আহত্য দেবী বাণৌঘৈরপাতয়ত ভূতলে।।১৬

ঢাল আর খড়্গ কেটে দিতে নিশুম্ভ দেবীর উপর শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করল। কিন্তু দেবী চক্র দিয়ে সেই শক্তি অস্ত্রকেও দু টুকরো করে দিলেন। তাতে নিশুম্ভ আরও ক্রুদ্ধ হয়ে জ্বলে উঠেছে আর দেবীকে মারবার জন্য একটা শূল হাতে নিয়েছে, কিন্তু সেই শূল উড়ে দেবীর কাছে আসতেই দেবী নিজের মুষ্টির আঘাতে শূলকে চূর্ণ করে দিলেন। নিশুম্ভ তখন একটা গদাকে ঘুরিয়ে চণ্ডিকা দেবীর দিকে ছুঁড়ে মারল, দেবীর ত্রিশূলের আঘাতে সেই গদাও ভেঙে ভস্ম হয়ে গেল। নিশুম্ভের খড়্গ, ঢাল, শক্তি, শূল ও গদা সব চূর্ণ হয়ে যেতে দেখে নিশুম্ভ একটা কুঠার হাতে দেবীর দিকে তেড়ে গেছে। নিশুম্ভকে কুঠার আসতে দেখে মা চণ্ডিকা তখন নিশুম্ভের প্রতি প্রচুর বাণ নিক্ষেপ করে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছেন।

তস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ নিশুম্ভে ভীমবিক্রমে।
ভ্রাতর্যতীব সংক্রুদ্ধঃ প্রযযৌ হন্তুমম্বিকাম্।।১৭
স রথস্থস্তথাত্যুচ্চৈর্গৃহীতপরমায়ুধৈঃ।
ভুজৈরষ্টাভিরতুলৈর্ব্যাপ্যাশেষং বভৌ নভঃ।।১৮

নিশুম্ভ, যে এত বড় পরাক্রমশালী, রক্তবীজেরও রাজা, তাকে মা মাটিতে ফেলে দিয়েছেন! পরাক্রমশালী ভাই নিশুম্ভকে ধরাশায়ী হতে দেখে শুম্ভ প্রচণ্ড রেগে গেছে আর অম্বিকাকে বধ করতে রাগে প্রচণ্ড বেগে ছুটে এসেছে। শুম্ভ যখন যুদ্ধ করতে এসেছে তখন সে রথে করেই যুদ্ধে এসেছে। আমরা এর আগেও বলেছি যে, সেনাপতি যদি রথে থাকে তাহলে তার যুদ্ধ করার শক্তি ও ক্ষমতা আরও বেশি থাকে। তার কারণ অস্ত্রশস্ত্র সব রথেই মজুত থাকে তার সাথে পার্শ্বরক্ষক, চক্ররক্ষক থাকার জন্য তার সাথে আরও অনেক অতিরিক্ত সেনা সব সময় যুক্ত হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, নিজের হাতে অস্ত্রগুলোকে বহন করতে হচ্ছে না বলে তারা আরও ভারী ভারী

অস্ত্র চালানোর সুযোগ পায়। শুম্ভ সাধারণ কোন অসুর নয়, তার আটটি হাত। মায়ের একটা রূপ যেমন তিনি অষ্টভূজা, তেমনি শুম্ভও অষ্টভূজ হয়ে সমগ্র আকাশকে যেন ছেয়ে আছে। পুরো রথটাই সমস্ত রকম ভয়ঙ্কর আয়ুধে মজুত। শুম্ভ নিশুম্ভ কত শক্তিমান যদি বুঝতে হয় তাহলে রক্তবীজের কথা ভাবলেই বোঝা যাবে। যে রাজার একজন সেনাপতি রক্তবীজ, সেই সাধারণ সেনাপতির এত শক্তি ও ক্ষমতা যদি হয় তাহলে তার রাজার শক্তি আর ক্ষমতা আরও কত হবে!

তমায়ন্তং সমালোক্য দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ।
জ্যাশব্দঞ্চাপি ধনুষশ্চকারাতীব দুঃসহম্।।১৯
পূরয়ামাস ককুভো নিজঘণ্টাস্বনেন চ।
সমস্তদৈত্যসৈন্যানাং তেজোবধবিধায়িনা।।২০

অন্যান্য যত অসুর আছে এরা কেউই ধর্তব্যের মধ্যে আসে না। মহাভারতে সেনাপতিদের কবচ বা বর্ম পরিধান করার অনেক বর্ণনা আছে। যাদের শরীরে জোর নেই, শরীরকে বয়ে নিয়ে যেতেই তাদের দম শেষ হয়ে যাচ্ছে, তার উপর লোহার একটা পোশাক যদি গায়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়, এরপর সে চলবে কী করে! ফলে তাকে হাল্কা ও পাতলা কিছু পোশাক গায়ে চাপাতে হবে। এরপর সেই সৈন্যকে সামনে থেকে তীর বা তলোয়ার চালিয়ে পাতলা পোশাক ভেদ করে শরীর কেটে দিতে কোন অসুবিধাই হবে না। অন্য দিকে যাঁরা শক্তিশালী সেনাপতি হতেন তাঁরা শরীরে যে বর্ম চাপাতেন সেই বর্ম এত শক্ত ও ভারী হত যে, আমাদের গায়ে চাপিয়ে দিলে আমরা হাঁটাচলাই করতে পারব না। এই ধরণের ভারী কবচ সব দিক দিয়ে সুরক্ষিত করলেও তার মধ্যেও কিছু কিছু ফাঁক থেকে যেত। কারণ হাতের স্বাভাবিক নড়াচড়ার জন্য হাতকে খোলা রাখতে হবে। যুদ্ধের সময়ে ব্যবহৃত বর্ম নিয়ে তখনকার দিনে অনেক পরীক্ষা-নিরিক্ষা করা হয়েছে। শুম্ভ যে এখন মায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসছে, অম্বিকার সাথে শুম্ভের যে লড়াই হবে এখানে অন্যান্য যারা দেবীর সৈন্যরা আছে তারা যে শুম্ভের উপর অস্ত্র চালাবে তাতে শুম্ভের কিছুই হবে না, অস্ত্র শরীরে লেগে ছিটকে বেরিয়ে যাবে, এতই শক্ত কবচ শরীরে লাগানো আছে। কিন্তু এক অপরকে যে অস্ত্রগুলো চালাবে সেই অস্ত্রগুলো এতই শক্তিশালী যে ওই অভেদ্য কবচকেও ভেদ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। মহাভারতে বর্ণনা আছে, অস্ত্র চালিয়ে কবচকে ছেঁদা করতে পারছে না, কিন্তু অস্ত্রের এমন জোর যে তাকে উল্টে মাটিতে ফেলে দিচ্ছে। দেবী ও শুম্ভের সাথে বাকি যত সৈন্য আছে এরা অস্ত্র চালালে কোন অনুভূতিই হবে না, কিন্তু শুম্ভ মায়ের উপর যে অস্ত্র চালাচ্ছে বা মা শুম্ভের উপর যে অস্ত্র চালাচ্ছেন, ওই অস্ত্র একটা সাংঘাতিক ধাক্কা দেবে। এখানে যে বর্ণনায় বলা হচ্ছে, শুম্ভ এই অস্ত্র চালালো কিন্তু মায়ের কিছু হল না, কিছু হল না মানে একেবারেই যে কিছু হবে না তা নয়। এখানে দিব্য শক্তির কথা বলা হচ্ছে বলে এই কথাগুলো চলে না। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় বড় বড় সেনাপতি যতই শক্ত কবচ ধারণ করে থাকুক না কেন, দিব্য অস্ত্র চালালে হাল্কা একটা ধাক্কা লাগবে। কিন্তু যে অস্ত্রগুলো জোর ধাক্কা দেয় সেগুলো খুব ভারী অস্ত্র। সাধারণ সৈন্যদের উপর পড়লে কোথায় ছিটকে পড়বে জানাই যাবে না।

শুম্ভকে এগিয়ে আসতে দেখে মা শঙ্খধ্বণি করতে শুরু করেছেন আর ধনুকের তীব্র অসহনীয় টঙ্কার দিতে থাকলেন। সাথে সাথে দেবী অসুরদের তেজনাশক ঘণ্টাধ্বণি করছেন। একদিকে শঙ্খের নিনাদ, অন্য দিকে ধনুকের অতীব টঙ্কার, সঙ্গে ঘণ্টার ধ্বণিতে দশদিক পরিপূর্ণ হয়ে গেল। দেবীর এই শব্দের প্রভাবে অসুরদের শক্তি হ্রাস হতে শুরু হয়ে গেছে। এর আগে যেমন ব্রহ্মাণী মন্ত্রপূতঃ জল ছিটিয়ে অসুরদের তেজ নাশ করে দিচ্ছিলেন, ঠিক তেমনি দেবী শব্দ দিয়ে অসুরদের তেজকে হ্রাস করে দিচ্ছেন। শব্দ একদিকে যেমন তেজকে বাড়িয়ে দেয় আবার অন্য দিকে তেজকে নাশও করে দেয়।

শেয়াল আর নেকড়ে একই গোত্রের, এরা যখন শিকার করে তখন একই গলা থেকে তিন চার রকমের আওয়াজ করতে থাকে। তার পাশে যে শেয়াল থাকে সেও তিন চার রকমের আওয়াজ করে। শেয়ালের শত্রুরা যখন ওই গলার আওয়াজ শুনতে পায় তখন সে মনে করে একসাথে আট ন খানা শেয়াল ধারে কাছে আছে। দুটো শেয়ালের আওয়াজ যদি কোন কারণে মিলে যায় ওরা তখন চুপ করে এক অপরের দিকে তাকায়, ভাবখানা এই

যে আমাদের গলার আওয়াজে ভুল হয়ে গেছে। আমরা যেমন কোরাসে সুর মেলাতে চাই, শেয়ালরা সেখানে সুর সব সময় আলাদা রাখে। চারটে শেয়াল যদি ডাকে মনে হবে কুড়ি পঁচিশটা শেয়াল আছে। কারণ ওই আওয়াজের প্রভাবেই শেয়াল বা নেকড়ে যাকে শিকার করতে যাচ্ছে তার সব শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়। এই আওয়াজে অন্য শেয়ালদের শক্তিটা বেড়ে যায় কিন্তু তার শত্রুর শক্তি দমে যায়। যুদ্ধে এখন অনেক রকম আওয়াজ হচ্ছে, সেনারা জানে যে এটা আমার সেনাপতির আওয়াজ আর এই আওয়াজ আমার শত্রুপক্ষের সেনাপতির আওয়াজ। গীতার প্রথম অধ্যায়ে এর বর্ণনা আছে যেখানে বলছেন বিভিন্ন সেনাপতিরা তাঁদের নিজের নিজের শঙ্খের আওয়াজ করছেন। শঙ্খের আওয়াজেই সৈন্যরা বুঝে নেয় এটা আমার সেনাপতির আওয়াজ। শঙ্খ ছাড়াও ভেরি, সিঙ্গা প্রভৃতির ধ্বণিকেও যুদ্ধের সময় বিভিন্ন সঙ্কেত দেওয়ার কাজে লাগানো হত। আওয়াজ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয় সেনাপতি তার সেনাদের কি নির্দেশ দিচ্ছে। আবার উৎসাহ দেওয়ার জন্যও এগুলো দিয়ে বিভিন্ন তালে শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি হত। দেবী এখন অনেক কিছু দিয়ে ধ্বণি সৃষ্টি করে অসুরদের তেজ ক্ষয় করে দিচ্ছেন। কিন্তু শুম্ভের তাতে কিছু আসে যায় না।

ততঃ সিংহো মহানাদৈস্ত্যাজিতেভমহামদৈঃ।
পূরয়ামাস গগনং গাং তথোপদিশো দশ।।২১

শুধু তাই না, দেবীর বাহন সিংহও মহামদমত্ত গজরাজদের মদস্রাব নির্গত হওয়া বন্ধ করে দেওয়ার মত ঘোরতম গর্জন করতে শুরু করে দিয়েছে। হাতির যখন মদস্রাব নির্গত হয় তখন হাতিকে নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য হয়ে যায়, হাতি তখন মদমত্ত হয়ে যায়। একটা বিশেষ সময়ে হাতির শরীর থেকে এক ধরণের তরল পদার্থ বেরোয়, ওর গন্ধে হাতি মত্ত হয়ে যায়। নিজের গন্ধেই হাতি এত মত্ত হয়ে যায় যে মাহুতও তখন তাকে সামলাতে পারে না। বেশি কিছু করতে গেলে হাতি মাহুতকেই ছুঁড়ে ফেলে দেবে। যুদ্ধে হাতি আর সিংহের লড়াই খুব নামকরা লড়াই, আর খুব বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। যে সিংহ খুব শক্তিশালী সে লাফ দিয়ে হাতির মাথায় আক্রমণ করে। সেইজন্য হাতি খুব সতর্ক থাকে যাতে সিংহ লাফ দিতে না পারে, আগেই শূর দিয়ে সিংহকে পেঁচিয়ে ধরে নেওয়ার চেষ্টা করে। এখানে সেটাই বলছেন, বড় বড় হাতি যদি মদমত্ত হয়ে থাকে সিংহের গর্জনে তার মদস্রাব, যে মদস্রাবের গন্ধে হাতি মদমত্ত হয়ে আছে, সেই মদস্রাব নির্গত হওয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। যার জন্য অনেক সময় দেখা যায় যারা মদের নেশা করে মাতলাম করছে সেই সময় হঠাৎ যদি কিছু হয়ে যায়, কেউ গুলি চালিয়ে দিল বা পুলিশকে দেখে নিল তখন তার নেশাটা চলে যায়। এখানেও তাই হচ্ছে, মায়ের সিংহের এত ঘোর গর্জন যে সেই গর্জনের মদমত্ত হাতির নেশাও ছুটে যাবে।

ততঃ কালী সমুৎপত্য গগনং ক্ষ্মামতাড়য়ৎ।
করাভ্যাং তন্নিনাদেন প্রাক্স্বনাস্তে তিরোহিতাঃ।।২২
অট্টাট্টহাসমশিবং শিবদূতী চকার হ।
তৈঃ শব্দৈরসুরাস্ত্রেসুঃ শুম্ভঃ কোপং পরং যযৌ।।২৩
দুরাত্মংস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ব্যাজহারাম্বিকা যদা।
তদা জয়েত্যভিহিতং দেবৈরাকাশসংস্থিতৈঃ।।২৪

কালী তখন এক উল্লম্ফন দিয়ে আকাশে উঠে গেছেন। আকাশে উঠে যখন পৃথিবীতে নেমে এসেছেন তখন তিনি নিজের হাতের তালু দিয়ে মাটিটে আঘাত করলেন। তাতে এমন ভয়ঙ্কর জোর আওয়াজ হল যে বাকি সব শব্দ চাপা পড়ে গেল। তার উপর আবার শিবদূতী দৈত্যদের উদ্দেশ্য করে মহা অমঙ্গলজনক ভয়ানক অট্টহাস্য করলেন। সেই সময় দেবী আবার শুম্ভকে লক্ষ্য করে বলছেন ‘রে দুরাত্মা! তুই এবার থাম! থাম!’ দেবতারা এইবার বুঝতে পারলেন যে অসুররা এবার নাশ হতে যাচ্ছে। কারণ রক্তবীজ বধ হয়ে গেছে। দেবতারা দেবীর শুম্ভের প্রতি ওই হুঙ্কার শুনে আকাশ থেকে জয়ধ্বণি করতে শুরু করেছেন। এরপর আবার শুম্ভও অস্ত্র চালাচ্ছে অন্য দিকে মাও শুম্ভের দিকে অস্ত্র চালাতে শুরু করলেন –

শুম্ভেনাগত্য যা শক্তির্মুক্তা জ্বালাতিভীষণা।
আয়ান্তী বহ্নিকূটাভা সা নিরস্তা মহোল্কয়া।।২৫

সিংহনাদেন শুম্ভস্য ব্যাপ্তং লোক্‌ত্রয়ান্তরম্‌।
নির্ঘাতনিঃস্বনো ঘোরো জিতবানবনীপতে।।২৬

শুম্ভমুক্তাঞ্ছরান্‌ দেবী শুম্ভস্তৎপ্রহিতাঞ্ছরান্‌।
চিচ্ছেদ স্বশরৈরুগ্রৈঃ শতশোহথ সহস্রশঃ।।২৭

ততঃ সা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা শূলেনাভিজঘান তম্‌।
স তদাভিহতো ভূমৌ মূর্ছিতো নিপপাত হ।।২৮

ততো নিশুম্ভঃ সংপ্রাপ্য চেতনামাত্তকার্মুকঃ।
আজঘান শরৈর্দেবীং কালীং কেশরিণং তথা।।২৯

শুম্ভ তখন রেগে গিয়ে এক ভীষণ তেজশালী ভয়ঙ্কর শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করল। আগুনের মত সেই শক্তি অস্ত্র আসতে দেখে দেবী সঙ্গে সঙ্গে তার থেকেও ভয়ঙ্কর মহোল্কা নামে এক মহা শক্তিশালী অস্ত্র দিয়ে শুম্ভের শক্তি অস্ত্রকে বিনষ্ট করে দিলেন। এরপর শুম্ভও তখন বিশাল বিকট গর্জন করতে শুরু করেছে, শুম্ভের সেই ভয়ঙ্কর গর্জনে ত্রিভুবন যেন কেঁপে উঠেছে। শুম্ভের গর্জনের প্রতিধ্বণিতে বজ্রপাত হলে যেমন ভয়ানক শব্দ হয়, সেই রকম শব্দ অন্য সব শব্দকে চাপা দিয়ে দিল। শুম্ভের নিক্ষিপ্ত বাণ সমূহকে দেবী যেমন টুকরো টুকরো করে দিচ্ছেন, দেবীর নিক্ষিপ্ত বাণ সমূহকেও শুম্ভ বাণ দিয়ে শত সহস্র টুকরো করে দিচ্ছে। তখন দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হয়ে শুম্ভকে শূল দ্বারা আঘাত করলেন। এবার আর শুম্ভ সেই শূলকে কিছু না করতে পেরে শূলের আঘাতে মুর্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। ষোল নম্বর মন্ত্রে যখন বলা হয়েছিল নিশুম্ভকে প্রচুর বাণ দ্বারা আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন, তখন সবাই মনে করেছিল নিশুম্ভ মারা গেছে। আসলে নিশুম্ভও মুর্ছিত হয়ে পড়ে গিয়েছিল। নিশুম্ভকে নিহত হয়ে যেতে শুম্ভ যুদ্ধ করতে এগিয়ে এসেছিল। এখন দেখা যাচ্ছে নিশুম্ভ নিহত হয়নি। ইতিমধ্যে নিশুম্ভের চেতনা ফিরে এসেছে। চেতনা ফিরে আসতেই সে দেবী, কালী ও সিংহ এই তিনজনকে ধনুক হাতে নিয়ে বাণ দিয়ে আঘাত করতে লাগল। এখানে যে এক তরফা দেবী ও তাঁর মাতৃগণই লড়াই করে যাচ্ছেন, এক হুঙ্কার দিয়েই সব অসুরদের শেষ করে দিচ্ছেন তা কিন্তু হচ্ছে না। অসুররাও প্রচণ্ড শক্তিমান। নিশুম্ভ এখন অসুদের সেই পরাক্রম দেখাচ্ছে –

পুনশ্চ কৃত্বা বাহূনামযুতং দনুজেশ্বরঃ।
চক্রায়ুধেন দিতিজশ্ছাদয়ামাস চণ্ডিকাম্‌।।৩০

ততো ভগবতী ক্রুদ্ধা দুর্গা দুর্গার্তিনাশিনী।
চিচ্ছেদ তানি চক্রাণি স্বশরৈঃ সায়কাংশ্চ তান্‌।।৩১

নিশুম্ভ তখন দশ হাজার বাহু বিস্তার করে চক্র দ্বারা চণ্ডিকাকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। ওই দেখে দেবী দুর্গা, যিনি সমস্ত জগতের সকল প্রকার অসহনীয় দুর্গতি নাশ করেন, তিনি অত্যন্ত কুপিতা হয়ে নিশুম্ভের সব কটি চক্র এবং সমস্ত বাণকে নিজের বাণ দিয়ে কেটে দিলেন। এখানে মা দুর্গাকে বলছেন দুর্গার্তিনাশিনী – অর্থাৎ আর্ত, পীড়া, দুঃখ যা কোন ভাবে দূর করা যায় না, মা দুর্গা সেই পীড়া দুঃখকেও নাশ করে দেন। চণ্ডীর এটাই বিশেষত্ব, এই এত যুদ্ধের বর্ণনা চলছে, চলতে চলতে সেখানে আসল তত্ত্বটাও ঢুকে যাচ্ছে। যারা ঠিক ঠিক মায়ের আশ্রিত, তাদের যখন কষ্ট হবে তারা তখন কোথায় যাবে? ঠাকুরের সব রকম সাধনা হয়ে গেছে, তিনি বুঝে গেছেন যে তিনি অবতার, তখনও যখন নরেন বা তাঁর শিষ্যরা আসছে, কথায় কথায় তাঁদের জন্য তিনি মায়ের কাছে দৌড়ে যাচ্ছেন। 'মা! নরেন এই কথা মানছে না', 'মা! নরেন এই রকম কথা বলছে'।

আমরা এখানে ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে জানতে এসেছি, চণ্ডীর মত শাস্ত্রকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া আমাদের কাজ। কিন্তু এর মধ্যেও একটা আধ্যাত্মিক দিক আছে। যাঁরা জীবনকে সব দিক দিয়ে দেখে নিয়েছেন তাঁরা আধ্যাত্মিক দিকটা জানার ইচ্ছা করবেন, এটাই আমরা প্রত্যাশা করতে পারি। আধ্যাত্মিকতার

একটা দিক আছে যেটা জীবনে প্রয়োগ করতে হয়, সেই দিকটাকে জানার প্রয়োজনীয়তা আছে। আধ্যাত্মিকতার এই বাস্তব দিককে ধারণা করা যেমন কঠিন, আবার ধারণা করে জীবনকে সেই অনুযায়ী পরিচালনা করা আরও কঠিন। সব জায়গায় এই ধরণের কথা বললে সবাই তাই নিতে পারবে না। মা দুর্গাকে বলছেন মা দুর্গতিনাশিনী। আমাদের জীবনে যে দুঃখ কষ্ট আসে, এই দুঃখ কষ্ট কোথা থেকে আসে? মায়ের কাছ থেকেই এই কষ্ট আসছে, তিনিই তো আমাদের সব কিছু দেন, দুঃখ কষ্টটাও তিনিই দিচ্ছেন। সংহারমূর্তি যেমন মায়েরই রূপ তেমনি আবার কল্যাণময়ী মূর্তিও মায়েরই রূপ। আমাদের জীবনের যত দুঃখ, চূড়ান্ত দুর্গতি, এত কষ্ট যে আমাদের সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে গেছে, সব মায়ের কাছ থেকেই আসে। ঠাকুর বলছেন – মাইরি বলছি আমি ঈশ্বর বৈ আর কিছু জানিনা। বাচ্চা ছেলে নিজের মাকে ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু জানে না। পাঁচ ছয় বছরের শিশু কত রকম দুষ্টুমি, অবাধ্যপনা করে। কথা না শুনলে, বেশি দুষ্টুমি করলে মা বাচ্চাকে মারধরও করে। মা যখন বাচ্চাকে মারতে যায় তখন বাচ্চা মায়ের শাড়ির আঁচলে আরও বেশি করে ঢুকে আশ্রয় পেতে চায়। মা মারছে, কিন্তু মায়ের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে না, আরও বেশি করে মায়ের শাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়। বাচ্চা যখন কিছু পেতে চায় তখন মায়ের পা জড়িয়ে ধরছে, কষ্ট যখন পাচ্ছে তখনও মাকে জড়িয়ে ধরছে, আবার মা যখন তাকে মারছে তখনও সে মাকেই জড়িয়ে ধরে। মা তার বাচ্চাকে মারছে আর বাচ্চা যদি পালিয়ে ঠাকুরমা বা বাবার কাছে পালিয়ে বাঁচতে চায় তাহলে বুঝতে হবে মায়েরই কোন মারাত্মক গোলমাল আছে। ঠিক ঠিক মা যদি বাচ্চাকে মারধোর করে বাচ্চা তখন আরও সে মায়ের শাড়ি আঁচলের মধ্যে ঢুকে যাবে।

আমাদের জীবনে যখন কষ্ট আসছে তখন আমাদের কাছে রিয়েলিটিটা কী? রিয়েলিটি আমি আপনি নিজে, আমি নিজের শক্তিতে জগৎ জয় করব। যারা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আছে, তারা ভাবছে আমার স্ত্রী-পুত্রের জোরে জগতকে জয় করব। যখন আপনার জীবনে কোন আপদ-বিপদ আসছে তখন আপনি আপনার স্বামী বা স্ত্রী, পুত্রের উপরেই ভরসা করছেন। আপনার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আছে, আপনার পাঁচজন পরিচিত বন্ধু আছে, আপনার আত্মীয়-স্বজনরা আছেন, আপদে-বিপদে আপনি তাদের উপর নির্ভর করছেন। আর ঠাকুর যখন বলছেন – মাইরি বলছি আমি ঈশ্বর বৈ আর কিছু জানি না। ঠাকুরের তো আর কিছু নেই। তাহলে তাঁর যখন কষ্ট হবে তখন তিনি কার উপর নির্ভর করবেন? আরও মায়ের কাছেই যাবেন। কষ্ট তো মায়ের কাছ থেকেই আসছে। আপনার জীবনে ধরুন কোন অঘটন ঘটে গেল, কেদারনাথে বেড়াতে গেলেন আর সেখানে ওই ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আপনার স্ত্রী পুত্র মারা গেল। এই যে কষ্ট, এর যে বিভীষিকা, জীবন থেকে সব কিছু হারিয়ে যাওয়ার যে তীব্র যন্ত্রণা এওতো মা দিয়েছেন। তখন আপনি কি করবেন? আপনি যদি মায়ের ভক্ত হন তাহলে কি আপনি বলবেন, আমি আর মাকে মানবো না? নাকি আরও বেশি করে মাকে জড়িয়ে ধরতে চাইবেন। যদি মাকে আরও বেশি করে জড়িয়ে ধরেন, দেখবেন কষ্টের ওই বিভীষিকাটা আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে গেছে। দুর্গম কষ্ট, যে কষ্টকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না, সেই কষ্ট থেকেও মা আমাদের তুলে নিয়ে আসেন, তাইতো মা আমার দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী।

একজন লোক আর্ত হয়ে পোপের কাছে কিছু সাহায্যের জন্য গেছে। পোপ তাকে বললেন প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর। লোকটি আর কী করবে! পোপের কাছ থেকে চলে গেল। তখন ক্যাসানোভা পোপকে বলছেন ‘মহামান্য ফাদার! এই লোকটি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে পেলো না বলেই তো আপনার কাছে এসেছিল’। একটা অবস্থা পর্যন্ত কিছু সুরাহা না হলে আমরা এর ওর কাছে সাহায্য চাইতে যাই। কারুর সাহায্যেই যখন কিছুই সুরাহা হয় না, তখন আমরা ভগবানের কাছে চাইতে শুরু করি। ভগবানের কাছেও প্রার্থনা করে সত্যিই যখন কিছু পাই না তখন আরও হায়ার অথোরিটির কাছে যাই। কিন্তু যারা ঠিক ঠিক ভক্ত তারা কখনই কোথাও যাবে না, ভক্ত একমাত্র ঠাকুরের উপরেই নির্ভর করে থাকে। ক্যাসানোভা তখন বলছেন ‘আপনি হলেন ভগবানের একজন প্রতিনিধি। ভগবান তো তাকে বুদ্ধি দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। যেমন রাজা মন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছে, মন্ত্রী আবার রাজার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। রাজা আবার মন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এই ভলিবল খেলা কতদিন চলবে? আপনি এর একটা কিছু করে দিন’।

কিন্তু ঠাকুর বার বার এই কথা বলছেন, যে ঠিক ঠিক ভক্ত সে কখন কাউকে বড়লোক বলে মানে না, রাজাকেও রাজা বলে মানে না। সেইজন্য ঠাকুরের যা কিছুই হয়ে যাক কোন দিন কারুর কাছে যেতেন না,

এমনকি শরীর খারাপ যখন হচ্ছে তখনও বলছেন – হয় সবাইকে বিশ্বাস করতে হয় তা নাহলে কাউকেই বিশ্বাস করি না। ঠাকুর ডাক্তারকে ডাক্তার দেখছেন না, তাকেও নারায়ণ দেখছেন, নারায়ণই ডাক্তার রূপে এসেছেন। কিন্তু সেই নারায়ণ আবার বাচ্চা রূপেও আছেন, বাচ্চা যখন বলছে আপনি এই রকম করুন তখন ঠাকুর সেই রকমও করছেন। সমস্যার সমাধান জগৎ থেকে কীভাবে হবে! সমস্যা তো জগৎ থেকেই আসে। তাই ওই দুর্গম বিষম পরিস্থিতি থেকে মা ছাড়া আর কেউ রক্ষা করতে পারেন না। আপনি যদি খুব নিষ্ঠা সহকারে প্রার্থনাও করেন তখন দেখলেন হয়তো তিনি আপনাকে সেই দুর্গম পরিস্থিতি থেকেও রক্ষা করে দিলেন। চৈতন্য শক্তি কিনা, চৈতন্য শক্তি যে কোন জড় শক্তিকে পার করে দেন। কিন্তু এমন কোন কর্ম আগে করা আছে বা এমন কিছু প্রারব্ধ আছে যার জন্য তিনি কষ্ট থেকে পার করে দিলেন না, তখন দেখা যায় কষ্টের লাঘব না হলেও সহ্য করার ক্ষমতাটা তিনি দিয়ে দেন। কবিতায় বলে প্রভু যদি কষ্ট দাও তবে সহ্য করবার শক্তি দাও, এগুলো ভুল চিন্তা-ভাবনা। এগুলো ঠাকুরের মামার গোয়ালে অনেক ঘোড়া থাকার মত। মা জগদম্বার কাছে যে ঠিক ঠিক প্রার্থনা করে, হয় তাকে দুর্গতির মধ্যে পড়তে হয় না, যদি দুর্গতিতে পড়েও যায় সাথে সাথে সহ্য করার ক্ষমতাটাও সে পেয়ে যায়। দুদিক থেকেই মা দুর্গা আমাদের বিষম পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেন। হয় তিনি রক্ষা করবেন, রক্ষা যদি না করেন কিন্তু ওই বিষম পরিস্থিতি আপনাকে অবসাদগ্রস্ত হতে দেবে না। প্রার্থনার শক্তি দুভাবে আসে, তিনি কৃপা করে হয়তো বার করে দিলেন, আবার নাও দিতে পারেন। যদি নাও বার করে আনেন তাতে কিছু ক্ষতি আপনার হবে না, কারণ তিনি আপনার সহ্য করার শক্তিটা দিয়ে দেবেন। তাই তিনি দুর্গতিনাশিনী। নিশুম্ভের যে অশুভ শক্তি সেই শক্তিকে তিনি নাশ করে দিলেন।

ততো নিশুম্ভো বেগেন গদামাদায় চণ্ডিকাম্।
অভ্যধাবত বৈ হন্তুং দৈত্যসেনাসমাবৃতঃ।।৩২

তস্যাপতত এবাশু গদাং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
খড়্গেন শিতধারেণ স চ শূলং সমাদদে।।৩৩

শূলহস্তং সমায়ান্তং নিশুম্ভমমরার্দনম্।
হৃদি বিব্যাধ শূলেন বেগাবিদ্ধেন চণ্ডিকা।।৩৪

নিশুম্ভের সমস্ত চক্র ও বাণকে মা দুর্গা কেটে দিয়েছেন। তখন নিশুম্ভ এক গদা নিয়ে দৈত্যসেনাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে মা চণ্ডিকাকে বধ করার উদ্দেশ্যে ধেয়ে গেল। নিশুম্ভ সামনে আসতেই দেবী এক তীক্ষ্ণ শাণিত খড়্গ দিয়ে নিশুম্ভের গদাকে ছেদন করে দিলেন। নিশুম্ভ তখন শূল তুলে নিল। নিশুম্ভকে শূল হাতে এগিয়ে আসতে দেখে চণ্ডিকা একটা শূল অতিবেগে ঘুরিয়ে নিশুম্ভের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করে ছুড়তেই নিশুম্ভের বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গেল।

ভিন্নস্য তস্য শূলেন হৃদয়ান্নিঃসৃতোহপরঃ।
মহাবলো মহাবীর্যস্তিষ্ঠেতি পুরুষো বদন্।।৩৫

নিশুম্ভের বক্ষ বিদীর্ণ হতেই তার ভেতর থেকে আরেকটি মহাবলশালী পুরুষ বেরিয়ে এসেছে। এখানে রক্তবীজের মত হচ্ছে না, এখানে আরেকটা শরীর বেরিয়ে আসছে। মহিষাসুরের যেমন আরেকটা থেকে আরেকটা বেরিয়ে আসছে, সেই রকম এখানে নিশুম্ভের আহত শরীর থেকে আরেকটা শরীর বেরিয়ে এসেছে। যে মহাবলশালী বেরিয়ে এসেছে সে এখন দেবীকে বলছে ‘দাঁড়াও, দাঁড়াও’।

তস্য নিষ্ক্রামতো দেবী প্রহস্য স্বনবৎ ততঃ।
শিরশ্চিচ্ছেদ খড়্গেন ততোহসাবপতদ্ ভুবি।।৩৬

ততঃ সিংহশ্চখাদোগ্রদংষ্ট্রাক্ষুণ্ণশিরোধরান্।
অসুরাংস্তাংস্তথা কালী শিবদূতী তথাপরান্।।৩৭

কৌমারীশক্তিনির্ভিন্নাঃ কেচিন্নেশুর্মহাসুরাঃ।
ব্রহ্মাণীমন্ত্রপূতেন তোয়েনান্যে নিরাকৃতাঃ।।৩৮

মাহেশ্বরীত্রিশূলেন ভিন্নাঃ পেতুস্তথাপরে।
বারাহীতুণ্ডঘাতেন কেচিচ্চূর্ণীকৃতা ভুবি।।৩৯

খণ্ডং খণ্ডঞ্চ চক্রেণ বৈষ্ণব্যা দানবাঃ কৃতাঃ।
বজ্রেণ চৈন্দ্রীহস্তাগ্রবিমুক্তেন তথাপরে।।৪০

কেচিদ্বিনেশুরসুরাঃ কেচিন্নষ্টা মহাহবাৎ।
ভক্ষিতাশ্চাপরে কালীশিবদূতীমৃগাধিপৈঃ।।৪১

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে নিশুম্ভবধো নাম নবমোহধ্যায়ঃ।।

নিশুম্ভের শরীর থেকে সেই পুরুষ বের হওয়ার পর তার আওয়াজ শুনেই মা এক অট্টহাস্য করে খড়্গ দিয়ে তার মাথাটা কেটে দিলেন। তার শরীরটা মাটিতে পড়তেই সিংহ তার ধারালো দাঁত দিয়ে অসুরদের ঘাড় ভেঙে মাংস খেতে শুরু করেছে। সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবতারণ হয়েছে। কালী আর শিবদূতীও অন্যান্য অসুরদের মাংস খেতে শুরু করে দিয়েছেন। কৌমারী শক্তি অস্ত্র দিয়ে অন্যান্য মহাসুরদের শরীর বিদীর্ণ করে বিনষ্ট করতে থাকলেন, আর এদিকে ব্রহ্মাণী এখনও মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে অসুরদের নির্বীর্য করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। মাহেশ্বরী ত্রিশূল দিয়ে অপর অনেক অসুরদের ধরাশায়ী করে যাচ্ছেন আর বারাহীশক্তির মুখের আঘাতে অনেক অসুর চূর্ণ হয়ে ভূতলে লুটিয়ে পড়ছে। বৈষ্ণবীও তাঁর চক্র দিয়ে দানবদের টুকরো টুকরো করে যাচ্ছেন। ঐন্দ্রীর বজ্রের আঘাতে কত অসুর যে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল তার কোন হিসাব নেই। এইভাবে কিছু অসুর শেষ হয়ে গেল আবার অনেক অসুর প্রাণের ভয়ে মহাযুদ্ধ থেকে পালিয়ে গেল অন্য দিকে কালী, শিবদূতি আর সিংহ কত অসুরকে খেয়েই ফেললেন। এইভাবে নিশুম্ভ শেষ হয়ে গেল। আর শুম্ভেরও সৈন্যবাহিনীর বিরাট অংশ নাশ হয়ে গেছে। যদিও সেনাপতি না থাকলে সৈন্যদের মানসিক বল ও তেজ কোনটাই আর অবশিষ্ট থাকে না। এরপর দশম অধ্যায়ে শুম্ভ বধের কথা বর্ণনা করা হবে।

আগের কয়েকটি অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে মা অম্বিকা কিভাবে এক এক করে ধূম্রলোচন, চণ্ড ও মুণ্ড, রক্তবীজের মত মহাসুরদের বধ করছেন, এরপর দৈত্যরাজ শুম্ভের ভাই নিশুম্ভকেও মা বধ করলেন। নিশুম্ভ মারা যাওয়ার পর এবার দৈত্যাধিপতি শুম্ভের সঙ্গে দেবী অম্বিকার সরাসরি লড়াই হতে যাচ্ছে। রক্তবীজ বধের সময় মায়ের শরীর থেকে মায়েরই নানা রকম শক্তি বেরিয়ে এসেছিল। মা নিজে শক্তিস্বরূপিণী, অন্য দিকে দেবতাদের নিজ নিজ শক্তি ঠিক সেই দেবতাদের রূপ আর শক্তি ধারণ করেই মায়ের ইচ্ছাতে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। শুম্ভের সব বড় বড় সেনাপতিরা মায়ের হাতে বধ হয়ে গেছে, আর দেবী খড়্গ দিয়ে তার ভাই নিশুম্ভের মাথাটা কেটে দিয়েছেন, তার সাথে সব মাতৃকাগণরা একজোট হয়ে লড়াই করে অসুর সৈন্যদের এক নাগাড়ে ভক্ষণ করে গেছে। এইসব দেখে-শুনে শুম্ভ খুব রেগে গিয়ে বলছে –

অথ দশমোঽধ্যায়ঃ

শুম্ভ-বধ

ওঁ ঋষিরুবাচ।।১

নিশুম্ভং নিহতং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং প্রাণসম্মিতম্।
হন্যমানং বলঞ্চৈব শুম্ভঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্ বচঃ।।২

মেধা ঋষি বলছেন – হে রাজন্! নিজের প্রাণপ্রতিম ভাই নিশুম্ভ নিহত হওয়াতে আর অসুর সৈন্যবল ধ্বংস প্রায় হতে দেখে শুম্ভ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে গেছে। যখন কেউ রেগে যায় তখন সে মনে করে আমি যেটা বলছি, যেটা করছি সেটাই ঠিক। যদি কেউ তখন তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে, এতে তো তোমার ক্ষতি হয়ে যাবে, তাও সে বলবে আমি যা করছি ঠিক করছি। রেগে গেলে বা ক্রুদ্ধ হয়ে গেলে বুদ্ধি সম্পূর্ণ ভাবে বিপরীতে চলে যায়, কোন যুক্তিকেই সে আর গ্রাহ্য করতে পারবে না, মানতেও চাইবে না। এটা ঠিকই মানুষ রেগে গেলে একটা জিনিষকেই সে ধরে নেয় আর সেটা ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না, একটা পাথরের মূর্তির মত হয়ে যায়। মূর্তি হয়ে যাওয়াটাই one pointed। এরই অন্য একটা দিক হল সে মনে করে আমি যেটা ভাবছি সেটাই ঠিক, আমি যেটা করছি ঠিক করছি। মানুষ রেগে গেলে তার মস্তিষ্ক থেকে যে chemicals গুলো release হয়, এই chemicals গুলি অন্য যে reasoning faculty আছে বা অন্য যে নিওরোনাল এরিয়া আছে, যেখানে এগুলো কাজ করে, সেই জায়গাটাকে চাপা দিয়ে দেয়।

ক্রোধ আর ভয় দুটো বিপরীত। যার প্রাণ আছে তার ভয় থাকতেই হবে। ভয় প্রাণের একেবারে মূল বৈশিষ্ট্য। প্রাণী মাত্রেই মস্তিষ্কে একটা ছোট্ট সেল থাকতে হবে, যার এই চারটে কাজ – আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন। এই সেলের বৈজ্ঞানিক নাম এ্যমিগডালা। চারটে কাজের মধ্যে একটা হল ভয়, এই ভয়ের উল্টোটা হল ক্রোধ। সাপ প্রচণ্ড ভয় পায়, সামনের কোন বস্তুকে যদি সাপ ভয় পায় সে পালিয়ে যাবে, যদি দেখে সামনের জিনিষকে জয় করতে পারবে তখন তার ক্রোধ জন্ম নেবে, ক্রোধ হলে তাকে আক্রমণ করবে। পালাও নয়তো আক্রমণ কর, এই fight আর flight দুটো একই জিনিষ। ভয় পেলে flight হবে আর ক্রোধ হলে fight হবে, এছাড়া আর কিছু নেই। ভয় আর ক্রোধ মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। যার যত সহজে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে, তার তত সহজে রাগও আসে, সুযোগ পেলেই সে ক্রোধ দেখাবে। কাপুরুষদের যদি ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয় তখন ওর মত অত্যাচারী দুনিয়াতে পাওয়া যাবে না। কাপুরুষতা আর অত্যাচারীর ভাব দুটো একই জিনিষ। শুম্ভ এত বড় একজন যোদ্ধা, অসুরদের রাজা, দেবতাদের হারিয়ে স্বর্গে রাজত্ব করছে, কিন্তু এখন এত রেগে গেছে যে তার বুদ্ধি আর কোন কাজ করছে না, পুরো irrational হয়ে গেছে। দেখা যায় যারা খুব irrational হয় তারাই খুব সহজে রেগে যায়।

আচার্য শঙ্করের সাথে একবার তখনকার দিনের কর্মকাণ্ডীদের সব থেকে বড় নেতা মণ্ডন মিশ্রের তর্ক বিচার হয়েছিল। শঙ্করাচার্যকে সারা ভারতে বেদান্ত প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, বেদান্তীদের সবচেয়ে বড় বিরোধী হল বেদের কর্মকাণ্ডীরা। তখনকার দিনের কর্মকাণ্ডের সব থেকে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন কুমারিল ভট্ট। আচার্য প্রথমে কুমারিল ভট্টের সঙ্গে তর্ক করতে গেছেন। কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধদের পরাজিত করার জন্য উনি একটা বাক্য বলেছিলেন 'বেদ যদি প্রমাণ হয়'। কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে বৌদ্ধদের যুক্তিতর্ক, তর্ক করার সব কৌশল

শিখে নিয়ে ওদেরই অস্ত্র দিয়ে বৌদ্ধদের তর্কে হারিয়েছেন। পরে তাঁর প্রচণ্ড অনুশোচনা হয়েছে। অনুশোচনা শুধু এইটুকু নিয়ে 'আমি কি করে 'যদি' শব্দটা বললাম'। বেদ তো নিজেই প্রমাণ, প্রমাণ মানে চূড়ান্ত সত্য। আমরা যদি বলি 'শ্রীরামকৃষ্ণ যদি ভগবান হন' তখন এটাই আমাদের কাছে একটা পাপের কথা হয়ে যাবে। 'যদি' আবার কেন বলতে হল! ঠিক সেই রকম বেদ তো প্রমাণ, 'যদি' আবার কেন আসছে! কুমারিল ভট্টের প্রচণ্ড অনুশোচনা হয়েছে। ওই পাপ কাজের জন্য এবার তিনি প্রায়শ্চিত্ত করবেন ঠিক করলেন। কিভাবে প্রায়শ্চিত্ত করবেন? তুষের বিরাট স্তুপ করা হয়েছে, সেই তুষের স্তুপের উপরে তিনি বসবেন আর তুষের তলায় আগুন দিয়ে দেওয়া হবে। ওই তুষের আগুন একটু একটু করে পুড়তে পুড়তে উপরের দিকে উঠতে থাকবে। একদিনে তো ওই বিশাল তুষের স্তুপ পুড়ে যাবে না, পুড়তে অনেক দিন সময় লেগে যাবে। কুমারিল ভট্ট ছিলেন তখনকার দিনের সব থেকে বড় পণ্ডিত, তিনি শুধু বলেছেন 'যদি বেদ প্রমাণ হয়'। এই 'যদি' শব্দটা বলেছেন 'আমি এত বড় পাপ করলাম', সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তিনি নিজে তুষাগ্নির উপর বসে গেছেন। কিন্তু তাঁর কাছে আর কোন উপায়ও ছিল না, বৌদ্ধদের পরাস্ত করে বেদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাকে এসব করতে হয়েছিল। এবার তিনি তুষাগ্নিতে তিল তিল করে পুড়ছেন। তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পুড়ছে, নীচের অংশটা পুড়তে পুড়তে উপরে দিয়ে তাপ উঠছে। সেই সময় শঙ্করাচার্য ওখানে হাজির হয়েছেন। কুমারিল ভট্ট আচার্যকে বলছেন 'আমি তো ভাই তুষানলে বসে গেছি এখন আমি আর তোমার সঙ্গে কী তর্ক করব! তুমি এক কাজ কর, আমার শিষ্য মণ্ডন মিশ্র মিথিলাতে আছে (যদিও শঙ্কর বিজয় হয়েছিল মাহেষ্মতিতে) সেখানে গিয়ে তুমি তার সাথে তর্ক কর'।

আচার্য মণ্ডন মিশ্রের কাছে যেতেই মণ্ডন মিশ্র খুব রেগে গেছে। কারণ পূর্বমীমাংসক বা কর্মকাণ্ডীরা সন্ন্যাসীদের একেবারেই সহ্য করে না। ওদের বক্তব্য হল যেখানে ষোড়শ কর্মাদির অনুষ্ঠান হবে সেখানে যদি কোন সন্ন্যাসী পৌঁছে যায় তাহলে ঐ ষোড়শ কর্ম অশুদ্ধ হয়ে যাবে। মণ্ডন মিশ্র সেই সময় শ্রাদ্ধাদি কর্ম করছিলেন। আচার্য শঙ্কর যখন বলেছেন যে আমি তর্ক করতে এসেছি, তখন মণ্ডন মিশ্র রেগেমেগে বলে দিলেন – এখন যাও, আমার পিতৃদেবের শ্রাদ্ধকর্মাদি আগে শেষ হোক তারপরে দেখা যাবে। শ্রাদ্ধাদি কর্ম মিটে যাওয়ার পর এবার তর্ক শুরু হবে, তার আগে ঠিক করতে হবে বিচারক কাকে করা হবে। ঠিক হল মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী উভয় ভারতী তর্কযুদ্ধের বিচারক হবেন। উভয় ভারতী বলে দিলেন 'আমার এত সময় নেই যে বসে বসে আপনাদের যুক্তিতর্ক শুনব, ঘরে আমার অনেক কাজ আছে। আপনাদের দুজনকে দিব্য মালা পরিয়ে দিলাম, যিনি হেরে যাবেন তাঁর গলার মালা শুকিয়ে যাবে'। এরপর সাত দিন ধরে তর্ক চলেছে, সপ্তম দিবসে এসে দেখা গেল মণ্ডন মিশ্রের গলার মালা শুকিয়ে এসেছে। আচার্য শঙ্করকে বিজয়ী ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। মানুষ যখন যুক্তিতে হারতে শুরু করে তখন তার শরীর গরম হয়ে যায়, কারণ ভেতর থেকে রাগতে থাকে। রেগে গেলে শরীরে তাপ সৃষ্টি হয়, মালা গরমের ব্যাপারে খুব স্পর্শকাতর, গরমের সংস্পর্শে এলে মালার শুকিয়ে যাবে। মণ্ডন মিশ্রের মালা সঙ্গে সঙ্গে ম্লান হতে শুরু হয়ে গেছে। তখন মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী এসে আচার্যকে বলছেন 'এভাবে তো হবে না, কারণ কর্মকাণ্ড একা চলে না, কর্মকাণ্ড স্বামী ও স্ত্রী দুজনকে নিয়ে চলে। এবার আমি আপনাকে প্রশ্ন করব, আমার প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলে আপনাকে জয়ী বলে স্বীকার করা হবে না'।

উভয় ভারতী এবার আচার্যকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন। শঙ্করাচার্য জন্ম থেকেই সন্ন্যাসী, স্বামী স্ত্রী পরস্পরেরের সাথে কি করে আর কি করে না, আচার্যের জানার কথা নয়। উভয় ভারতীর প্রশ্ন শুনে আচার্যের তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাঁকে তো এবার হার স্বীকার করতে হবে। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী বলতেন, রান্নাতে যেমন মশলা দেওয়া হয় খাবারে স্বাদ আনার জন্য, এগুলোও হল গল্পের মশলা, এসব কাহিনীকে আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই। তখন আবার শঙ্করাচার্য কায়দা করে বললেন 'এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমাকে কয়েকটি দিন সময় দিতে হবে, এই কটি দিন পরে এসে আমি আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দেব'। আচার্য শঙ্কর তখন যোগবলে তাঁর স্থূল শরীরটাকে রেখে এক রাজা তখন মারা গিয়েছিল, রাজার সেই মৃত শরীরে গিয়ে ঢুকে গেছেন। রাজা বেঁচে উঠেছেন, খুব আনন্দের কথা। রাজা রাত্রিবেলা রানীর সঙ্গে আছেন আর থেকে থেকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করেছেন। রানীও চমকে উঠছেন, এই বুড়ো বয়সে রাজা হঠাৎ এইসব প্রশ্ন করছে কেন! সবই তো তারা জানা আছে। রানীর তখন সন্দেহ হয়েছ। যাই হোক আচার্য ওখান থেকে

এসে উভয় ভারতীর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এগুলো কাহিনী, খুব আক্ষরিক অর্থে এগুলোকে কখনই নিতে নেই। মূল কথা হল রাগের কথা। শুম্ভও রেগে গেছে, রেগে গিয়ে কি তর্ক করছে তা ও নিজেই বুঝতে পারছে না। তুমি তো যুদ্ধ করতে এসেছ, তোমার ক্ষমতা যদি থাকে তাহলে যুদ্ধ করে যা করার করে নাও। কিন্তু সেদিকে না গিয়ে শুম্ভ দেবীকে উল্টোপাল্টা কথা বলতে শুরু করেছে, সেই সব কথা বলতে গিয়ে শুম্ভ মা দুর্গাকে বলছে –

বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাহতিমানিনী।।৩

রে দুষ্টা দুর্গে! তুমি খুব নিজেকে নিয়ে গর্ব করছ, তোমার এই বলদর্পে গর্ব করার কিছু নেই। আসলে শুম্ভ বলতে চাইছে, প্রথম যখন সুগ্রীবকে দূত করে দেবীর কাছে পাঠিয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে শুম্ভ আর নিশুম্ভের দুজনের একজনকে বিয়ে করে নিতে। তখন তুমি বলেছিলে – আমি একা আছি, যে এসে আমাকে যুদ্ধে জয় করবে সে আমাকে নিয়ে যাবে। তারপর দেবীকে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে আসার জন্য শুম্ভ একজন একজন করে বড় বড় সেনাপতিদের বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে পাঠিয়েছিল, আর এও বলে দিয়েছিল দেবীকে যারা রক্ষা করতে আসবে তাদেরকেও পারলে শেষ করে দেবে। তাহলে এখানে দেবী একাই যুদ্ধ করুক আর তাঁকে যাঁরা রক্ষা করতে এসেছিলেন তাঁরা সবাই মিলেই যুদ্ধ করুক তাতে শুম্ভের আপত্তির কী আছে! আসলে শুম্ভ এখন রেগে গেছে। রেগে যাওয়ার জন্য কী বলছে নিজেই বুঝতে পারছে না, কোন যুক্তিতর্কের দিকে তাকাচ্ছে না। যারই ভয় আর ক্রোধ এসে গেছে এক্ষুণি সে ভুলভাল কথা বলতে শুরু করে দেবে। এদের সঙ্গে কেউ যুক্তিতর্ক করতে পারবে না। আর যার যুক্তিতর্ক উল্টোপাল্টা হচ্ছে, বুঝবেন ভেতরে ভেতরে সে রেগে আছে। কোন মানুষের কথার উপর যদি লক্ষ্য রাখা হয়, তার কথার ভাষা, কথার মধ্যে যুক্তি নির্ভরতা কতটা আছে সেটা দেখে তার ব্যক্তিত্বটা জানা যায়। যে সব কিছুর চট্ পট্ উত্তর দিয়ে দেয় বুঝতে হবে তার বুদ্ধি খুব তিক্ষ্ণ। Sharp Mindএর সব থেকে বড় শত্রু হল ছয়টি রিপু – কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। তা সে ভয়ের রিপুই হোক আর ক্রোধের রিপুই হোক। এখানে শুম্ভের ভয় বৃত্তি ক্রোধে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। শুম্ভ নিজেও জানে ও ভালো করেই বুঝতে পারছে, এত এত সৈন্য সেনাপতিরা এই দুর্গা দেবীর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারল না, সেখানে আমি একা কী করতে পারব! শুম্ভের এই কথার উত্তরে তখন দেবী যে কথা বলছেন এটিই আধ্যাত্মিকতার শেষ কথা। সেই কারণে এই মন্ত্রটি বেদান্ত দর্শনের একটি অত্যন্ত মূল্যবান মন্ত্র। দেবী বলছেন –

দেব্যুবাচ।।৪
একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ।।৫

দেবী বলছেন এই জগৎ সংসারে আমি একাই আছি, আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর আছে কে! তুমি যাদের নিয়ে আপত্তি করছিলে এই সব বিভূতি আমার, যাঁদের তুমি আমার হয়ে যুদ্ধ করতে দেখেছ এরা সবাই আমারই বিস্তার। আর তোমার যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে এই দেখ, কৌমারী, ঐন্দ্রী, ব্রাহ্মণী, বৈষ্ণবী যাঁদের তুমি দেখছিলে তারা সবাই কীভাবে আমার ভেতরেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। *একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা*, এটাই বেদান্তের শেষ কথা, এক ছাড়া দ্বিতীয় বলে কিছু নেই। আশ্চর্যজনক এটাই যে, প্রত্যেকটি ধর্মই এই একই কথা বলছে। মুসলমানরা যখন বলে লা ইলাল্লাহা তখন তারা এই একই কথা বলছে। বাইবেলে যখন বলছে In the beginning there was word, word was with God and word was God, word বলতে এখানে শক্তিকে বোঝাচ্ছে। এই শক্তি ছাড়া কিছু নেই, in the beginning the world was come out of word শব্দ থেকেই সৃষ্টি, ওই শব্দই ঈশ্বরের শক্তি। এখানে সেই শক্তিকে মা বলা হচ্ছে, *দ্বিতীয়া কা মমাপরা*, আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কে আছে! আমরা সবাই এই কথা শুনছি, শুনে মনে করছি কী ভালো কথা, কিন্তু ধারণা করে নিজেকে এই ধারণার সঙ্গে একাত্ম করে পুরো জীবনকে সেইভাবে সংগঠিত করতে কত যে জীবন লেগে যাবে আমরা চিন্তাই করতে পারব না। আমাদের এখন শুনে যেতে হবে, একবার, দুবার, বার বার, শতবার শুনে যেতে হবে, শুনতে শুনতে একদিন হঠাৎ মনের মধ্যে দপ্ করে একটা চেতনা জেগে যাবে যে এখানে কী বলছেন। তখন মনে হবে, আমি এতদিন এত বোকা ছিলাম, এই কথাটা এতদিন বুঝতে পারিনি!

কোটি কোটি সহস্র ঝিনুক সমুদ্রে পড়ে আছে। কখন সখন একটা ঝিনুকের মধ্যে ছোট্ট একটা বালির কণা ঢুকে যায়, ঢুকে যেতেই ঝিনুকের মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়, সেই আলোড়নের ফলে ঝিনুকের শরীর থেকে কিছু রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয়, সেটাই ধীরে ধীরে দামী মুক্তা হয়ে দাঁড়ায়। সেই বালিকণা এত ছোট হয় যে, মুক্তা কে ভাঙলে কিছুই পাওয়া যাবে না। আধ্যাত্মিক জীবন আসলে তাই। ঝিনুক গুলোকে যদি সমুদ্র থেকে তুলে পরিষ্কার জলে রেখে দেওয়া হয়, সেই ঝিনুক থেকে আর কোন দিন মুক্তা তৈরী হবে না। তার মানে আধ্যাত্মিক সমুদ্র থেকে তুলে এনে আমাদের যদি এই সংসার সমুদ্রে রেখে দেওয়া হয়, আর কোন দিন আমাদের জ্ঞান হবে না। লোকে বলে সংসারে থাকলে কি হবে না! কোন দিন হবে না। ভগবানও আমাদের কিছু করতে পারবেন না। সংসারে থেকে আজ পর্যন্ত কারুরই হয়নি আমাদেরও হবে না। আধ্যাত্মিক সমুদ্রে যদি পড়ে থাকে তাহলে কার হবে? গীতায় ভগবানই বলে দিয়েছেন – *মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।* কোন ঝিনুকের ভেতর কখন ওই একটি ছোট্ট বালিকণা ঢুকবে কেউ জানে না। কোন ঝিনুককে যদি জিজ্ঞেস করা হয় – বাপু! মুক্তা হওয়ার জন্য এক কণা বালির দরকার পড়ে, তা তুমি বালির কণা পেয়েছ কি? ঝিনুক গর্ব করে বলবে – কী বলছেন আপনি বালির কণা পেয়েছি কিনা! আরে বালির উপর আমি বাস করি, বালির উপর আমি শুই, বালির উপর আমি খাই। বেলুড় মঠে নিত্য যাই, ঠাকুরকে নিত্য প্রণাম করি, নিত্য চরণামৃত পান করি, প্রত্যেক উৎসবে খিচুরী প্রসাদ খাই। তাতে কী হবে! ঝিনুক হয়ে জন্মাতে থাকবে ঝিনুক হয়েই মরতে থাকবে। আর কোন কারণে একটি বালির কণা যদি ঢুকে যায় তাহলে মুক্তা হয়ে যাবে। এই সব কথার সার কখন, কবে আমার আপনার ভেতরে ঢুকবে সেখানে আমাদের কারুরই কোন হাত নেই। কঠোপনিষদে বলছেন *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যাস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্*। এই আধ্যাত্মিক সত্য কখন আমাদের বরণ করবে, আমরা কেউই জানি না। কিন্তু থাকতে হবে ওখানেই, না যদি থাকা হয় যেটুকু আশা ছিল সেটাও চলে যাবে, জীবনে আর কিছুই হবে না। যেমনি কেউ আধ্যাত্মিক সমুদ্র থেকে বেরিয়ে গেল, যেটুকু সম্ভবনা ছিল সেটুকুও নষ্ট হয়ে গেল, আর কোন আশা নেই। এখানে পড়ে থাকলে নাও হতে পারে আবার হতেও পারে। এর বাইরে থাকলে কোন দিন হবে না। এই যে কথা, দ্বিতীয়া কা মমাপরা, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কে আছে! এটাই বেদান্তের শেষ মৌলিক সিদ্ধান্ত।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা – কারও দোষ দেখো না, জগতে কেউ পর নয়। শ্রীমায়ের এই মহান উক্তি থেকে দুটো ব্যাখ্যা বেরিয়ে আসে। সত্যিই তো জগতে পর বলে কিছু কী করে হতে পারে? যখন আমরা বেদান্তের দৃষ্টিতে জগতকে দেখছি, তখন এখানে পর আসবে কোথা থেকে! ঈশ্বর ছাড়া কি কিছু আছে! ঈশ্বর ছাড়া যদি কিছু না থাকে তাহলে পর কোথা থেকে আসবে! ঈশাবাস্যোপনিষদেও তো এই কথাই বলছে, *তত্র কো মোহ কঃ শোক*। কোথা থেকে শোক আসবে, কোথা থেকে কিসের প্রতি মোহ আসবে! *একত্বং অনুপশ্যতি*, একত্ব যখন দেখে তার আর শোক মোহ হয় না। কিন্তু একত্বটাই একমাত্র চরম সত্য। অথচ আমরা জন্ম জন্মান্তর ধরে বহুত্বকেই দেখে অভ্যস্ত হয়ে আছি। যতই আমরা যা কিছু করি না কেন, এই বহুত্ব থেকে একত্বে আমরা কিছুতেই যেতে পারি না। যখন কেউ প্রচুর কষ্ট পাচ্ছে, কষ্টের দরুণ কেঁদে কেঁদে চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে, সে যদি একবার একটু একত্বকে নিয়ে ভাবে, সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরে একটা শক্তি এসে যাবে।

এর আগে আমরা যে বইয়ের কথা উল্লেখ করেছিলাম, যাতে মুম্বাইর তাজ হোটেলে যে সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ হয়েছিল, সেই ঘটনার যাঁরা সাক্ষী ছিলেন তাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথাকে সঙ্কলন করা হয়েছে। সেখানে এক ভদ্রলোকের কথা বলা হয়েছে, যিনি ঠাকুরের ভক্ত। সেখানে তিনি মায়ের এই কথা – কারও দোষ দেখো না, কেউ পর নয়, উল্লেখ করেছেন। লেখক মায়ের এই কথার অনুবাদ করেছেন – Acceptance is spirituality। সবাইকে গ্রহণ করার কথা বলছেন, এটাই একত্ব। ভদ্রলোক শুধু মায়ের এই একটি কথাকে সর্বক্ষণ মাথায় রেখে ওই action periodকে পুরোটা face করে গেছেন। এখানে যে এত লম্বা কাহিনী, ধূম্রলোচন মরছে, রক্তবীজ মরছে, নিশুম্ভ মরছে এই পুরো কাহিনীর মধ্যে এই অংশটুকু, *একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা*, এই জগতে আমি ছাড়া কে আছে, এটুকু বলার জন্য এত বড় কাহিনী দাঁড় করান হয়েছে। ঈশ্বর ছাড়া এই জগতে কারুর কোন অস্তিত্বই নেই। ঈশ্বর আর শক্তি অভেদ, মা ঈশ্বরেরই শক্তি।

লোকেরা মায়ের এই কথা বুঝতে পারবে না বলে তাই বলছেন – *পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ*, শুম্ভ! তুমি যে বললে আমি অনেক নারীর শক্তিকে আশ্রয় করে যুদ্ধ করছি, আসলে এগুলো আমারই বিভূতি, এই দেখ এরা সবাই কিভাবে আমার ভেতরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে যে এত রকম শক্তি দেখা যাচ্ছে, ব্রহ্মাণী, শিবদূতি, চামুণ্ডা, বারাহী ইত্যাদি এঁদের বলছেন মায়ের বিভূতি, মা আর মাতৃগণরা এনারা কেউই আলাদা নন। আগুন আর আগুনের স্ফুলিঙ্গ একই, আগুনের স্ফুলিঙ্গ আগুনের থেকে আলাদা নয়। অথবা বেদান্তে যেমন বলে শুদ্ধ জলে যদি শুদ্ধ জল মিশিয়ে দেওয়া হয় তখনও শুদ্ধ জলই থাকবে, শুদ্ধ জলে কোন পরিবর্তন হবে না। তখন বলছেন –

ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীৎ তদাম্বিকা।।৬

এই কথা বলার পর সবাই দেখছে সেই ব্রহ্মাণী আদি যত দেবীগণ ছিলেন সব দেবীরা অম্বিকা দেবীর শরীরে এসে মিলিয়ে গেলেন। একমাত্র অম্বিকাই তখন থাকলেন। আমরা যে জগৎ দেখছি মূলতঃ এই জগৎ মায়েরই বিভূতি। আমরা মাতৃশক্তিই বলি, ঈশ্বরের শক্তিই বলি, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিই বলি, জগতে যা কিছু দেখছি সব বিভূতি। বিভূতি মানে মায়েরই বিস্তার। আচার্য শঙ্কর বিভূতির অর্থ করতে গিয়ে একেবারে নির্দিষ্ট করে বলছেন 'বিস্তার'। আমরা শিবের বিভূতি বলতে মনে করি শিব যে ভস্ম লাগান সেটাই বিভূতি, কখনই তা নয়, শিবের আবার ভস্ম কি! আসলে এই জগৎ হল শিবেরই বিস্তার। আর মুর্খরা বিভূতিকে বানিয়ে দিল ভস্ম। শিব তাই শুধু ভস্ম লাগিয়ে যাচ্ছেন। বিভূতি মানে বিস্তার, মা! তুমি যা, সেটা তোমারই বিস্তার। মহিমার অর্থও তাই, বিস্তার। বেদের পুরুষসূক্তে *এতাবানস্য মহিমা* যখন বলছেন, তখন একই কথা বলা হচ্ছে, এই জগৎ তোমারই বিস্তার। এটা তিনিই, তিনি আর জগৎ কখন আলাদা নন। এইসব দেখিয়ে তখন মা আবার বলছেন –

দেব্যুবাচ।।৭
অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব।।৮

এই যে আমার ঐশ্বর্য দেখছ, যা কিছু ঐশ্বর্য আছে সব আমারই বিভূতি। এই ঐশ্বর্যশক্তির প্রভাবে আমি অনেক রূপে এখানে অবস্থান করছিলাম। এই দেখো আমার সব বিভূতিকে আমার মধ্যে গুটিয়ে নিলাম, আমি আগে যা ছিলাম এখন তেমনই আছি, এই যুদ্ধক্ষেত্রে এখন আমি একাই দাঁড়িয়ে আছি। আমি প্রস্তুত, তুমিও যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। যদি দরকার হয় আমি আবার আমার বিভূতি বার করে নিয়ে আসব। এখন দরকার নেই। আমরা যেমন অফিসে গিয়ে কাজ করতে বসে পকেট থেকে পেনটা টেবিলে রাখলাম, মোবাইলটা ড্রয়ারে রাখলাম, দরকারি কাগজ বার করে টেবিলে সাজিয়ে রাখলাম, এগুলো আমারই বিস্তার। বাড়ি ফেরার সময় আবার সব কটা পকেট ঢুকিয়ে নিলাম। ঠাকুর বলছেন গিন্নীরা সব কিছু একটা পুটলির মধ্যে গুছিয়ে রাখে, শশার বীজ, সমুদ্রের ফেনা সব ওই পুটলির মধ্যে যত্ন করে রাখা থাকে। যখন যেমন যেমন দরকার পড়বে বার করবে। সব মায়েরই বিভূতি, মায়েরই ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য মানে বিস্তার। বাবুর বাগান আছে, বাড়ি আছে, বাগান আর বাড়ি বাবুর ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য মানে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিস্তার। সন্তান মায়েরই বিস্তার। সেই মা যখন ঠাকুরমা হয়ে যায়, নাতি-নাতনীরাও ঠাকুরমারই বিস্তার। গীতাতে ভগবান আবার বলছেন *অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু*, সেইজন্য এই বিস্তারটা কমিয়ে আনতে হয়। বাবু বলছেন এই বাগানবাড়ি যত দূর দেখা যাচ্ছে সবটাই আমার। এটা আপনারই ব্যক্তিত্বের বিস্তার ঠিকই, কিন্তু এই বিস্তারকে কমিয়ে আনতে হবে। কমিয়ে নিয়ে আসা মানে এসবের প্রতি আসক্তি কমাতে হবে। তারপর নিজের শরীরের প্রতি আসক্তিকেও আস্তে আস্তে শেষ করতে হবে, মানে নিজের বিস্তারকে আরও গুটিয়ে নিয়ে আসা হল। এরপর ঐ ক্ষুদ্রের উপর মনকে একাগ্র করলে আসল বৃহৎ বেরিয়ে আসবে। বৃহৎ যখন এসে যাবে তখনই আসবে আসল শক্তি, এটাই আসল বিভূতি। আমার বিভূতি আছে কিনা তার শেষ পরীক্ষা হল সমাজ আমাকে মানছে কিনা, আমি যে কথা বলছি সেটাই সমাজে সবাই বেদবাক্য বলে স্বীকার করে নিচ্ছে কিনা। আপনার ঐশ্বর্য আছে কিনা, মহিমা আছে কিনা আমরা কীভাবে জানবো? আপনার বিস্তার দেখেই জানা যাবে। তাহলে সন্ন্যাসীরাও কি সাম্রাজ্য বিস্তারে নেমে পড়বে? কখনই না, সন্ন্যাসীর মুখের বাক্য, সন্ন্যাসীর

আধ্যাত্মিকতাই সন্ন্যাসীর বিস্তার। ভগবান বুদ্ধ সব কিছু ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন, তিনি দুচারটে কথা বলেছেন আজও মানুষ সেই কথা অধ্যয়ন করছে, মনন করে যাচ্ছে, বুদ্ধের বাণীকে অবলম্বন করে মানব জীবনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। আচার্য শঙ্কর যা বলেছেন আজও মানুষ সেগুলোকে চিন্তন মনন করে আধ্যাত্মিকতায় পুষ্টি লাভ করছে। যতক্ষণ ভেতরে শক্তি সঞ্চয় না হয় ততক্ষণ ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। তার মানে এই নয় যে আপনাকে টাকা-পয়সা, সম্পদ সঞ্চয় করতে নেমে পড়তে হবে, তা কখনই নয়। ওই ক্ষমতাটা আপনাকে আগে অর্জন করতে হবে, আমিও পারি এই আত্মবিশ্বাস আগে অর্জন করতে হবে।

থেইলস একজন নামকরা দার্শনিক ছিলেন। এক সময় থেইলসকে নিয়ে সবাই হাসাহাসি করত। তিনিও সবাইকে দেখে হাসতেন – এরা কেউ কোন কাজের না। কিন্তু অন্য দিকে থেইলসের প্রখর অনুমান করার ক্ষমতা, হিসাব করার ক্ষমতা ছিল। থেইলস যেখানে থাকতেন ওই অঞ্চলটা আঙুর চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। খরার জন্য পর পর কয়েক বছর ওই অঞ্চলে আঙুর চাষ একেবারেই হয়নি। কিন্তু থেইলস সেই বছর বন্যা, চন্দ্রগ্রহণ আরও অনেক কিছু দেখে হিসেব করে দেখলেন সামনের বছর আঙুরের সাংঘাতিক ফলন হবে। তিনি করলেন কি, ওই রাজ্যে আঙুর পেষাইয়ের যত কল ছিল সব কটা আগে থাকতেই ভাড়া করে নিলেন। তাঁর নিজের কোন পয়সাও ছিল না। দিদির কাছ থেকে কটি টাকা ধার নিয়ে সব আঙুর পেষাই মেশিন ভাড়া করে রেখে দিয়েছেন। যা অনুমান করেছিলেন ঠিক তাই হল, আঙুরের বাম্পার উৎপাদন হয়েছে। চাষীদের আঙুর পেষাই করতে হবে। পেষাই করতে গিয়ে দেখছে সব পেষাই মেশিনের মালিকানা থেইলসের। থেইলস আবার কি করেছেন, অন্য বছর যে রেট থাকে এই বছর মেশিন ভাড়ার রেট তার তিন গুণ করে দিয়েছেন। ওই দামে পেষাই না করেও কোন উপায়ও নেই নাহলে সব আঙুর পচে যাবে। রাতারাতি থেইলস সেই রাজ্যের বিরাট ধনী ব্যক্তিদের একজন হয়ে গেলেন। কিন্তু থেইলস সব টাকা নিলেন, নিয়ে সব টাকাটা গিয়ে দিদির হাতে তুলে দিলেন। এরপর থেকে কেউ থেইলসকে দেখে আর হাসাহাসি করত না।

ক্ষমতা আর শক্তি সবাইকেই দেখাতে হবে, তা সন্ন্যাসীই হোন আর যেই হোন। ক্ষমতা অর্জন করা কিছুই না, স্বামীজী বারবার বলছেন মনের একাগ্রতার শক্তি দিয়েই সব ক্ষমতা অর্জন করা যায়। মনের একাগ্রতা শক্তি যার ভেতরে এসে গেছে সে যা বলবে তার সামনের লোক সেই কথা শুনতে বাধ্য থাকবে। দক্ষিণেশ্বরে অধর সেন আসতেন, তিনি একদিন ঠাকুরকে বলছেন – মশাই! আপনার কোন সিদ্ধাই-টিদ্ধাই আছে? ঠাকুর বলছেন – হ্যাঁ আছে বইকি! যে ডেপুটির ভয়ে সবাই কাঁপে আমি সেই ডেপুটিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখি। অধর সেন ঠাকুরের কথা বুঝতে পারলেন না। অধর সেন তখনকার দিনের ডাকসাইটে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সেই ডাকসাইটে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকেও তো দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে দৌড়ে আসতে হচ্ছে। ঠাকুরের যদি ক্ষমতা না থাকে, আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য যদি না থাকে তাহলে অধর সেন ঠাকুরের কাছে আসবে কেন!

এসব কথা বলার পর আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে যাচ্ছে। এরপর দেবী আর শুম্ভের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। আর নানা রকমের দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগের বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন।

ঋষিরুবাচ।।৯
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং দেব্যাঃ শুম্ভস্য চোভয়োঃ।
পশ্যতাং সর্বদেবানামসুরাণাঞ্চ দারুণম্।।১০
শরবর্ষৈঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈস্তথাস্ত্রৈশ্চৈব দারুণৈঃ।
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ ভূয়ঃ সর্বলোকভয়ঙ্করম্।।১১

ঋষি বলছেন – তখন দেবতা আর দানবদের সামনে দেবী আর শুম্ভ দুজনে প্রবল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। বলছেন বাণের বর্ষণ, তীক্ষ্ণ শস্ত্র আর মারাত্মক ধরণের অস্ত্রের সংঘাতে এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হল যে তিনটে লোকে সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে ভয় উৎপন্ন হয়ে গেল।

দিব্যান্যস্ত্রাণি শতশো মুমুচে যান্যথাম্বিকা।
বভঞ্জ তানি দৈত্যেন্দ্রস্তৎপ্রতিঘাতকর্তৃভিঃ।।১২

মুক্তানি তেন চাস্ত্রাণি দিব্যানি পরমেশ্বরী।
বভঞ্জ লীলয়ৈবোগ্রহুঙ্কারোচ্চারণাদিভিঃ।।১৩

দেবী যেমন যেমন শত শত দিব্য অস্ত্র শুম্ভের প্রতি নিক্ষেপ করছেন, তেমন তেমন শুম্ভও প্রতিরোধক শস্ত্র দ্বারা দেবীর সব অস্ত্রই প্রতিকার করে দিচ্ছে। আবার শুম্ভও যে সব দিব্য অস্ত্র চালাচ্ছে, দেবী শুধু হুঙ্কার দিয়েই শুম্ভের সব অস্ত্র ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছেন। প্রথমেই যদি বলে দেওয়া হয় শুম্ভ বিরাট যোদ্ধা, তাহলে আমাদের মনে কোন রকম প্রতিক্রিয়া হবে না। শুম্ভ কত বড় শক্তিমান এই প্রতিক্রিয়া তৈরী করার জন্য প্রথমে রক্তবীজ দিয়ে দেখানো হয়েছে। রক্তবীজ একজন সামান্য সেনাপতি মাত্র, কিন্তু তারই যদি এই ক্ষমতা হয় তাহলে আসল লোকটির কি ক্ষমতা হতে পারে! একটা মানুষের ক্ষমতা বোঝা যাবে, তার অধীনে কারা আছে তাদের দেখে। শুম্ভের কী ক্ষমতা আমাদের জানার কোন সুযোগ নেই, কিন্তু রক্তবীজের বর্ণনা দিয়ে শুম্ভের ক্ষমতা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুম্ভের সেই ক্ষমতা এখন দেখা যাচ্ছে, মা দিব্যাস্ত্র চালাচ্ছেন, শুম্ভও দিব্যাস্ত্র চালাচ্ছে, মা শুম্ভের অস্ত্র কেটে দিচ্ছেন, শুম্ভও মায়ের সব অস্ত্র প্রতিকার করে দিচ্ছে। মায়ের শক্তির স্তুতি করার জন্য বলছেন, দেবী আবার শুধু হুং বীজ মন্ত্রেই শুম্ভের অস্ত্রগুলোকে গুড়িয়ে দিচ্ছেন। এরপর একবার মা এই অস্ত্র নিক্ষেপ করছেন, শুম্ভও মায়ের প্রতি অন্য অস্ত্র নিক্ষেপ করছে।

ততঃ শরশতৈর্দেবীমাচ্ছাদয়ত সোঽসুরঃ।
সাপি তৎ কুপিতা দেবী ধনুশ্চিচ্ছেদ চেষুভিঃ।।১৪

ছিন্নে ধনুষি দৈত্যেন্দ্রস্তথা শক্তিমথাদদে।
চিচ্ছেদ দেবী চক্রেণ তামপ্যস্য করস্থিতাম্।।১৫

ততঃ খড়্গমুপাদায় শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ।
অভ্যধাবৎ তদা দেবীং দৈত্যানামধিপেশ্বরঃ।।১৬

তস্যাপতত এবাশু খড়্গং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
ধনুর্মুক্তৈঃ শিতৈর্বাণৈশ্চর্ম চার্ককরামলম্।।১৭

শুম্ভ তখন শত শত বাণ দিয়ে দেবীকে একেবারে আচ্ছাদিত করে দিয়েছে, দেবী আবার এক বাণ দিয়ে শুম্ভের ধনুক কেটে দিলেন। ধনুক কেটে যাওয়ার পর শুম্ভ শক্তি অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে, কিন্তু সেই অস্ত্র শুম্ভের হাতেই থেকে গেল। কারণ মা একটা চক্র দিয়ে সেই শক্তি অস্ত্রকে ভেঙ্গে দিলেন। শক্তি অস্ত্র বিফল হতেই শুম্ভ একটা ঢাল, যে ঢাল আকাশের একশটা পূর্ণচন্দ্রের কিরণের মত উজ্জ্বল, আর তার সাথে একটা খড়্গ নিয়ে দেবীর দিকে ধেয়ে গেছে। শুম্ভকে তীব্র গতিতে এগিয়ে আসতে দেখেই চণ্ডিকা তাঁর ধনুক থেকে ছোঁড়া বাণ দিয়ে সূর্যপ্রভাসম উজ্জ্বল ঢাল ও খড়্গকে সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে দিলেন।

হতাশ্বঃ স তদা দৈত্যশ্ছিন্নধন্বা বিসারথিঃ।
জগ্রাহ মুদ্গরং ঘোরমম্বিকানিধনোদ্যতঃ।।১৮

মা যে দিব্য অস্ত্রগুলো চালিয়েছিলেন তাতে শুম্ভের রথের ঘোড়া আর সারথি মারা গেছে, ধনুক তো আগেই কেটে দিয়েছিলেন। এর আগে আমরা উল্লেখ করেছিলাম, রথ থেকে যারা যুদ্ধ করত তাদের ধনুকটা অন্য ধরণের হত। রথে চড়ে যারা যুদ্ধ করত, রথ কোন রকমে ভেঙে গেলে এরা খুব অসহায় হয়ে যেত। কারণ তার অস্ত্র-শস্ত্র সব রথের মধ্যেই মজুত থাকত। এই ধরণের কোন পরিস্থিতি হলে, মহাভারতে এর আরও খুব সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়, এরা গদা আর তা নাহলে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে নেমে পড়তেন। অভিমন্যুর রথ ভেঙে দেওয়ার পর সে যখন গদা নিয়ে যুদ্ধ করতে নেমে পড়েছে তখন কৌরবদের পক্ষ থেকে সেগুলোকেও কেটে দেওয়া হয়েছিল। কোন অস্ত্রই নেই কিন্তু অভিমন্যু রথের চাকা নিয়েই কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নেমে পড়েছিল। এখানেও শুম্ভ ভয়ঙ্কর এক মুদ্গর অর্থাৎ গদা নিয়ে দেবী অম্বিকাকে বধ করার জন্য তীব্র বেগে তেড়ে গেছে।

চিচ্ছেদাপততস্তস্য মুদ্গরং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তথাপি সোঽভ্যধাবত্তাং মুষ্টিমুদ্যম্য বেগবান্।।১৯

ওইভাবে শুম্ভকে তীব্র বেগে ধাবিত হয়ে আসতে দেখে মা তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে সেই মুদ্গরকে কেটে ফেললেন। শুম্ভের এখন আর কিছু নেই, রথ, ঘোড়া, সারথি, হাতী কিছুই নেই, এখন মুখোমুখি লড়াই ছাড়া আর কোন উপায় নেই। শুম্ভের হাতে কোন অস্ত্র নেই কিন্তু তার বলশালী বাহু তো আছে, সে তখন মুষ্টি উদ্যত করে তীব্রবেগে দেবীর দিকে ধেয়ে গেছে। তখন বলছেন –

স মুষ্টিং পাতয়ামাস হৃদয়ে দৈত্যপুঙ্গবঃ।
দেব্যাস্তঞ্চাপি সা দেবী তলেনোরস্যতাড়য়ৎ।।২০
তলপ্রহারাভিহতো নিপপাত মহীতলে।
স দৈত্যরাজঃ সহসা পুনরেব তথোত্থিতঃ।।২১

শুম্ভ তখন গিয়ে মুষ্টি দিয়ে সজোরে মায়ের বুকে এক মুষ্টাঘাত করেছে। শুম্ভের তখন আর কোন জ্ঞান নেই, কে সুন্দরী, কে নারী এসবের কোন বোধ নেই, তার মাথায় একটাই চিন্তা এই নারীকে যে করেই হোক আমায় শেষ করে দিতে হবে। এখন দুজনেই সামনা সামনি এসে গেছেন, অস্ত্র-শস্ত্র আর চালানো যাবে না। মাও তখন শুম্ভের বুকে হাতের তালু দিয়ে সজোরে এক চপেটাঘাত করেছেন। দেবী এত জোরে চড় মেরেছেন যে, ওই চড় খেয়েই শুম্ভ মাটিতে পড়ে গেল। শুম্ভ মাটিতে পড়ে গেছে, ওই দেখে সবাই ভাবছে ওখানেই শুম্ভ বুঝি শেষ হয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ আবার সে আগের মত উঠে দাঁড়াল। আগেকার দিনে ঘোড়ার পিঠে বসে যারা যুদ্ধ করত তাদের কাছে মাঝে মাঝে এই ধরণের এক মহা সমস্যা হত। ঘোড়ার পিঠে যুদ্ধ করতে করতে দেখছে সামনে শত্রু পক্ষের একজন সৈন্য মাটিতে উল্টে পড়ে আছে, সে ভাবছে মরে পড়ে আছে বা মুর্ছিত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু যেমনি কাছে এসে যেত হঠাৎ দুম্ করে লাফিয়ে উঠে আক্রমণ করে ঘোড়সওয়ারকে মেরে দিত। শুম্ভও ওই রকম দুম্ করে লাফিয়ে উঠেছে।

একটা খুব মজার ঘটনা আছে। ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল খুব বনেদি পরিবারের সন্তান ছিলেন। ওনার ঠাকুর্দাও ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। চার্চিলদের বিরাট বড় বাগানবাড়ি ছিল, যেখানে বন, খাল, ছোট ছোট সাঁকো কৃত্রিম ভাবে তৈরী করা ছিল। উইনস্টন চার্চিল বারো-তেরো বছর বয়সে বাড়ির অন্য বাচ্চাদের সাথে একবার লুকোচুরি খেলছিল। একটা জায়গায় এসে উইনস্টন ধরা পড়ে যাচ্ছিল বুঝতে পেরে সাঁকো থেকে খালের জলে ঝাঁপ দিয়ে দেয়। অগভীর ও অল্প জলে ঝাঁপ দেওয়ার ফলে উইনস্টন হাঁটুতে চোট পায়। সঙ্গে সঙ্গে ভাই বোনরা সবাই ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে এসেছে। হাঁটুর এই আঘাত চার্চিলের সারাটা জীবন থেকে গিয়েছিল। ঐ সময় সবারই ভয় হয়ে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত খোঁড়া না হয়ে যায়। সবারই মন খারাপ বাচ্চাটার কি হয়ে গেল, সারাটা জীবন খোঁড়া ল্যাঙড়া হয়ে থাকতে হবে কিনা কে জানে! পরে লেখাপড়া শেষ করার পর চার্চিল সেনাবাহিনীতে যোগ দেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি অনেক দিন সেনাবাহিনীতে কাজ করেছিলেন। ভারতেও তিনি একটা ব্যাটেলিয়ানের কমাণ্ডার হয়ে বেশ কিছু দিন ছিলেন। পরের দিকে আফ্রিকার একটা যুদ্ধে ব্রিটিশ আর্মির সাথে তাঁকে অংশ নিতে হয়েছিল। ব্রিটিশ আর্মিরা সেই যুদ্ধে প্রায় জিতে গিয়েছিল। চার্চিলের পায়ে হাল্কা সমস্যা ছিল বলে সেনাবাহিনীর কিছু কিছু নিয়ম থেকে তাঁকে অব্যবহতি দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য কমাণ্ডারদের নিয়ম ছিল তারা সবাই পায়ে হেঁটে যাবে আর হেঁটে যাওয়ার সময় কড়া নিয়ম ছিল সঙ্গে ভারী রাইফেল নিয়ে চলতে হবে। কিন্তু চার্চিলকে এই ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হয়েছিল, ঘোড়ার পিঠে করে যাওয়ার অনুমতি তাঁর ছিল। আর ঘোড়া পিঠে যারা যেত তাদের রাইফেল নিয়ে যেতে হত না, তাদের সঙ্গে রিভলবার নিয়ে যেতে হবে। ব্রিটিশ আর্মিরা পুরো যুদ্ধটা প্রায় জিতে গিয়েছিল। যুদ্ধভূমির মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ আর্মিরা ফিরে আসছে। পথের মধ্যে অনেক আফ্রিকান মৃত সৈন্য পড়ে আছে। হঠাৎ একটা মৃত আফ্রিকান সৈন্য দুম্ করে লাফিয়ে উঠে হাতে একটা ধারাল অস্ত্র নিয়ে সোজা চার্চিলকে আক্রমণ করল। আসলে সৈন্যটি মরার মত পড়েছিল, এরাও ভেবেছিল সৈন্যটি মারা গেছে। আফ্রিকান সৈন্যটি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল কমাণ্ডারটাকে মারতে হবে তাই মরার ভাণ করে পড়েছিল। চার্চিল নিমেষের মধ্যে রিভলবারটা বার করে গুলি করে লোকটিকে মেরে দিল। রিভলবার না থেকে যদি সেদিন রাইফেল সঙ্গে থাকত তাহলে রাইফেলকে তুলে ঠিক করতে করতে ততক্ষণে সে

চার্চিলকে প্রাণেই মেরে ফেলত। শুধু রিভলবার থাকার জন্য বেঁচে গেলেন। পরে চার্চিল নিজের আত্মজীবনী লেখার সময় পরিষ্কার বলছেন ওই বাচ্চা বয়সে যদি আমি পায়ে চোট না পেতাম, তাহলে আমাকে সেদিন রাইফেল নিয়ে মাটিতে হেঁটে চলতে হত। ঐ অবস্থায় রাইফেল বার করে ওকে মারার আমি সময় পেতাম না আর আমিও আজকে বেঁচে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম না।

উৎপত্য চ প্রগৃহ্যোচৈর্দেবীং গগনমাস্থিতঃ।
তত্রাপি সা নিরাধারা যুযুধে তেন চণ্ডিকা।।২২

শুম্ভ যে কত শক্তিশালী ছিল, সেটাই এই মন্ত্রে দেখান হচ্ছে। দেবীর চড় খেয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর, *সহসা পুনরেব তথোত্থিতঃ*, হঠাৎ করে উঠে সে দেবীকে ধরে এক বিশাল লাফ দিয়ে আকাশে উঠে গেল। দুজনেই আকাশে এখন নিরাধারা, ওই আকাশেই দেবী শুম্ভের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

নিযুদ্ধং খে তদা দৈত্যশ্চণ্ডিকা চ পরস্পরম্
চক্রতুঃ প্রথমং সিদ্ধমুনিবিস্ময়কারকম্।।২৩

এই অবস্থায় তখন আকাশমার্গেই দেবী ও অসুররাজ শুম্ভ পরস্পর যুদ্ধ করতে লাগলেন। এই আশ্চর্যজনক যুদ্ধ সিদ্ধ ও মুনিদেরও বিস্ময় উৎপাদন করল। সিদ্ধ মানে সিদ্ধ পুরুষ নয়, ঋষিদেরই একটা শ্রেণী। সিদ্ধরা হলেন সব থেকে শ্রেষ্ঠ ঋষি। সৃষ্ট জগতে সিদ্ধরাই শ্রেষ্ঠতম। গীতাতে উল্লেখ করছেন *সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ*, সিদ্ধদের মধ্যে আমি কপিল মুনি। ঠাকুর যেমন বলছেন স্বামীজীকে তিনি সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে নিয়ে এসেছেন, সপ্তর্ষি মণ্ডল পুরাণে ভালো মতই ছিল, কিন্তু বেদে সেই ভাবে এর কোন উল্লেখ নেই। এই সৃষ্ট জগতে যেমন দেবতারা আছেন, গন্ধর্ব, যক্ষ, অপ্সরা আছেন তেমনি মানুষও আছে, পশু পাখিও আছে, এদের মধ্যে সিদ্ধ যাঁরা তাঁরা সবার উপরে। কোন কোন জায়গায় কাহিনীতে বিদ্যাধর, গন্ধর্বদের সঙ্গে এক করে উল্লেখ করা হয় যে সিদ্ধরা আকাশ পথে বিচরণ করেন, কিন্তু এগুলো ঠিক নয়, সিদ্ধ মানেই খুব উচ্চ ঋষি। পৃথিবীতে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তপস্বী তাঁরা মুনি আর দেবলোকের যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা সিদ্ধ। সিদ্ধ আর মুনিদের জ্ঞানের কাছে আর কেউ নেই। কিন্তু সিদ্ধরা হলেন শেষ কথা, কারণ তাঁরা দেবলোকেরও ঋষি। বলছেন, এনারাও এই অভূতপূর্ব যুদ্ধ দেখে বিস্মিত হয়ে গেছেন, এমন যুদ্ধ তাঁরা কখন দেখেননি। দেবী আর শুম্ভ আকাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। আমরা যদি বলি তাঁরা দিব্য শক্তির সাহায্যে আকাশে দাঁড়িয়ে আছে, এখানে কিন্তু সেই অর্থে বলছেন না। এখানে এই অর্থে বলছেন, আমরা যদি কোন নর্দমা পার হতে চাই, লাফ দিয়ে আমাকে পার হতে হবে। আর যদি কোন বাচ্চা থাকে তাহলে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে লাফ দিয়ে পার হব। এই ব্যাপারটাকেই এখানে আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শুম্ভের এত জোর যে এমন শক্তিতে দেবীকে তুলে নিয়ে আকাশে লাফ দিয়েছে যে সেই শক্তিতেই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ওখানেই তাঁদের মারামারি চলছে। মাধ্যাকর্ষণের বাইরে তাঁরা চলে যাননি, কারণ মাধ্যাকর্ষণের বাইরে যদি চলে যেতেন তাহলে এখানে সিদ্ধ ও মুনিদের বিস্ময় হওয়ার কথা বলতেন না। তবে এগুলোকে খুব আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই। ভয়ঙ্কর রস, বিস্ময় রস কাব্যেরই অঙ্গ, সেই রসকে কাব্যের মাধ্যমে দেখানোর জন্য এই ধরণের কিছু কিছু বিস্ময়কর ব্যাপারকে নিয়ে আসতে হয়।

ততো নিযুদ্ধং সুচিরং কৃত্বা তেনাম্বিকা সহ।
উৎপাত্য ভ্রাময়ামাস চিক্ষেপ ধরণীতলে।।২৪

পৌরাণিক কাহিনীতে আকাশে যুদ্ধের বর্ণনা করাটা খুবই প্রিয় বিষয়। কোন জিনিষকে যদি খুব গুরুত্ব দিতে হয় তখন সেটাকে আকাশ যুদ্ধে নিয়ে যাবে। বলছেন, আকাশে অনেকক্ষণ শুম্ভের সাথে যুদ্ধ করার পর মা শুম্ভকে ধরে ওপরে তুলে খুব করে ঘোরাতে লাগলেন, ঘোরাতে ঘোরাতে মাটিতে আছাড় মেরে ফেলে দিলেন।

স ক্ষিপ্তো ধরণীং প্রাপ্য মুষ্টিমুদ্যম্য বেগতঃ।
অভ্যধাবত দুষ্টাত্মা চণ্ডিকানিধনেচ্ছয়া।।২৫

তমায়ান্তং ততো দেবী সর্বদৈত্যজনেশ্বরম্।
জগত্যাং পাতয়ামাস ভিত্ত্বা শূলেন বক্ষসি।।২৬

স গতাসু পপাতোর্ব্যাং দেবীশূলাগ্রবিক্ষতঃ।
চালয়ন্ সকলাং পৃথ্বীং সাব্ধিদ্বীপাং সপর্বতাম্।।২৭

আকাশ থেকে আছাড় মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছেন, তাই বলে কি শুম্ভ মরে গেছে! না, সে অসুরদের রাজা, প্রচণ্ড বলশালী ও পরাক্রমশালী। সে আবার মুষ্টি উদ্যত করে অম্বিকা দেবীকে বধ করার জন্য তীব্র বেগে ধেয়ে গেছে। শুম্ভকে তীব্র বেগে দৌড়ে আসতে দেখে মা সঙ্গে সঙ্গে শূল বার করলেন। এবার শুম্ভের নিজের গতি আর মায়ের শক্তিতে নিক্ষিপ্ত শূলের গতি, দুটো তীব্র গতি যখন বিপরীত দিক থেকে এসে পরস্পর ধাক্কা লাগলে যা হয়, শুম্ভেরও তাই হল। শূলের আঘাতে শুম্ভের বুক এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে ভূপাতিত হয়ে পড়ে গেল আর ওখানেই শুম্ভের প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেল। শুম্ভ কোন সাধারণ অসুর ছিল না, অসুরদের রাজা, সেই শুম্ভ যখন ভূতলে নিপাতিত হচ্ছে তখন কি রকম পরিস্থিতি হতে পারে, তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। ভাগবতে যখন পূতনা বধের বর্ণনা করা হচ্ছে সেখানেও তখন এই একই দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন পূতনার প্রাণ শুষে নিয়েছেন তখন পূতনার বাইরের মুখোশটা নষ্ট হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে যেতেই পূতনার বাস্তবিক রূপটা বেরিয়ে এসেছে। পূতনার ওই বিশাল শরীর যখন মাটিতে এসে পড়েছে তখন পৃথিবীটা নড়ে উঠেছে। এখানেও ঠিক ওই একই বর্ণনা দিচ্ছেন। দেবীর শূলাগ্রের আঘাতে শুম্ভের প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল, শুম্ভ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল আর তখন সাগর, দ্বীপ ও পর্বতসমেত সমস্ত পৃথিবী কাঁপতে শুরু করল।

আমাদের ঋষিদের ভূগোলের জ্ঞান খুব সীমিত ছিল, কিন্তু তার মধ্যেও তাঁরা সমুদ্র জিনিষটা ভালো মতই জানতেন। জানতেন বলে এটা বুঝতেন যে পৃথিবীর পরে সমুদ্র আছে সমুদ্রের পরে আরও কিছু তো থাকতে হবে। ওনাদের ধারণা ছিল, ভারতবর্ষের চারিদিকে সমুদ্র। কারণ যেদিক থেকেই যান না কেন একদিকে হিমালয় আর অন্য দিকে গেলে সমুদ্র, সমুদ্রের আবার যেন শেষ নেই। কিন্তু কোথাও না কোথাও সমুদ্রকে তো শেষ হতে হবে। পুরাণ রচয়িতাদের মধ্যে, এমনকি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেও সমুদ্রকে নিয়ে অনেক রকম বিচিত্র ধারণা ছিল। যেমন তাঁদের একটা ধারণা ছিল, সাতটা সমুদ্র সাতটা দ্বীপকে ঘিরে রেখেছে। এই সাতটা দ্বীপের প্রথম দ্বীপের নাম জম্বু দ্বীপ, ভারতবর্ষ এই জম্বুদ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। জম্বু দ্বীপের চারদিকে নোনা জলের সমুদ্র। তারপর প্লক্ষ দ্বীপ, এর চারিদিকে আখের রসের সমুদ্র। তৃতীয় দ্বীপের নাম শাল্মীল, এর চারিদিকে মদের সমুদ্র। চতুর্থ কুশদ্বীপ, এর চারিদিকে ঘিয়ের সমুদ্র। পঞ্চম দ্বীপের নাম ক্রৌঞ্চ দ্বীপ, এর চারিদিকে দুধের সমুদ্র। ষষ্ঠ দ্বীপ শাকদ্বীপ, এই দ্বীপের সমুদ্র ঘোলের। শেষে সপ্তম দ্বীপের নাম পুস্কর দ্বীপ, এর চারিদিকে যে সমুদ্র তার জল মিষ্টি। এগুলো পুরোপুরি কাল্পনিক, খুব একটা আক্ষরিক অর্থে নিতে নেই।

হিন্দুদের পুরাণ শাস্ত্রে এই সাতটা দ্বীপ আর সমুদ্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সমুদ্রের মাঝখানে যে জায়গা ছিল সেটাকে দ্বীপ বলতেন। আমরা যে অর্থে দ্বীপ বলি, সেই অর্থে নয়, এনাদের কাছে দ্বীপ মানে সাতখানা বৃত্তাকার হয়ে আছে। বহির্জগত সম্বন্ধে যতক্ষণ প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হবে ততক্ষণ এই ধরণের বিচিত্র রকমের ধারণার জন্ম নেবে। অন্তর্জগতের জ্ঞানের উন্মোচন যদি না হয়ে থাকে তখন অন্তর্জগত সম্বন্ধেও মানুষের বিচিত্র রকম ধারণা তৈরী হতে থাকবে। মন, বুদ্ধি, আত্মার বিষয় হল অন্তর্জগতের বিষয়, বিজ্ঞানীরা বহির্জগতের জ্ঞানকে উন্মোচন করেছে কিন্তু অন্তর্জগতের জ্ঞানকে নিয়ে তাদের কোন চর্চা নেই বলে অন্তর্জগত সম্বন্ধে তাদের ভাসা ভাসা জ্ঞান। একটু একটু হয়ত জানলেন তারপর বাকিটা নিজের কল্পনা ও বুদ্ধি দিয়ে কিছু একটা ধারণা করিয়ে দেবেন। পুরাণ বা গ্রীক মাইথোলজিতে বহির্জগতের ব্যাপারে সমস্যা হল, তাঁরা কিছু জিনিষ দেখেছেন, কিছু জিনিষ জেনেছেন আর বাকিটা কল্পনা দিয়ে পূরণ করে দিয়েছেন। বিজ্ঞানের অনেক অগ্রগতি হওয়ার জন্য আমরা এখন বহির্জগতের ব্যাপারে অনেক কিছু জেনে গেছি। কিন্তু অন্তর্জগতের ক্ষেত্রে গিয়ে পুরাণ রচয়িতাদের বহির্জগৎ সম্বন্ধে যে রকম ভাসা ভাসা জ্ঞান ছিল, অন্তর্জগতের ব্যাপারে আমাদের সেই রকম ভাসা ভাসা জ্ঞানই থেকে গেছে। আমরা জানি আমার মন আছে, আমার মস্তিষ্ক আছে, মস্তিষ্কে নিওরোনের কার্য হচ্ছে, এই ধারণাগুলো আমাদের আছে। সেখান থেকে আমরা ঈশ্বরের ব্যাপারে কতকগুলি বিচিত্র ধারণা করে নিয়েছি। কথামৃত, গীতা, উপনিষদের কিছু কিছু কথা শুনছি, কিছু পড়েছি, সব মিলিয়ে ঈশ্বরের ব্যাপারে আমরা বিচিত্র রকমের ধারণা করে নিয়েছি। আচার্যের কাছে ঠিক ঠিক শাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু হওয়ার পর দেখছি এটার সঙ্গে ওটা মিলছে না, ওটার সঙ্গে সেটা

মিলছে না। মনের মধ্যে তখন কত রকম বোকা বোকা প্রশ্নের উদয় হয়। এখানে যে দ্বীপ শব্দটা এসেছে, এই দ্বীপও তাঁদের ওই বিচিত্র ধারণা থেকে এসেছে আর ভারতবর্ষ যে দ্বীপে অবস্থিত তার নাম জম্বু দ্বীপ। ইদানিং কালের অনেক পণ্ডিতরা আবার সাতটা দ্বীপকে বর্তমান সাতটা মহাদেশের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তার সাথে তাঁরা বিভিন্ন জলের সাতটা সমুদ্রকে মেলাতে পারছেন না। যাই হোক, শুম্ভের দেহ যখন ভূপাতিত হল তখন তার শরীরের ভারে সমস্ত পৃথিবীটা কেঁপে উঠেছে। শুম্ভের যে কত প্রচণ্ড শক্তি ছিল সেটাকে বোঝাবার জন্য এই ভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে। তারপর বলছেন –

ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্মলঞ্চাভবন্নভঃ।।২৮

দুরাত্মা শুম্ভের নাশ হয়ে গেছে। এর আগে নিশুম্ভ, রক্তবীজ, চণ্ড ও মুণ্ড এবং ধূম্রলোচন বধ হয়ে গেছে, তার সাথে সমস্ত অসুরকুলের বিনাশ হয়ে গেছে। বাকি ছিল এই দুরাত্মা শুম্ভ, তারও নাশ হয়ে গেল। ত্রিলোকের সমস্ত অশুভ শক্তির বিনাশ হয়ে গেছে, তাই সমস্ত জগৎ অতি প্রসন্ন হয়ে গেছে। আনন্দই আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা। আমাদের শরীরের সাম্য ভাব নষ্ট হলে যা হবে, জগতের সাম্য ভাব ভঙ্গ হলেও তাই হবে। অতিরিক্ত খাওয়া-দাওয়া করলে শরীরের সাম্য ভাব বিগড়ে যাবে, পেটের গণ্ডগোল শুরু হয়ে যাবে, কম খেলে খিদে পাবে, রাতে ঘুম হবে না। খাওয়া, ঘুম ঠিক থাকলে শরীরও সুস্থ থাকে, তখন মনও প্রফুল্ল থাকে। জগতের ঋতম অনুযায়ী যদি সব কিছু চলতে থাকে তখন জগতের সব কিছুই ঠিকঠাক থাকে। ঋতম যদি বিগড়ে যায় জগতের সব কিছুতেই বিশৃঙ্খল এসে যাবে, অশান্তি ছাড়া তখন আর কিছু থাকবে না। তার মানে শুম্ভ আর নিশুম্ভ জগতের ঋতমকে বিগড়ে দিয়েছিল, এরা নিহত হতেই তাই স্বাভাবিক ভাবে জগতের সব কিছু শান্ত ভাব ধারণ করে প্রসন্ন হয়ে গেছে। আমরা কি করে বুঝবো জগৎ শান্ত হয়ে প্রসন্ন হয়ে গেছে? তখন বলছেন –

উৎপাতমেঘাঃ সোল্কা যে প্রাগাসংস্তে শমং যযুঃ।
সরিতো মার্গবাহিন্যস্তথাসংস্তত্র পাতিতে।।২৯

আকাশে প্রচুর উল্কাপাৎ হলে, প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ হলে, ধুমকেত দেখা গেলে তখন এগুলোকে বলা হয় উৎপাতসূচক। আসলে যে জিনিষকে দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি সেই জিনিষটা না হয়ে যদি অন্য রকম হয় তখনই আমরা সেটাকে অস্বাভাবিক বলে মনে করি, স্বাভাবিকের বাইরে কিছু হলে আমরা চমকে উঠি, তখন ভাবি কিছু অমঙ্গল হয়েছে। রাজস্থানের মরুভূমির কোন এক গ্রামাঞ্চলে একবার বারো বছর যাবৎ কোন বৃষ্টিপাত হয়নি। ওরা জানে জল মানে কুয়ো থেকে আসে। বারো বছর পর যেদিন বৃষ্টি পড়ছে তখন সেখানকার সব বাচ্চা 'বাবা গো! মা গো' বলে ভয়ে চিৎকার করে পালিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। ওরা জন্ম থেকে জানে জল মানে মাটির তলা থেকে আসে, আকাশ থেকে যে জল পড়তে পারে তারা জানেই না। ওদের বাবা-মায়েরা বোঝাচ্ছে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু ওরা কোন দিন দেখেইনি বৃষ্টি কি জিনিষ। ঠিক তেমনি, উল্কাপাত, ধূমকেতু এগুলো প্রকৃতির স্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু এই স্বাভাবিক ঘটনাকে আমরা উৎপাতের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছি। মানুষের মন পাঁচটা জিনিষকে নিয়ে থাকতে চায়, তার মধ্যে ভয় আতঙ্ক এগুলোকে নিয়েও সে থাকে। এনাদের এই ধরণের অনেক কিছু লক্ষণ বিচার ছিল, এই হলে উৎপাত হবে, এই হলে ভালো হবে ইত্যাদি। বাল্মীকি রামায়ণে তো এগুলোকে একটা মাত্রা ছাড়িয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। যে কোন ঘটনা স্বাভাবিকের বাইরে গেলেই এনারা তার পেছনে একটা অর্থ দাঁড় করিয়ে দিতেন। উল্কাপাত, প্রচুর বৃষ্টিপাত এগুলোকে এনারা উৎপাতের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। এর সাথে বলছেন, দৈত্যদের নিধনের পরেই নদীগুলো নিজেদের পথ দিয়ে ঠিক ভাবে প্রবাহিত হতে শুরু করল। নদী যেন এতদিন ট্যাঁরা ব্যাঁকা বা উল্টো দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল, এখন সোজা পথে প্রবাহিত হতে শুরু করে দিয়েছে। এগুলো সব কাব্যিক বর্ণনা।

ইবনবতুতা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরতে ঘুরতে বাংলার মাটিতে এসেছেন। তখনকার বঙ্গদেশের বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলছেন, এখানে প্রচুর ধান হয় আর এখানকার সব কিছু খুব সস্তা। জিনিষপত্র এত সস্তায় ভারতে আর কোথাও পাওয়া যেত না। তারপরেই বলছেন অন্যান্য জায়গার লোকেরা বাংলাকে খুব ভয় পায় –

ঠিক এই ভাষায় বলছেন – it's a hail with some blessings। মুঘল আমলে কোন রাজপুত সৈন্যকে শাস্তি দিতে হলে সবাইকে বাংলাতে পাঠিয়ে দিত। বাংলাকে সবার ভয় পাওয়ার কারণ ছিল এখানকার জলবায়ু আর ম্যালেরিয়া, কলেরার মত ভয়ঙ্কর রোগের মহামারী। অনেকে মজা করে বলে এসব উৎপাত হওয়াটাই তো স্বাভাবিক কারণ এখানে গঙ্গা ছয় ঘণ্টা অন্তর তার গতিপথ পাল্টায়, জোয়ারের সময় উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় আর ভাটার সময় দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। এখনও উত্তর ভারত থেকে প্রথম কেউ কলকাতায় এলে আঁতকে ওঠে, এই কিছুক্ষণ আগে দেখলাম গঙ্গা দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল আর এখন উত্তর দিকে যাচ্ছে কী করে! কলকাতার ওর দেশওয়ালী ভাই বুঝিয়ে দেয়, ইয়ে কলকাত্তা হ্যায়, ইঁহা কা গঙ্গা ছে ঘণ্টা উধার ছে ঘণ্টা উধার বহতি হ্যায়। ঋষিরাও হয়ত নদীকে এভাবে তার গতিপথ পাল্টে নিতে দেখে থাকবেন। বাংলাতে অসুর বেশী বলে গঙ্গা ছয় ঘণ্টা উত্তরে যায় আর ছয় ঘণ্টা দক্ষিণে যায়। যদিও এগুলো মজা করে বলা হয়। কবিরা আবার অসুরের অনাচারের মাত্রাকে কাব্যিক ভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য বলেন, এমনই এদের অনাচার যে, নদী পর্যন্ত উল্টো দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। কবিরা যখন একটা ভাবকে প্রকাশ করতে চাইছেন কিন্তু পারছেন না, তখন তাঁরা এই ধরণের উপমার সাহায্য নেন। কবিদের এই স্বাধীনতা দেওয়া থাকে। কিন্তু গদ্য লেখকদের এই স্বাধীনতা থাকে না। কবিতায় দু-তিনটি শব্দে বা তিন চার লাইনে একটা ভাব বা দৃশ্যকে বোঝাবার জন্য কবিদের উপমাগুলো আমাদের কাছে অবাক লাগে বলে আমরা প্রশ্ন করি, এটা কি করে হতে পারে! সেইজন্য গদ্য লেখা খুব কঠিন। গদ্য লেখক যদি এইভাবে লেখে – এমনই সে অনাচার ছিল যে নদী উল্টো দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে দিল, এরপর পাতা উল্টে পরের পাতা কেউ পড়তে চাইবে না। গদ্য লেখার থেকে কবিতা লেখা অনেক সহজ। একজন বলছিলেন – কবিতা লেখা হল যে কোন গাছের তলায় খাটিয়া পেতে শুয়ে পড়া আর গদ্যলেখন হল একটা রাজমহল তৈরী করা। কোন উপন্যাসে যখন একটা চরিত্রের মনের ভাব ও আবেগকে ভাষার বাঁধুনি দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয় তখন সেই কাজ খুব কঠিন হয়, কিন্তু ওই চরিত্ররই মনের আবেগকে কবিতায় দুটো একটা শব্দ আর উপমা দিয়ে সহজে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়।

আসলে আমরা চিরদিন সাহিত্যে, কাব্যে কতকগুলি শব্দ নিয়ে খেলা করে গেছি, আদর্শ, ভাব এগুলোকে নিয়ে কখন নাড়াচাড়া করিনি। এখানেই স্বামীজীর বিশেষত্ব, তিনি শুধু আদর্শ ও ভাবকে নিয়ে খেলা করে গেছেন। যে জিনিষগুলো একমাত্র অধ্যাত্ম জগতের স্বামীজি সেগুলোকেও সাধারণ মানুষের উপযোগী করে নিয়ে এলেন। সহজ কথা হল তত্ত্বমসি, তুমি সেই, তুমি পূর্ণব্রহ্ম। আমাদের ভেতরে যে চৈতন্য আছে এটাই পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। পূর্ণ ব্রহ্মই সচ্চিদানন্দ। আমার ভেতরে যে চৈতন্য সত্তা আছে সেটাই সচ্চিদানন্দ। তাঁর ইচ্ছা বিনা গাছের পাতাটিও নড়ে। তাঁর বলতে কে? সচ্চিদানন্দ। তার মানে সচ্চিদানন্দের ইচ্ছা বিনা গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ে না। কিন্তু তুমিই তো সেই সচ্চিদানন্দ, তাহলে তোমার ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতা নড়বে না। তার মানে তোমার ভেতরে অনন্ত শক্তি বিদ্যমান হয়ে আছে। স্বামীজী তো এই কথাই বলছেন – তোমার ভেতরে অনন্ত শক্তি, কেন তুমি চোখের জল ফেলছ। একেবারেই অত্যন্ত সহজ যুক্তি। তত্ত্বমসি, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম এগুলো উপনিষদের খুব নামকরা কথা। তত্ত্বমসি কথার শাব্দিক অর্থ খুব সহজ – তুমি সেই। তুমি সেই মানে কি? তুমি সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ। You are the lion, Strength is life weakness is death স্বামীজীর এই ধরণের সিংহগর্জনের মত বাণীগুলো কিছুই না, উপনিষদের একটা খুব সহজ বাক্যের অনুবাদ। কি সেই বাক্য? তত্ত্বমসি। স্বামীজী গীতা উপনিষদের কথাগুলোকে শুধু অনুবাদ করেননি, ব্যাখ্যা করে সবার জীবনের জন্য ব্যবহারোপযোগী করে দিয়েছেন। তত্ত্বমসির অনুবাদ তুমি সেই বলে দিচ্ছেন না, সাথে সাথে এর প্রয়োগের পন্থাগুলোকেও সহজ করে নামিয়ে দিয়েছেন। কীভাবে নামিয়েছেন? তোমার ভেতরে সেই অনন্ত শক্তি, তুমি চিরপবিত্র। এই কথাগুলো স্বামীজী সেই তত্ত্বমসি থেকেই বলছেন। স্বামীজীর সমগ্র রচনাবলী উপনিষদের কিছু কথা, গীতার কিছু কথাকে অনুবাদ করে নিজের ভাষায়, নিজের মত করে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। স্বামীজীর বাণী ও রচনা থেকে আমরা প্রচুর শক্তি পাচ্ছি, প্রচুর প্রেরণা পাচ্ছি, এগুলো আর কিছু না, কয়েকটি আধ্যাত্মিক সত্য যে সত্যকে বেদান্ত দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে। স্বামীজী আধ্যাত্মিক সত্তাকেও জাগতিক বিচারধারাতে নামিয়ে নিয়ে এসেছেন। যেগুলো জাগতিক জিনিষ সেগুলোকে আমরা আধ্যাত্মিক স্তরে নিয়ে যেতে পারছি না। এই যে উল্কাপাত, ভূমিকম্প, নদীর জোয়ার-

ভাঁটা এগুলো জাগতিক ঘটনা, প্রকৃতির নিয়মে হয়ে যাচ্ছে, এগুলোকে কখনই আধ্যাত্মিক স্তরে নিয়ে যাওয়া যায় না। স্বামীজী বলছেন আধ্যাত্মিক জিনিষকে তুমি জাগতিক স্তরে নামাও, তাহলেই তোমার মধ্যেকার অনন্ত শক্তি বেরিয়ে আসার সুযোগ পেয়ে যাবে। আমরা তা না করে, জাগতিক জিনিষগুলোকে আধ্যাত্মিক স্তরে নিয়ে নিজেদের দুর্বল করে দিচ্ছি। যাই হোক, এখন সব উৎপাত বন্ধ হয়ে গেছে আর সাথে সাথে –

ততো দেবগণাঃ সর্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ।
বভূবুর্নিহতে তস্মিন্ গন্ধর্বা ললিতং জগুঃ।।৩০

অবাদয়ংস্তথৈবান্যে ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সুপ্রভোহভূদ্দিবাকরঃ।।৩১

জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তদিগ্‌জনিতস্বনাঃ।।৩২

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভবধো নাম দশমোহধ্যায়ঃ।।

শুম্ভের নিধন হতেই দেবতাদের মন-প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল, গন্ধর্বগণ মধুর স্বরে গান গাইতে শুরু করলেন, সাথে অন্যান্য গন্ধর্বরা বাজনা বাজাতে লাগল এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করতে লাগল। পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল, সূর্যের কিরণও উজ্জ্বল হয়ে গেল। যজ্ঞশালার নির্বাপিত অগ্নি নিজে থেকেই আবার প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। ধর্মীয় কর্মকে ইঙ্গিত করার জন্য যজ্ঞের অগ্নিই শেষ কথা। এখানে যে শুভ কর্ম হচ্ছে যজ্ঞই তার প্রমাণ। অন্যান্য ধর্মে বিভিন্ন ধর্মীয় কাজ দিয়ে বোঝা যায় যে এখানে ধর্মীয় কিছু হচ্ছে। কিন্তু তখনকার দিনে ভারতে যজ্ঞই ছিল প্রধান ধর্মীয় কর্ম। সেই যজ্ঞের অগ্নিই নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল, এটাই প্রমাণ করছে যে আসুরিক শক্তি ধর্মকে নাশ করে দিয়ে অধর্মকে বলশালী করে দেয়। আর সব দিক থেকে যে ভয়ঙ্কর অশুভ শব্দ হচ্ছিল সেগুলো সব বন্ধ হতেই চারিদিক শান্ত হয়ে সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেল।

এরপর শুরু হবে একাদশ অধ্যায়, চণ্ডীর এই অধ্যায়টি প্রথম, চতুর্থ আর পঞ্চম অধ্যায়ের মতই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এখানে দেবীর যে স্তুতি করা হয়েছে, তাতে অত্যন্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলিকে খুব সুন্দর ভাবে স্থাপন করা হয়েছে। আমাদের যত দেবী ও দেবতা আছেন তাঁদের সবারই বিশেষ বিশেষ স্তুতি আছে। দেবী স্তুতি যখন করা হয় তখন তা চণ্ডী থেকেই নেওয়া হয়। আর হাজার হাজার বছর ধরে এই দেবী স্তুতি মানুষ নিত্য পাঠ করে করে এর এমন একটি শক্তি হয়ে গেছে যে, এই স্তুতিগুলি পাঠ করলেই ভেতরে একটা শক্তির জাগরণ হয়ে যায়। আমরা পরের অধ্যায়ে সেই দেবস্তুতিকে নিয়েই আলোচনা করতে যাচ্ছি।

অথ একাদশোঽধ্যায়ঃ

নারায়ণীস্তুতি ও দেবী কর্তৃক দেবতাদের বরদান

ওঁ ঋষিরুবাচ।।১

দেব্যা হতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে
সেন্দ্রাঃ সুরা বহ্নিপুরোগমাস্তাম্।
কাত্যায়নীং তুষ্টুবুরিষ্টলম্ভাদ্
বিকাসিবক্ত্রাস্তু বিকাসিতাশাঃ।।২

দেবী কর্তৃক শুম্ভ আর তার সেনাদের বিনাশ হয়ে গেল, বলছেন তাতে মহাসুরেন্দ্র, দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের চেহারাটা দীপ্তমান হয়ে গেছে। ইন্দ্র এত দিন দেবতাদের শত্রু অসুরদের দ্বারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। ইন্দ্রের মনের মধ্যে সব সময় একটা ভয় সংশয় ছিল, এই বুঝি আবার শত্রু আক্রমণ করল। কারুর মনের মধ্যে যদি প্রাণ নাশের সংশয় এসে যায়, সর্বস্ব হরণের শঙ্কা যদি হয়ে থাকে তার চেহারাটা সঙ্গে সঙ্গে অন্য রকম হয়ে যায়। যাই হোক, তখন সব দেবতারা অগ্নিকে পুরোভাগে রেখে কাত্যায়নী দেবীর স্তুতি করতে লাগলেন। অগ্নি দেবতা হলেন দেবতাদের পুরোহিত। হিন্দুদের একটা মৌলিক ধারণা হল, আমাদের যা কিছু শুভ কর্ম করা হয় সবটাই যজ্ঞ। হিন্দুদের কাছে জন্ম নেওয়া থেকে শুরু করে বিবাহ সবটাই যজ্ঞ আবার সন্তানোৎপত্তিও যজ্ঞ, আমরা যা কিছু পেতে চাইছি সেটাও যজ্ঞের মাধ্যমেই আসবে। আবার দান, দক্ষিণাদির মত ধর্মীয় কর্ম সেটাও যজ্ঞ, তীর্থে যাওয়া সেটাও যজ্ঞ। যজ্ঞ যে করা হবে এটিও একটি শুভকর্ম। ওনারা মনে করতেন পুরোহিত না হলে কোন শুভকর্ম নিষ্পন্ন করা যাবে না। পাণ্ডবরা যখন রাজা হলেন তখন তাঁদের বলা হল তোমরা একজনকে ব্রাহ্মণকে রাজপুরোহিত রূপে নিয়োগ কর। তখন পাণ্ডবরা ধৌম্য নামে একজন খুব বড় ঋষি ছিলেন, তাঁকে রাজপুরোহিত রূপে বরণ করলেন। রাজপুরোহিতরা যেমন দরকার পড়লে বুদ্ধি পরমার্শ দিতেন তেমনি আবার পূজো অর্চনাও করতেন। অগ্নি ছিলেন দেবতাদের পুরোহিত। রাজারা যখন কোথাও যেতেন তখন সম্মানার্থে তাঁরা তাঁদের পুরোহিতকে অগ্রবর্তি করে চলতেন। গ্রীক ট্রাডিশানে কিছু ছবি আছে যেখানে দেখা যায় যখন চাষবাশ হত তখন রাজা ক্ষেতে প্রথম বীজ রোপণ করতে যাচ্ছেন আর তাঁর সামনে সামনে পুরোহিত যাচ্ছেন। পুরোহিতরা সেই সময় মঙ্গলসূচক স্তোত্রগুলো পাঠ করতে করতে যেতেন। স্তোত্র পাঠ করে অশুভ যা কিছু আছে সব কিছুকে যেন সরিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। আমরা এগুলোকে মানতে পারি আবার নাও মানতে পারি, কিন্তু আমাদের জীবনে এই সব উপাচারের একটা বিশেষ স্থান আছে।

জিম করবেটের একটা কাহিনী আছে। একবার তাঁকে এক নরখাদক বাঘকে শিকার করার দায়ীত্ব দেওয়া হয়। শিকারের জন্য জঙ্গলের দিকে যাচ্ছেন। মাল বহনের জন্য তাঁর সাথে দু তিনজন লোকও আছে। এরা সবাই জিম করবেটকে খুব ভালোবাসত। একটা নদী পার হওয়ার সময় সাথের লোকরা জিম করবেটকে বলল, স্যার আপনাকে এখানে আগে একটু অপেক্ষা করতে হবে, এই পাহাড়ের উপর দেবীর এক মন্দির আছে, ওখানে আমরা আগে পূজো দেবো তারপর নদী পার হব, দেবী প্রণাম না করে গেলে আমাদের কার্য সফল হবে না। জিম করবেট তখন বর্ণনা করছেন, আমার লোকরা মন্দিরে পূজা দিতে যাওয়া মানে আসা-যাওয়াতে চার ঘন্টার মত সময় নষ্ট হয়ে যাওয়া, মানে একটা দিনই নষ্ট হওয়া। কিন্তু যদি মন্দিরে পূজো দিয়ে এদের আত্মবল বেড়ে যায় সেটা এই চার-পাঁচ ঘন্টা সময়ের থেকে অনেক মূল্যবান। জিম করবেট তখন খুব সুন্দর কথা বলছেন, একটা দিন বাঁচিয়ে নেওয়ার অপেক্ষা ওদের এই আত্মবল বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরী, যার জন্য আমি এখানে একটা দিন নিশ্চয়ই অপেক্ষা করতে পারি। তিনি জানেন, ওরা যে মন্দিরে যাচ্ছে, সেখানে প্রার্থনা করছে তখন ওদের এই দৃঢ়বল নিশ্চয়ই হবে যে আমরা জয়ী হব। একটি দিন না বাঁচিয়ে ওদের মন্দিরে যাওয়া যদি আটকে দেওয়া হয় তাহলে সারা রাস্থা ওদের মন খুঁত খুঁত করতে থাকবে, এতে মনে চাঞ্চল্য আসবে যা কিনা কখনই কাম্য নয়। প্রার্থনা করে সফল হতেও পারে নাও হতে পারে কিন্তু এই খুঁত খুঁতানির জন্য মনের চাঞ্চল্যটা একবারের জন্যও আসবে না। শুভ কাজ করার আগে যে উপাচার না করলে মনের মধ্যে খুঁত খুঁত করবে সেই উপাচার না করার থেকে করে নেওয়া অনেক ভালো। কিন্তু ধর্ম যদি আপনাকে বিপরীত কিছু করতে বলে, তখন আপনি নাও করতে পারেন। যেমন

আপনার পা কেটে গেছে, আপনি জানেন আপনাকে ডাক্তারের কাছে গিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। সেখানে কোন সাধুবাবা এসে যদি বলে আপনি যদি এতে ওষুধ লাগান তাহলে পায়ের অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাবে, আমি মন্ত্র দিয়ে আপনার পায়ের ক্ষত সারিয়ে দিচ্ছি। আপনি জানেন মন্ত্র দিয়ে পায়ের ক্ষত সারে না, সেইজন্য এদের কথামত কাজ করতে নেই। কিন্তু যদি বলে আপনি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন যান, কিন্তু দাঁড়ান আমি দুটো মন্ত্র পড়ে দিচ্ছি। তখন অবশ্যই তা করাতে পারেন। এগুলো কোন অন্ধ বিশ্বাস নয়, সবই তো মনের শক্তি। এই ধরণের উপাচারে আমাদের মনের শক্তি বৃদ্ধি করে। আপনি নিজে থেকে কিছু করছেন ঠিক আছে, কিন্তু পরিবারে কিংবা সামাজিক জীবনে কোন দৈবী সহয়তার জন্য বা অশুভ বাধাগুলোকে দূর করার জন্য শুভ কাজ করতে গেলে পুরোহিতের দরকার। আমাদের হিন্দুদের সব পরিবারেই একজন পারিবারিক পুরোহিত থাকেন। সেই রকম দেবতাদের পুরোহিত হলেন অগ্নি দেবতা। দেবতাদের এত বড় অভিষ্ট সিদ্ধি হয়ে গেছে, স্বাভাবিক ভাবেই দেবতাদের চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে গেছে। তখন সবাই অগ্নিকে পুরোভাগে রেখে দেবী কাত্যায়নীর স্তুতি করতে লাগলেন।

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য।।৩

প্রপন্ন মানে যিনি শরণাপন্ন হয়েছেন, দেবীকে স্তুতি করে বলছেন – হে দেবী আপনি আপনার শরণাগতের দুঃখ পীড়াকে দূর করে দেন। *প্রসীদ* মানে প্রসন্ন হওয়া। *দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ*, এর পুরো অর্থ দাঁড়াল – হে শরণাগতের দুঃখহারিণী দেবী! আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন। কাত্যায়নী দেবী, যিনি শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করেছেন তিনি হলে *মাতর্জগতোঽখিলস্য*, অখিল জগতের জননী। মজার ব্যাপার হল, শুম্ভ ও নিশুম্ভের যে শক্তি, সেই শক্তিও মায়েরই শক্তি। কিন্তু মায়ের শক্তি হলেও এদের শক্তি জগতের ভারসাম্যকে নষ্ট করে দিচ্ছে। বাড়িতে চারটে সন্তান আছে, চারজন একই মায়েরই সন্তান। তাদের একজন খুব বদমাইশি করছে, বাকি তিনজনকে জ্বালাতন করে সব সময় অতিষ্ঠ করে রেখেছে। মা গিয়ে তাকে দুটো চড় লাগিয়ে দিলেন, ছেলেটি ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এও সেই রকম, শুম্ভ বেশি বাঁদরামো করছিল, মা গিয়ে তাকে চড় মেরে দৃশ্য থেকে সরিয়ে দিলেন। হে নিখিল বিশ্বের জননী! আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন। *প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং*, পাহি মানে রক্ষা করা, হে বিশ্বেশ্বরি! আপনি সমস্ত বিশ্বকে রক্ষা করুন। *ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য*, বলছেন, চর ও অচর যে জগৎ, এই জগতের তুমি হলে ঈশ্বরী। ঈশাবাস্যোপনিষদের প্রথম মন্ত্রেরও এই একই ভাব *ওঁ ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ*, এই জগতে যা কিছু আছে সব কিছুকে ঈশ্বরীয় ভাবনা দিয়ে দেখতে হয়, আসলে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই কিনা। এখানেও তাই, চর ও অচর বলতে যা কিছু আছে সবারই আপনি অধীশ্বরী। সাপের শরীরেও তিনি, ব্যাঙের শরীরেও তিনি আর মানুষের শরীরেরও তিনিই বিদ্যমান। এখন তিনি কাকে বাঁচাবেন আর কাকে মারবেন, সাপ একদিকে ব্যাঙকে খাবে, ব্যাঙ আবার পোকামাকড় খাচ্ছে, অন্য দিকে সাপ আবার মানুষকে ছোবল দেবে। আর মানুষ সাপের মাথায় লাঠি মারবে আর ব্যাঙকে ধরে চচ্চড়ি বানাবে। বিদেশে ব্যাঙের ঠ্যাঙের ডিশ খুব আভিজাত্যের ব্যাপার। সবাইকেই মাকে দেখতে হয়। এই যে বিরাট খাদ্য-খাদকের চক্র, এই চক্রকে ভাবতে গেলেই অবাক হয়ে যেতে হয়, যিনি ঈশ্বর তাঁকে এই চক্রের সবারই কথা ভাবতে হয়। সাপেরাও জানে সব ব্যাঙ খেয়ে নিলে নতুন ব্যাঙ আসবে না, তাই সামলে সুমলে খায়। একমাত্র মানুষ এমন এক প্রাণি যার লোভের আর শেষ নেই। মা সবাইকেই সামলাচ্ছেন। এই যে বলছেন মা হলেন *চরাচরস্য*, মা কীভাবে চরাচরস্য হয়ে আছেন? তখন বলছেন –

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতৎ
আপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্যে।।৪

দেবতারা দেবীর স্তুতি করে বলছেন – *আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা*, আপনিই এই জগতের একমাত্র আধার। কারণ *মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি*, মহী মানে পৃথিবী, আমরা সবাই এই পৃথিবীর উপরেই আশ্রয় করে আছি, মা যিনি, তিনিই এই পৃথিবী রূপে বিরাজিতা। এখানে দেবীর স্তুতি করা হচ্ছে, স্তুতির আবার একটা ব্যাখ্যাও হয়। ঠাকুরের সমসাময়িক কিছু সাধকদের বর্ণনায় আমরা পাই, তাঁরা যখন স্তোত্র পাঠ করতেন তখন ভাবে গদ্‌গদ হয় তাঁদের চোখ দিয়ে প্রেমাশ্রু বেরিয়ে আসত, বুক রক্তিম হয়ে যেত ইত্যাদি। এই ধরণের স্তোত্র পাঠের যেমন গুরুত্ব আছে, তার সাথে এইসব স্তোত্রের অন্য একটা দিকও আছে। যখন এই ধরণের স্তোত্রের ভাবকে চিন্তা করা হবে, স্তোত্রে ঠিক কি জিনিষ বলতে চাইছে, সেখান থেকে যখন আরেক ধাপ এগোবে তখন দেখা যাবে তাঁর মনটা কোথায় হারিয়ে গেছে। এই ব্যাপারটাই ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিয়ে বলছেন – একজন গান করছে ‘নিতাই আমার মাতা হাতি’। গান করতে করতে তার ভাব হতে শুরু করেছে, তখন শুধু নিতাইয়ের ভাবে বিভোর হয়ে গেছে। ঠাকুর বলছেন যে, এমন ভাবে বিভোর হয়ে গেছে যে গানের পুরো লাইনটাও আর বলতে পারছে না, বলছে মাতা হাতি, তারপর মাতাও বলতে পারছে না, শুধু হাতি হাতি করছে, শেষে শুধু ‘হা’ টুকু বলতে পারছে। আধ্যাত্মিকতার গভীরে না যাওয়া পর্যন্ত স্তুতি বা স্তোত্র পাঠের সুদূর প্রসারী প্রভাবের মাত্রাটা বোঝা যাবে না।

যিনি ঈশ্বরের শক্তিকে নিজের মধ্যে অনুভব করতে চাইছেন, প্রথমে তাঁর শুরু হয় শুভ আর বৃহৎকে দিয়ে, আর ওখান থেকেই মানুষ প্রথমে মায়ের দিব্য প্রকাশকে দেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে শেখে। কারুর প্রতি যদি খুব ভালোবাসা হয়, আর তাকে যদি দেখতে খুব সুন্দর হয় তখন প্রথমেই এই বলে শুরু করবে – your face is so divine। কোন সুন্দর জিনিষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশকেই আমরা দেখতে অভ্যস্ত। ঠাকুর বলছেন, দক্ষিণেশ্বরে বাবুরা বেড়াতে এসে ফুল দেখে বলে ‘ঈশ্বর কী বিউটিফুল ফুল করেছেন’। যে কোন সুন্দর জিনিষ দেখলে, ফুল হোক, চেহারা হোক, সুন্দর জিনিষ দেখলেই ঈশ্বরের ভাব চলে আসে। ঠিক তেমনি যখন বৃহৎ কিছু দেখলে, সমুদ্রের বালুকাময় তটভূমিতে দাঁড়ালে বা হিমালয়ের দিকে তাকালে মনের মধ্যে একটা বিরাটের ভাব উদয় হয়। বিরাট কিছু দেখলে মনে হয় – ঈশ্বরের কী ক্ষমতা! প্রথম ধাপ হল ঈশ্বর সুন্দর জিনিষ, বিরাটকে সৃষ্টি করেছেন। সেই ধাপ থেকে যখন আরও গভীর যাবে তখন দেখে, ঈশ্বর ছাড়া এই জিনিষ হতে পারে না, ঈশ্বরই এটা হয়েছেন। সেখান থেকে শেষ ধাপে এসে দেখে ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। এই তিনটে ধাপে চলে, প্রথমে ঈশ্বরই এটা করেছেন, দ্বিতীয় ঈশ্বরই এটা হয়েছেন আর শেষে ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। আমরা যখন কোন কিছু তৈরী করি, যেমন একটা বাড়ি তৈরী করলাম, কিন্তু এই বাড়িকে আধার করে সবাই দাঁড়িয়ে থাকবে এই মনোভাব নিয়ে কোন কিছু তৈরী করা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন। অথচ এই পৃথিবীকে আধার করে এত লোকজন, পশুপাখি, গাছপালা, ঘরবাড়ি, পাহাড়, নদী দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে পৃথিবীই সব কিছুর আধার। পৃথিবীকে আধার করে যে সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে, এর জন্য একটা বিশেষ ক্ষমতার দরকার। তখন প্রথম ধাপ হল ঈশ্বর এই পৃথিবীকে তৈরী করে রেখেছেন। তারপর বলছেন – না, ঈশ্বরই এই পৃথিবী হয়েছেন। গীতায় ভগবান বলছেন *গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা*, আমার ওজঃ দিয়ে এই পৃথিবীকে আমি ধারণ করে আছি। এখানেও সেই একই কথা বলা হচ্ছে। ঈশ্বর এই পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন, আর দ্বিতীয় ধাপে বলছেন, ঈশ্বরই এই পৃথিবী হয়েছেন। এখানে দেবতারা তাই বলছেন – *মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি*, আপনিই পৃথিবী রূপে সব কিছুকে ধারণ করে আছেন। সেখান থেকে শেষ ধাপে গিয়ে দেখবে – যাবতীয় যা কিছু হয়েছে সব ঈশ্বর বা মা হয়েছেন।

প্রথমে বলছেন *আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা*, আপনি সব কিছুর আধার। গ্লাশে জল আছে, তার মানে জলের আধার এই গ্লাশ, গ্লাশের আধার এই টেবিল, টেবিলের আধার ঘরের মেঝে। কিন্তু সব কিছুর আধার হল পৃথিবী। তাই না, জল যখন বাষ্প হয়ে যাচ্ছে, সেই বাষ্পকে যে বাতাস ধরে আছে, ওই বাতাস রূপে মায়ই বিরাজ করছেন। জলে মাছ আছে, মাছের আধার জল, ওই জলও মায়ই হয়ছেন। *আধাতভূতা জগতস্ত্বমেকা* যখন বলছেন তখন শুধু *মহীস্বরূপেণ* রূপেই নয়, যা কিছু আছে তার সব কিছুর আধার হলেন মা। একটা মশা আমার গালে রক্ত খেয়ে আপনার গালে গিয়ে বসল। যদি জিজ্ঞেস করা হয় মশাটা মাটিতে পড়ছে না কেন? আপনি বলবেন, ঈশ্বরের শক্তিতে সে শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। যারা বিজ্ঞানী তারা বলবে বাতাসের বোয়েনসির নিয়মের জন্য পড়ছে না। সমুদ্রের জলের গভীরে কত রকমের মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাছ সমুদ্রের জলে ডুবে যাচ্ছে না কেন? কারণ জল

মাছকে ধারণ করে আছে, তেমনি বাতাস মশাকে ধারণ করে আছে। যিনি ঈশ্বর তিনি এই বাতাস রূপে আছেন, যিনি ঈশ্বর তিনিই জল রূপে আছেন, তিনিই আবার পৃথিবী রূপেও আছেন। তার মানে আরও সহজ ভাবে বলা যেতে পারে, জল ছেড়ে দিন, বাতাস ছেড়ে দিন, পৃথিবীই সব কিছুর আধার। দেবতারা তাই বলছেন *মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি*।

এর সাথে বলছেন *অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতৎ*, মা! একদিকে তুমি যেমন পৃথিবীর আধার হয়ে সব কিছুর আশ্রয়স্বরূপা, আবার তুমি জল রূপ ধারণ করে সমস্ত জগতকে তৃপ্ত করছ। জগতে যত কিছু সৃষ্ট পদার্থ আছে, সব কিছু কোন না কোন ভাবে জলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বৈজ্ঞানিকরা বলছেন সমুদ্র থেকেই সব কিছুর জন্ম হয়েছে। তার মানে সব কিছু কোন না কোন ভাবে জলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এখানে কিন্তু কোন জীববিদ্যার বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে না। আমাদের দৃশ্য জগতে যা কিছু দেখছি, বুঝছি সবই কোন না কোন ভাবে জলের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আছে। এখন যদি বলা হয় কিছু কিছু পদার্থ আছে যা জলের বিপরীত, তখন সেটাও মা। পৃথিবী রূপে মা সব কিছু ধারণ করে আছেন আর জল রূপে তিনি ব্যপ্ত হয়ে জগতকে তৃপ্ত করছেন। সেইজন্য মা হলেন সব কিছুর আধার।

যাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি তাঁকে খুশি করার জন্য আমরা তাঁর স্তুতি করি। স্তুতি যখন করা হয় তখন তাঁর বৈশিষ্ট্যকে নিয়েই স্তুতি করা হয়। এখানে তাই মায়ের বৈশিষ্ট্য গুলিকেই স্তুতিতে রাখা হচ্ছে। মানুষকে স্তুতি করা আর ঈশ্বরকে স্তুতি করার মধ্যে সব থেকে বড় পার্থক্য হল, মানুষকে স্তুতি করার জন্য যখন তার মিথ্যা স্তুতি করা হয় তখন মানুষ বিশ্বাস করে নেয়। যে কোন মানুষ নিজের স্তুতি শুনতে ভালোবাসে আর শুনতে তার ভালও লাগে। মিষ্ট ভাষী মানুষ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে বোকা মানুষের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেয়। কিন্তু দেবতাদের যে স্তুতি এখানে তাঁরা কোন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে নিজেদের মিষ্ট ভাষিত্বকে জাহির করছেন না, সত্য ভাষণের জন্যও বলা হচ্ছে না। এখানে কতকগুলি আধ্যাত্মিক সত্যকে নিয়ে আসা হচ্ছে। কেউ হিমালয়ের কোন উচ্চ শিখরে নির্জন জায়গায় গিয়ে হিমালয়ের ঐ বিশালত্বের দিকে তাকিয়ে শুধু যদি ভাবে *এতাবানস্য মহিমা*, এই উত্তুঙ্গ হিমালয় তাঁরই মহিমা, এই হিমালয় তাঁরই বিস্তার, কিছুক্ষণের জন্য হলেও তার মন অন্য এক রাজ্যে চলে যাবে। একদিন এমন হল যে বাড়িতে জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে সবারই খুব জলের কষ্ট হয়ে গেল, তারপর জল যখন স্বাভাবিক ভাবে আসতে শুরু করল তখন মনে করছি *অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতৎ*, মা! তুমিই জল রূপে অবস্থান করে সমস্ত প্রাণীকে তৃপ্ত করছ। জল মায়েরই রূপ, ঠাকুর বলছেন অপো নারায়ণ। এভাবেই স্তুতি করা হয়, এতে সত্যও কিছু নেই আর মিথ্যাও কিছু নেই, এর মধ্যে একটা ধ্যানের মূল্য আছে। গঙ্গার ঘাটে বসে যদি ভাবি, এই গঙ্গাকে নিয়ে কত গান, কত স্তব রচিত হয়েছে। গঙ্গা, গঙ্গার জল সমস্ত জগতকে তৃপ্ত করছে, মা নিজেই এই গঙ্গা রূপে হয়ে আছেন। এতে নিজের অন্তর অন্য ভাবে তৃপ্ত হয়।

যে কোন চিন্তন যখন আমাদের ভেতর থেকে না আসে ততক্ষণ ওই চিন্তন আমার নিজস্ব নয়। বেশির ভাগ কবিরা জড় প্রকৃতিকে বর্ণনা করেন, সেই বর্ণনাই যখন ভাগবতাদি গ্রন্থে আসে তখন এই জড়কেই সেই চৈতন্যের মহিমা রূপে দেখান হয়। সাধকরা যখন প্রকৃতিকে দেখেন তখন তাঁরা জড় প্রকৃতিকে দেখেন না, তাঁরা দেখেন চৈতন্যই প্রকৃতি রূপে দাঁড়িয়ে আছে। উপনিষদে বলছে সূর্য চন্দ্র তাঁর নেত্র, এই কথা বলার পর সূর্য চন্দ্র প্রকৃতির কি করে হবে! গীতাতে ভগবান বলছেন আমি এই হয়েছি, আমি সেই হয়েছি, যা কিছু দেখছ সব আমারই বিস্তার, তখনও প্রকৃতি আর থাকছে না। হিমালয়ে যারা ঘুরতে যায়, তাদের কেউ ভ্রমণপিপাসু রূপে যাচ্ছে, কেউ তীর্থযাত্রী হয়ে যাচ্ছে। উত্তরাখণ্ডে ওই ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর ওখানকার পুরোহিত বলছেন – হিমালয় হল শিবক্ষেত্রে, বিয়ে করে এখানে সবাই হনিমুন করতে আসছে, এখানে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হবে নাতো আর কোথায় হবে! আধ্যাত্মিক পুরুষ যেখানে ঘোরতর জড় সেখানেও চৈতন্য দেখে আর যেখানে ঘোরতর চৈতন্য বিষয়ীরা সেখানেও জড় দেখে। সাধু আর বিষয়ীর মধ্যে এটাই তফাৎ। কুকুর-কুক্কুরির মৈথুনেও ঠাকুর দেখছেন সেই সচ্চিদানন্দের চৈতন্যজ্যোতি লক্ লক্ করছে। আর যেখানে সচ্চিদানন্দের চৈতন্যজ্যোতি সদা জাগ্রত বিষয়ীরা সেখানেও হনিমুন করছে। স্তব বা স্তোত্রে কিংবা ভাগবতে যেখানে প্রকৃতির বর্ণনা করা হয় সেখানে তাঁরা দেখেন *এতাবানস্য মহিমা*, আর যে কবি প্রকৃতির পূজারী সে চৈতন্যের মধ্যেও প্রকৃতিকে দেখে। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে

বিগ্রহের অলঙ্কার কয়েকবার চুরি হয়েছে। তার মানে, ঠাকুর যাঁকে চৈতন্য দেখেছিলেন, সেই চৈতন্যকে চোর জড় দেখছে, এর থেকে বড় বিষয়ী আর কে হতে পারে! প্রকৃতির পূজারী কবিরাও জড় ছাড়া কিছু দেখতে পায় না। যাঁরা আধ্যাত্মিক জগতের লোক তাঁরা জড় বলে কিছু দেখতে পায় না। এখানে এটাই বলা হচ্ছে, পৃথিবী, জল এগুলো তো জড়, কিন্তু দেবতারা দেখছেন মা জল হয়ে রয়েছেন আর পৃথিবীটাও মায়েরই রূপ, মায়ই এই পৃথিবী হয়েছেন। এগুলো আমরা শুনি কিন্তু ধারণা করতে পারি না, আসলে আমাদের মন হল বিষয়াসক্ত, বিষয় চিন্তা দিয়ে মন আচ্ছাদিত হয়ে আছে বলে এই উচ্চ ভাবগুলি আমাদের ভেতরে ঢুকতে পারছে না। ভেতরে একবার ঢোকার পর এই ভাবকে নিয়ে যত মনন চিন্তন করবে তত এই জিনিষগুলো ভেতরে গিয়ে ধাক্কা মারতে থাকবে। কিন্তু যতক্ষণ না ওই চিন্তা-ভাবনা আমার নিজের ভেতর থেকে আসছে, ততক্ষণ অপরের চিন্তা-ভাবনা কখনই আমাদের ধাক্কা দেবে না।

তারপরে বলছেন *আপ্যায়্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্যে*, তোমার যে বীর্য, তোমার যে শক্তি এই শক্তি অলঙ্ঘ্য, দুর্লঙ্ঘ্য বলছেন না, বলছেন অলঙ্ঘ্য, একে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। অলঙ্ঘ্য দুটো জিনিষ হয়, একটা হল ঈশ্বর আর দ্বিতীয় ঈশ্বরের শক্তি, এই দুটো অলঙ্ঘ্য। ঈশ্বরকে যেমন কখন অতিক্রম করা যায় না, তেমনি ঈশ্বরের শক্তিকেও কখন অতিক্রম করা যাবে না। ঈশ্বরকে কেন অতিক্রম করা যায় না? বেদান্তের দৃষ্টিতে এর উত্তর হয়, নিজেকে নিজে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। পুরো গীতাতে ঘুরে ঘুরে এই একটি কথাই বার বার এসেছে। বেদান্তে বলছে তুমিই সেই, তাই কেউ কক্ষণ নিজেকে লঙ্ঘন করতে পারে না। স্বামীজীও বলছেন – you cannot jump out yourself। যখন বলছেন *ন হন্যমানে শরীরে*, তার মানে কেউ কখন নিজের বিনাশ করতে পারে না। কারণ নিজের উপর কখনই কার্য হয় না। আপনি বলবেন, তাহলে আত্মহত্যা যখন করছে ওটাতো নিজেকেই বিনাশ করে দিচ্ছে, এখানে কি বলবেন? শঙ্করাচার্য কি জানতেন না যে লোকেরা আত্মহত্যা করে! আচার্য কি এত বড় মুর্খ ছিলেন! অথচ মনোবিজ্ঞানের উপর আচার্যের ভাষ্যগুলো পড়তে গিয়ে মনোবিজ্ঞানীরাও অবাক হয়ে যাচ্ছেন। বেদব্যাস যখন মহাভারতে গীতার মধ্যে এই তত্ত্বটা রাখছেন তখন তিনি কি জানতেন না যে মানুষ তো আত্মহত্যা করতে পারে! আসলে আত্মহত্যায় নিজের নাশ করছে না। আপনার গলা আলাদা হাত আলাদা, সেইজন্য হাত দিয়ে গলার উপর একটা কাটারির কোপ বসিয়ে দিতে পারেন। আপনি আলাদা বিষ আলাদা, আপনি বিষকে পান করে নিতে পারেন, তাতে নিজের নাশ হয় না। ক্রিয়া কখন নিজের উপর হয় না, ডান হাত দিয়ে আমি জগতের সব কিছুকে ধরে নিতে পারব কিন্তু ডান হাতকে কখন ধরতে পারবে না। সেই রকম আত্মা কখন আত্মার নাশ করতে পারে না। আচার্য তাঁর ভাষ্যে এক জায়গায় বলছেন নিজের নাশ নিজের দ্বারা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়, এমনকি ঈশ্বরও করতে পারবেন না। এখন যদি বলা হয় ঈশ্বর অনন্ত আবার ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তাহলে এই অনন্ত ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে লঙ্ঘন করতে পারবেন কিনা বা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অনন্ত ঈশ্বরকে লঙ্ঘন করতে পারবেন কিনা! এবার অনন্ত আর সর্বশক্তিমানের মধ্যে লড়াই বাঁধবে। ঈশ্বরের অনন্তকে যদি লঙ্ঘন করে দেওয়া হয় তাহলে ঈশ্বর অনন্ত নন, আর লঙ্ঘন যদি না করতে পারেন তাহলে সর্বশক্তিমান নন। এই ধরণের যুক্তিকে তর্কশাস্ত্রে আটকে দেওয়া হয়, self contradictory statement আনা যায় না। নিজেকে নিজের উপর ক্রিয়া কখন করা যায় না। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হতে পারেন কিন্তু নিজের উপর ক্রিয়া করতে পারবেন না। তার মানে তিনি নিজের নাশ করতে পারবেন না, নিজেকে লঙ্ঘন করতে পারবেন না। সবাই জানে আগুন নিজেকে জ্বালাতে পারে না, জল নিজেকে আর্দ্র করতে পারে না। তাহলে ঈশ্বর কেন অলঙ্ঘনীয়? কারণ আপনি আর ঈশ্বর সমান। ঈশ্বর আর আপনি যদি আলাদা হন, এরপর তিনি অনন্ত হন আর যাই হন আপনি ঠিক তাঁকে লঙ্ঘন করে যাবেন। জগতে এমন কিছু নেই যা কিনা মানুষের সাধ্যের বাইরে। কিন্তু একটা কারণেই ঈশ্বরকে মানুষ লঙ্ঘন করতে পারে না, কারণ মানুষ সেটাই। মানুষ সেটাই বলে সে নিজেকে নিজে আর লঙ্ঘন করতে পারে না।

ঈশ্বর আর ঈশ্বরের শক্তি এক। সেইজন্য বলছেন *আপ্যায়্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্যে*, মায়ের বীর্য অর্থাৎ মায়ের শক্তিকে কেউ অতিক্রম করতে পারবে না। ভক্তির দৃষ্টিতে যদি এই কথাকে টেনে নিয়ে আসা হয় তখন বলবে – মা সৃষ্টি করেছেন মায়ের শক্তিকে কী করে অতিক্রম করতে পারবে! কিন্তু বেদান্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বর আর ঈশ্বরের

শক্তি এক আর মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে এক, সেইজন্য কোন দিন তাঁকে কেউ লঙ্ঘন করতে পারবে না। সাংখ্যের দৃষ্টিতে গেলে তখন আবার সমস্যা এসে যায়। কারণ সাংখ্য শক্তিকে মানে না, তারা মানে প্রকৃতিকে। সেখানে আবার পুরুষ অর্থাৎ চৈতন্য আলাদা একটি সত্তা এবং প্রকৃতি আলাদা একটি সত্তা। সেইজন্য চৈতন্য সত্তা প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করে বেরিয়ে যেতে পারে। লঙ্ঘন করুক আর যাই করুক, প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে চৈতন্য সত্তা প্রকৃতির উপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। প্রকৃতিকে যদি শক্তির সঙ্গে এক করা হয় তখন আবার সমস্যা লেগে যায়। একটু পরেই এখানেও পরমাপ্রকৃতি, মূলাপ্রকৃতি এই কথাগুলো আসবে। ঠিক ঠিক অর্থের দিক দিয়ে মেলাতে গেলে এগুলোকে কখনই মেলানো যায় না। কারণ, মানুষ প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করতে পারে, এবং করেও। সিদ্ধ পুরুষ মানেই তিনি প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করে সিদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু শক্তিকে লঙ্ঘন কেউ করতে পারবে না, ঈশ্বরকেও কেউ লঙ্ঘন করতে পারবে না। কারণ সেটাই তাঁর স্বরূপ, নিজেকে কী করে লঙ্ঘন করবে! সাংখ্য বা যোগের উদ্দেশ্যই হল প্রকৃতিকে অতিক্রম করে প্রকৃতির পারে যাওয়া। কিন্তু পরের দিকে এত রকমের দর্শন, এত রকম পরিভাষা আসার ফলে সব কিছু গুলিয়ে যায় বলে প্রকৃতি, শক্তি, মায়া এগুলোকে এক জায়গায় এনে রাখা হয়েছে। এরপর এটাকেই টেনে নিয়ে পরের মন্ত্রে বলছেন –

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।।৫

ভক্তিশাস্ত্র বা সমন্বয় শাস্ত্র সব কিছুকে নিয়ে এসে এক জায়গায় জড়ো করে দিয়ে বেরিয়ে যাবে। এরপর আপনি আপনার বুদ্ধির ক্ষমতা অনুযায়ী এগুলোকে নিয়ে ভাবতে থাকুন। উপযুক্ত আচার্যের কাছে এসব মন্ত্রের ব্যাখ্যা না শুনলে আমাদের মনে অনেক রকম সংশয় আসবে। অধ্যাত্ম রামায়ণ যেমন সমন্বয় শাস্ত্র তেমনি চণ্ডীও সমন্বয় শাস্ত্র। সমন্বয় শাস্ত্র মানেই এখানে প্রকৃতিই হোক কিংবা মায়া হোক, শক্তিই হোক আর সীতাই হোক, লক্ষ্মীই হোক সবাইকে এক জায়গায় নিয়ে এসে এক করে দেবে। কিন্তু বেদান্ত দর্শনের নিরিখে খুব চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ হলে এর একটাও তখন এক থাকবে না। বেদান্ত দর্শনের মৌলিক সিদ্ধান্তই হল শক্তির পারে কেউ যেতে পারবে না, কিন্তু প্রকৃতির পারে চলে যেতে পারবে, এখানেই শক্তি আর প্রকৃতি আলাদা হয়ে গেল।

এখানে বলছেন মা তুমিই বৈষ্ণবী শক্তি, ভগবান বিষ্ণুর যে শক্তি তা তুমি। আর তুমি *অনন্তবীর্যা*, তোমার শক্তির অন্ত নেই। *বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া*, এই জগতের যে বীজ, তুমিই সেই বীজ। *পরমাসি মায়া*, এর আগে আমরা উল্লেখ করেছিলাম, মানুষের মধ্যে যে মায়া থাকে তাকে মায়া বলে আর ব্রহ্মাণ্ডের স্তরে যে মায়া সেই মায়াকে বলে অবিদ্যা বা মহামায়া বা পরমাপ্রকৃতি। এইভাবে বলার উদ্দেশ্য ব্যষ্টি মায়া আর সমষ্টি মায়াকে আলাদা করে বোঝানোর জন্য। কিন্তু এর অর্থ এক। বেদান্তের শেষ কথা সচ্চিদানন্দের উপর মায়ার আবরণের জন্য তাঁকে নানা নাম ও রূপে দেখাচ্ছে। কিন্তু বেদান্তের এই শেষ কথাকে সব জায়গায় ধরে রাখা খুব কঠিন। সন্ন্যাসীরাই ধরে রাখতে পারেন না। সন্ন্যাসীদের সাধনা আলাদা, সন্ন্যাসীদের মন্ত্র আলাদা কিন্তু তাও বেদান্তের এই শেষ কথাকে তাঁরাও সব সময় ধরে রাখতে পারেন না। সচ্চিদানন্দের উপর যে মায়ার আবরণ পড়ছে, সৃষ্টি সেখান থেকে হচ্ছে। গীতায় ভগবান বলছেন, *তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্*, আমিই সেই বীজ প্রদান করি। মাঠে চাষীরা যেভাবে বীজ বপন করে ভগবান কি সেভাবে বীজ বপন করেছেন? একেবারেই না, ঈশ্বরের যে শক্তি সেটাই বীজ। কিভাবে? সচ্চিদানন্দের উপর যে মায়ার আবরণ পড়ছে। সচ্চিদানন্দের উপর মায়ার আবরণ আসা মানে, এতক্ষণ যে জিনিষটা অবিদ্যমান ছিল, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যাচ্ছিল না, সেই জিনিষটা বিদ্যমান হয়ে গেল। বীজ বলতে আমরা যেমন বটবৃক্ষের বীজ মনে করি, সেই অর্থে এই বীজ নয়। সৃষ্টি যেটা শুরু হল, সেটা শুরু হল মায়া এসেছে বলে, সেইজন্য মায়াটাই বীজ। এই বীজ সূক্ষ্ম বীজ নয়, এতটাই মহৎ বীজ যে সচ্চিদানন্দকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। সেইজন্য বলছেন *বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া*।

সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ, এই মায়া যেমন সচ্চিদানন্দকে আবরিত করে রাখছে অন্য দিকে সমস্ত জগৎকে মোহিত করে রেখেছে। এখানে এসে বেদান্ত আর ভক্তিশাস্ত্র আলাদা হয়ে যায়। বেদান্ত এই কথা কখনই

বলবে না, বেদান্ত বলবে ব্যষ্টি মায়া আর সমষ্টি মায়া। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্র এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলবে মা সবাইকে সম্মোহিত করে রেখেছেন। যার প্রতি বা যে বস্তুর প্রতি আমার ভালোবাসা এসেছে, তার প্রতি বা সেই বস্তুর প্রতি আমার মোহও আসবে। গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে তমোগুণের মোহ, রজোগুণের মোহ আর সত্ত্বগুণের মোহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সুখ ও বিদ্যা এত মহৎ কিন্তু এই দুটোও মোহ, যারা প্রচুর শাস্ত্র অধ্যয়ন করছে, শাস্ত্র পাঠ করতে খুব ভালোবাসছে, এরাও মোহিত হয়ে আছে। মায়া মোহ যদি কিছু অবলম্বন নাও পায় এরা দয়ার রূপ ধারণ করে সামনে এসে যাবে, তখন মায়া দয়া দিয়েই বাঁধে। কি ভাবে বাঁধে? সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখলেন আপনার বাড়ির দরজার সামনে কোথাকার বেড়ালের একটা বাচ্চা কুঁই কুঁই করে যাচ্ছে, আপনার ভেতরে দয়ার ভাব জেগে উঠল, আপনি বেড়ালের বাচ্চাটা তুলে নিয়ে যত্ন করতে শুরু করে দিলেন। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন – মহামায়া বেড়াল পুষিয়েও সংসার করিয়ে নেন। সারা জীবন প্রচুর সাধন ভজন করে এসেছেন, তিন কুলে কেউ নেই, বুড়ো বয়সে একটা বেড়ালের প্রতি ভালোবাসা এসে গেল। জ্ঞানী বা জীবনমুক্ত পুরুষ ছাড়া যার ভেতরে করুণার ভাব আসবে বুঝবেন মায়া তাকে বেঁধে ফেলেছে। সন্ন্যাসী যখন সত্যিকারের নারী কল্যাণ, সমাজেসেবার কাজে পুরোপুরি ঝাঁপিয়ে পড়েন তখন বুঝতে হবে মা তাঁর কাছে দয়া রূপে এসে তাঁকে বেঁধে নিয়েছেন। তখন তিনি হাসপাতাল, ডিসপেন্সারি করবেন, স্কুল চালাবেন, কোচিং ক্লাশ খুলতে থাকবেন। অন্য দিকে সাধারণ মানুষ তো মায়ার জালে খাবি খেয়ে যাচ্ছে। আর যাঁরা মন্দিরে রোজ পূজা অর্চনা করে যাচ্ছেন, সেখানেও একই জিনিষ হচ্ছে। একটা বয়স পর্যন্ত পূজা উপাচার ঠিক আছে, কিন্তু কতদিন? একটা সময় সাধু সন্ন্যাসীরাও পূজা উপাচার থেকে সরে আসেন। কিন্তু আমরা পারি না, বাচ্চারা যেমন খেলনা নিয়ে খেলতে ভালোবাসে, সংসারীরা যেমন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে খেলতে ভালোবাসে, সন্ন্যাসীর কাছে পূজা উপাচার এগুলোও তাঁর কাছে খেলনা। একমাত্র সচ্চিদানন্দের চিন্তন ছাড়া, সচ্চিদানন্দের তো চিন্তন হয় না, চিন্তন মানেই এক হওয়া, এর বাইরে যে কোন ধর্মীয় আচার মানেই খেলনা নিয়ে খেলা করা। যখন আমরা ঠাকুরের ধ্যান করছি সেটাও খেলনা, ঠাকুরকে নিয়েই আছি সেটাও খেলনা, নারীকে নিয়ে আছি সেটাও খেলনা। কিন্তু তফাৎ হল, যখন কেউ স্ত্রী-পুত্র নিয়েই আছে তখন তা ঘোর প্রবৃত্তির দিকে নিয়ে যায়, আর যখন পূজা, উপাচার, ঠাকুরের ভক্তির দিকে চলে যাচ্ছে তখন এই জিনিষগুলো তাকে নিবৃত্তির দিকে নিয়ে যাবে, কিন্তু এটাও খেলনা। এই জগতে খেলনা ছাড়া কেউই থাকতে পারবে না। যাঁরা অবতার পুরুষ, যিনি নির্বিকল্প সমাধি লাভ করে নিয়েছেন, তাঁরও একটা অবলম্বন চাই, অবলম্বন মানেই খেলনা। খেলনা ছাড়া কেউ থাকতে পারবে না। শুধু তফাৎ হল এর খেলনা এক রকম ওর খেলনা অন্য রকম। আপনি যখন আমার সাথে কথা বলছেন এটাও খেলনা, আচার্য ক্লাশ নিচ্ছেন এটাও খেলনা, বই পড়া, বই লেখা সেটাও খেলনা। কিছু কিছু খেলনা আছে আমাদের আরও বেশি করে বেঁধে ফেলে, কিছু কিছু খেলনা আমাদের মায়ার বাঁধনগুলোকে আলগা করে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু কত দূর নিয়ে যাবে! সত্ত্বগুণের সীমার কাছে গিয়ে বেঁধে রেখে দেবে। এভাবেই মা সমস্ত জগতকে সম্মোহিত করে রেখেছেন।

ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ, এই সম্মোহিত জগৎ থেকে কেউ যদি বেরিয়ে আসতে চায় তার একটিই উপায়, তুমি যদি প্রসন্না হয়ে পথ ছেড়ে দাও। মা হলেন ত্রিগুণাত্মিকা, তিনি কাউকে তমোগুণ দিয়ে বাঁধছেন, কাউকে রজোগুণ দিয়ে আবার কাউকে সত্ত্বগুণ দিয়ে বাঁধছেন। যখন দয়ার ভাব, করুণার ভাব দিয়ে বাঁধছেন সেটাও বন্ধন, যখন কেউ অপরের ভালো করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে সেটাও বন্ধন, যখন মায়া দিয়ে বেঁধে রাখছেন সেটাও বন্ধন আর শুধু নিজে লুটেপুটে খাব সেটাও বন্ধন। একমাত্র মা যদি প্রসন্না হয়ে কৃপা করে পথ ছেড়ে দেন তখন একজন ক্রুঢ়কর্মা, সেও ঈশ্বরের পথে চলে যাবে, আবার কোন সত্যিকারের সাধু তিনিও পুরোপুরি ঈশ্বরের পথে চলে যাবেন। তুমি পথ না ছাড়লে কারুর সাধ্যি নেই এই মায়ামোহ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার।

এখানে মায়ের স্তুতি করা হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু আগে যেটা বলা হয়েছিল, প্রকৃতির সাথে মা ও তাঁর শক্তির তফাৎ হল, যতক্ষণ প্রকৃতিকে তুমি অতিক্রম না করে প্রকৃতির পারে চলে যাচ্ছ ততক্ষণ কেউ তোমাকে পার করে দিতে পারবে না, তাই সাংখ্য বা যোগশাস্ত্র বলবে তুমি নিজের ক্ষমতায় প্রকৃতির এলাকা থেকে বেরিয়ে যাও। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্র বলবে – তুমি কি করে অতিক্রম করবে! শক্তি তো ঈশ্বরেরই শক্তি, তিনি তো অলঙ্ঘ্যবীর্যা, তাঁর শক্তিকে তো লঙ্ঘন করা যায় না, তিনি যদি কৃপা করে পথ ছেড়ে দেন, শেষ আবরণটা তিনি যদি না সরিয়ে দেন

তা নাহলে কখনই মায়া থেকে বেরোতে পারবে না। ঠাকুরের শেষ আবরণ ছিলেন মা কালী। ঠাকুরের শেষ আবরণ কি মা কালী নিজে এসে সরিয়ে দিয়েছেন, নাকি ঠাকুর জ্ঞান অসি দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন বলে শেষ আবরণটা চলে গেল? এবার আপনি ভাবতে থাকুন। আসলে ওই জায়গায় গিয়ে আর কথা বলা যায় না। এরপর দেবতারা স্তুতি করে বলছেন –

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পুরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ।।৬

এই মন্ত্রে মায়ের স্বরূপের ব্যাপারে অনেক কিছু বলা হচ্ছে। কেউ যদি একটি মন্ত্রে মায়ের স্তুতি করতে চায় তখন এই মন্ত্রটি আবৃত্তি করলেই মায়ের স্তুতি হয়ে যাবে। এখানে মায়ের স্বরূপ বর্ণনা করে স্তুতি করা হচ্ছে। স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন *বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ*, জগতে যত রকম বিদ্যা আছে, পরা বিদ্যাই হোক আর অপরা বিদ্যাই হোক, বেদ বিদ্যা, ধনুরবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা যে কোন বিদ্যাই হোক, হে দেবী! যত রকমের বিদ্যা আছে সব তোমারই ভেদা, ভেদা মানে বিস্তার, যত বিদ্যা আছে সব মায়েরই বিস্তার। সব বিদ্যা তোমার থেকেই বেরিয়েছে। মা সরস্বতীকে যে আমরা বিদ্যার দেবী রূপে অর্চনা করি, মা সরস্বতীকে যে সমস্ত বিদ্যার দেবী বলা হয়, সেখানেও এই একই ধারণা কাজ করছে। ঠাকুর বলছেন, মা সরস্বতীর একটি কিরণ যদি কারুর মধ্যে চলে আসে তাতেই সে জ্ঞানী হয়ে যায়। আগে আগে যত বিদ্যা হয়েছিল, আমাদের চোখের সামনেই কত বিদ্যা হারিয়ে যাচ্ছে, আগেকার দিনে গ্রামেগঞ্জে কুমোররা যে ধরণের কাজ করত, ছুতোররা যে কাজ করত এগুলো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এই কাজগুলো করার জন্য এখন নানা রকমের মেশিন এসে গেছে। মেশিন দিয়ে করার ফলে ওই বিদ্যাটাই হারিয়ে যাচ্ছে। আগেকার দিনে কিছু কিছু জাতি ছিল তারা বিশেষ ধরণের কাজে দক্ষ ছিল, সেই কাজ এখন কারখানায় মেশিনের সাহায্যে করা হচ্ছে। এইভাবে গত ছয়-সাত হাজার বছরে পৃথিবীতে কত বিদ্যা এসেছে আর কত বিদ্যা চলে গেছে। এখন আবার কত নতুন নতুন বিদ্যা আসছে যার নামও আমরা অনেকে জানি না। প্রত্যেক দিন নতুন নতুন বিদ্যার কথা আসছে। আর ভবিষ্যতে যে কি হতে যাচ্ছে ভগবান জানেন। দেবতারা বলছেন, যত রকমের বিদ্যা আছে, যত রকমের বিদ্যা হতে পারে সব তোমারই ভেদ, তোমারই বিস্তার। যখন মাকে শুধু বিদ্যারূপিনী রূপে দেখছি তখন তাঁকে মা সরস্বতী বলি। কিন্তু মা সরস্বতী হলেও তিনিও তো বাগদেবী, তিনিও তো সেই শক্তিরই মূর্তি। যখন শক্তিকে বিদ্যারূপিণী রূপে দেখছি তখন আমরা বলছি মা সরস্বতী। এর আগেই শুম্ভকে মা বলছেন – আমা ছাড়া জগতে আর কে আছে। সরস্বতী দেবীও মায়েরই একটি রূপ।

স্ত্রীয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু, জগৎ সংসারে যত নারী আছে সমস্ত নারী তোমারই মূর্তি। আমাদের ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে সাধকদের বিভিন্ন মতে, বিভিন্ন ভাবে সাধনার কথা, বিভিন্ন রকম চিন্তা-ভাবনার কথা পাওয়া যায়, সবটাই আলাদা আলাদা। কিন্তু বেদান্ত মতে জগতে যত রূপ আছে সব তাঁরই এক একটি রূপ – *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী*, তুমিই সেই স্ত্রী, তুমিই সেই পুরুষ, যুবক রূপেও তুমি, যুবতীর রূপেও তুমি। এখানে শক্তির কথা বলা হচ্ছে, তাই শক্তিকে স্ত্রী রূপে নিয়ে আসা হচ্ছে। স্ত্রী রূপে মানে নারী মূর্তি, তাই মায়ের সব নারী মূর্তি, অম্বিকা, কাত্যায়নী, ভদ্রকালী, কালিকা ইত্যাদি। এখানে এই শক্তিকে আরও ব্যাপক অর্থে নিয়ে এসে বলছেন – সংসারে যত স্ত্রী রয়েছে সব মায়েরই রূপ। কথামৃতে যে ঠাকুর পদে পদে মায়ের ব্যাপারে যত কথা বলছেন সবই চণ্ডী থেকে প্রভাবিত।

আমাদের মনে স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন আসতে পারে, এর আগেই তো বলা হল চর অচর যা কিছু আছে সব মা, কিন্তু হঠাৎ করে এখানে শুধু সব স্ত্রীকে মায়ের রূপ বলছেন কেন? যদি আমাদের বলা হয় মা সব কিছুরই ঈশ্বরী, যে জল সেই জলও তিনি, তখন এটাই আমাদের কাছে খুব abstract concept হয়ে যাবে, কিন্তু এটাই সত্য। বিশ্বের ধর্মীয় বিকাশের ইতিহাসে দেখা যায়, ইসলাম ধর্মের যখন প্রথম প্রসার হতে শুরু করেছিল তখন খুব দ্রুত গতিতে প্রসার হতে শুরু করেছিল। যেভাবেই তারা করে থাকুক না কেন, ইসলামের প্রসারটা খুব দ্রুত হারে বিস্তার হয়েছিল। এর পেছনে যত কারণ আছে তার মধ্যে একটি প্রধান কারণ হল ইসলাম ধর্মের আচার আচরণ

অত্যন্ত সহজ সরল ছিল। ইসলাম ধর্মের দুটো রূপ, একটা হল খুব সহজ রূপ আরেকটি গূঢ় রূপ। ইসলাম ধর্মের গূঢ় রূপটা সুফিরা আর ইসলাম ধর্মের সাধু মহাত্মারা আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু জনসাধারণের জন্য ইসলাম যে ধর্ম প্রচার করল সেটা অত্যন্ত সহজ। দিনে পাঁচবার নমাজ পড়, এক মাস রোজা রাখ, জীবনে একবার হজ কর, সাধারণের পক্ষে এগুলো খুবই সহজ।

আমাদের সাধুরা আমেরিকাতে গিয়ে সাধারণ জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলবেন যিশুও সত্য, কৃষ্ণও সত্য আর রামকৃষ্ণও সত্য। এই ধরণের কথা শুনে সাধারণ মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায়। সবাই যদি সত্য হয় তাহলে আমাদের যিশু তো ঠিকই আছেন, আলাদা করে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামকৃষ্ণকে ভজনা করার কী দরকার! সেইজন্য রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন এখনও আমেরিকাতে আশানুরূপ ভাবে দানা বাঁধতে পারছে না। আর ইসকনের সাধুরা গিয়ে বলছেন যিশু কিছুই না, কৃষ্ণই সব। রাতারাতি ইসকনের অনুগামীর সংখ্যা বেড়ে গেল। সাধারণ মানুষের চিন্তার জগৎ এতটুকুর মধ্যে সীমিত। ঐটুকু জগতের মধ্যে ধর্মের দর্শনকে জায়গা করে নেওয়া অসম্ভব। অথচ দর্শনটাই সত্য। যে কোন ধর্ম যখন বেদান্তের সামনে আসে তখন কেউই দাঁড়াতে পারে না। স্বামীজী যখন বেদান্তের কথা আমেরিকাতে শোনালেন তখন সেখানকার সত্যিকারের চিন্তাবিদরা শুনে তাজ্জব হয়ে গেলেন। বেদান্তের দর্শনকে ধারণা করার মত সেই বুদ্ধি সাধারণ মানুষের নেই। তাদের জন্য সহজ হল, স্তোত্র পাঠ, হরিবোল হরিবোল করে নৃত্য করা। এসব দেখে স্বামীজী বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কী করবেন, এটাই বাস্তব যে বেশির ভাগ মানুষই হল স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন। সাধারণ মানুষকে যদি বলা হয় চর অচর যা কিছু আছে সব ভগবানই হয়েছেন, তখন আর তারা ধারণা করতে পারে না। সেইজন্য ধর্মীয় তত্ত্বগুলোকে সহজীকরণ করে সামনে নিয়ে আসা হয় যাতে সাধারণ মানুষকে এদিকে আকৃষ্ট করা যায়। দেশের কোন ক্ষমতাশালী মহিলার দিকে ইঙ্গিত করে কোন বাবাজী যদি বলে দেন, ইনিই হলেন মা দুর্গা, সঙ্গে সঙ্গে সব লোক এক বাক্যে মেনে নেবে। লোকে এগুলো সহজে গ্রহণ করে। কিন্তু বেদান্তের তত্ত্বকে সাধারণ মানুষ গ্রহণ করতেই পারে না। খ্রিশ্চান ধর্মে ডেজার্ট ফাদাররা আছেন, যাঁরা মরুভূমিতে ধ্যান ধারণাদি করেন। ডেজার্ট ফাদারদের লেখা পড়লে মনে হবে যেন বেদান্ত পড়ছি। সুফি সন্তদের লেখা পড়লে মনে হবে বেদান্ত পড়ছি। শুধু একটাই ব্যাপার, বেদান্ত কারুর সঙ্গে নিজেকে মেলাতে যাবে না। অন্য দিকে চৈতন্য মহাপ্রভু যে ধর্ম দিলেন সেই ধর্ম সাধারণ মানুষ খুব সহজে গ্রহণ করে নিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আগে মানুষকে ধর্মের দিকে টেনে নিয়ে আসা। একবার কোন ভাবে ধর্মের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে তারপর একটা সময় পার হয়ে যাওয়ার পর তাকে একটু একটু করে বেদ, উপনিষদের কথা দিতে হবে। আগে তাকে প্ল্যাটফর্মে নিয়ে গিয়ে কোন রকমে ট্রেনে তুলে দিন তারপর সে যে করেই হোক তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে। প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যাওয়া আর ট্রেনে তোলাটাই সব থেকে কঠিন কাজ। এই কাজে সবচেয়ে সাফল্য পেয়েছে ইসলাম ধর্ম। ধর্মের দিক দিয়ে বিচার করলে ইসলাম হল সব থেকে সহজ ধর্ম, পাঁচটা জিনিষ ঠিক করে দিয়েছে, পাঁচটা সহজ প্রার্থনা ঠিক করে দিয়েছে, এগুলো করলেই তোমার সব হয়ে যাবে। চৈতন্য মহাপ্রভুও ঠিক এভাবেই ধর্মের কতগুলো সহজ বিধান দিয়ে বলে দিলেন এগুলো করলেই তোমার কৃষ্ণে ভক্তি এসে যাবে।

এখানে চণ্ডীতে যেটা বলছেন *স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু*, এটাই হল ধর্মের সহজীকরণের নমুনা। খুব সহজ করে বলে দিলেন যত নারী সব তোমারই রূপ। অধ্যাত্ম রামায়ণে এটাকেই আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে যেখানে দেবর্ষি নারদ বলছেন – হে রাম! যত পুরুষ সব আপনারই রূপ আর যত স্ত্রী সব মা সীতার রূপ। কিন্তু আসল তত্ত্ব হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু এটাকে ধারণা করা একেবারেই অসম্ভব। সেইজন্য সহজীকরণ করা হচ্ছে – সব নারী মায়েরই রূপ। যদি তাতেও না হয় তখন আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে বলবে, অমুক মহিলা মন্ত্রী দুর্গার অবতার, এবার বুঝবে হ্যাঁ ঠিক তাই, ক্ষমতা আছে, রূপ আছে, বুদ্ধি আছে সবই আছে, এবার দুর্গার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। সমস্ত নারী মায়েরই রূপ এইভাবে বলাতে এর আবার কিছু ভালো প্রয়োগও আছে। জগতে যত স্ত্রী আছে এরা সবাই মাতৃরূপা, নারী জাতির প্রতি এই ভাব যদি জাগ্রত হয়ে যায় তখন নারীদের উপর কারুর অত্যাচার করার প্রবৃত্তি আসবে না।

কিছু কিছু জিনিষ আমাদের ধারণা করতে অনেক সময় লেগে যায়। যুক্তি তর্ক দিয়ে যখন দেখা হয় তখন এক রকম মনে হবে, সেই জিনিষটাকেই ধারণা করতে গেলে অন্য রকম মনে হবে। এই অন্য রকম বোধ নিয়ে

জীবন চালানো মুশকিল। আমাদের ভারতবর্ষ হল ঘোর তমোগুণী দেশ, তমোগুণে দেশটা একেবারে ডুবে আছে। এই তমোগুণকে কাটানোর জন্য দরকার পৌরুষত্ব। কিন্তু শুধু পৌরুষত্ব নিয়েও দেশ চলবে না, শুধু পৌরুষত্ব নিয়ে চললে অনেক কিছু এলোমেলো হয়ে যাওয়ার খুব বেশি সম্ভবনা থাকে। রাবণ বা হিটলার এদেরও প্রচণ্ড শক্তি ছিল। শক্তিটা যাতে আসুরিক বৃত্তিতে রূপান্তরিত না হয়ে যায় তার জন্য দরকার চরিত্র গঠন। স্বামীজীও শিক্ষার ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলছেন শিক্ষা হবে Man making character building education। কিন্তু চরিত্র জিনিষটা কি, এই ব্যাপারেই আমাদের কারুরই স্বচ্ছ ধারণা নেই। Ethics, মূল্যবোধ, এগুলোকে যখন আলোচনা করা হয় তখন চরিত্রকে ব্যাখ্যা করা সত্যিই কঠিন। স্বামীজী খুব সংক্ষেপে what is right what is wrong বলে দিয়েছেন। চরিত্রের ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা একমাত্র আচার্য শঙ্কর দিয়ে গেছেন। আচার্য বলছেন, শাস্ত্রের কথা আচার্যের মুখে শোনার পর সেই অনুসারে জীবনকে চালিত করাই চরিত্র। কোনটা ভুল কোনটা ঠিক এটা কে ঠিক করে দেবে? শাস্ত্রই ঠিক করে দেবে। শাস্ত্রের কথা যখন গুরু বা আচার্যে মুখ দিয়ে আসে তখন সেই বাক্যই ঠিক। কেউ যদি নিজে শাস্ত্র পড়ে ঠিক করে নেয় এটা ভুল এটা ঠিক, তখনও কোনটা ভুল কোনটা ঠিক নির্ধারণ করাটা ঠিক হবে না। আচার্যও যদি শাস্ত্রকে আধার করে না বলেন তখনও তা ঠিক হবে না। শাস্ত্রের কথা আচার্যের মুখ দিয়ে আসতে হবে। আচার্য কে হবেন তারও সংজ্ঞা আছে, কোন গ্রন্থকে শাস্ত্র বলা হবে তারও সংজ্ঞা আছে। তাহলে তো হিন্দুদের মূল্যবোধ আর মুসলমানদের মূল্যবোধ আলাদা হয়ে যাবে। ঠিকই, আলাদাই হবে, কারণ সার্বজনীন মূল্যবোধ বলে কিছু হয় না।

ঠাকুর বলছেন সত্য কথা কলির তপস্যা, অন্য দিকে মহাভারত ও মনুস্মৃতি বলছে পাঁচটি ক্ষেত্রে সত্য কথা বলা চলবে না। এইসব ক্ষেত্রে সত্য কথা বললে পাপ হবে, এই সময় মিথ্যা কথাই বলতে হবে। সেখানে বলা হচ্ছে নিজের যদি সর্বস্ব অপহরণ হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে তাহলে তখন মিথ্যা কথা বলতে হবে আর আপনার কথাতে অপরের যদি সর্বস্ব চলে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে তখন আপনাকেও মিথ্যা কথা বলে সম্পদ রক্ষা করতে হবে। তাহলে ঠাকুরের বাবা ক্ষুদিরাম চট্টোপধ্যায়কে আদালতে জমিদার মিথ্যা সাক্ষী দিতে বলেছিল, সত্যি কথা বললে সব জমি-জায়গা চলে যাবে। ঠাকুরের বাবা মিথ্যে সাক্ষী না দিয়ে সত্যি কথা বললেন, আর তাঁর সর্বস্ব চলে গেল। দেড়ে গ্রাম ছেড়ে তাঁদের কামারপুকুরে বন্ধুর কাছে আশ্রয় নিতে হল। তাহলে ক্ষুদিরাম চট্টোপধ্যায় কি ধর্ম করলেন, কি করলেন না? আসলে ধর্ম দুজনের জন্য দু রকম হবে, একটা হয় সন্ন্যাসীর ধর্ম আরেকটা হয় গৃহস্থের ধর্ম। সন্ন্যাসী কোন কিছুতেই নিজের ধর্মের সঙ্গে আপোষ করবে না। ক্ষুধিরাম চট্টোপধ্যায় গৃহস্থ হয়েও সন্ন্যাস ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহাভারত বা মনুস্মৃতি আমাদের একটু জায়গা ছেড়ে দিয়েছে, তুমি এতটুকু করতে পার, তোমাকে করতেই হবে তা নয়। সাধারণ গৃহস্থরা অনেক কষ্টে কিছু জমি-জায়গা করেছে, সেটুকুও চলে গেলে তাকে আরও দুঃখ-কষ্টে পড়ে হাবুডুবু খেয়ে জীবনের আসল লক্ষ্যটাই ভুলে যাবে, তাই ওদের জন্য বলে দিলেন তুমি এটাই করবে। মিথ্যা কথা বলতে গিয়ে সেইজন্য বলতে হয় – মা সরস্বতী! তুমি এখন আমার জিহ্বা থেকে নেমে যাও। তা নাহলে মা সরস্বতীর অপমান হবে। মা সরস্বতী জিহ্বা থেকে নেমে গেলে তখন মিথ্যা কথা বলা যায়। মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে যখন আদালত থেকে বেরিয়ে এল তখন বলতে হয় – মা! তুমি আমায় বরণ করে আমার জিহ্বাতে অধিষ্ঠান কর। আর দরকার হলে একটা প্রায়শ্চিত্ত করে নিতে পারে। এটাই গৃহস্থ ধর্ম।

এখানে মিথ্যা কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, অথচ ঠাকুর বলছেন সত্য কথাই কলির তপস্যা। ঠাকুর এখানে সন্ন্যাস ধর্মের কথা বলছেন। এখন আমাদের ঠিক করতে হবে আমি মিথ্যা কথা বলবো কি বলবো না। কোনটা করা উচিৎ আর কোনটা করা অনুচিৎ এটা ঠিক করার জন্য দরকার শাস্ত্র। কিন্তু শাস্ত্র তো চিনিতে বালিতে মিশে আছে। তাই শাস্ত্রের কথা যখন গুরুর মুখ দিয়ে আসবে তিনিই তখন পরিষ্কার করে ঠিক করে দেবেন কোনটা উচিৎ আর কোনটা অনুচিৎ, এই রকম পরিস্থিতি হলে তোমাকে এই এই করতে হবে। সেইজন্য গুরুর এত মূল্য। গুরু ছাড়া আমাদের জীবন চলে না। মূল্যবোধ, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল, গুরুই ঠিক করে দেন। আগেকার দিনের রাজারা সব শাস্ত্রই জানতেন কিন্তু নির্ভর করতেন তার মন্ত্রীর উপর, যাঁরা সব সময় ব্রাহ্মণ বংশের হতেন। এইসব তত্ত্ব জানতে হলে আগে লেকচার দেওয়া বন্ধ করতে হবে। সেইজন্য ঠাকুর কোথাও লেকচার দিতেন না। স্বামীজীর বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি লেকচারে অনেক বিষয়কে কাটিয়ে চলে যেতেন। স্বামীজীর রচনাবলীতে যে বেশির

ভাগ লেকচার পাই এগুলো হল class talks। গড়ের মাঠে লেকচার দেওয়া আর ধর্মীয় ক্লাশে মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নেওয়া পর কিছু বিদগ্ধ শ্রোতাদের সামনে লেকচার দেওয়ার মধ্যে অনেক তফাৎ। আমরা এখানে শাস্ত্রের যে কথাগুলো শুনছি, এগুলোকে বিচার করতে গেলে অন্য রকম ধারণা আসতে থাকে। যেমন বললেন সকল স্ত্রীর মধ্যে জগন্মাতাকে দেখ। খুব সুন্দর কথা, শুনতে কত ভালো লাগছে। কিন্তু যখন বিচার করতে যাওয়া হবে তখন দেখা যাবে এই কথাটি যত সহজ মনে হচ্ছিল তত সহজ নয়, বিচার করতে করতে অনেক গূঢ় তত্ত্ব বেরিয়ে আসছে। কি সেই গূঢ় তত্ত্ব? মা হলেন শক্তিরূপিণী, তিনিই তো সব কিছু হয়েছেন, তাহলে শুধু মেয়েদের মধ্যেই কেন দেখতে যাব! কারণ মেয়েদের মধ্যে মায়ের প্রকাশ অন্যান্য জিনিষের থেকে অনেক বেশি। এটাকে বলা হয় সমানাধিকরণ। মা শক্তিস্বরূপিণী, মা আবার জগতপ্রসবিনীও। জগতের সমস্ত নারীই সন্তানপ্রসবিনী। জগতপ্রসবিনী আর সন্তানপ্রসবিনী, তা সে কুকুর হোক বেড়াল হোক আর মানুষই হোক, যেই হোক, এই প্রসবটা সমানাধিকরণ হওয়ার জন্য প্রত্যেক নারীর সাথে মায়ের সমানতা বিদ্যমান। অন্য দিকে মা মাতৃশক্তি, মাতৃশক্তির যেখানে অপমান হয় সেখানে প্রচুর সমস্যার প্রাদুর্ভাব হয়।

তাহলে কি নিজের স্ত্রীকেও মা রূপে দেখতে হবে? হ্যাঁ মা রূপেই দেখতে হবে। ব্যাপারটা খুব গভীর ভাবে বোঝার দরকার। অনেকের একটা ভ্রান্ত ধারণা হয়ে আছে যে মনু নারীদের খুব নীচে নামিয়ে দিয়েছেন। মনু একবারও নারীদের কোথাও ছোট করেননি। নারীদের মনু যে সম্মান দিয়েছেন, আজকের যে সংবিধান, সেই সংবিধানও সেই সম্মান দিচ্ছে না, আর কোন দিন দিতেও পারবে না। আমাদের কাছে অতিথি হল নারায়ণ, বাড়িতে অতিথিকে তাই সবার আগে খাওয়াতে হবে। মনুও তাই বলছেন, কিন্তু তার সাথে এও বলছেন – ঘরে যদি গর্ভবতী স্ত্রী থাকে, যুবতী পুত্রবধু থাকে আর কুমারী মেয়ে থাকে, এই তিনজন নারীকে সবার আগে খেতে দিতে হবে। নারীকে মনু যে কত উচ্চ স্থানে রেখেছেন, এই ব্যাপারে আমাদের কোন ধারণাই নেই। বাড়িতে অতিথি থাকলে অতিথির আপ্যায়নকে সর্বাগ্রাধিকার দিতে হবে, অতিথিকে না খাইয়ে বাড়ির কেউ খাবে না। কিন্তু এই অগ্রাধিকার ক্ষেত্রেও মনু তিনটে ব্যতিক্রম রেখে দিলেন – গর্ভবতী স্ত্রী, যুবতী পুত্রবধু আর কুমারী মেয়ে, এই তিনজনকে সবার আগে খাওয়াতে হবে, এদেরকে খাওয়াবার পর অতিথিরা ও বাড়ির অন্যরা খাবে। এই জিনিষ কেউ কল্পনা করতে পারবে! আবার বলছেন, মেয়ের টাকা-পয়সা যদি কেউ আত্মসাৎ করে নেয় বা ছিনতাই করে নেয়, তখন মনু বাড়ির লোকদের আদেশ করছেন, যে আত্মসাৎ করেছে তাকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা কর। বাড়ির লোক যদি না পারে তাহলে রাজাকে বলা হচ্ছে শাস্তি দিতে, এসব বলার পর মনু বলছেন যদি কেউ শাস্তি দিতে না পার তাহলে দেবতাদের অভিশাপে পুরো পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে। মনু পদে পদে নারীদের সুরক্ষার কথা বলে গেছেন। শুধু সুরক্ষার কথাই বলছেন না, আবার বলছেন *যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।।* যে গৃহে নারীর পূজা হয় সেই গৃহে দেবতারা বাস করেন। যে গৃহে নারীর পূজা হয় না সেই গৃহের সব শুভ কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। যে গৃহে নারীর পূজা হয় সেখানে দেবতারা বাস করেন, এই শ্লোকের মাধ্যমে মনু কোন কবিত্ব জাহির করছেন না, একটা সত্যকে সমাজ ও পরিবারের উপর আদেশ রূপে চাপিয়ে দিচ্ছেন।

চণ্ডীর এই মন্ত্রে যে দেবাতারা স্তুতি করছেন *স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু*, এই ভাবটাই মনু তাঁর স্মৃতিশাস্ত্রে সবার জন্য আদেশার্থে বলে দিচ্ছেন। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত স্ত্রী জাতি আছে, তা সে কুকুর, বেড়াল, পাখি যেই হোক সব স্ত্রী সেই জগন্মাতারই মূর্তি। ঠাকুর বেড়ালের মধ্যেও মা কালীকে দেখছেন। কারণ তারও প্রসবের ক্ষমতা আছে। এটাই সমানাধিকরণ, মা জগৎপ্রসবিনী আর স্ত্রী জাতি সে সন্তানপ্রসবিনী, একটা মেয়ে মশাও সন্তানপ্রসবিনী। প্রত্যেক নারী জাতির মধ্যে জগন্মাতার মূর্তি যে না দেখবে তার জীবনে কিন্তু অবধারিত ভাবে বহু সমস্যা হবে। তাই বলে কি একজন পুরুষ যখন কোন নারীকে বিবাহ করে বাড়িতে নিয়ে আসছে তখন কি তার সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক থাকবে না? অবশ্যই থাকবে, আমোদ-আহ্লাদ, মনোমালিন্য, ঝগড়া সবই হবে। কারণ একটি মেয়ে যে কাজের জন্য একমাত্র উপযুক্ত সেই কাজের জন্যই তার পুরুষের দরকার। কিন্তু যখন বাইরের মেয়ে আপনার পুত্রবধু হয়ে এসেছে সে তো মাতৃশক্তিরূপিণী। মাতৃশক্তিরূপিণী হওয়ার জন্য, মা যেমন নিজের সন্তানকে দেখাশোনা করে সেও পুরো বাড়িকে সেভাবেই দেখে। নিজের স্বামীকেও স্ত্রী সন্তানের মতই দেখে। একজন স্ত্রীর

উপর দুটি প্রাণী প্রচণ্ড ভাবে নির্ভরশীল, একজন তার নিজের সন্তান আর অন্য জন তার স্বামী। সেইজন্য বলে, মেয়েরা যখন মা হয়ে যায় তখনই তাদের মধ্যে ঠিক ঠিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়।

আগেকার দিনে একজন পুরুষ সন্তান চাইত কারণ তাকে যজ্ঞ-যাগ করতে হবে, এখনকার দিনে পুরুষ সন্তান চায় যাতে তার বংশ রক্ষা হবে বা বুড়ো বয়সে সন্তান তার লাঠি হবে। তখন সে যাকে বিবাহ করে নিয়ে এসেছে, সেই তো তাকে সন্তান দেওয়ার মালিক। তার জন্য সেখানে একটা সম্পর্ক থাকতে হবে। কিন্তু সর্বোপরি স্ত্রীকে মা রূপেই দেখতে হবে, আমার সন্তানের দরকার ছিল বলে স্ত্রীকে ব্যবহার করেছি, কিন্তু সেও আমার মাতৃরূপিণী। ঠাকুরও শ্রীমাকে মা রূপেই দেখতেন। অন্য দিকে আজকালকার ছেলেরা মেয়েদের খেলনার মত ব্যবহার করছে। সমাজের নাশ তো হবেই, কিছু করার নেই। বৈদিক কাল থেকে আমাদের সব কিছুতেই যজ্ঞের বিধান দেওয়া ছিল। যখন কোন পুরুষ কোন নারীকে নিজের স্ত্রী রূপে গ্রহণ করছে তখন তাকে এইভাবেই দেখতে হত যে, ইনি হলেন সেই যজ্ঞকুণ্ড যেখান থেকে আমার সন্তানের জন্ম হবে, মাতৃশক্তি যিনি জগৎপ্রসবিনী ইনি তাঁরই রূপ। মাতৃশক্তি রূপেই সমস্ত স্ত্রীকে দেখা হত। যাঁরা এই ভাব নিয়ে দেখেন তাঁরা মহৎ হয়ে যান, যারা দেখে না তারা সাধারণ হয়েই থাকে। এখানে বলছেন *স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ*, দুষ্টা স্ত্রী সেও মাতৃশক্তিরূপিণী। কিন্তু ব্যবহারিক জীবন দুষ্টা স্ত্রীলোক দিয়ে চলে না, চলতে পারেও না। সেইজন্য মনু পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন কাকে দুষ্টা স্ত্রী বলা হবে। তার সঙ্গে কি ধরণের আচরণ করতে হবে সেটাও মনু স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, যেমন তাকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হবে। কিন্তু তাতেও বলছেন – এর কিন্তু খাওয়া-পড়ার কষ্ট যেন না হয়। এগুলো ধারণা করা কঠিন, ধারণা করে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা আরও মুশকিল। কিন্তু মূল কথা হল, যারা স্ত্রী জাতিকে মাতৃরূপা না দেখে অন্য ভাব নিয়ে দেখে, তাদের জীবনে ঝামেলার আর শেষ থাকবে না। সে যেই হোক না কেন। ঠাকুর নিজে করে দেখালেন, নিজের স্ত্রীকেও যে মাতৃ রূপে দেখা যায়, শুধু দেখা যায় না ঠাকুর ষোড়শোপাচারে শ্রীমাকে পূজা করে সমগ্র জগদ্বাসীকে দেখিয়ে দিলেন। *স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু*, এখানে নিজের স্ত্রীকে বাদ দিয়ে বলছেন না, নিজের স্ত্রী, নিজের মেয়ে, নিজের বোন সবাই সেই মাতৃশক্তিরূপিণী, সাথে সাথে জগতে যত মেয়ে প্রাণী আছে সবাই সেই মাতৃশক্তিরই প্রকাশ।

ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়েতৎ, হে অম্বিকা! এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তুমি তো একাই ব্যাপ্ত করে রেখেছ। এর আগেই বললেন সমস্ত স্ত্রীরা হলেন আপনারই মূর্তি। প্রথমে নারী শক্তির কথা বলে সেখান থেকে আবার সরে এসে বলছেন যা কিছু আছে সব কিছুতে তুমিই তো পূর্ণ হয়ে আছ। এখানে আমাদের একটা জিনিষ বোঝার আছে। কল্পনা করুন একটা পাত্র আছে, পাত্রের ভেতরে আরেকটা গোলাকার পাত্র রাখা আছে, সেই পাত্রের বাইরে আরেকটা গোলাকার পাত্র, তার বাইরে আরেকটা সেই রকম পাত্র, তারও বাইরে আরেকটা পাত্র। প্রত্যেকটি পাত্রের গায়ে জালি দেওয়া নেট লাগান আছে। প্রথমটাতে মোটা জালি, তার বাইরের পাত্রে তার থেকে একটু কম মোটা জালি, সব কটিতে এই ধরণের জালি আছে কিন্তু প্রথম জালিতে দ্বিতীয় জালি থেকে বেশী বড় বড় ছিদ্র আছে, তৃতীয় জালিতে দ্বিতীয় জালি থেকে আরও একটু সূক্ষ্ম জালি লাগানো, এই করে করে শেষ জালিটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এবার মনে করুন সব থেকে ভেতরে যে গোলাকার মোটা জালি দেওয়া পাত্র আছে তার মধ্যে পাথর রাখা আছে। তার পরের পাত্রে বালি, বালির পরের পাত্রে আছে জল, জলের পরে আছে বাতাস। এবার পাথরগুলো পাথরের জায়গাতেই থাকবে কিন্তু বালিতে আসতে পারবে না। বালি পাথরেও যেতে পারবে আর নিজের জায়গাতেও থাকতে পারবে। বালি কিন্তু জলের পাত্রে যেতে পারবে না, জল বালিতেও যেতে পারবে আর পাথরেও যেতে পারবে, পাথর আর বালি জলের পাত্রে আসতে পারবে না। বাতাস জলেও যাবে, বালিতেও যাবে আর পাথরেও যেতে পারবে। কিন্তু বাতাসের পাত্রে কেউ আসতে পারবে না। আমাদের পঞ্চভূতের অবস্থানের যে ধারণা সেটা ঠিক এই রকম।

এই পঞ্চভূত হল আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী। পঞ্চভূতের অগ্নির সঙ্গে এই অগ্নির কোন সম্পর্ক নেই, এগুলো এক একটা নাম মাত্র। সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, আরও সূক্ষ্মতম, আরও আরও সূক্ষ্মতম। এখন পঞ্চভূতের যে পৃথিবী বলা হচ্ছে সেটা হল পাত্রের পাথর। ওই পাথরের চারিদিকে ঘিরে রেখেছে বালি, জল আর বাতাস। কিন্তু পাথর তার জায়গা থেকে এগুলোর কোনটাতেই যেতে পারবে না। আমাদের এই শরীর যতক্ষণ

আছে ততক্ষণ আমরা এই শরীর দিয়ে দেবতাদের মত চলতে পারব না। দেবতাদের মত চলতে হলে আমাদের এই শরীরটাকে ছাড়তে হবে। সেইজন্য বলা হয় সশরীরের কেউ স্বর্গে যেতে পারে না। সশরীরে স্বর্গে না যাওয়ার কারণ পাথরের পাত্রের গায়ে যে ছিদ্রগুলো রয়েছে সেই ছিদ্র দিয়ে পাথরটা তো বেরোতে পারবে না। তাহলে বলবে পাথরটা ভেঙে দাও। পাথর ভেঙে দিলে তো আর পাথর থাকবে না, পাথর বালি হয়ে যাবে। এইভাবে আমরা যদি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতমের চিন্তা করি তাহলে শেষ যে সব থেকে সূক্ষ্মতম পদার্থ আছে, আমরা আমাদের বোঝার জন্য বাতাসকে ধরে নিচ্ছি। বাতাস জলেও যাচ্ছে, বালির মধ্যেও ঘুরছে আবার পাথরের মধ্যেও ঘুরছে। এই মাতৃশক্তিকে আমরা যদি বাতাসের মত মনে করি তখন বলবে – *পুরিতমম্বয়ৈতৎ*। হে অম্বে! জগতে যা কিছু আছে সবের মধ্যে তুমিই পূর্ণ হয়ে আছ। যেমন এই গ্লাশ আছে, গ্লাশের মধ্যে জল আছে, জলের যে দুটো মলিক্যুলস তার মাঝখানে স্পেস মানে আকাশ আছে, যার জন্য লবণ বা চিনি জলে দিলে গুলে যায়। এবার জলের দুটো মলিক্যুলসের মাঝখানে যে স্পেস আছে তার মধ্যে ঢুকে গেল লবণ। লবণ আর জলের মাঝখানে যে স্পেস আছে, ওই স্পেসে কি আছে? আকাশ পঞ্চভূত আছে, আকাশ হল সব থেকে সূক্ষ্ম ভূত। কিন্তু মাতৃশক্তি আকাশ থেকেও সূক্ষ্ম। দুটো আকাশ মলিক্যুলস আছে, তার মাঝখানে যে স্পেস আছে সেখানেও মাতৃশক্তি।

মাতৃশক্তির উপরেও হলেন আত্মা। কিন্তু যখন আমরা এই শাস্ত্র পড়ছি তখন আত্মা এখানে আর ঐ অর্থে আসবে না। মাতৃশক্তিকে দিয়েই আত্মার ব্যাখ্যা হয়ে যায়। শাক্তরা আত্মা নিয়ে বেশি আলোচনা করতে যাবেন না, ওনারা মাতৃশক্তিকেই শেষ কথা মানেন। তাঁরা এই কথাই বলবেন – মা সবেতেই তুমি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছ। আকাশ হল সব থেকে সূক্ষ্ম পদার্থ, মাতৃশক্তি আকাশের থেকেও সূক্ষ্মতম। আকাশের ভেতরে যে স্পেস তার মধ্যেও মাতৃশক্তি পূর্ণ হয়ে আছে। জলের মধ্যে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন আছে, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের মাঝখানে একটা স্পেস আছে। বাস্তবিকই স্পেস আছে, এখানে কল্পনার কিছু নেই, যারাই কেমেস্ট্রি পড়েছেন তারা ভালো করে এই ব্যাপারগুলো জানবেন। এবার আপনি শুধু হাইড্রোজন এ্যটমে আসুন। হাইড্রোজেন এ্যটমের কেন্দ্রে প্রোটন আর নিউট্রন আছে, তারপর বিরাট স্পেস। ওই বিরাট স্পেসের পর আছে ইলেক্ট্রন। ওই স্পেসে কী আছে? বিজ্ঞানীরা জানেন না কী আছে। কিন্তু আমরা বলব আকাশ, কিন্তু আকাশও তো ভূত। তাহলে আকাশ ভূতের দুটো পার্টিকেলস তার মাঝখানে কী আছে? আত্মা, আত্মা সর্বব্যাপী, তাই মাতৃশক্তি সর্বব্যাপ্ত। বিজ্ঞান যেখানেই পৌঁছে যাক না কেন, আমাদের কাছে তা নিয়ে কোন দিন কোন সমস্যা হবে না। আপনি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর থেকে সূক্ষ্মতমতে চলে যান, আমাদের কোন সময়েই সমস্যা হবে না। একটা ইলেক্ট্রনের যদি চৈতন্য হয়ে যায়, সে দেখবে চারিদিকে মাতৃশক্তির যে সমুদ্র তার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। তার মানে ইলেক্ট্রনের চারিদিকে ওই মাতৃশক্তি। বিজ্ঞানের মতে ইলেক্ট্রনের চারিদিকে হল স্পেস, তার সব থেকে কাছে আছে প্রোটন। এর পুরোটাকে মিলিয়ে একটা এ্যটম, যাকে চোখে দেখা যায় না। মা! এই তো তোমার স্বরূপ। *বিদ্যাঃ সমস্তাঃ*, মানুষ আর কিছু বুঝুক না বুঝুক বিদ্যাকে তো বোঝে। বিদ্যাটাও তোমারই রূপ। জগতের সব স্ত্রী রূপে তুমিই বিদ্যমান হয়ে আছ, যেখানে কিছু নেই সেখানেও তুমি বিদ্যমান। এরপর আমরা তোমার কী স্তুতি করতে পারি!

কিন্তু তার থেকে আরও মারাত্মক ব্যাপার যেটা, *কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ*, এই যে বলে দেওয়া হল জগতের সমস্ত বিদ্যা তোমারই বিস্তার, সমস্ত স্ত্রী তোমারই রূপ, জগতে যা কিছু আছে সব কিছুতেই তুমি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছ, তুমি অনন্ত, তুমিই সব কিছু, এরপর তোমার আর কি স্তুতি হতে পারে! এরপর কি দিয়ে তোমার স্তুতি করা হবে! যার স্তুতি যত লম্বা করা হবে, তার মানে এখনও অনেক কিছু তার অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। কিন্তু যাঁকে বলছি আপনি পূর্ণ, তখন তাঁর আর কী বর্ণনা করা হবে! মা! তুমিই সব কিছু হয়েছ এই কথা বলার পর মায়ের আর কী বর্ণনা করার থাকবে! আর তাই না, তুমি *পরাপরোক্তিঃ*, বাণীর মধ্যে তুমি পরা বাণী। আমি যখন জয় জয় রামকৃষ্ণ এই বলে স্তুতি করছি, তখন আমি বাণীর ব্যবহার করছি। যখন কারুর কোন স্তুতি করা হচ্ছে তখন তিনি হলেন স্থূল, ওই স্থূলের যদি পূজা করা হয় তখন তার থেকে সূক্ষ্ম জিনিষ দিয়ে তার পূজা হয়। যে কোন মূর্তি বা বিগ্রহের যখন পূজা করা হয় তখন সেই মূর্তিকে বুলডোজার দিয়ে পূজা করা হয় না, মূর্তির থেকে ছোট বা সূক্ষ্ম জিনিষ ফুল বা ধূপ-দীপ দিয়েই পূজা করা হয়।

স্তুতির সময় বাণীর ব্যবহার করা হয়। বাণীর যখন উদ্গার হয় তখন তা চারটে ধাপে উদ্গার হয়ে থাকে, এই চারটে ধাপ হল – পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা এবং বৈখরী। আমরা সাধারণতঃ যা কথাবার্তা করি, যে কথা অপরে শুনতে পায় ও বুঝতে পারে এগুলোকে বলে বৈখরী, গলা থেকে ঠোঁট পর্যন্ত এটুকু থেকে যে কথাগুলো বেরোয় এই কথাকে বলে বৈখরী। দীক্ষার সময় শিষ্যকে মন্ত্র দিয়ে গুরু বলে দেন, মন্ত্র জপ করার সময় ঠোঁট যেন না নড়ে। যে কোন জপ করার সময়, গায়ত্রী মন্ত্রই হোক বা যে মন্ত্রই হোক ঠোঁট নড়া নয়, আসলে বৈখরীকে বন্ধ করতে বলা হয়। বৈখরী বন্ধ করা মানে, 'অ' থেকে 'ম' পর্যন্ত সব কটা বর্ণকেই বন্ধ করতে হবে। বৈখরীতে সব বাণী আমাদের vocal chord দিয়ে বেরোয়। বৈখরীতে vocal chordএর কম্পন হতে বাধ্য। বৈখরীকে বন্ধ করা মানে entire vocal chordকে বন্ধ করতে হবে। মুখ থেকে নিয়ে কণ্ঠ পর্যন্ত যে ধ্বণি যন্ত্র রয়েছে, এর যা কিছু নড়াচড়া এটাই বৈখরী। যা কিছু ধ্বণি এখান দিয়ে বেরোয় সেই ধ্বণিকেই বলছে বৈখরী। আমি যদি মুখ বন্ধ করে মনে মনে আপনাকে গালাগাল দিতে থাকি, আমি মনে করছি মনে মনে আপনাকে গালাগাল দিচ্ছি। মনে মনে যদি সত্যিকারের গালাগাল দেওয়া হয় তখন কি মনে মনে গালাগাল দেওয়া হচ্ছে? না, মনে মনে কখনই গালাগাল দেওয়া হয় না। মনে মনে কাউকে গালাগাল দেওয়া বা প্রশংসা করার সময় যদি ভালো করে লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে গলার কাছে খুব হাল্কা একটা কম্পন হতে থাকে। যদি খুব শক্তিশালী শব্দ তরঙ্গ মাপার যন্ত্র থাকে তাহলে ওতে ধরা পড়বে যে আমি কিছু বলছি। যদি দেখা যায় কিছু নড়ছে না, তাহলেও আমাদের শরীরের আভ্যন্তরীণ কোন একটা যন্ত্র নড়তে থাকবে। এটা থিওরেটিক্যাল কিছু নয়, সত্যিকারের নড়ে।

যতক্ষণ বৈখরীকে বন্ধ না করা হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু মন একাগ্র হবে না। স্বামীজীর রচনাবলীর এক পাতা যদি কেউ এক মিনিটে পড়ে নেয় তাহলে বুঝবেন বৈখরী তার অনেক নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। তিন মিনিট যদি লাগে তাহলে স্বাভাবিক। মনে মনে পড়ার সময়ও যাদের ঠোঁট নড়ে বুঝে নিন ওদের দ্বারা জীবনে পড়াশোনা হবে না। পড়ার সময় ঠোঁট নড়ছে না, কিন্তু এক মিনিটের বেশি সময় লাগছে তারা হল ধীর গতির পাঠক। স্বামীজীর রচনাবলীর মত বইয়ের এক পাতা যারা এক মিনিটে পড়ে নিতে পারে তাহলে বুঝতে হবে তাদের মন খুব একাগ্র হয়ে গেছে। কিন্তু তখনও শরীরের কোন একটা কিছু নড়তে থাকে, নড়তে থাকার জন্য পড়ার গতি নিতে পারে না। বৈখরী স্তরে ভোকাল কর্ড খুব হাল্কা নড়ছে। অনেক দিন ধরে প্রচুর জপ-ধ্যান করার ফলে ভোকাল কর্ডের কম্পন বন্ধ হয়ে যায়।

ভোকাল কর্ড যখন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়, তখন যে বাণী আসবে তাকে বলছে মধ্যমা। মধ্যমার বাণী কণ্ঠ দেশের নীচ থেকে বেরোয়। কণ্ঠ থেকে যখন ধ্বণি বেরোয় তখন এটাই ঠিক ঠিক নৈঃশব্দ। কণ্ঠের স্থূল ইন্দ্রিয়ের কার্য বন্ধ হয়ে যাওয়া মানেই নৈঃশব্দ, এই জায়গায় এসে জপের গতি অনেক বেড়ে যায়। প্রথমে একশ আট বার জপ করতে হয়তো দুই থেকে তিন মিনিট লেগে যাচ্ছিল কিন্তু ভোকাল কর্ড বন্ধ হয়ে গেলে তিরিশ সেকেণ্ডেরও কম সময়ে একশ আট বার জপ হয়ে যাবে। এবার আপনি মধ্যমাতে এসে গেছেন। মন আরও গভীরে যাওয়ার পর এই জপও যখন শান্ত হয়ে যায় তখন অনাহত অবস্থায় চলে যায়। অনাহত ধ্বণি বক্ষদেশ থেকে বেরোতে থাকে। এই অবস্থাকে বলছেন পশ্যন্তি। সাধনা করতে করতে এই অবস্থাকেও যখন অতিক্রম করে চলে যায় তখন দেখে এটাই পরা বাণী। আসলে অনাহত আর পরা বাণীর মধ্যে খুব একটা তফাৎ নেই। পরা বাণীতে দেখেন এই সেই ধ্বণি যেখান থেকে সমস্ত সৃষ্টি হচ্ছে। এই অবস্থাকেই বলা হয় পরা।

বেদ বলছে সমস্ত সৃষ্টি শব্দ থেকেই হয়েছে। ওম্এর 'অ' কণ্ঠ দেশ থেকে উৎপন্ন হয় আর 'ম'তে গিয়ে বন্ধ হয়, মাঝখানে 'উ'তে গড়াতে থাকে। আমাদের ঋষিরা ওম্এর 'অ' 'উ' 'ম'এর উপর অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ওম্ অনাহত ধ্বণি। ধ্যানের গভীরে যেতে যেতে প্রথমে তার সমস্ত শব্দগুলো বন্ধ হয়ে যায়, দ্বিতীয় ধাপে শুধু নৈঃশব্দ এবং তৃতীয় ধাপে একমাত্র ওঁ শুনতে থাকেন। ওঁএর পারে চলে যাওয়া মানে নির্বিকল্প সমাধিতে চলে যাওয়া। সমাধির ওই অবস্থাতেই ঠিক ঠিক ঈশ্বর জ্ঞান হয়। কিন্তু ওই স্তরে যাওয়ার শেষ অবস্থায় ওঁ টাও থাকে না। আকাশে একটা পাথর ছুড়লে কিছুটা উপরে গিয়ে আবার নীচে চলে আসে। একটা এ্যরোপ্লেনকে যখন আকাশে পাঠাচ্ছে তখন অনেক উপরে গিয়ে আবার নীচে নেমে আসে। যখন উপগ্রহ ছাড়া হয় সেই উপগ্রহ অনেক উপরে গিয়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। কিন্তু মঙ্গলযান যখন মঙ্গল গ্রহে পাঠানো হচ্ছে তখন সে

পৃথিবীর কক্ষ পথটাকেই অতিক্রম করে বেরিয়ে যায়। আমাদের যত সাধারণ কথা-বার্তা হয় এগুলো সব আকাশে পাথর ছোড়ার মত, এটা হল বৈখরী। কথা-বার্তা বন্ধ করে দেওয়া হল, সব শান্ত হয়ে গেল, এটা হল এ্যারোপ্লেনের মত, অনেক উঁচু দিয়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। এখানে ভোকাল কর্ড বন্ধ হয়ে গেছে, অর্থাৎ মধ্যমা স্তরে চলে গেল। অনাহত হল উপগ্রহের মত একটা কক্ষ পথে নিজের মত ঘুরে যাচ্ছে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আর ওর উপর কোন কাজ করতে পারছে না। পরা হল ওম্ এরও পারে, যেখান থেকে ওম্ এর জন্ম হয়। এটাই নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা।

দেবতারা স্তুতিতে বলছেন – মা! তুমি হলে পরা বাণী, বাণী তোমার থেকে জন্ম নেয়। বাণীর কথা ছেড়ে দাও, সব বাণী তো ওম্ থেকেই জন্ম নিচ্ছে, কিন্তু সেই ওম্‌কে তুমিই জন্ম দিচ্ছ। ওম্ এর 'অ' 'উ' 'ম', 'ম'য়ের পর যে নৈঃশব্দ নেমে আসে এটাই চতুর্থ অবস্থা। এমনিতে তিনটে অবস্থার কথা বলা হয় – জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এই তিনটে অবস্থার পর চতুর্থ একটি অবস্থা আছে, যাকে বলছেন তুরীয়। তুরীয় হল জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার পারে। পরা বাণী তুরীয় অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। মা! তুমি হলে পরা বাণী। তোমার যদি পূজা করতে হয়, তোমার যদি স্তুতি করতে হয় তাহলে তা তখনই করা যাবে যখন তুমি মূর্ত রূপ ধারণ করে থাকবে। মা দুর্গার প্রতিমা আছে, আমরা ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করছি। কিন্তু মা দুর্গা, তিনি তো পরা বাণীর রূপ, তাঁকে আমরা কি দিয়ে স্তুতি করবো। ছোট্ট বালগোপালের মূর্তি তাকে কি আমরা বুলডোজার দিয়ে কখন পূজা করতে পারি? বালগোপালের যে পূজা হবে তাঁর থেকে ছোট জিনিষ দিয়েই তো পূজা হবে। পরা মানে সূক্ষ্ম স্থূল কিছুই নয়। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, পরা হল মহাকারণ, মহাকারণকে আমরা কি দিয়ে স্তুতি করব! সেইজন্য দেবতারা বলছেন – *কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ*, তোমাকে কী দিয়ে স্তুতি করব! তুমি তো পরা বাণী। পরা বাণী মানে মন বাণীর পারে। এমনকি অনাহত অর্থাৎ ওম্ এরও পারে।

স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, যোগীর মন যখন সমাধিতে লীন হতে যাচ্ছে তখন জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের শেষ অবলম্বন হল অনাহত ধ্বণি। যাঁরা সমাধিতে যান তাঁরা ঘণ্টাধ্বণির শেষ লম্বা রেশ যেটা আস্তে আস্তে নৈঃশব্দের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই রকম অনুভব করেন। একটা ধ্বণি যেন ধীরে ধীরে ক্রমশ নৈঃশব্দের মধ্যে হারিয়ে যেতে থাকে। ওই আওয়াজ ওম্ না 'ম' না ঘণ্টার ধ্বণির মত, যে কোন ধরণের হতে পারে, আমাদের জানার কথা নয়, যাঁদের সমাধির অভিজ্ঞতা হয়েছে একমাত্র তাঁরাই জানেন। 'অ' 'উ' আর 'ম' হল ধ্বণি। আমরা যে অর্থে শব্দ বুঝি সেই অর্থে 'ওম' কোন শব্দ নয়, যেমন 'ক' আকার 'ক' কাক, 'আ' আর 'ম' আম, 'স' আকার 'প' সাপ এগুলো শব্দ, সেই রকম 'অ' 'উ' আর 'ম' মিলিয়ে 'ওম্' কোন শব্দ নয়। 'ওম্' হল একটা প্রতীক। কিসের প্রতীক? অনাহত ধ্বণির প্রতীক, যেখান থেকে সব শব্দের উৎপত্তি হয়। 'ওম'এর পারে হয় পরা বাণী। এটাই আশ্চর্যের যে সেন্ট লুইও বাইবেলে বলছেন – In the beginning there was word, word was with God and word was God।

অবাক হয়ে ভাবতে হয় যে, এখানে না হয় সাধনার একটা দীর্ঘ পরম্পরা আছে, সেই পরম্পরাতে দেবীকে বলা হচ্ছে *কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ*, মা তুমি পরা বাণী, খ্রিশ্চানরাও তো সেই একই কথা বলছে word was God। খ্রিশ্চান পণ্ডিতরা এটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছে আমাদের জানা নেই, আদৌ কোন ব্যাখ্যা আছে কিনা তাও জানা নেই। কিন্তু এই একটা ছোট্ট শব্দ *পরাপরোক্তিঃ*, মা তুমি পরা বাণী, এইটুকুর মধ্যে যে আধ্যাত্মিক জগতের কী বিশাল এক অমূল্য তত্ত্ব লুকিয়ে আছে ভাবলেই অবাক হয়ে যেতে হয়। আমাদের ঋষিরা, পূর্বজরা আমাদের জন্য এত কিছু অমূল্য সম্পদ দিয়ে গেছেন, অথচ আমরা জানিও না যে কত অমূল্য রত্নভাণ্ডারের আমরা মালিক। সাপ মাথায় মণি নিয়ে চলে কিন্তু শুধু মরা ব্যাঙ খেয়ে মরে। আমরা মাথায় এত বিশাল অমূল্য আধ্যাত্মিক সম্পদ, spiritual heritage বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি অথচ সারা জীবন শুধু মরা ব্যাঙ খেয়েই মরছি।

এই স্তুতি যে সে লোক কেউ করছে না, দেবতারা এই স্তুতি করছেন। কথামৃতে ঠাকুর একটা গল্প বলছেন। গ্রামের জমিদারের বাড়িতে ভোজের আয়োজন হয়েছে। সেখানে গ্রামের বড়লোকদের সাথে চাষাভুশারাও নিমন্ত্রিত। খাওয়ার সময় চাষাভুশাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে 'আমড়ার অম্বল খাবে'। তারা জিজ্ঞেস করছে 'বাবুরা

কি খেয়েছেন? বাবুরা যদি খেয়ে থাকে তাহলে আমাদেরও দাও, বাবুরা যেকালে খেয়েছেন তাহলে তা ভালোই হবে’। যখন দেখছেন যে দেবতাদের আমরা শ্রেষ্ঠ বলছি, তাঁরাই দেবী অম্বিকার স্তুতি করছেন। শুধু মানুষ যদি এই স্তুতি করত তাহলে মনে হত সেরকম কিছু কথা নয়। রাজা যদি করে তাহলে হ্যাঁ এর কিছু দাম আছে। দেবতারা রাজারও ওপরে, সেই দেবতারাই যদি স্তুতি করেন তাহলে তার সাংঘাতিক গুরুত্ব বেড়ে যাবে। যে ঋষিরা মাতৃশক্তির মাহাত্ম্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তারপর তাঁরা যখন কাহিনী রূপে রাখছেন তখন প্রথম থেকেই তাঁরা দেবতাদের কাহিনীর মধ্যে নিয়ে এসেছেন। ঋষিরা জানতেন আমাদের সাধারণ মন এগুলোকে ধারণা করতে পারবে না। সাধারণ মানুষ রাজার জাঁকজমক ছাড়া রাজাকে বুঝতে পারে না। ঐশ্বর্য ছাড়া রাজা হয় না। মাতৃশক্তি ঐশ্বর্য ছাড়া হবে না। দেবতাদের ঐশ্বর্য সব থেকে বেশী বলে দেবতাদের দিয়ে মাতৃশক্তির বন্দনা করাচ্ছেন। এর পর বলছেন –

সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ।।৭

যিনি পরা বাণী তাঁকে আমরা কী দিয়ে পূজা আর স্তুতি করব! আর তোমার স্তুতি যদি করতেও হয় তাহলে সব থেকে শ্রেষ্ঠ কি উক্তি হতে পারে? মানব জীবনের উদ্দেশ্য ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটে পুরুষার্থের সাধন করা। অর্থ আর কাম হল, একটা বড়লোকের অধীনে যদি চাকরি করা যায় দুটো টাকা এসে যাবে আর ভজিয়ে ভাজিয়ে কোন মেয়েকে কোন রকমে রাজী করিয়ে বিয়ে করে নিলে কাম পূরণ হয়ে যাবে। কিন্তু এরপরের যে দুটো তার মধ্যে ধর্ম আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে আর এই ইহকাল আর পরকালের মধ্যে বারবার আসা-যাওয়ার পারে নিয়ে যাবে মোক্ষ। দেবতারা তাই বলছেন, মা! তোমাকে যদি পরমা উক্তি দিয়ে স্তুতি করতেই হয়, তাহলে এর থেকে আর শ্রেষ্ঠ উক্তি কী হতে পারে! কি সেই উক্তি? *সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী*, তুমি সর্বভূতা, শুধু মানুষ বা ঋষিকেই নয় যে কোন লোককে, তুমি যদি চাও স্বর্গ প্রদান করে দিতে পারো আর তুমি যদি চাও মুক্তিও দিয়ে দিতে পারো।

কোন বক্তৃতা মঞ্চে বা কোন সভায় যখন কোন বক্তাকে পরিচিত করান হয় তখন তাঁকে কীভাবে পরিচয় দেওয়া হয়? উনি মিস্টার অমুক, উনি অমুক জায়গার বাসিন্দা, উনি অমুক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্সের অধ্যাপক, এই ধরণের অনেক কিছুই বলা হয়। তাঁর থেকে আরেকটু বিখ্যাত লোককে পরিচয় করার সময় বলবে ইনি এই এই পুরস্কার পেয়েছেন, উনি তিনবার বিদেশ সফর করেছেন ইত্যাদি। কিন্তু যখন অমিতাভ বচ্চন বা শচীন তেণ্ডুলকারকে পরিচয় করান হবে তখন কী বলবে? ইনি শচীন তেণ্ডুলকার। ব্যস্! এতেই সব পরিচয় হয়ে যাবে। যদি প্রধানমন্ত্রী আসেন? তখন বলবে, ইনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এরপর কেউ বলতে যাবে না যে, ইনি বিশ্বের একজন নামকরা অর্থনীতিবিদ্, ইনি তাঁর দলের সভাপতি, তিনি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার গভর্নর ছিলেন, যেটাই বলবে সেটাই ফালতু হয়ে যাবে। প্রণব মুখার্জি যদি হন? ইনি ভারতের রাষ্ট্রপতি। এরপর আপনি আর বলতে যাবেন না যে উনি আগে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন, উনি অর্থমন্ত্রী ছিলেন, উনি বিদেশ মন্ত্রী ছিলেন, সবটাই ফালতু হয়ে যাবে। ইনি দেশের রাষ্ট্রপতি, এরপর আর কিছু বর্ণনা হয় না। এরপর যেটাই বলা হবে সবটাই ফালতু। একজন ফিজিক্সের অধ্যাপককে পরিচয় করাতে গিয়ে অনেক কিছু বলতে হবে, কারণ তিনি ওই স্তরের লোক নন। কিন্তু আইনস্টাইন যদি আসেন, তাহলে শুধু বলে দেবে ইনি আইনস্টাইন। এরপর আর বলতে যাবে না যে ইনি রিলেটিভিটির উপর কাজ করেছেন, ইনি ফটো ইলেক্ট্রনিকের উপর কাজ করেছেন, তাঁর অমুক অমুক থিসিসের উপর বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে যাচ্ছে। একটাই শব্দ – ইনি অমুক।

দেবতারা মাকে বলছেন, তোমাকে কীভাবে introduce করা হবে? তোমার একটাই বর্ণনা, তুমি যাকে খুশি স্বর্গ দিতে পার, যাকে খুশি মুক্তি দিয়ে দিতে পার। এখানেই তো শেষ কথা বলা হয়ে গেল, এরপর আর কী বলার বাকি থাকে! সাধারণ মানুষের একটাই ইচ্ছা মৃত্যুর পর আমি স্বর্গে যাব, স্বর্গে আমার যারা প্রিয়জনরা আছে তাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে। আর যাঁরা সন্ন্যাসী, তাঁরা বলবেন আমার মুক্তি চাই। যার জীবনের যেটা সব থেকে উচ্চতম প্রত্যাশা সেটাই মা ইচ্ছে করলেই দিয়ে দেন। এমনকি ঠাকুর, যিনি বর্তমান যুগের যুগপুরুষ, তিনিও বলছেন মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। মা অনায়াসে সেটাও আপনাকে দিয়ে দেবেন। এরপর মায়ের

আর কী বর্ণনার বাকী থাকে! তিনি বিদ্যাস্বরূপা, তিনি *স্ত্রীয়ঃ সকলা জগৎসু*, এগুলো বলার আর কোন গুরুত্বই থাকে না। ঠাকুর বলছেন কল্পতরু বৃক্ষের কাছে গিয়ে কেউ কি লাউ কুমড়ো ফল চাইবে! মায়ের গুণের যদি বর্ণনা করতে হয় কি দিয়ে বর্ণনা করা হবে? *সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী*, যত জীব আছে তুমি ইচ্ছে করলে যাকে খুশি স্বর্গ আর মুক্তি দিয়ে দিতে পার। একটা যে কীট তাকেও তুমি স্বর্গ দিয়ে দিতে পার। একটা যে কীট তাকেও তুমি মুক্তি দিয়ে দিতে পার। এইভাবে যখন তোমার স্তুতি করা হয়ে গেল এরপর আর কি দিয়ে তোমার স্তুতি হতে পারে! বিরাটকে যখন বলে দেওয়া হয় এরপর বাকি সব কিছুই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। যদিও অনেক সময় বলা হয় – এনার পরিচয় দুটো বাক্যেই বলে দেওয়া যায়, কিন্তু এখানে দুটো অর্থে নেওয়া যেতে পারে, হয় তিনি অপদার্থ আর তা নাহলে তিনি এত বিরাট যে তাঁর ব্যাপারে বলে শেষ করা যাবে না। মা ঠিক সেই রকম সব থেকে শ্রেষ্ঠ যেটা হতে পারে, তিনি যে কোন জীবকে, শুধু সাধককেই নয় বা সিদ্ধ পুরুষকেই নয়, যে কাউকে, কারুর হয়তো কিছুই উপলব্ধি হয়নি, কোন তপস্যা বা সাধনাও করেনি তাকেও তিনি স্বর্গ ও মুক্তি দিয়ে দিতে পারেন। এরপর আর কিছু স্তুতি করার থাকে না।

কিন্তু তাও আমাদের স্তুতি করতে হয়। ঠাকুর বলছেন একজন গান করছে 'নিতাই আমার মাতা হাতি'। সেখান থেকে ধীরে ধীরে তার ভাব হয়ে যাচ্ছে। ভাব হয়ে যাওয়ার পর বলছে 'মাতা হাতি', তারপর শুধু 'হাতি' 'হাতি' করে যাচ্ছে। তারপর আর হাতিও বলতে পারছে না, মুখ দিয়ে শুধু 'হা' এই শব্দটুকুই বার করতে সক্ষম হচ্ছে। সে 'তি' বলছে না, কারণ 'তি' বলতে মুখ যে নড়বে, ভাবের অবস্থায় সেটাও নড়বে না, তখন শুধু 'হা' হয়ে থেকে যায়। এবার আপনাকে মায়ের ধ্যান করতে বলা হয়েছে, আপনি যদি প্রথমেই ভাবতে থাকেন 'মা! তোমার কী আর ধ্যান করব! তুমি তো স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী'। তাহলে তো আর এই দুর্গাস্তোত্র যা কিনা চণ্ডীতে বলা হয়েছে, এই স্তোত্র আর চলবে না। এখানে সাধারণ মানুষকে মায়ের স্তুতি করার দিকে আকৃষ্ট করাতে হবে, সেইজন্য প্রথমে মায়ের সর্বোচ্চ অবস্থাটা বলে দেওয়ার পর এবার মায়ের ব্যাপারে আরও দুচারটে কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু যে জায়গাকে অবলম্বন করে মায়ের ধ্যান করা হবে, ধ্যানে মন এক গভীর ভাবরাজ্যে চলে যাবে, যে অবস্থায় চলে যাওয়ার পর আর ফিরে আসতে ইচ্ছে করবে না, সেটা হল এই সাত নম্বর মন্ত্র। কেউ না কেউ এই মন্ত্রের রচয়িতা, যিনি রচনা করেছেন, তিনি ঋষিই হোন আর যাই হোন, কী অসাধারণ প্রতিভা! ভাবলেই অবাক হয়ে যেতে হয়। এর আগেও তো মায়ের অনেক স্তুতি হয়েছে, পঞ্চম অধ্যায়ে বলছেন মা তুমি এই, তুমি সেই, এগুলো হল আমাদের বোঝানর জন্য, তা নাহলে আমরা মায়ের স্তুতি করতে পারব না। এই যে বলছেন মা! তুমি স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী, যাঁরা সাধনা করেছেন, তপস্যা করেছেন তাঁরা হয়ত বুঝে যাবেন, কিন্তু আমরা সাধারণ লোক, এটাকে ধারণা করা আমদের ক্ষমতার বাইরে, তাই এই কথা সেই কথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলতে হয়। পরের মন্ত্রে সেইজন্য বলছেন –

সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।৮

এখানে সাধারণ মানুষের স্তরে নিয়ে এসে বলছেন, সমস্ত হৃদয়ে তুমি বুদ্ধি রূপে অবস্থান কর। হৃদয় বলতে আমরা আমাদের বক্ষস্থলের কেন্দ্রকে দেখাই আর বুদ্ধিকে ইঙ্গিত করার সময় মাথা দেখাই। আমাদের ঋষিরা এত বোকা ছিলেন না যে, এই জিনিষটা তারা জানতেন না। সবাই বোঝে হৃদয় কি আর বুদ্ধি কি। হৃদয় হল একটি সাধারণ পরিভাষা, যেখান থেকে শুদ্ধ দৈবী শক্তির স্ফুরণ হয়। মস্তিষ্কের বুদ্ধি সব সময় আসুরিক শক্তি। দিব্য ভাব দিয়ে আসুরিক ভাবকে দৈবী ভাবে রূপান্তরিত করা হয়। দিব্য ভাব সর্বদা আত্মজ্ঞান থেকে আসে। আমাদের ধারণা যে আত্মজ্ঞান বুদ্ধি থেকে আসে, কিন্তু বুদ্ধি থেকে আত্মজ্ঞান আসে না। আত্মার স্তর সব কিছু থেকে আলাদা, ঋষিরা ধ্যানের গভীরে আত্মাকে হৃদয়ে জ্যোতি রূপে দর্শন করেন, অনাহত ধ্বণি রূপে দেখেন। সেইজন্য বলা হয়, ভালো যা কিছু, যা কিছু শুভ সব হৃদয় থেকেই বেরোয়। ভালোবাসার প্রত্যক্ষ অনুভূতি মানুষ হৃদয়েই অনুভব করে। যার প্রতি ভালোবাসা আছে তাকে দেখলেই হৃদয়টা মোচড় দিয়ে ওঠে। বিরহ জ্বালা সেটাও হৃদয়েই অনুভূত হয়। ভালোবাসার মানুষকে কাছে না পেলে বুকে ব্যাথা হয়। অথচ এর সব রাসায়নিক বিক্রিয়া মস্তিষ্ক থেকেই ছাড়া হয়।

বুদ্ধিরূপেণ, এই বুদ্ধি হল বিবেক বুদ্ধি, যা দিয়ে কোনটা শুভ আর কোনটা অশুভ চেনা যায় এবং শুভ আর অশুভকে জানার পর বুদ্ধি আমাদের শুভের দিকে নিয়ে যায়। এই বুদ্ধি কিন্তু মস্তিষ্কের বুদ্ধি নয়। বুদ্ধি থাকলেই হবে না, আমরা সবাই মোটামুটি জানি কোনটা শুভ, কোনটা অশুভ। কিন্তু জানলেই তো হবে না, সেই অনুসারে আমাদের শুভ কর্ম করার ক্ষমতাও থাকা চাই। *সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে*, মানুষের যে মন, সেই মনের মধ্যে মা! তুমি বুদ্ধি রূপে অবস্থান করে আছ। মা যদি বুদ্ধি রূপে বসে থাকেন তাহলে ভালো যা করা হবে সেটাও বুদ্ধি করায়, মন্দ যেটা করা হবে সেটাও বুদ্ধি করায়। দুর্বল বুদ্ধি আর সবল বুদ্ধি সবটাই তাহলে মা। সেইজন্য বলছেন *স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে*। এই জগতে মানুষ যা কিছু পায় সব বুদ্ধির জোরেই পায়। যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে, বুদ্ধির জোরেই করছে, সন্তানকে ভালো শিক্ষা দিচ্ছে তাও বুদ্ধির জোরে, আপনার জীবনে যা কিছু উন্নতি সব আপনার বুদ্ধির জোরেই হচ্ছে। আর মৃত্যুর পর যে স্বর্গে যাবে সেটাও বুদ্ধির জোরেই যাচ্ছে। কি করে স্বর্গে যাচ্ছে? শুভ কাজের দ্বারা, মানুষ যখন শুভ কাজ করে – আমি অশুভ জিনিষের দিকে মন দেব না, বাজে কাজ করব না, শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম করব না, ঈশ্বরের দিকে মন দেব – সব বুদ্ধির জোরেই সম্ভব হচ্ছে। যাঁরা স্বর্গ চাইছেন না, ইহলোকে কোন কিছুর প্রতি যাঁর কোন ধরণের আকর্ষণ নেই, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু চাইছেন না, এনাদের মা অপবর্গ দেন। অপবর্গ মানে মুক্তির দিকে যাওয়া, যে বুদ্ধি মানুষকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ধর্ম দুই প্রকার – প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্মে কর্ম থাকবে, কর্ম করলে কিছু প্রাপ্তি হবে আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মে শুধু ত্যাগ। নিবৃত্তিতে যে ত্যাগ হয়, যদি সত্যিকারের ত্যাগ হয়, আলস্যের জন্য ত্যাগ করছে না, তখন এই ত্যাগ মোক্ষের দিকে নিয়ে যাবে। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মে, যেখানে মানুষ সংগ্রহ করছে, সেটা দুই রকম হয় – দৈবী আর আসুরিক। যখন ধর্ম সম্মত ভাবে সংগ্রহ করছে তখন সেটা দৈবী হয়ে যায়, অন্যায় ভাবে যখন সংগ্রহ করা হচ্ছে তখন সেটাই আসুরিক হয়ে যায়। বলছেন, ভোগ জিনিষটাই মায়ের কাছ থাকে আসে, কারণ বুদ্ধির শক্তি না থাকলে ভোগ্যবস্তু অর্জন করতে পারবে না। একজন বুদ্ধিকে যখন দৈবী সম্পদ রূপে কাজে লাগিয়ে আয়ত্ত করছে, তখন সেই বুদ্ধি তাকে স্বর্গের দিকে নিয়ে যায়। আবার আরেকজনের বুদ্ধি তাকে এমন করে দিচ্ছে যে সে বলছে আমার কিছুই লাগবে না, তখন সেই বুদ্ধিই তাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মা হলেন এই বুদ্ধি স্বরূপা। যার বুদ্ধির অভাব বুঝবেন তার উপর মায়ের কৃপা কম। যার মধ্যে অন্যায় ভাবে সংগ্রহ করার প্রবণতা, বুঝবেন তার উপর মায়ের কৃপা নেই। যে ঠিক পথে ধর্ম সম্মত ভাবে সংগ্রহ করে যাচ্ছে, তার উপরে মায়ের কৃপা আছে ঠিকই কিন্তু সন্ন্যাসীর তুলনায় কম। যে সন্ন্যাসী সম্পূর্ণ কামিনী-কাঞ্চন মুক্ত, একেবারে ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত, বুঝবেন মায়ের কৃপা লাভে সে শ্রেষ্ঠ। মায়ের কৃপা তিনটি স্তরে চলে – আসুরিক শক্তি, দৈবী শক্তি আর ত্যাগের অর্থাৎ সন্ন্যাসের শক্তি। বাকি যারা আছে সব অপদার্থ, কুমড়ো কাটা বড় ঠাকুর, এদের দ্বারা কিছুই হবে না। শাস্ত্র এদেরকে হিসাবের মধ্যেই রাখছে না। ক্ষমতা প্রথমে আসে আসুরিক শক্তি দিয়ে, আমি সব কিছুকে জয় করব। সেখান থেকে দ্বিতীয় স্তরে আসে আমি যা কিছু সংগ্রহ করব ধর্ম সম্মত ভাবেই সংগ্রহ করব। তৃতীয় স্তরে, আমার কিছু লাগবে না, আমি কিছু সংগ্রহ করতে যাবো না। মা হলেন স্বর্গাপবর্গদে দেবি, হে নারায়ণী! তুমিই স্বর্গ প্রদান কর তুমিই আবার মুক্তির দিকে নিয়ে যাও, তোমাকে প্রণাম। পরের মন্ত্রে আবার বলছেন –

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।৯

আমাদের ঋষিরা সময়কে মাপার যে হিসাব দিয়েছেন তার মধ্যে সময়ের সব থেকে ক্ষুদ্র ইউনিট হল নিমি। চোখের পাপড়ি ফেলতে যেটুকু সময় লাগে তাকে বলছেন নিমি। চোখের পলকে কিছু করে দেওয়াকে বাংলায় বলে নিমেষের মধ্যে করে ফেলেছে। মিথিলাতে এক সময় এক রাজা ছিলেন, তিনি ছিলেন জ্ঞানী। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাঁর উপর কিছু অভিশাপ হয়ে যায়, অভিশাপে বলা হয় রাজা সবার চোখের পাপড়িতে থাকবেন। রাজার নাম ছিল নিমি, সেখান থেকে এসে গেল নিমেষ। নিমি হল সময়ের সব থেকে ক্ষুদ্র ইউনিট, নিমি থেকে একে একে কলা, কাষ্ঠা নামে সময়ের মাপ বাড়তে থাকে, সেখান থেকে আরও বড় ইউনিটে গিয়ে নাম হয়ে যায়

ঘড়ি, প্রহর, দিন ইত্যাদি। পাশ্চাত্যের হিসাবে সেকেণ্ড সব থেকে ছোট ইউনিট কিন্তু আমাদের কাছে নিমি সব থেকে ছোট। নিমেষ এক সেকেণ্ড থেকে অনেক ছোট ইউনিট। ইদানিং বিজ্ঞানে ন্যানো সেকেণ্ড এসে গেছে।

কলা, কাষ্ঠাদি সময়ের এই ইউনিট গুলি কোন কিছুর পরিবর্তনকে সূচিত করছে। তাহলে পরিবর্তন জিনিষটা কি? যে কোন বস্তু দেশ, কাল ও পাত্রে আবদ্ধ হয়ে আছে। ধরুন এই কলম, এই কলমের দেশ, কাল ও পাত্রকে যদি জানতে চাই তাহলে আমাকে বলতে হবে, পাত্র হল কলম, দেশ মানে বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘরের টেবিলে আছে, যদি চান তো এর কোর্ডিনেটস্‌কেও ব্যাখ্যা করে দেওয়া যাবে। আর কাল হল, তিনটে বেজে বত্রিশ মিনিটে এখানে দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে বেজে তেত্রিশ মিনিটে এই কলমের অবস্থার পরিবর্তন হবে কি হবে না? অবশ্যই পরিবর্তন হতে হবে, এটাই বিজ্ঞানের মৌলিক নিয়ম। তিনটে বেজে বত্রিশ মিনিট থেকে তিনটে বেজে তেত্রিশ মিনিটের মধ্যে কত এয়ার মলিক্যুলস এই কলমকে এসে আঘাত করেছে। ডিজেনারেট তো একদিনে হচ্ছে না, ডিজেনারেট প্রতি মুহুর্তে হয়ে যাচ্ছে। সব কিছু সব সময় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বিনাশের দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এখানে আসার আগে আমরা খাওয়া-দাওয়া করে এসেছি। কেন খেয়ে এসেছি? শরীরে শক্তি সরবরাহের জন্য। কাল রাত্রে বা দুপুরেও খেয়েছিলাম, তখনও শরীরে শক্তি সরবরাহ হয়েছিল। কিন্তু সেই শক্তি ক্ষয় হতে হতে আজকে পেট ফাঁকা হয়ে গেছে, আজকে তাই আবার খেতে হয়েছে। আমাদের পরিবর্তন তো বারো ঘণ্টা পরে হয়নি, ক্রমাগত আমাদের অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। বিজ্ঞান জগতে আইনস্টাইনের দেশের ধারণা আর নিউটনের দেশের ধারণায় অনেক তফাৎ এসে গেছে। যে কোন জিনিষ শুধু দেশে আবদ্ধ হয়ে নেই। প্রথম দিন থেকে আমাদের ঋষি মুনিরা যে দেশ, কাল ও পাত্রের কথা বলে আসছেন, আইনস্টাইন এসে সেই একই কথা বলছেন, তিনি দেশ আর কালকে এক সঙ্গে নিয়ে এলেন, এর নামই হল Time and Space। এখন এই কলমকে আমি টেবিল থেকে সরিয়ে আমার পকেটে রাখলাম, এখানেই কলমের অবস্থান পরিবর্তন হয়ে গেল। পকেটে না রেখে যদি সব সময় টেবিলেই রেখে দেওয়া হয় তাহলেও এর অবস্থান পরিবর্তন হবে। কারণ কলমের গায়ে বাতাস এসে ধাক্কা মারছে, তাপ, জলীয় কণা এগুলো এসে কলমের উপর পড়ছে, এতে কলমও ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। পড়াশোনা করার সময় একটা জিনিষকে হঠাৎ করে কখনই বুঝে নিচ্ছি না। এখানেও একটা ধীর গতিতে রূপান্তর হতে থাকে। পরিবর্তন বস্তুতে যেমন হচ্ছে তেমনি সময়েও পরিবর্তন হতে থাকে।

দেশ ও কাল দুটোতেই পরিবর্তন হয়। কোন কারণে যদি দেশে পরিবর্তন না হয়, কিন্তু আইনস্টাইনের থিয়োরিতে স্পেসও স্থির নয়, স্পেসও মুভ করছে। সেই অনুসারে আপনি এখানে একটি কলম রেখেছেন, আপাতঃ দৃষ্টিতে আপনার মনে হবে জিনিষটা এখানে স্পেসে স্থির হয়ে আছে। কিন্তু একজন লোক যদি চাঁদ থেকে বা সৌরজগতের বাইরে থেকে দেখে, তখন সে দেখবে কলমটার স্থান পরিবর্তন হয়ে গেছে, কারণ ততক্ষণে পৃথিবী কয়েক পাক ঘুরে ফেলেছে, এখানেই অবস্থান পরিবর্তন হয়ে গেল। কলমের যে স্থান পরিবর্তন হয়েছে, এর একটা হল পৃথিবী ঘুরছে কিন্তু সব থেকে বড় পরিবর্তন হয়েছে সময়ে, কারণ সময় তো থেমে নেই সেতো অনবরত মুভ করে যাচ্ছে, তাই কলমের অবস্থারও পরিবর্তন হয়ে গেছে। যে কোন জিনিষের অবস্থার পরিবর্তন হবেই।

জগতে অনবরত সৃষ্টি আর বিনাশ হয়ে চলেছে। এর আগে আমরা দু ধরণের এণার্জির কথা বলেছিলাম – Pattern Energy আর Unpattern Energy। এই দুটো এণার্জি কোথায় কাজ করছে? বেলুড় মঠের মন্দিরকে দেখলে মনে হবে গঙ্গার পশ্চিম তীরে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে মন্দিরের অবস্থান পরিবর্তন অনবরত হয়ে চলেছে। কারণ মন্দিরের উপর বাতাস, রৌদ্রের তাপ, জল, জলীয় কণা সব সময় আছড়ে পড়ছে। মন্দিরের অবস্থানের পরিবর্তন দেশে হচ্ছে না, পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে কালে। দেশে পরিবর্তন বলুন আর কালে পরিবর্তন বলুন, কিন্তু মূল পরিবর্তন যেটা হয় সেটা কালে হয়। যেটা সব থেকে স্থির বস্তু তারও কালে সব সময় পরিবর্তন হয়ে চলেছে।

যদি কোন কলমকে আরও দ্রুতগতিতে ক্ষয় করাতে চান, তাহলে কলমটাকে ভেঙে দিলেই হল। দামী কলমকে ভেঙে দিয়ে এর অবস্থান পরিবর্তন করে দেওয়া হল। এই পরিবর্তনটাও তো কালের মধ্যেই হল। কিন্তু এখানে ভাঙচুরের কথাও বলছেন না, যে জিনিষকে আমি অনেক যত্ন করে রেখে দিয়েছি, যেমন বেলুড় মঠের মন্দিরকে কত ভাবে রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা যত্ন নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তাতেও মন্দিরের অবস্থার পরিবর্তন হবেই। এই

অবস্থার পরিবর্তনটা হয় কালে বা টাইমে। সিনেমায় যেমন ডায়লগে বলা হয় তোমার জীবন থেকে একটা সেকেণ্ড কমে গেল। তার মানে এক সেকেণ্ড করে করে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে সে বিনাশের দিকে যাচ্ছে। এগুলো সিনেমার ডায়লগ হতে পারে, কিন্তু আমি আপনি সবাই, আমাদের আশেপাশে যা কিছু আছে সব কিছুরই অনবরত অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। কোথা দিয়ে পরিবর্তন হচ্ছে? Journey through time।

যখন journey through time হয় তখন তার ছোট্ট ইউনিট হল কলা কাষ্টা। কলা কাষ্ঠা কে? মা নিজেই। তাই বলছেন *কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি*, যে কোন জিনিষের পরিণাম যেটা হয় সেটা মায়ই দিচ্ছেন। আমি ভালো হচ্ছি, ভাল হওয়ার যে পরিণাম সেটা মা দিচ্ছেন, আমি অসৎ হয়ে যাচ্ছি, সেটাও মা দিচ্ছেন। খারাপের পরিণামও মা দিচ্ছেন, ভালোর পরিণামটাও মা দিচ্ছেন। কার মাধ্যমে? কালের মাধ্যমে। কালের ক্ষুদ্রতম ইউনিটের কথাই এখানে উল্লেখ করছেন। কারণ বড় ইউনিট যদি দেওয়া হত তাহলে ক্রমাগত পরিবর্তনটা বোঝা যাবে না। ক্ষুদ্রতম ইউনিটে দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, সময়ের মধ্যে দিয়ে জগতের সব কিছুর অবস্থার ক্রমাগত পরিবর্তন হয়ে চলেছে। কোন কিছুই এই পরিবর্তন থেকে রেহাই পাবে না, শুধু বস্তুর নয়, পরস্পরের সম্পর্কের কথা বলুন, ব্যক্তিত্বের কথাই বলুন যেটাই বলুন সব কিছুর অনবরত পরিবর্তন হয়ে চলেছে। পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষাতে যদি বলা হয় তখন বলবে মাইক্রো সেকেণ্ড আর ন্যানো সেকেণ্ডের মাঝখান দিয়ে অবস্থার পরিবর্তন ক্রমাগত হয়ে চলেছে। তিনিই হলেন মাইক্রো সেকেণ্ড, তিনিই আবার ন্যানো সেকেণ্ড। কালী শব্দের অর্থ হল যিনি কালের সাথে রমণ করেন। একমাত্র ন্যানো সেকেণ্ডই না, এরপরেও যে টাইমের smallest unit হবে সেটাও মায়ই হবেন।

আগেকার দিনে আমাদের সপ্তাহের কোন ধারণা ছিল না, চন্দ্রমার কলার হ্রাস বৃদ্ধি দেখে পক্ষের হিসাব করা হত, এক পক্ষ মানে পনের দিন। কলা, কাষ্ঠা থেকে শুরু করে দিন, পক্ষ, মাস, বছর, যুগ, যেখানেই যান কাল হল মা নিজে। কাল কি করে? জগতের যে কোন জিনিষ, হীরা যা কিনা সব থেকে কঠিন পদার্থ, তাকেও বিনাশের দিকে নিয়ে যায়, যদিও ধীর গতিতে যাচ্ছে, কিন্তু সময় এই হীরা সমেত সবাইকে বিনাশের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর পরিণাম। কাঁচা চাল, কাঁচা সবজি রান্না করার পর একটা হয়ে গেল ভাত আর অন্যটা হয়ে গেল চচ্চড়ি। এই যে বস্তুর পরিণাম হল, এটাও মা নিজে। এগুলো শুধু শুনে গেলে হবে না, ধারণা করতে হবে। আমরা সবাই বলছি আমাদের জীবন রেলগাড়ির মত ছুটে চলেছে। কোথায় আর ছুটে যাচ্ছে! শুধু পরিবর্তন হয়ে চলেছে, জীবনের একমাত্র বাস্তবতা হল পরিবর্তন। জগতে কোন কিছুই স্থির নেই। কারণ প্রকৃতি নিজে ত্রিগুণাত্মিকা, সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণ। এই তিনটে গুণ সব সময় এক অপরকে দাবানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। এখন ঘড়ির যে কাঁটা কোয়ার্জ দিয়ে চলে সেখানে বলা হয় কোয়ার্জ ক্রিস্টালের মলিক্যুলস যখন কাঁপে তখন তার কম্পন এক সেকেণ্ডে এত বার কাঁপে। তাহলে এতগুলো যদি কম্পন হয় তখন সেটা হবে এক সেকেণ্ড। এখন যে এ্যটমিক ঘড়ি হয়েছে, সেই ঘড়িকে যদি এই নিয়মানুসারে মাপা যায়, তাতে বলা হয় এক একটা যে এ্যটমিক ঘড়ি আছে এক কোটি বছর পর তাতে এক সেকেণ্ডের স্লো বা ফাস্ট হবে।

ইংরাজীতে দুভাবে মানুষের বয়স জিজ্ঞেস করা যায়, একটা হল what is your age, আরেকটা হল how old are you। ভারতীয় ভাষাতেও দু ভাবে বলা হয়, একটা হল বয়স কত, আরেকটা হল আয়ু কত। অথচ আয়ুর অর্থ উল্টো, আয়ু মানে উপর থেকে কমাতে থাকে, আমরা প্রায়ই বলি, তোমার আয়ু দিনে দিনে কমে আসছে। প্রত্যেক সেকেণ্ডে আমাদের বয়স বাড়ছে, কিন্তু আয়ু কি করে কমে আসছে বলছে! আমাদের দুটো শব্দ – বয়স আর আয়ু। বয়স হল এগিয়ে যাওয়া, বয়সে এগিয়ে যাওয়া মানে আয়ু কমে আসছে। আয়ু শব্দের সমস্যা হল, আয়ুকে দুদিক থেকেই নেওয়া হয়, কতটা এগিয়েছে আর কতটা কমেছে। যখন আমি ভাবছি পৃথিবীর এত বয়স হয়েছে, অন্য দিকে এটাও মনে রাখতে হবে পৃথিবীর যত দিন বেঁচে থাকার কথা সেখান থেকে তার আয়ু কমে যাচ্ছে। কেন কমে আসছে? কারণ অবস্থা পরিবর্তনের মাঝখান দিয়ে গেছে বলে। এই অবস্থার পরিবর্তন কীভাবে হচ্ছে? সময়ে পরিবর্তন হচ্ছে। সময়ের ক্ষুদ্রতম ইউনিটকে মানুষ বুঝতেও পারে না। মানুষ যেটা বুঝতে পারে না, সেটা নিয়ে তার মাথা ব্যাথাও হয় না। তাই মানুষ যে তার অজান্তেই পরিবর্তনের মাঝখান দিয়ে বিনাশের দিকে চলে যাচ্ছে সেই ব্যাপারে তার কোন হুঁশ নেই।

টাইমকে আমরা দুভাবে দেখতে পারি। দুটো ইভেন্ট ইউনিফর্ম ভাবে চলছে, যেমন ঘড়ির কাঁটা স্প্রিংএর জন্য ঘুরছে, তাই দিয়ে মেপে বলছে এটা হল সেকেণ্ড। অথবা কোয়ার্জের ক্রিস্টলের মলিক্যুলের লেভেলে যে কম্পন হচ্ছে সেটাই সময়ের মাপ। আর অন্যটা হল ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী। এমনকি ফিজিক্সের লোকেরাও যাঁরা দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখেন তাঁরা দেখেন সময়ের নদী বয়ে চলে যাচ্ছে, সবাই আমরা এই সময়ের নদীতে ভাসমান। তাই সবারই পরিবর্তন হয়ে চলেছে। সময়ের গতিকে যদি মাপতে হয় তাহলে ইভেন্টস্ গুলোকে রেখে মাপতে হবে। কিন্তু সময় নিজে যে বয়ে চলে যাচ্ছে, এটা হল মা নিজে। সবাইকে অবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, ঈশ্বর ছাড়া জগতে আর কেউ নেই যার অবস্থার পরিবর্তন হবে না। একমাত্র ঈশ্বরের অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই। কারণ তিনি প্রকৃতির পারে। কিন্তু তিনিও যখন অবতার হয়ে শরীর ধারণ করে আসেন, তখন তাঁরও শরীরের অবস্থার পরিবর্তন হয়।

কত লোক চণ্ডী শুনেছেন, কত লোক চণ্ডী নিত্য শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করে যাচ্ছেন, কিন্তু চণ্ডীর এইসব মন্ত্রের ভেতরের গূহ্য দর্শন কত গভীরে নিয়ে চলে যেতে পারে আমরা ভাবতেই পারি না। সেই ভাব নিয়ে বেশির ভাগই লোক চিন্তনই করতে পারেন না। এগুলোই ঠিক ঠিক চিন্তনের বিষয়, চিন্তন করতে করতে আমাদের ধ্যানের গভীরে নিয়ে যায়। চণ্ডী পাঠ করা খুবই ভালো এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু যখন খুব গভীর ভাবে চিন্তা করবেন এই জগতে কোন কিছুই এমন নেই যেটা স্থির হয়ে আছে, সব কিছুরই প্রতিনিয়ত নিরন্তর পরিবর্তন হয়ে চলেছে, তখন এই চঞ্চল মন স্বাভাবিক ভাবেই অন্য জগতে চলে গিয়ে শান্ত হয়ে যায়।

আর বলছেন *বিশ্বস্যোপরতৌ*, মায়ই আবার এই জগতের সংহার করে দেন। উপরতির অর্থ হল গুটিয়ে নেওয়া, বিস্তার যেটা হয়ে আছে সেটাকে গুটিয়ে নেওয়া। উপরত করে দেওয়া মানে, গুটিয়ে ফেরত নিয়ে আসা। যোগশাস্ত্রে যে উপরতির কথা বলা হয়, সেখানেও এই একই জিনিষ, নিজের যে ইন্দ্রিয়গুলি বাইরের দিকে ছড়িয়ে রয়েছে তাকে গুটিয়ে ভেতরে নিয়ে আসা। মাকড়সা যেমন নিজের ভেতর থেকে জাল তৈরী করে ছড়িয়ে দেয়, ঠিক তেমনি মা এই জগতকে বিস্তার করে ছড়িয়ে দিয়েছেন। একটা সময় মা ঠিক করেন যে এবার এই সৃষ্টিকে গুটিয়ে নিতে হবে, তখন মা যে সৃষ্টিকে গুটিয়ে নিচ্ছেন এটাই উপরতি। কোম্পানির ম্যানেজার একদিন হঠাৎ রেগে গিয়ে বলে দিলেন আগামীকাল থেকে কারখানায় এই নিয়ম চালু হবে, সেই রকম মাও কি একদিন অসন্তুষ্ট হয়ে ঠিক করলেন যে অনেক হয়েছে এবার আমি সৃষ্টিটাকে টেনে গুটিয়ে নেব। না, সৃষ্টির উপরতি এভাবে হয় না। এই যে অনবরত পরিণাম হয়ে চলেছে, এই পরিণামেরই পরিণামে তিনি সব কিছুকে আবার গুছিয়ে রাখেন।

মা! তুমি *বিশ্বস্যোপরতৌ*, তুমিই এক সময় এই বিশ্বকে উপসংহার করে দাও। মা! তুমিই তাই সব কিছুর সংহারসমর্থা। আর বলছেন, *শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে*, পুরো বিশ্বকে যিনি সংহার করে দেওয়ার শক্তি রাখেন, সেই শক্তিরূপিণী নারায়ণি আপনাকে প্রণাম। তিনিই নারায়ণের শক্তি কিনা তাই বলছেন নারায়ণি। হে নারায়ণি! তোমার মধ্যে সেই সামর্থ আছে, ব্যষ্টিতে অর্থাৎ প্রত্যকটি জীবের বা বস্তুর যে অবস্থার পরিবর্তন হয় সেটা কলা, কাষ্টাদি দিয়ে হচ্ছে আর সমষ্টিতে অর্থাৎ পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সংহার করে দেওয়ার সেই সামর্থ একমাত্র তোমারই মধ্যে আছে।

এর পরের তিনটি মন্ত্র আমাদের মঠ মিশনে প্রত্যেক দিন ঠাকুরের আরতির সময় গান করা হয়। এই তিনটে মন্ত্র মূলতঃ শান্তি মন্ত্র, নিয়মিত পাঠ করলে বা গান করলে বাড়িতে একটা শান্তির, একটা মঙ্গলময় বাতাবরণ তৈরী হয়। চণ্ডীর এই দেবীস্তুতির মন্ত্রগুলো যেমন একদিকে মানুষকে জাগতিক শান্তির দিকে নিয়ে যায় আবার এগুলোকে অন্তর্মুখী করে চিন্তা করলে আধ্যাত্মিক উত্থানকে তরান্বিত করে। যেমন বলছেন *স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে*, এই মন্ত্র জাগতিক সুখ বা সাংসারিক শান্তির দিকে যেমন নিয়ে যায় তেমনি কেউ যদি এগুলোকে অন্তঃকরণ করে ভেতরের দিকে নিয়ে যায় তখন তাকে মুক্তির দিকেও নিয়ে যাবে, এইভাবে চণ্ডী দু দিক দিয়েই কাজ করে।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।১০

হে ত্রিনয়নী গৌরী! তুমি মঙ্গলময়ী, যা কিছু মঙ্গল, যত রকম শুভ হতে পারে সব তুমি প্রদান কর। মঙ্গলময়, সত্যময়, এই যে শব্দের পরে 'ময়' বলছেন, এর খুব গভীর তাৎপর্য আছে। যিনি সত্যময় তাঁর কাছে কোন মানুষ গেলে সত্যবান হয়ে যাবে, কিন্তু তাঁকে যদি কোন অসৎ লোকের সঙ্গ করতে হয় তাতে তাঁর সত্যের কোন হানি হবে না, কারণ তিনি সত্যময়। ঠিক তেমনি মা হলেন মঙ্গলময়ী। মঙ্গলময়ী হওয়ার জন্য যাদের দুঃখ-কষ্ট আছে তাদের উপর মা কৃপা করলে মায়ের নিজের মঙ্গলটা কমে যাবে না। আমার কাছে টাকা আছে, কাউকে টাকা দিলে আমার টাকা কমে যাবে, কিন্তু মা যখন কাউকে শুভ প্রদান করছেন তখন মায়ের শুভটা কমে যাবে না। কারণ তিনি শুভময়ী।

মা! তুমি *সর্বার্থসাধিকে*। অর্থ সাধন হল, মানুষের যত রকমের ইচ্ছা, টাকা-পয়সার ইচ্ছাই হোক বা যে কোন কিছুর ইচ্ছাই হোক, সেই ইচ্ছা মায়ই একমাত্র পূরণ করেন। আপনি মনে একটা সঙ্কল্প করেছেন, আমি এই কাজ করব, মা সেই সঙ্কল্পের সিদ্ধি প্রদান করেন। সেইজন্য মা হলে *সর্বার্থসাধিকে*। *শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি*, মা হলে শরণাগতবৎসল। যিনি একবার মায়ের শরণাগত হয়ে যান, মা তাঁকে দেখেন। মানুষের যখন কষ্ট, দুর্ভোগ, রোগ এইসব হয় তখন প্রথমে সে নিজের চেষ্টাতে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে। আমাদের মত সম্বলহীন লোকেদের যাদের চেষ্টা করার সামর্থ থাকে না, আমরা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি হে ঠাকুর! রক্ষা কর। যখন দেখছি তাও সামাল দেওয়া যাচ্ছে না, তখন ক্ষমতা যাদের আছে তাদের কাছে দৌড়ে যাই। ক্ষমতাবান লোকেদের কাছে দৌড়াদৌড়ি করেও যখন হয় না, তখন আবার ঠাকুরের কাছে ফেরত আসি। ঠাকুর গল্প বলছেন, পাহাড়ের উপর একজনের একটা কুঁড়েঘর ছিল। একদিন ঝড় উঠেছে দেখে সে বেচারী ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছে হে ঠাকুর! রক্ষা কর। ঠাকুর রক্ষা করছেন না। তখন তার মনে পড়ল বায়ুর পুত্র হল হনুমান। তখন চেঁচিয়ে বলছে এটা হনুমানের ভক্তের বাড়ি। তাও ঝড় থামছে না, তখন সে ভাবল রামের ভক্ত হনুমান। তখন সে বলতে শুরু করল এটা রামের বাড়ি। তাও ঝড় থামছে না। তখন সীতার বাড়ি, লক্ষণের বাড়ি, বলে যাচ্ছে। ততক্ষণে ঝড়ে কুঁড়েঘরটা ধড়মড় করে পড়ে গেল। তখন বলছে শালার বাড়ি। বেশির ভাগ ভক্তরা এই ভাব নিয়েই প্রার্থনা করে। প্রার্থনা করেও যখন দেখে কিছু হচ্ছে না, তখন শালার বাড়ি বলে বেরিয়ে যায়। এখানে এসে একজন সত্যিকারের ঈশ্বর ভক্ত আর সাধারণ ভক্তের তফাৎটা ধরা পড়ে। একজন সাধু সব ভক্তদের উপদেশ দিয়ে বেড়াত, তোমরা ভগবানের শরণাগত হয়ে যাও এছাড়া কোন গতি নেই, বকল্‌মা দিয়ে দাও, ইত্যাদি। সবাইকে এই একই উপদেশ দিয়ে যেত। একবার কোন কারণে সেই সাধুবাবা যেখানে থাকতেন সেই জায়গাতে কি একটা গোলমাল হওয়াতে ওখানকার লোকাল অথোরিটি বলে দিল ওখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে দিতে। সাধুবাবা এখন কোথায় যাবেন, নতুন করে ভক্ত জোগাড় করাও এখন সংশয়ের মধ্যে চলে গেছে। এইসব ভেবে ভেবে খুব অস্থির হয়ে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁর ভক্তরা এসে বলছে বাবা! আপনি তো এতদিন আমাদের বলছিলেন ভগবানের শরণাগত হতে, বকল্‌মা দিতে, কিন্তু এখান আপনাকে এ কী দেখছি! সাধুবাবা বলছেন, তখন যেটা বলতুম সেটাও ঠিক আর এখন আমার যা অবস্থা এটাও ঠিক। অত কিছুর পরেও তাকে সেই জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে হয়েছিল। তখন সাধুবাবাও হয়ত শালার জায়গা বলে মনে শান্তি পেয়েছিলেন।

চার-পাঁচ বছরের বাচ্চাকে মা যদি মারতে থাকে, সেই বাচ্চা তখন কোথায় যাবে! মায়ের শাড়ির আঁচলের ভেতর আরও সেঁদিয়ে যাবে। একটা কার্টুন কাহিনীতে ছয় বছরের বাচ্চার জ্বালায় মা বাবা সবাই অতিষ্ঠ, ওর জ্বালায় স্কুলের টীচাররা চাকরি ছেড়ে পালিয়ে যায়, ডাক্তাররাও ওকে চিকিৎসা করতে চায় না। ওই বাচ্চার জন্য বাড়ি থেকে শুরু করে পাড়াপ্রতিবেশী সবাই অতিষ্ঠ। একদিন ছয় বছরের বাচ্চাটি ঠিক করল ওর খেলনার বাঘকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, বাড়িতে আর থাকা যাবে না, ওর উপর খুব অত্যাচার হচ্ছে। অত্যাচার মানে, ওকে সবাই টাইমে ঘুমোতে বলে, স্কুল যেতে হবে, স্নান করতে হবে, পড়তে হবে ইত্যাদি, এটাই ওর কাছে অত্যাচার। মাকে গিয়ে বলেছে, আমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। মা বলছে বেশ বেশ! এস তাহলে। তাতে ওর একটু দুশ্চিন্তা আর অভিমানও হয়েছে। এরপর লম্বা কাহিনী। এখন সে খেলনা বাঘটাকে নিয়ে বাড়ির বাগানে জঙ্গল ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঢুকে গেছে। কিছুক্ষণ ওখানে থাকার পর দেখছে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে সে বাঘের সঙ্গে মজা করতে শুরু করেছে। যদিও খেলনার বাঘ কিন্তু খেলনা বাঘকেই সে জীবন্ত মনে করে। ওদের দুজনের মধ্যে

ঝগড়া হয়ে দুজনে আলাদা হয়ে গেছে। বাচ্চাটির দুশ্চিন্তা হচ্ছে এখন আমি যাবটা কোথায়। আস্তে আস্তে দুশ্চিন্তাটা বাড়তে শুরু হয়েছে। একবার ভাবছে, আমি যদি বাড়ি ফিরে যাই, তখন মা বাবা যদি আমাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে দেয় তখন আমার কী হবে! আর ইতিমধ্যে যদি আমার ঘর, আমার জিনিষপত্র সব বিক্রী হয়ে যায় তখন আমার কী হবে! সে আর নিজেকে সামলাতে পারছে না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। তারপর সে ভয়ে ভয়ে বাড়িতে ঢুকছে। ঢোকার পর মায়ের কাছে গিয়ে মাথা নিচু করে বলছে 'মা! আমি যে এই ঘরবাড়ি ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলাম আমি কি আবার আবেদন করে বাড়িতে চলে আসতে পারি'! তখন মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে আদর করে বলছে 'তুমি যতই ছেড়ে চলে যাও সারা জীবনই তো আমি তোমার মা থাকব, মা আর ছেলে কখনই আলাদা হয় না'। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে ওর বদমাইশি আবার শুরু হয়ে গেল।

মা আর ছেলে কোন দিনই আলাদা হয় না, এই ভাবকে আধার করে প্রচুর কাহিনী রচিত হয়েছে। বাইবেলে একটা গল্প আছে, যাতে একটি ছেলে বাবাকে বলে দিল আমার হিস্যে দিয়ে দাও। তারপর ঝগড়া ঝাটি করে নিজের হিস্যে বুঝে সেই টাকা-পয়সা নিয়ে বিদেশে সব উড়িয়ে ফতুর হওয়ার পর আর কোথায় যাবে! আবার বাবার কাছেই ফিরে এসেছে। ভগবান হলেন শেষ আশ্রয়। আশ্রয় কার? যিনি শরণাগত চাইছেন। একজন মহিলার স্বামীর খুব খারাপ অবস্থা, বাঁচার আর আশা নেই। সেই মহিলা শ্রীমার কাছে গেছে প্রার্থনা করতে, মা যদি রক্ষা করেন। কথাবার্তা বলার পর মহিলাটা চলে গেছে। তখন মা বলছেন 'তোমরা লক্ষ্য করেছ! যার স্বামীর কঠিন অসুখ, মরতে বসেছে, আর স্ত্রী কি রকম সেন্ট পাউডার মেখে এখানে এসেছে! কোথায় এখন দীন-হীন কাঙালীর বেশে থাকবে, তা না'! আসলে আমাদের বেশির ভাগ মানুষের চিন্তা-ভাবনা উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমোর মত। একজন মাথায় ধামা করে খৈ নিয়ে বাজারে বিক্রী করতে যাচ্ছিল। বাতাসে কিছু খৈ উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছিল। তখন কী আর করবে! মন্ত্র পড়তে পড়তে যাচ্ছে উড়ো খৈ গোবিন্দায় নম, তার মানে যে খৈ গুলো উড়ে যাচ্ছে ওই খৈ গুলো গোবিন্দায় নম, গোবিন্দকে দিলাম। পুরো খৈ যদি গোবিন্দকে দিয়ে দেয় তাহলে তো প্রসাদ হয়ে গেল, তখন আর ভগবানকে দেওয়া যাবে না, তাই যে খৈ গুলো উড়ে উড়ে যাচ্ছিল সেটা এমনিতে যাতে নষ্ট না হয় তাই বলছে উড়ো খৈ গোবিন্দায় নম। আমাদের শরণাগতি, ভক্তি সব এই উড়ো খৈ গোবিন্দায় নম।

জীবনে যা কিছু হচ্ছে সব আমার নিজের ক্ষমতার জোরে হয়েছে, আর মাঝে মাঝে থেকে থেকে ঠাকুরকে ডাকে, ঠাকুর এই গোলমালটা হচ্ছে একটু দেখ। এই হল উড়ো খৈ গোবিন্দায় নম। চলতে চলতে একটা কথা ভগবানের নামে ছুড়ে দিলাম, আর ভগবান বেচারী সব কিছু ছেড়ে আমাকে সামাল দিতে নেমে যাবেন, এভাবে কখন হয় না। শরণাগত মানে পূর্ণ শরণাগতি, ঠাকুর ছাড়া আমার আর কেউ নেই। একটা জিনিষকে যদি মনে রাখা হয় – বাচ্চা যখন জগৎ থেকে মার খায় তখন সে মায়ের কাছে দৌড়ে আসে, কিন্তু মা যখন কোন কারণে বাচ্চাকে মারে তখন সে আরও মায়ের শাড়িতেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। কারণ তার তো আর কোথাও যাবার নেই। যখন আপনি বুঝে নেবেন আমার তো কোথাও আর যাওয়ার জায়গা নেই, বাড়িতে কেউ অসুস্থ হয়ে গেল, চিকিৎসার সব কিছু করা হচ্ছে, ডাক্তার, কবিরাজ, ফকির বাবা, তান্ত্রিকের জল সব করা হয়ে গেছে, তাও বাঁচান গেল না, তখন আর কী করবেন! আপনি যদি জ্ঞানযোগী হন তখন বলবেন কর্ম নিজের মত হয়েছে আমার এখানে কিছু করার নেই। যারা ভক্ত তারা ঠাকুরের কাছে গিয়ে হত্যে দিয়ে বসে যাবে। এতেও যদি না শোনেন, তাও যদি তাকে নিয়ে চলে যান সেখানে কী করবেন, আপনার তো কিছু করার নেই। এই দু নম্বরী কত দিন চলবে! একদিকে বলছে মৃত্যুর পর সবাই রামকৃষ্ণলোকে যাব, আপনিই বলছেন জীবনের উদ্দেশ্য স্বর্গ পাওয়া, জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তি পাওয়া তাহলে কেউ মরে গেলে দুঃখ করার কী আছে! জীবনের উদ্দেশ্যই তো সফল হয়েছে। বৈষ্ণবদের কেউ মারা গেলে তাঁরা আনন্দ করেন, কারণ সে বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের সাথে আছে। তবে হ্যাঁ, ওনার সঙ্গ করতাম, সেটা আর করা যাবে না। মানুষ শরণাগত তখনই হতে চায় যখন জগতের প্রতি আসক্তিটা বেশি থাকে। আসক্তিটাই তো পাপ। কী আর করা যাবে! যত পাপ থাকবে তত শরণাগতির প্র্যাক্টিস করে যেতে হবে। কিন্তু শরণাগতির ভাব যদি করতে হয় তখন পূর্ণ শরণাগতি হতে হবে, তখন আর এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করা যাবে না। কারণ সে জেনে গেছে ঠাকুর ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আর যা হবার তা হবে, তিনি যা করাবেন তাই হবে, না পারলে মেনে নিতে হবে। কিন্তু তার আগে যা চেষ্টা করার সেই চেষ্টা করে যেতে হবে।

তাই বলছেন, মা হলেন শরণ্যে, তিনি সবাইকেই শরণ দেন। এটাই সার্বজনীন প্রার্থনা, কোন বাছ বিচার নেই, কে ভক্ত, কে ভক্ত নয়, কে হিন্দু, কে মুসলমান মায়ের কাছে কোন বাছ বিচার নেই। ঈশ্বরের যারা ভক্ত তাদের কথা মা শুনবেন, যিনি খুব সাধন ভজন করেছেন, পবিত্র হৃদয়ের যাঁরা তাঁদের কথাই মা শুনবেন আর যে ভক্ত নয় তার কথা মা শুনবেন না, যারা মুসলমান তাদের কথা শুনবেন না। তা নয়, তিনি সবারই মা, সবাইকেই তিনি শরণ দেন।

মাকে এখানে সম্বোধন করছেন *ত্র্যম্বকে গৌরী*, মায়ের তিনটি নেত্র। তৃতীয় নেত্র মানে জ্ঞাননেত্র। সবারই দুটো করে চোখ, এই চোখ দিয়ে জগতের জ্ঞান হয়, তৃতীয় চক্ষু দিয়ে সূক্ষ্ম পদার্থের জ্ঞান হয়। ত্রিনয়ন একমাত্র বলা হয় শিবকে, কারণ শিব হলে জ্ঞানের প্রতিমুর্তি। আমাদের সবারই জ্ঞানচক্ষু আছে কিন্তু বন্ধ হয়ে আছে। মেয়েদের কপালে বিন্দি লাগানো এই ধারণা থেকেই এসেছে, আমার তৃতীয় চোখ আছে, মেয়েরা মায়েরই রূপ কিনা। গৌরী পার্বতীরই একটি নাম। মায়ের কি কি বৈশিষ্ট্য? বলছেন –

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।১১

এই যে সৃষ্টি, যিনি অখণ্ড হঠাৎ তাঁর থেকে যে বিস্তার হচ্ছে, এই বিস্তার মায়ের দ্বারাই হয়ে থাকে। আর কলাকাষ্ঠাদির মাঝখান দিয়ে এই বিস্তারকে আবার যে বিনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, সেটাও মা করছেন। আর ঐ যে গতিময়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে একটা আকার নিচ্ছে, ওই আকার থেকে একটা sense of stability আসে। যখন ট্রেনে বা প্লেনে যাচ্ছি তখন ক্রমাগত ট্রেনটা নড়ছে, গোটা ব্যাপারটাই যেন দুলছে, কিন্তু ওই দুলুনির মধ্যে আমাদের একটা sense of stabilityর ভাব থাকছে। ট্রেনে বসে থাকলে বোঝা যায় না যে আমি চলছি, ট্রেনে ঝাঁকুনি লাগলে বোঝা যায় যে চলছে। কিন্তু প্লেনে বোঝা যায় না, কিন্তু প্রচণ্ড গতিতে প্লেন চলছে। এই যে stability factor ট্রেনটা একটা সমান গতিতে একভাবে চলছে, তখন বোঝা যায় জিনিষটা stable। কিন্তু এই stabilityটা অনেকটা সাইকেলের মত, সাইকেলের centre of gravity এমন ভাবে হয়ে আছে যে দাঁড় করালেই পড়ে যাবে। যতক্ষণ সাইকেল চলছে ততক্ষণ স্থিতিশীল থাকে। এই সৃষ্টি যেটা চলছে, এর সব কিছুর এমন একটা relative speed আছে যার জন্য মনে হচ্ছে সব কিছু স্থিতিশীল। আমরা অপরকে প্রায়ই বলি তোমার ব্যবহারে কোন স্থিতিশীলতা নেই। কিন্তু স্থিতিশীলতাটাই গোলমাল, স্থিতিশীল না হওয়াটাই স্বাভাবিক। এইসব কথা শুনলে মনে হবে কি বিচিত্র সব চিন্তা-ভাবনা। কিন্তু এটাই বাস্তব। সেইজন্য আমাদের এখানে আগে প্রথা ছিল বাচ্চাদের আগে সব শাস্ত্র মুখস্ত করিয়ে দেওয়া। গৃহস্থ হয়ে যাওয়ার পর বলে দেওয়া হত, এগুলোকে নিয়ে এবার তুমি যজ্ঞ-যাগ কর। একটা ধাপ এগোল। আর বাণপ্রস্থি হয়ে গেলে বলে দিত এবার তুমি এগুলোকে নিয়ে চিন্তন করতে থাক। জগৎ যতক্ষণ দেখা না হয়ে থাকে আপনি চিন্তন করবেন কি করে! বাচ্চাকে চিন্তন করতে বললে সে পারবেই না। আর সন্ন্যাসীদের বলে দিতেন, তোমার এখন সব কিছু করা হয়ে গেছে, এবার চিন্তন-টিন্তন সব বন্ধ করে শুধু ব্রহ্মে মন ফেলে রাখ।

এত কিছু যে বলা হল এগুলোকে একটু চিন্তা করলেই আমরা খেই হারিয়ে ফেলি। কত কিছু বলা হয় এই হল পরিবর্তন, এই হল স্থৈর্য কিন্তু আদৌ কিছুই নেই। সেইজন্য উপনিষদে বলছে *নিত্যোঽনিত্যানাং*, এখানে সব কিছুই অনিত্য, নিত্য বলে কিছু নেই। যেটাকে আমি স্থিতিশীল মনে করছি, ওটা আমার মনের একটা ভ্রম মাত্র। অনিত্যটাই সত্য, আর সমস্ত অনিত্যের মধ্যে যে নিত্য আছে সেটাই বাস্তব। যিনি এক তিনিই বহু হয়েছেন? কি দিয়ে বহু হয়েছেন? এই অনিত্যের ভেতর দিয়ে। এই জগৎ, জগতের সব কিছু ক্রমাগত সরে সরে যাচ্ছে। নদীর প্রবাহে কোন কারণে দুটো কাঠের টুকরো একই গতিতে ভাসতে ভাসতে চলেছে তখন মনে হবে এই কাঠটা স্থিতিশীল। তারপরে কোন কারণে ওর গতি পাল্টে গেল, এরপর দুটো কাঠের টুকরো আলাদা হয়ে গেল। তারপর আরেকটা কাঠ এসে গেল। সংযোগ আর বিয়োগই জীবনের ধর্ম। সংযোগ বিয়োগেরই পরিণাম, বিয়োগটাই জীবনের সনাতন নিয়ম। সংযোগ যেটা হয় এটাও একটা ভ্রম। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী মনে করে আমরা সারা জীবন একসাথে থাকব, এটাই ভ্রম। সংযোগটা দৈব, বিয়োগটাই স্বাভাবিক। এগুলোকে বোঝার জন্য যে বুদ্ধি দরকার, মানুষের মধ্যে সেই বুদ্ধি থাকে না। এই বুদ্ধি থাকলে সংসার কার্য আর চলবে না। যদি বুদ্ধি থাকেও বা, সেই

বুকের পাটা নেই যে এটাকে মেনে নিয়ে সব কিছু থেকে বেরিয়ে আসবে। বেশির ভাগ মানুষই দুর্বল প্রকৃতির, ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নয়, নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। বাচ্চার হাত থেকে খেলনা নিয়ে নিলে চিৎকার করে পাড়া শুদ্ধু জানিয়ে দেবে আমার খেলনা নিয়ে নেওয়া হয়েছে। ঠিক তেমনি একটা বয়সের পর জীবন থেকে কিছু যদি চলে যেতে চায়, মানুষ চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেবে।

আমরা ভুলে যাচ্ছি সৃষ্টি, স্থিতি আর বিনাশ তিনটে জিনিষই তাঁর। যিনি নিত্য তিনিই অনিত্য রূপে ভাসমান, যিনি এক তিনিই বহু রূপে প্রতিভাসিত, এটাই সৃষ্টি। যখন অনেককে গুটিয়ে একে নিয়ে আসা হচ্ছে তখন সেটাও তিনি। আবার যখন অনেকের মধ্যে একটা স্থিতির ভ্রম তৈরী হয়, সেটাও তাঁরই জন্য তৈরী হয়। কিন্তু ওই স্থিতিটাই ঈশ্বর। আমরা যে নদী, কাঠের উপমা দিচ্ছি এগুলো এত দ্রুত ভেসে যায় বলে জীবনের ক্ষেত্রে মেলাতে গিয়ে কেমন একটা উদ্ভট মনে হয়। কিন্তু বিচার করতে গেলে দেখা যাবে এটাই সত্য। এই যেমন আমরা সবাই এখানে এসে মিলিত হয়েছি এটাও কালের প্রবাহে মিলিত হয়েছি। আমরা যাদের স্বামী-স্ত্রী করে রেখেছি, বন্ধু করে রেখেছি, যারা আমাদের প্রাণ বলে মনে করছি কিন্তু সব কালের প্রবাহে এসেছে আবার কালের প্রবাহে আলাদা হয়ে যাবে। কালের প্রবাহটাও মায়ের। আমরা একদিকে বলছি আমি মায়ের ভক্ত আবার অন্য দিকে এগুলোকে মেনে নিতে পারি না, এভাবে তো কিছু হয় না। যদি আপনি জগন্মাতাকে ভক্তি করেন তাহলে এগুলোকেও আপনাকে নিতে হবে। যদি এগুলো না নিতে চান তাহলে মাকেও বাদ দিয়ে রাখুন। আমাদের লক্ষ্য হল সোনার বাটিতে নাতিকে দুধ খাওয়ানো। আমাদের কাছে ভগবান মানে এটাই। যে ভগবান দীর্ঘায়ু না দেন সেই ভগবান ভগবান নয়, যে ভগবান নাতির চাঁদ মুখ না দেখায় সেই ভগবান ভগবান নয়, আর যে ভগবান সোনার বাটি মানে ঐশ্বর্য না দেন সেই ভগবান ভগবান নয়। কিন্তু এই ভগবানের বর্ণনা কোন শাস্ত্রেই পাওয়া যায় না। শাস্ত্র যে ভগবানের বর্ণনা দেন, জগতের সব কিছুই সেই ভগবানের, যেটা দিয়েছেন সেটাও তাঁর, যেটা নিয়ে নিচ্ছেন সেটাও তাঁর। কিন্তু আমরা দুর্বল চিত্তের বলে আমাদের এই দুরবস্থা।

মা হলেন *শক্তিভূতা*। কিসের শক্তি? ওই যে এক থেকে বহু হয়ে যাচ্ছেন, সেই বহুর মধ্যে যে স্থিতির আভাস আর বিনাশে বহু যখন একে ঢুকে যায়, সবটাই তিনি করছেন। *গুণাশ্রয়ে গুণময়*, যত রকমের গুণ, তার আধার তিনি, তিনিই আবার গুণময়ী। স্বামীজী আরাত্রিক ভজনে বলছেন নির্গুণ গুণময়। ঠাকুর নির্গুণ আবার তার সঙ্গে তিনি গুণময়। আপাত ভাবে মনে হবে দুটো বিপরীত জিনিষ একই সাথে কি করে হতে পারে! গুণাশ্রয় আর গুণময়ী এর মধ্যে দর্শনের একটা বিশেষ তত্ত্ব আছে। এখানে গুণ বলতে যদি qualities নেওয়া হয় তখন এটা দ্বৈতবাদীদের ঈশ্বর হয়ে যাবেন। বৈষ্ণবরা, রামানুজ সম্প্রদায়ের অনুগামীরা ঈশ্বরকে গুণময় দেখেন। এখানে ওই অর্থে গুণময় বলা হচ্ছে না। এখানে গুণ বলতে সত্ত্ব, রজো আর তমোগুণকে বোঝাচ্ছেন। মা হলেন গুণের আশ্রয় আবার গুণময়ী। প্রকৃতিকে বলা হয় ত্রিগুণাত্মিকা, ত্রিগুণাত্মিকা আর গুণময় একই কথা। সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণই তিনি। কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতি আর শাক্তদের শক্তির মধ্যে বিরাট তফাৎ আছে। শাক্তরা বলছেন শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা কিন্তু তিনি সাংখ্যের প্রকৃতির মত জড় নন। প্রকৃতি জড় বলে প্রকৃতি কখন মুক্তি দিতে পারে না। কিন্তু মা হলেন ঈশ্বরের শক্তি, ঈশ্বর আর ঈশ্বরের শক্তি অভিন্ন। তিনি ঈশ্বরের শক্তি বলে গুণের আধার। ঈশ্বরকে যেমন আমরা সাকার নিরাকার দুভাবে বলি, ঠিক তেমনি শক্তিরও দুটো রূপ হয়ে যায়। তিনি যখন নিরাকার তখন তিনি বিশ্বের আধার। আর যখন তিনি সাকার তখন সৃষ্টি তাঁর কাছ থেকে বেরোচ্ছে। যখন বিপরীত ভাব আসে তখন এই জায়গাতে এসে একটু চিন্তা ভাবনা করলে বোঝা যায় কি বলতে চাইছে। সাংখ্য মতে যা কিছু আছে সব প্রকৃতি, প্রকৃতি মানেই তিনি ত্রিগুণাত্মিকা। কিন্তু মা হলেন নারায়ণি, ঈশ্বরের শক্তি। ঈশ্বরের শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা হতে পারে না, সেইজন্য তিনি হলেন গুণের আশ্রয়। মাকে আশ্রয় করে গুণের খেলা চলছে, তার মানে তিনি গুণের পার। স্বামীজী যে নির্গুণ গুণময় শব্দ ব্যবহার করছেন, এই শব্দ দিয়ে জিনিষটাকে আরও পরিষ্কার করা হয়ে গেল। স্বামীজী এখানে বলতে চাইছেন তিনি যে কোন qualitiesএর পারে। কিন্তু পুরাণাদিতে যখনই গুণ শব্দ আসে তখন সব সময় এর অর্থ সত্ত্ব, রজো আর তমো। প্রকৃতি, মায়া সব একই জিনিষ, শক্তিও তাই। কিন্তু শাক্ত দর্শনে মা হলেন ঈশ্বরের শক্তি। যখন তিনি ঈশ্বরের শক্তি, তখন সেই শক্তি রূপে তিনি গুণের আধার। মাকে গুণময় বলে

দিলে অনেক সমস্যা হয়ে যাবে। তাহলে সত্ত্ব, রজো ও তমো ঈশ্বরের মধ্যেও এসে যাবে, তমোগুণের দোষও ঈশ্বরের মধ্যে এসে যাবে, যা কখনই হতে পারে না।

এগুলো বুঝতে যদি আমাদের সমস্যা হয় তাহলে গীতার নবম অধ্যায়ের পর পর তিনটে শ্লোককে মাথায় বসিয়ে নিলে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেখানে প্রথমে বলছেন আমিই এই সব কিছু হয়েছি। তারপরের শ্লোকে বলছেন, আমার অধ্যক্ষতাতে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া সব কিছু সৃষ্টি করে। এই কথা বলার পর শেষে বলছেন আমার সঙ্গে সৃষ্টির কোন সম্পর্ক নেই। আচার্য শঙ্কর বলছে, এই জগৎ মৃগ মরীচিকার মত। মরুভূমিতে যে মরীচিকা দেখা যাচ্ছে তাতে জল আছে, কিন্তু ওই জল দিয়ে মরুভূমি আর্দ্র হয় না। ঠিক তেমনি মায়ের যে গুণ, এই গুণের দ্বারা মা কখন আবদ্ধ হন না। সেইজন্য তিনি আধার। সাধারণ মানুষ প্রথমে দেখে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়েছে, পরের ধাপে দেখে ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন শেষে দেখে ঈশ্বরের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এই তিনটে স্তর মানুষকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যায়। ঈশ্বর আর ঈশ্বরের শক্তি কখন কোন কিছুতে লিপ্ত হন না। তাহলে এই জগতটা কী? এটাই মায়া, মরীচিকার মত দেখাচ্ছে। তাও মা আছেন বলেই দেখাচ্ছে। সাধারণ লোক ধারণা করতে পারবে না, তাই বলছেন মা নিজেই এই জগৎ হয়েছেন। সেইজন্য বলছেন *গুণাশ্রয় গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্তু তে*।

শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্তু তে।।১২

দীনার্ত, যারা দীন, আর্ত তারা যখন মায়ের কাছে শরণ নেয় তখন মা সব আর্ত নিবারণ করে দেন। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যতক্ষণ দীন আর আর্ত হয়ে মায়ের কাছে না যাওয়া যাবে ততক্ষণ শরণাগতি পাবে না। *সর্বস্যার্তিহরে দেবি*, আর্ত মানে যে কোন দুঃখ-কষ্ট, বলছেন মা সকলের সমস্ত আর্তি হরণ করেন। কী করে হরণ করেন? ঘটন অঘটন সবার জীবনেই আসবে, ঘটন অঘটন সম্পর্কিত যে দুঃখ সেটাও সবার জীবনেই আসবে। দুঃখের সঙ্গে আরেকটি শব্দ জড়িত থাকে, যাকে বলে যন্ত্রণা। দুঃখ বাহ্যিক ভাবে হয়, আমাকে কেউ আঘাত করল, এটা হল ব্যাথা। কিন্তু তুমি আমাকে আঘাত করলে! এই যন্ত্রণাটা পুরোপুরি আভ্যন্তরীন, মস্তিষ্কের ব্যাপার। মানুষ মাত্রই দুঃখ ছাড়া থাকতে পারে না, দুঃখ না থাকলেও দুঃখের একটা কারণ খুঁজে বেড়াবে। উর্দুতে একটা শায়ের আছে যার অর্থ হল জগতে দুঃখ যদি না থাকত তাহলে দুঃখের সওদা করে কেউ বড় রাজা হয়ে যেতে পারত। সময় নষ্ট করে, টাকা খরচ করে মানুষ চোখের জল ফেলার জন্য ট্র্যাজেডি সিনেমা দেখতে যায়। এই কথাটাই বলা হচ্ছে, মানুষ দুঃখ ছাড়া থাকতেই পারে না। আজকের শোকবার্তা কী? আজ আমার দুঃখের কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। এটাই শোকবার্তা। শোক, আর্ত হল ভেতরের ব্যাপার। দুর্বল মনের মানুষ দুঃখ নিয়েই থাকতে চায়।

বার্মার মেয়ে সু-চির মার কাহিনী শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। সু-চির বাবা ছিলেন বার্মার প্রেসিডেন্ট। যেদিন বার্মাতে সামরিক অভ্যুত্থান হল আর সু-চির বাবাকে গুলি করে মেরে ফেলা হল সেই সময় বার্মার রামকৃষ্ণ মিশনের বিরাট বড় হাসপাতালে একটা অনুষ্ঠান চলছিল, সু-চির মা সেই সময় ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত। সেই সময় একজন দৌড়ে এসে ভদ্রমহিলার কানে ফিস ফিস করে কি একটা খবর দিয়ে চলে গেছে। কিছুক্ষণ পর আবার একজন এসে দৌড়ে কি বলল, ভদ্রমহিলা ok বলে চুপ করে গেলেন। তখনও কেউ কিছু জানে না। প্রোগ্রাম চলছে। আসলে সেই সময় বার্মাতে মিলিটারি ক্যু হয়ে গেছে, তাতে তাঁর স্বামীকে মিলিটারির লোকেরা গুলি করে মেরে দিয়েছে। তাঁকে স্টেজে গিয়ে খবর দেওয়া হয়েছে তিনি গুরুতর আহত, তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সু-চির মা জিজ্ঞেস করছেন 'প্রেসিডেন্ট কি মারা গেছেন'? 'না, এখনও বেঁচে আছেন'। কাউকে কিছু টের পেতে দিলেন না। সেখান থেকে আবার সভাপতির ভাষন দিলেন। প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেল, টিফিনের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তিনি আর টিফিন নিলেন না। ওনার লোকজনরা গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। সেখান থেকে সরাসরি স্বামীর কাছে চলে গেলেন। ততক্ষণে চারিদিকে খবর ছড়িয়ে গেছে বার্মাতে সামরিক অভ্যুত্থান হয়ে গেছে, বার্মার রাষ্ট্রপতিকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। সু-চি তখন বাচ্চা মেয়ে। রাষ্ট্রপতির স্ত্রী একটুও চঞ্চল হলেন না। রাত্রিতে নিজের দলের লোকদের এবং গণতন্ত্রকামী জনগণের উদ্দেশ্যে ভদ্রমহিলা একটা বাণী দিয়ে বলছেন

'তোমরা কাঁদবে না। আমাদের শত্রুরা আমাদের দেখছে। আমাদের কান্না দেখে তাদের আনন্দ হবে। কান্নার জন্য তোমাদের সারা জীবন পড়ে আছে, তাই কান্না দিয়ে এখন শত্রুদের আনন্দ দিও না'। এই হল বীর্য, তেজ। তার মেয়ে এই সু-চি, যিনি পঞ্চাশ বছর ধরে মিলিটারি শাসনের বিরুদ্ধে একা লড়াই করে গেছেন।

আমি আপনি এখানে কী করব? ওগো আমাদের কী হলো গো! আমার সব গেলো! বুড়ি ঠাকুরমা, একশ বছর হয়ে গেছে, আর কত দিন বাঁচিয়ে রাখতে হবে! মরলে সেও বেচারী বার্ধক্যের কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। সেই বুড়ি মারা যাওয়ার পর মাটিতে আছাড় দিয়ে কাঁদতে থাকে। কান্নার একটা বাহানা পাওয়া গেছে। যুবতী মেয়ের তরতাজা স্বামী মারা গেছে, তখন সে একটা বিপদে পড়ে গেছে। যদি মায়ের প্রার্থনা করা হয় মনটা শক্ত হয় যায়। এই যে সু-চির মায়ের কাহিনী বলা হল, ভদ্রমহিলার মধ্যে যে তেজ, বীর্য এই শক্তি ভেতরে থাকলে কখনই আর্ত ভাবটা আসবে না। ইংরাজীতে একটা শব্দ আছে pity, I pity yoy। মানুষ চায় সবাই আমাকে করুণা করুক, সংস্কৃতের করুণা নয়, এখানে বাংলার করুণার কথা বলা হচ্ছে। সবাই আমার প্রতি করুণার চোখে যেন তাকায়, আহা গো! তোমার এ কী হল!

কিন্তু সত্যিকারের মনের কষ্ট সবারই ভেতরে আছে। মায়ের একটাই সন্তান মারা গেল, যুবতী মেয়ের স্বামী মরে গেল, কষ্ট তো হবেই। কষ্ট হলে সে কি কাঁদবে না? অবশ্যই কাঁদবে, না কাঁদলে আবার অনেক সমস্যা হয়ে যাবে। কিন্তু আর্ত হরণ মায়ই করেন। গাছের ডালে কুড়ুল বা কাটারির ঘা মারলে ডাল থেকে এক ধরণের আঠা জাতিয় স্রাব নির্গত হয়ে ওই জায়গাটাকে শক্ত করে দেয়। ঠিক তেমনি মায়ের আরাধনা করলে ব্যাথার ওই জায়গাটাকে শক্ত করে দেয়। যে মরে গেছে তাকে তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না, কিন্তু শোককে সামলে সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তিটা মায়ের আরাধনা করলে এসে যায়। ট্রেনে যাচ্ছি আর ডাকাতের দল উঠে পড়েছে, তখন তো ঝামেলায় পড়ে গেলাম। তখন খুব করে ভগবানকে ডাকলে কি হবে? কিছুই হবে না। ডাকাতি হবে, ছিনতাই হবে, সবারই হচ্ছে, ভক্তদেরও হয়, অভক্তদেরও হয়। কিন্তু মায়ের আরাধনা করলে সব রকম পরিস্থিতিতে সহ্য করার ক্ষমতা, মাথা ঠাণ্ডা রাখার ক্ষমতাটা নিজে থেকেই বেড়ে যাবে। জিনিষপত্র সব ডাকাতরা লুঠ করে নিয়েছে, দুঃখ তো হবেই। কিন্তু আর্ত ভাব, যে ভাবের ফলে মনে করছে আমার সর্বস্ব চলে গেল, আমি অসহায় হয়ে গেলাম, এই ভাবটা আসবে না। আসলে এই শক্তিটা হল অনাসক্ত হওয়ার ক্ষমতা। Power of detachment সব সময় দিব্য ভাব থেকে হয়। যে যত বিষয়ী হবে, সাংসারিক বুদ্ধি যার যত বেশি হবে তার তত আসক্তির ভাব থাকবে। সব কিছুকে আঁকড়ে থাকবে, কিছুতেই কোন কিছু ছাড়তে চাইবে, এরাই আগামীকাল কিছু একটা চলে গেলেই চিৎকার করতে থাকবে। কিন্তু যাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুদ্ধিতে পরিপক্কতা এসে গেছে, বুদ্ধি পাকা মানেই অনাসক্তি। তারা জেনে গেছে জীবনে সব কিছুই আসবে যাবে, এই সুখ এল, এই দুঃখ এল, আবার সুখ আসবে। কারণ জীবনের কোন কিছুর কোন pattern নেই, নিজের মত সব কিছু দুমদাম চলতে থাকে। এই বোধ যার এসে গেছে সেই পারবে জীবনের উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যেতে।

কুড়ি বাইশ বছরের মেয়ে বিধবা হয়ে গেছে, বাড়িতে কেউ নেই। ওর কাছে থেকে এখন আমরা কি প্রত্যাশা করব? যুবতী বিধবা কি সারা জীবন বাড়িতে বসে বসে কাঁদতে থাকবে আর শ্বশুড় শাশুড়ির সেবা করতে থাকবে? কখনই নয়, তাকেও পড়াশোনা করে জীবনে এগিয়ে যেতে হবে, সুবিধা মত বয়স্ক শ্বশুড় শাশুড়ির সেবাও করবে। জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনাসক্ত হতে হবে। অনাসক্ত মানে, সংসারের যত আবর্জনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা, আর থেকে থেকে চোখের জল ফেলাটা বন্ধ করতে হবে। চোখের জল ফেলাটা মানসিক বিকারের লক্ষণ, মানসিক রোগ। এই রোগ একমাত্র যায় অনাসক্তি থেকে, আর অনাসক্তি সব সময় আধ্যাত্মিকতা থেকে আসে। যতক্ষণ মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ না হবে ততক্ষণ অনাসক্তির ভাব আসবে না।

ঠাকুর কেশব সেনকে খুব ভালোবাসতেন। কলকাতায় গেলে ঠাকুর কেশবের সঙ্গে কথা বলতেন। কেশব সেন যখন অসুস্থ হয়েছিলেন তখন ঠাকুর মার কাছে বলছেন – মা কেশবের কিছু হলে আমি কার সাথে কথা বলব! কেশব যাতে সুস্থ হয়ে ওঠে, ঠাকুর ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী কালীর কাছে ডাব-চিনি মানত করলেন। কেশব সেন কিছু দিন বাদে সুস্থ হয়ে গেছেন। অনেক বছর পর আবার কেশব সেনের অসুখ করেছে, তখন তাঁর বয়সও

হয়ে গিয়েছে। ঠাকুর কেশব সেনকে দেখতে গেলেন। সেখানে তিনি কেশব সেনকে বলছেন – আগের বারে যখন অসুখ হয়, রাত্রি শেষ প্রহরে আমি কাঁদতুম। এবার কিন্তু অত হয় নাই। তার মানে, কেশব সেন থেকে তাঁর অনাসক্ত এসে গেছে, কেশব সেনের দেহ যদি চলে যায় আর কিছু করার নেই। প্রথম বারে ঠাকুরের দুশ্চিন্তা হয়েছিল, তাঁকে তো কারুর সাথে কথা বলতে হবে। তখন ঠাকুরের মনের মত কোন সঙ্গী নেই, কথা বলার কেউ নেই, ঠাকুরের মনকে কোথাও রাখতে হবে। হৃদয়রাম, হলধারীর মত লোকেরা মন্দিরে বসে আছে, ঠাকুর কার সঙ্গে কথা বলবেন! ওই কষ্ট ছিল। কিন্তু এটাকেও একটা সীমা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়। এই অনাসক্ত ভাব আধ্যাতিকতা ভেতরে না এলে কখনই আসবে না। যেখানেই দেখবেন চোখের জল বুঝবেন আধ্যাত্মিকতার অভাব। স্বামীজী বলছে long faces may be anything but it is not spirituality। আর্ত ভাব যে কোন কিছু হতে পারে কিন্তু আধ্যাত্মিকতা কখনই হবে না। আর্ত ভাব আর আধ্যাত্মিকতা দুটো এক সঙ্গে চলতে পারে না। আর্ত ভাব মানেই শোক আর মোহ। আচার্য বলছেন শোক মোহটাই সংসার। শোক মোহের পারে যাওয়া মানেই ঈশ্বর। আর্ত ভাব মানেই আধ্যাত্মিকতার বিপরীত। আর্ত ভাব মানেই শোক আর মোহে পড়ে আছে, যেটা চলে গেছে তার জন্য শোক আর যেটা আছে সেটার চলে যাওয়ার ভয় মানে মোহ। আধ্যাত্মিকতা তাহলে কী? ঈশ্বর। মা তো তাই, তিনি নারায়ণি। মানুষের মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা ভাবের উদয় হয় একমাত্র মায়ের আরাধণায় তাঁর কৃপায়। সু-চির মায়ের জীবনের যে কাহিনী আমরা বললাম, এই রকম প্রচুর ঘটনা পাওয়া যাবে।

বেলুড় বিদ্যামন্দিরের তখন অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী তেজেসানন্দ। সেই সময় বিদ্যামন্দিরে একজন বৃদ্ধ অধ্যাপক ফিজিক্স পড়াতে আসতেন। ক্লাশের পর উনি মহারাজের ঘরে এসে চা খেতেন। একদিন যথারীতি চা খাচ্ছেন। মহারাজ ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলছেন 'আপনার মুখটা দেখে ভালো লাগছে না, কেমন বিমর্ষ লাগছে, আপনার কি কিছু হয়েছে'? ভদ্রলোক বলতে চাইছেন না 'তেমন কিছু না'। 'না, বলুন কি হয়েছে'। 'আমার একমাত্র সন্তান গত হয়েছে, তাকে এখন দাহ করতে যেতে হবে'। 'এরপরেও আপনি এখানে এলেন কী করে'? 'এতগুলো ছেলে আমার অপেক্ষায় থাকবে'। স্বামী তেজেসানন্দজী হতবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন। এটাই detachment। একমাত্র সন্তান মারা গেছে, সন্তানহারা মা ওইদিকে হা হুতাশ করে যাচ্ছে। তখনকার সময় এত ফোন ছিল না, তিনি এসেছেন খবর দিতে। এতটা যখন এসেই গেছেন তাই এক ঘণ্টা ক্লাশ নিয়ে নিলেন। এরপর মহারাজের ঘরে চাও খেতে গেলেন। আধ্যাত্মিকতার বিকাশ না হয়ে থাকলে এই শক্তি হবে না। বেশির ভাগ গৃহস্থরা ভক্তরা হলেন ঘোর সংসারী, যা আছে সেটাকে আঁকড়ে থাকে। সন্ন্যাসীদের কাছে যা আছে সব ফেলে দেয়। সেইজন্য সন্ন্যাসীরা গৃহস্থ ভক্তদের সাথে মিশতে চান না। তাহলে গৃহস্থদের উপায় কি? এটাই উপায়, খুব ভক্তি সহকারে মায়ের স্তুতি করে যেতে হবে, তারপর কোথাও না কোথাও একটু আধ্যাত্মিকতার কিরণ জেগে উঠবে, তখন এই আর্ত ভাবটা কমবে। এতক্ষণ মায়ের গুণের কথা বর্ণনা করা হল। এবার মায়ের রূপের বর্ণনা করা হচ্ছে –

হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।১৩

শক্তি ছাড়া এ জগতে কেউই থাকতে পারে না। সমস্ত দেবতাদেরও আলাদা আলাদা শক্তি আছে, তেমনি ব্রহ্মা যিনি তাঁরও শক্তি আছে, ব্রহ্মার শক্তি হলেন ব্রহ্মাণী। এর আগে আমরা এগুলোর বর্ণনা করেছি। সেই ব্রহ্মাণী হংসযুক্ত বিমানে অবস্থান করেন। আমাদের শাস্ত্রে বিমান শব্দটির অনেক রকম অর্থ হয়। বিমান বলতে আমরা ভাবি এ্যারোপ্লেন, কিন্তু বিমান বলতে উঁচু অট্টালিকাকে বোঝায়। ওনাদের এ্যারোপ্লেনেরও ধারণা ছিল, তবে তা রথের মতই আকৃতির কিছু হবে যা হংস দ্বারা চালিত। সেই হংসযুক্ত বিমানে ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী আরোহণ করেন। তিনি কি করেন? *কৌশাম্ভঃক্ষরিকে*, কুশ দ্বারা মন্ত্রপূতঃ জল সিঞ্চন করেন। যাঁর উপর তাঁর কৃপা আছে জল সিঞ্চনের দ্বারা তার তেজ বৃদ্ধি করে দেন, আর তিনি যাকে নাশ করতে চান জল সিঞ্চন দ্বারা তার তেজ হরণ করে নেন। সেই ব্রহ্মাণী রূপী আপনাকে প্রণাম।

ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।১৪

মাহেশ্বরী, তাঁর হস্তে ত্রিশূল, অর্দ্ধচন্দ্র আর সর্প। তিনি শিবের শক্তি, শিবের যা যা আছে তাঁর শক্তি মাহেশ্বরীও ত্রিশূল, অর্দ্ধচন্দ্র ও সর্পধারিণী। শিবের বাহন বৃষ, তাঁর শক্তিও বসে আছেন বৃষের উপর, তাই বলছেন *মহাবৃষভবাহিনি*। হে মাহেশ্বরীস্বরূপিণী নারায়ণি! আপনাকে প্রণাম।

ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।১৫

কৌমারী হলেন দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র শক্তি। এখানে একটা জিনিষ মনে রাখার আছে, আমাদের এই পাঠ্যসূচীর নাম 'ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য', ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের যে বিবর্তনের ইতিহাস তাতে কত বিচিত্র রকমের ধারণা, চিন্তা, ভাবনার সমাবেশ দেখতে পাই, তার কিছু কিছু জনমানসে স্থায়ী ভাবে বসে গেছে, কিছু আবার ইতিহাস থেকে হারিয়ে গেছে। তার মধ্যে আবার কত দেবতা, কত দর্শন বিবর্তিত হয়ে উপরের দিকে উঠে এসেছে, এদের মধ্যে কিছু থেকে গেছে, কিছু কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ভারতের ঐতিহ্যে কার্তিক কয়েক জায়গায় খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। দক্ষিণ ভারতে এখনও কার্তিক খুব বড় দেবতা, সেখানে কার্তিকের নাম মুরগন্। বাংলাতেও কার্তিক পূজার প্রচলন আছে। আর আগেকার দিনে সব দেবতাদের পূজো এমন ভাবে করা হত যে সারা বছরই পূজো লেগে থাকত। তবে অন্যান্য দেবতাদের মত কার্তিক পূজাও অনেক কমে গেছে। ব্রহ্মার পূজাতো ভারত থেকে বলতে গেলে উঠেই গেছে। থেকে গেছে বিষ্ণু, মহেশ আর শক্তির আরাধনা। এখানে বলছেন ময়ূরকুক্কুটবৃতে, ময়ূর আর মোরগ বেষ্টিত কৌমারী। এখানে মায়ের রূপের বর্ণনা চলছে। ধ্যান ও চিন্তন তিন ভাবে করা হয় – রূপ চিন্তন, লীলা চিন্তন ও গুণ চিন্তন। এই তিন ভাবে উপাসনা করা হয়। মা এক এক করে যে অসুরদের বধ করছেন, এগুলো লীলা চিন্তন, *সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে* এগুলো গুণ চিন্তন। আর এখন চলছে রূপ চিন্তন। কৌমারী কার্তিকেয়র মতই মহাশক্তিধারিণী। বলছেন হে কৌমারীরূপী নারায়ণি! তোমাকে প্রণাম।

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।১৬

বিষ্ণুর শক্তি বৈষ্ণবীর বর্ণনা করে বলছেন, তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও শার্ঙ্গ নামক উত্তম অস্ত্র ধারিণী। এখানে পদ্মের কথা না বলে বলছেন শার্ঙ্গ, শার্ঙ্গ হল একট ধনুকের নাম। বৈষ্ণবী এখন যুদ্ধ করতে এসেছেন বলে পদ্ম নেই। এভাবেই বিবর্তন হয়। ইষ্টকে আমি যে রূপে চিন্তা করছি ইষ্টের যখন দর্শন হবে তখন আমি সেই রূপেই ইষ্টকে দেখব। অনেকের ধারণা যে ইষ্টদর্শন নিছকই কাল্পনিক। যেমন ধরুন শ্রীরামকৃষ্ণের যে ছবি সাধারণ ভাবে পূজা করা হয় আমি সেই রূপেই শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান করছি। আমার যখন শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন হবে তখন এই রূপেই আমার ইষ্টদর্শন হবে। আর লীলা চিন্তন করতে করতে আমি অনেক কিছুই দেখব। আমি যে রকমটি চিন্তন করব সেই রকমটিই দেখব। যিনি বিষ্ণুকে হস্তে পদ্ম নিয়ে ধ্যান করবেন তিনি পদ্ম হস্তেই দেখবেন। যিনি ধনুষ হাতে নেওয়া রূপের চিন্তন করবেন তিনি ধনুষ হাতেই দেখবেন। তাহলে কি এগুলো কোন কল্পনা? না কল্পনা নয়। ভাবরাজ্যের যিনি ভগবান, তাঁকে যিনি যেমনটি দেখতে চাইবেন তিনি সেই ভাবেই দেখবেন। এখানে দেখাচ্ছেন বৈষ্ণবী শক্তি পরমায়ুধে। প্রসীদ, তুমি প্রসন্ন হও, হে নারায়ণী তোমার যে বৈষ্ণবী রূপ আমার উপর যেন প্রসন্না হন। কারণ এখানে যে শুধু বর্ণনা করা হচ্ছে তা নয়, স্তুতিও করা হচ্ছে।

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।১৭

ভগবান যখন বরাহ অবতার হয়েছিলেন তখন পৃথিবীকে তুলে আনার জন্য তাঁকে বরাহের বিরাট রূপ ধারণ করতে হয়েছিল। তাঁরই শক্তি *বরাহরূপিণি শিবে*, তিনি *দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে*, বরাহের মুখের দু পাশে যে বিরাট দন্ত, সেই দন্ত দ্বারা তিনি পুরো পৃথিবীকে তুলে ধারণ করেছিলেন। কিন্তু তার আগে বলছেন *গৃহীতোগ্রমহাচক্রে*, এখন তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসেছেন তাই হাতে মহাচক্রটাও আছে। বরাহরূপিণি বলছেন কিন্তু তাঁর হাতে চক্র, বরাহের

হাতে কীভাবে চক্র আসবে প্রশ্ন হতে পারে। আসলে তিনি দেবী রূপে এসেছেন, বরাহের মানবী রূপকেই এখানে দেবীরূপে দেখা হচ্ছে। মা! বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তুতে, তোমাকে প্রণাম।

নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।১৮

ত্রিভুবনের রক্ষার জন্য সংলগ্ন নৃসিংহ অবতারের যে শক্তি তাঁর রূপ হল তিনি নৃসিংহরূপিণী, তাঁর নীচের অংশ মানবীর আর মুখ সিংহের। সেইজন্য তাঁর চেহারার মধ্যে উগ্র ভাব, আর তিনি সর্বদা দৈত্য নিধনে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। ত্রিলোকের রক্ষাকারিণী সেই নারায়ণীকে আমরা প্রণাম করছি।

কিরীটিনি মহবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।১৯

ইন্দ্র হলেন দেবতাদের রাজা, তাঁর যে শক্তি তিনি হলেন ঐন্দ্রী। মাথায় তাঁর মুকুট, হাতে মহাবজ্র, সহস্র নয়ন, বৃত্রপ্রাণহরে। অসুরদের রাজা বৃত্র, তাঁকে এই বজ্র দিয়ে ইন্দ্র বধ করেছিলেন, সেই শক্তির নাম ঐন্দ্রি।

শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।২০

শিবদূতী রূপে যিনি বিশাল অসুরসেনা সংহার করেছেন, যিনি ভয়ঙ্করা মূর্তিধারণ করে থাকেন আর বিকট গর্জনকারিণি সেই নারায়ণিকে আমরা প্রণাম করছি। শিবের এখানে দুটো রূপ দেখনো হয়েছে, এর আগে মাহেশ্বরী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, দ্বিতীয় এখানে শিবদূতী রূপে বর্ণনা করা হচ্ছে। শুম্ভ ও নিশুম্ভকে যুদ্ধ করতে বলার জন্য শিবকে দূত রূপে পাঠানো হয়েছিল। শিব যে দূত রূপে দেবীর কার্য করেছিলেন সেইজন্য তাঁর নাম হল শিবদূতী। আসলে শিবদূতীর রূপের সাথে কালীর রূপের অনেক মিল পাওয়া যায়।

দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।২১

এখানে চামুণ্ডা দেবীর রূপের বর্ণনা করা হচ্ছে। তাঁর মুখ ভয়ঙ্করা, বিকট দন্তবিশিষ্টা, গীতাতেও বিশ্বরূপদর্শনে এই রকম দংষ্ট্রাকরাল রূপ দেখানো হয়েছে। চামুণ্ডা দেবী মুণ্ডমালা বিভূষিতা। *চামুণ্ডা মুণ্ডমথনে*, তিনি চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করেছিলেন। চামুণ্ড রূপিণী সেই নারায়ণিকে আমরা প্রণাম করি। এতক্ষণ এক এক করে বিভিন্ন শক্তির বর্ণনা করা হল, ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহিণী, নৃসিংহরূপিণী, ঐন্দ্রী, শিবদূতী আর চামুণ্ডা, এনারা সবাই যুদ্ধে দেবীকে সাহায্য করেছিলেন। ইদানিং আর আলাদা ভাবে সবার পূজা করা হয় না, তার বদলে মা দুর্গার স্তুতি হয় আর শিবদূতী, চামুণ্ডা, কালী সব এক হয়ে গেছে। সেইজন্য দুর্গাপূজা আর কালীপুজাই আমাদের এখন প্রধান মাতৃ আরাধনা হয়ে গেছে। দেবতারা এখানে সবাইকে প্রণাম করছেন, এত যে শক্তির রূপ এগুলো তোমারই রূপ। এরপর থেকে আবার মায়ের গুণের বর্ণনা করে স্তুতি করছেন –

লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহামায়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।২২

এখানে একটা মজার ব্যাপার হল, এই মন্ত্রের প্রথম লাইনে মহাবিদ্যে বলছেন আবার দ্বিতীয় লাইনে এসে বলছেন মহারাত্রি মহামায়ে, মহামায়ে পাঠান্তরে অনেক জায়গায় মহাবিদ্যে পাঠ করা হয়। মহামায়ে আর মহাবিদ্যে একই কথা, অবিদ্যা আর মায়া একই। তাহলে দুবার কেন মহাবিদ্যে বলা হচ্ছে? সংস্কৃত ভাষার এটাই মহা দোষ। মহা+বিদ্যা মহাবিদ্যা ঠিক আছে, আবার মহা+অবিদ্যা এখানেও বলছেন মহাবিদ্যা। একই শব্দের একটার যে অর্থ হবে দ্বিতীয় একই শব্দের তার বিপরীত অর্থ কি করে হতে পারে? সেইজন্য সংস্কৃতে লুপ্ত ‘অ’এর একটা চিহ্ন আছে, এই চিহ্ন থাকলে বুঝতে হবে এর আগে একটা ‘অ’ আছে।

এখানে মায়ের কয়েকটি নাম উল্লেখ করে স্তুতি করা হচ্ছে। মায়ের কি কি নাম? লক্ষ্মী, লজ্জা, মহাবিদ্যা, শ্রদ্ধা, পুষ্টি, স্বধা, ধ্রুবা, মহারাত্রি আর মহামায়া বা মহাবিদ্যা। লক্ষ্মী মানে ধনধান্যে পরিপূর্ণ, এটাই মায়ের স্বরূপ। লজ্জা মানে, যে কাজ করতে নেই সেই কাজ করতে আড়ষ্ট বোধ হওয়া। যাঁরা আভিজাত্য বা উচ্চবংশের লোক তাঁরা কোন কোন জিনিষ করেন না। তেমনি ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসীদেরও কিছু কিছু জিনিষ করতে নেই। এই যে করতে নেই, যে জায়গাতে একটা লক্ষ্মণ রেখা টেনে দেওয়া হয়েছে, এটাকেই বলে লজ্জা। লক্ষ্মণ রেখা, মর্যাদা রেখা, লজ্জা একই জিনিষ। আজ থেকে একশ বছর আগের কোন ব্রাহ্মণ ছেলে যদি মদ পান করে তাতে আপত্তির কী থাকতে পারে? সন্ন্যাসী যদি রেস্তোরাঁ, বারে ঘুরে বেড়ায় তাতে আপত্তির কী আছে? কোথায় লেখা আছে সন্ন্যাসী এই রকম করবে না? এটাই চক্ষুলজ্জা। কেউ যদি মর্যাদা রেখা অতিক্রম করে যায় তার হয়ত বিপদ নাও হতে পারে, কিন্তু কোন না কোন দিন বিপদ তাকেও ডেকে নেবে। প্রত্যেক মানুষকে রক্ষা করার জন্য একটা গণ্ডি দেওয়া থাকে। গণ্ডির ভেতরে থাকলেই যে সে পুরোপুরি নিরাপদ থাকবে তা নয়। গণ্ডির ভেতরেও তার উপর আঘাত আসতে পারে। আবার অন্য দিকে গণ্ডির বাইরে চলে গিয়েও সে বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু যদি law of probabilityকে লাগানো হয় তাহলে গণ্ডির বাইরে যদি চলে যায় তাহলে বিপদ হওয়ার সম্ভবনা গণ্ডির ভেতরে থাকার তুলনায় অনেক গুণ বেশি হবে। কচ্ছপের খোল যেমন কচ্ছপকে রক্ষা করে, লজ্জা ঠিক সেইভাবে মানুষকে রক্ষা করে।

কথামৃতে লজ্জাকে নিয়ে খুব সুন্দর একটা গল্প আছে, যেখানে একজন চরিত্রহনন হতে হতে বেঁচে গিয়েছিল। এক শেখ ছিল, শেখ মানে আমাদের সন্ন্যাসীর মত। এই শেখকে দেখে এক নর্তকী আসক্ত হয়ে গিয়েছিল। নর্তকী খুব কায়দা করে শেখজীকে একবার তার আস্তানায় নিয়ে আসতে পেরেছে। কিছুক্ষণ থাকার পর শেখজী বলছেন, প্রস্রাব করার জন্য আমাকে একবার বাড়ি যেতে হবে। তখনকার দিনে আজকালকার মত ফ্লাশ সিস্টেমের স্যানিটেশান ছিল না। একটা পাত্র থাকত, আর মেথর এসে পাত্র পরিষ্কার করে রাখত। প্রস্রাব করা পাত্রকে উর্দুতে বদনা বলা হত। কিছু দিন আগে পর্যন্তও সব জায়গাতে বদনার ব্যবহার খুব ভালোমতই হত। মুসলিম প্রধান দেশে, ইওরোপের অনেক দেশে আর তুরস্কে তো বদনার খুব প্রচল ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও ইউরোপের বড় বড় রাস্থায় কিছু লোক আলখাল্লার মত গায়ে চাপিয়ে বদনা নিয়ে ঘুরে বেড়াত। এটাই তখনকার দিনে পাব্লিক টয়লেট ছিল। প্রত্যেক বড় বড় রাস্থায় এক জন দুজন করে ঘুরতে থাকত। কারুর যদি টয়লেট যেতে হয়, সে তখন ওর আলখাল্লার মধ্যে ঢুকে যাবে, ওখানে বদনা বসিয়ে দেবে, বদনাতে টয়লেট করার পর ওকে একটা মূল্য দিয়ে বেরিয়ে যাবে। মানুষই মুভিং টয়লেট ছিল। বদনার ব্যবহার অনেক পুরনো। এখন অবশ্য আধুনিক টয়লেটের যুগ এসে গেছে। যাই হোক, তখন নর্তকী বলছে আমি তোমাকে নতুন বদনা দিচ্ছি। তখন শেখজী বলছেন এক বদনার কাছে আমি লজ্জা হারিয়েছি, নতুন করে আরেক বদনার কাছে কেন আমি লজ্জা হারাই! মহিলাটি বুঝে গেছে শেখজী কি বলতে চাইছেন। নারী পুরুষের সংযোগ যখন হয় তখন কোথাও এই বদনার ব্যাপারটা এসে যায়। এরপর মহিলার আসক্তিটা চলে গিয়েছিল। শেখজীর কাছে নিজের ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা আর নিজের চরিত্র অনেক মূল্যবান। বর্তমান যুগে কাউকে এই ঘটনা যদি বলা হয়, সে বলবে – এতে আছেটা কী! মহিলা আসক্ত হয়ে গেছে, তাকে আপনি সন্তুষ্ট করছেন, এতে কী আর এমন হল! আমাদেরও মনে হতে পারে এখানে সামান্য একটু আপোষ করে নেওয়া হচ্ছে, এতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হল! মহিলার সঙ্গে যদি চার ঘণ্টা বসেই থাকত, আর একটু হাত ধরল তাতে কী এমন চরিত্রহনন হত। এখানে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। একটু সঙ্গ দেওয়া থেকে যে কোথায় চলে যাবে আমরা ভাবতেই পারব না, তারপর আর তাকে খুঁজেই পাওয়া যাবে না। সেইজন্য প্রথম পদক্ষেপেই নিষেধ করা হয়। লজ্জা বোধ ভেতরে না থাকলে প্রথমেই পা দিয়ে ফেলবে। লজ্জা মানুষকে রক্ষা করে। বিভিন্ন সমাজের যে বিভিন্ন ধরণের জীবন-যাপন, সেখানেও লজ্জা ব্যাপারটা রেখে দেওয়া হয়। আগেকার দিনের ক্ষত্রিয়দের একটা চক্ষুলজ্জা ছিল – শত্রুকে কখন আমার পিঠ দেখাব না, মরে যাব তো মরে যাব। আমরা বলব, তুমি তো মরে যাবে, পালাও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। সে বলবে আমি পালাতে পারব না। ছোটবেলা থেকে তাকে এমন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, নিজের পিঠ দেখানো তার কাছে ভয়ঙ্কর লজ্জার ব্যাপার। সেখান থেকেই বলা হয় কারুর পিঠে ছুরি মারাকে খুব খারাপ মনে করা হয়। মানুষ লজ্জা থেকে বাঁচার জন্য

মরতেও প্রস্তুত। এই কথাই গীতায় ভগবান বলছে *সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে*, সম্মানিত, প্রতিষ্ঠিত মানুষ লজ্জার সীমাকে এমন ভাবে টেনে রাখেন যে যার জোরে তাঁরা মাথা উঁচু করে সমাজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকেন। লজ্জাকে যদি না ধরে রাখেন তাহলে অসম্মান হয়ে তাঁর সমস্ত সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে। সম্মানিত ব্যক্তির সমাজে দুর্নাম হওয়ার থেকে মরে যাওয়া অনেক শ্রেয়।

লজ্জার পর বলছেন *মহাবিদ্যে*, দেবীর দশটি শক্তি বা বিদ্যাকে মহাবিদ্যা বলা হয়। *শ্রদ্ধা*, গুরুমুখে যে শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করা হয় তার উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখা, গুরু উপদিষ্ট বেদান্ত বাক্যের প্রতি যে বিশ্বাস, এটাই শ্রদ্ধা। গুরুর কাছ থেকে শাস্ত্রের কথা শোনার পর সেই কথানুসারে জীবনকে চালনা করতে হবে। *পুষ্টি*, পুষ্টত্ব লাভ, ধান, গমের দানাগুলো যে পুষ্ট হয় এটাকে বলে পুষ্টি। যার স্বাস্থ্য ভালো, তার মানে তার শরীরের পুষ্টি আছে। *স্বধা*, এর আগেও আলোচনা করা হয়েছে, পিতৃদের নামে যখন আহুতি দেওয়া হয়, তাকে বলা হয় স্বধা। *ধ্রুব*, ধ্রুব মানে কোন জিনিষের স্থিরতা। *মহারাত্রি*, বিনাশ কালে অর্থাৎ যখন সব কিছু অসৎ হয়ে যায়, ইন্দ্রিয় দিয়ে আর কিছু গোচর করা যায় না, তাকে বলা হয় মহারাত্রি। *মহাবিদ্যা* বা *মহামায়া* এই মহাবিদ্যা হল মহামায়া বা মায়া, মায়াই অজ্ঞানের মূল। এগুলো এক একটা মায়ের গুণের শাব্দিক অর্থ। শাব্দিক অর্থের সঙ্গে গুণ জড়িয়ে আছে।

কারুর যদি প্রচুর ঐশ্বর্য থাকে তখন বলি লক্ষ্মীবান, সেই রকম লজ্জাবতী, যার ভেতরে শ্রদ্ধা আছে তাকে বলি শ্রদ্ধাবান, বিদ্যা থাকলে বলি বিদ্যাবান, এগুলো সব গুণ। আমাদের পূর্বজরা বিশেষ্য আর বিশেষণে কখনই আলাদা করতেন না। বিশেষ্যকে বিশেষণ আর বিশেষণক বিশেষ্যে নিয়ে যেতে ওনাদের বেশি সময় লাগত না। আল বেরুনি এই জিনিষটাকে নিয়ে হিন্দুদের খুব বিদ্রুপ করেছেন। যেমন লজ্জা একটা বিশেষণ, কোন মেয়ের যদি লজ্জা থাকে সেটাই মেয়েটির একটি বিশেষ গুণ। কিন্তু হিন্দুরা লজ্জা গুণকেই একটা নারীর রূপে বানিয়ে দেবে। সেই মেয়েতো আর সাধারণ জাগতিক কোন মেয়ে হবে না, তাকে নিশ্চিত ভাবে কোন দেবী বা বড় ধরণের কিছু হতে হবে। নারী যখন বানিয়ে দেওয়া হয়ে গেল, এবার তার জন্মের কাহিনী নিয়ে আসতে হবে। সেই মেয়েকে তো বসিয়ে রাখা যাবে না, তাকে একটা বিয়ে দিতে হবে। বিয়ে দিতে গেলে একটা বর দরকার, বরকেও সেই মেয়ের উপযুক্ত হতে হবে। কখন সখন এক আধটা অনুপযক্ত বর জুটে যাবে। বিয়ের পর তার আবার সন্তান হতে হবে। তাদের সন্তান তো আমার আপনার বাড়ির সন্তানদের মত হবে না, তাকেও সেই রকম কিছু ব্যতিক্রমী হতে হবে। আমাদের পরম্পরাতে এমন কোন বিশেষণ নেই যার একটা মূর্ত রূপ হবে না। আমি যদি বলি নীল রঙ, খুঁজে দেখুন তারও একটা দেবতা আছে। যে গুণের কথাই বলুন না কেন, সবারই একজন করে দেবতা বা দেবী থাকবে। ঠিক সেই রকম যত বিশেষ্য আছে তাকে একটা গুণের মধ্যে নিয়ে আসবেন। যেমন শ্রীরাম একটা নাম, এই নামকেই ওনারা একটা গুণে পরিবর্তন করে দেবেন। এই ব্যাপারটা নিয়ে পুরাণেই সব থেকে বেশি খেলা করা হয়েছে। এখানে যে কটি গুণের কথা বলা হয়েছে, এর বেশির ভাগ গুণকেই আবার ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ প্রজাপতির কন্যা রূপে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টিকার্য শুরু হওয়ার সময় ব্রহ্মা প্রথমে নিজের মন থেকে সব সৃষ্টি করতে শুরু করেছিলেন। তখন সবে কয়েকজন প্রজাপতির জন্ম হয়েছে। মেয়েগুলো কোথা থেকে কীভাবে এসেছে সেটা আবার খুব পরিষ্কার করে বলা নেই। ব্রহ্মা দেখলেন মন দিয়ে সৃষ্টি করতে গিয়ে সৃষ্টির বিস্তার করতে প্রচুর সময় লেগে যাচ্ছে। তখন প্রজাপতিদের সৃষ্টি করে তাদের দেহের মাধ্যমে সৃষ্টি করতে শুরু করলেন। দক্ষ প্রজাপতির পরের পর শুধু মেয়েই হতে থাকল। এখানে যে কজন মেয়ের নাম করা হয়েছে, বেশির ভাগই প্রজাপতির কন্যা। এই কন্যাদের আবার কারুর এই দেবতা কারুর সেই মুনির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। এদের বংশের তালিকা দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। তাও আমরা কিছু নামের উল্লেখ করছি যাতে একটু ধারণা হতে পারে।

দক্ষ প্রজাপতির এক স্ত্রীর নাম ছিল প্রসুতি। প্রসুতি শব্দটা এসেছে সুত থেকে, সুত মানে জন্ম হওয়া। প্রসুতি থেকে দক্ষের চব্বিশটি মেয়ের জন্ম হয়েছে। এদের নাম আবার বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন রকম। কোন পুরাণের সাথে এদের নামের তালিকা মিলবে না, কারণ এগুলো কোন ঐতিহাসিক ঘটনা নয় যে সব মিল থাকতে হবে। এই চব্বিশ জন মেয়ের নাম – প্রথমেই শ্রদ্ধা, পরের জনের নাম শ্রীলক্ষ্মী। এই মন্ত্রে আমরা এই দুটো নাম পেয়ে গেছি। এই লক্ষ্মী কিন্তু বিষ্ণুর লক্ষ্মী নন। তারপর আসছে ধৃতি, ধৃতি মানে ধারণ করার ক্ষমতা। তুষ্টি, তুষ্টির পরে পুষ্টি। তারপর একে একে আসছে মেধা, ক্রিয়া, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধিকা, কীর্তি, খ্যাতি, সতি, সম্ভূতি, স্মৃতি,

প্রীতি, ক্ষমা, সংহতি, অনুসূয়া, ঊর্চা, স্বাহা, স্বধা, এখানে আমরা স্বধা নাম পেয়েছি। এই চব্বিশটি মেয়ের মধ্যে তেরটি মেয়ের বিয়ে হয়েছিল ধর্ম অর্থাৎ যমরাজের সাথে। এরা হলেন শ্রীলক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্তি। বাকি এগারোটি মেয়ের বিয়ে হয়েছিল ভৃগু ঋষির সাথে। আবার অন্য জায়গায় মৎসপুরাণে আছে, পঞ্চযোনি নামে এক মেয়ের সাথে দক্ষের বিবাহ হয়েছিল। পঞ্চযোনি থেকে দক্ষের বাষট্টিটি মেয়ে হয়েছিল। এই বাষট্টি মেয়ের মধ্যে দশটি মেয়ের বিবাহ হয়েছিল ধর্মের সাথে। কশ্যপ মুনির সাথে তেরটি মেয়ের আর সাতাশটি মেয়ের বিবাহ হয়েছিল চন্দ্রমার সাথে। যদিও আমাদের মূল চণ্ডীর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই তবুও শুধু তথ্যের জন্য বলা হচ্ছে যে, এই সাতাশটি মেয়ের মধ্যে – কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশীর্ষা, আর্তা, পুনর্বসু, পূর্বভদ্রপাদ, পূষ্যা, অশ্লেষা, মঘা ইত্যাদি। এই নামগুলি আমাদের খুব পরিচিত নক্ষত্রের নাম। চন্দ্রমা রাজার মত দাঁড়িয়ে আছেন, আর তার চারিপাশে এই নক্ষত্রগুলো চন্দ্রমাকে ঘিরে আছেন। চন্দ্রমা হয়ে গেলেন রাজা, রাজা মানে পুরুষ আর সব নক্ষত্রগুলো হয়ে গেল মেয়ে। চন্দ্রমা কখন এর ঘরে যান, কখন ওর ঘরে যান। আমাদের মাসের নাম চন্দ্রমা যখন যে নক্ষত্রের ঘরে থাকেন সেই অনুসারে মাসের নামকরণ করা হয়েছে। নক্ষত্র সাতাশটি, বারো মাসে এক বছর না হয়ে সাতাশ মাসে এক বছর হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কোন মাসে চন্দ্রমা একই সাথে দুটো বা তিনটে নক্ষত্রের কাছাকাছি থাকে, যে নক্ষত্রের সব থেকে কাছে থাকে সেই নক্ষত্রের নামানুসারে মাসের নাম হয়। মহাভারতে আবার দক্ষ প্রজাপতির বাষট্টিটি মেয়ের নামের তালিকায় সবার নাম দেওয়া আছে। ওর মধ্যে দশটি মেয়েকে ধর্ম, তেরটি মেয়েকে কশ্যপ, সাতাশটি চন্দ্রমা, চারটি মেয়েকে অরিষ্টনেমি, একটি মেয়েকে কামদেব আর একটি মেয়েকে শিব বিবাহ করেছিলেন। এই তালিকাতেই সতীর নাম পাওয়া যায়, সতীর শিবের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। এই তালিকায় ধর্মের স্ত্রীদের নাম হল – বসু, জমি, লম্বা, ভানু, ঊর্জা, সঙ্কল্পা, মৌরথ, সন্ধ্যা ও বিশ্বা। প্রথম তালিকার সাথে দ্বিতীয় তালিকার নামের কোন মিল নেই। বিভিন্ন ভাষ্যকাররা তাঁদের নিজের যেমন যেমন জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে আধার করে এইসব নামের ব্যাখ্যা করেন। মূল কথা হল মায়ের যে গুণের কথা বলা হয়েছে, লক্ষ্মী, লজ্জা, শ্রদ্ধা, পুষ্টি ইত্যাদি এনারা সবাই ছিলেন দক্ষ কন্যা আর এদের বিবাহ হয়েছিল ধর্মরাজের সঙ্গে। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের এক জায়গায় আচার্যও তাঁর ভাষ্যে বলছেন, শ্রী, বাক্, কীর্তি এনারা সবাই ধর্মের স্ত্রী। ধর্মের স্ত্রী মানে এগুলোই কোন মানুষের ভেতরকার গুণ। গুণের কথা বলে দ্বিতীয় লাইনেই বিনাশের দিকটা উল্লেখ করে বলছেন মহারাত্রি, আর মহামায়ে অর্থাৎ সম্পূর্ণ অজ্ঞান যেটা সেটাও মা নিজে। পরের মন্ত্রে বলছেন –

মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।২৩

মেধে, ইনিও দক্ষের এক কন্যা, *সরস্বতি*, *বরে* মানে শ্রেষ্ঠ, যিনি বরণীয়া, *ভূতি* মানে হওয়া, ভূতি থেকেই বিভূতি এসেছে, ঐশ্বর্যস্বরূপা। *বাভ্রবি* দুর্গার একটি নাম, যাঁর গাত্রবর্ণ কিছুটা ধুসর রঙের। আর *তামসী*, তামসী হলেন মহাকালী। এর আগে দেবতারা দেবীর স্তুতি করছিলেন তখন পার্বতী দেবতাদের প্রশ্ন করলেন, তোমরা কার স্তব করছ, তখন পার্বতীর শরীর থেকে একজন দেবী বেরিয়ে এসে বললেন এঁরা আমারই স্তব করছে। যে দেবী বেরিয়ে এলেন তিনি দুর্গা আর পার্বতীর রঙটা কালো হয়ে যাওয়াতে তাঁর নাম হয়ে গেলে কালী। দুর্গার গায়ের রঙ হলুদ হলুদ ভাব। একজনের নাম হল বাভ্রবি, আরেকজনের নাম হল তামসি।

নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে, নিয়তে মানে যিনি সব কিছুকে সংযমিত করেন, জগতে যা কিছু আছে সবাইকে মা নিয়মন করেন। আবহাওয়া, বৃষ্টি, গরম, ঠাণ্ডা সব কিছুকে মা নিয়মন করছেন, শরীরের বৃদ্ধিকে নিয়মনে রেখেছেন, জন্ম-মৃত্যুকে নিয়মন করছেন। *ত্বং প্রসীদেশে*, ঈশ শব্দের অর্থ যিনি সব কিছুর অধীশ্বর, *ত্বং প্রসীদেশে*, হে সর্বেশ্বরী তুমি আমাদের কৃপা কর। মেধা, সরস্বতী, শ্রেষ্ঠা, ঐশ্বর্যস্বরূপা, পার্বতী, মহাকালী, নিয়তা তথা সর্বেশ্বরী রূপিণী হে নারায়ণি তোমাকে আমরা প্রণাম করি।

চব্বিশ ও পঁচিশ নম্বর মন্ত্রও খুব গুরুত্বপূর্ণ। যাদের মনে কোন ধরণের যদি ভয় থাকে, মৃত্যুর ভয়, লোকের ভয়, শোকের ভয় বা কোন কারণে মনে খুব ভয়ের উদয় হয়েছে তখন চব্বিশ আর পঁচিশ নম্বর মন্ত্র নিয়মিত পাঠ ও জপ করলে সব রকমের ভয় দূরীভূত হয়ে যায়। শুধু চব্বিশ নম্বর মন্ত্র জপ করলেও হবে, এটাই

ভয়ত্রাণ মন্ত্র। কোন মানুষ থেকে আপনার ভয় হচ্ছে বা আপনার উপর কোন রাজকোপ পড়তে যাচ্ছে বা আপনার কোন বিপদ হতে যাচ্ছে বা যে কোন ধরণের ভয় হলে এই মন্ত্র যত বেশি জপ করা হবে, তখন ভয়টাও তত কেটে যেতে থাকবে।

সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে।।২৪

হে মা! যা কিছু আছে সব তুমিই হয়েছ আর সব কিছুকে তুমিই নিয়ন্ত্রণে রাখছ কারণ তুমিই তো সব কিছুর অধীশ্বরী। *সর্বশক্তিসমন্বিতে*, তুমি সর্ব প্রকার শক্তিসম্পন্না, তোমার মধ্যেই সব শক্তি বিদ্যমান। হে মা! তুমিই সব কিছু হয়েছ, তুমিই সব কিছুর অধীশ্বরী আর সব শক্তি তোমাতেই আছে, তুমি আমাদের রক্ষা কর। এই প্রার্থনা করলে সব ধরণের ভয়-টয় কেটে যায়। একবার দুবার নয়, বারবার প্রার্থনা করে যেতে হবে। আপনার ভয়ের মাত্রা যেমন প্রার্থনাও তেমন হতে হবে। অন্ধকারকে আমরা সবাই ভয় পাই। অন্ধকার রাস্থা দিয়ে যাবে, রাস্থায় কেউ নেই, এমন কেউ নেই যে শিরদাঁড়া দিয়ে শিরশির করা ভয়ের শিহরণ উঠবে না। তখন এই মন্ত্রটা উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করলে ভয় সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে। ভয় নিয়ে আরও বলছেন –

এতৎ তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে।।২৫

হে কাত্যায়নি তোমাকে প্রণাম! তোমার যে এই ত্রিলোচন বিভূষিতা সৌম্য রূপ এই সৌম্য রূপ যেন আমাদের সব রকম উপদ্রব ও ভয় থেকে রক্ষা করে।

জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে।।২৬

হে ভদ্রকালি! তোমার যে এই ত্রিশূল, এই ত্রিশূল হল *জ্বালাকরালম্*, ত্রিশূল এমন জ্বল জ্বল করছে মনে হচ্ছে যেন আগুন জ্বলছে, এই ভয়ঙ্কর ত্রিশূল দিয়ে তুমি অসুরদের সংহার করেছে, তোমাকে প্রণাম করছি আর এই ত্রিশূল যেন আমাদের সমস্ত রকম ভয় থেকে রক্ষা করে। বাংলাতে একটা ছড়া আছে, মা-বাবারা বাচ্চাদের এই ছড়াটা শিখিয়ে দিয়ে বলে দেয় ভূতের ভয় পেলে এই ছড়াটা বলতে থাকবি তাহলে ভূত-টূত আর কিছু করতে পারবে না। ছড়াটা হল ভূত আমার পুত, প্রেত্নী আমার ঝি। রাম-লক্ষ্মণ সাথে আছে করবি আমায় কি। রাম-লক্ষ্মণ সাথে আছে মানে, বাচ্চাকে শিখিয়ে দেওয়া হল ভগবান তোমার সাথে আছেন। এটা ছড়া, কিন্তু চণ্ডীর এগুলো ছড়া নয়, চণ্ডীর এই মন্ত্রের একটা প্রচণ্ড শক্তি আছে। কারুর জীবনে হয়তো খুব দুঃখ-কষ্ট চলছে, এই বুঝি কিছু হয়ে গেল, কোর্ট-কাছারি করতে হচ্ছে, সব সময় একটা আতঙ্ক লেগে আছে, তখন যদি কেউ প্রার্থনা করে – হে মা! তোমার যে এই উজ্জ্বল ভয়ঙ্কর তেজোময় ত্রিশূল, যে ত্রিশূল দিয়ে তুমি অসুরদের বধ করেছিলে, সেই ত্রিশূল দিয়ে তুমি আমাদের রক্ষা কর, তখন আস্তে আস্তে তার সব বিপদগুলি সরে যেতে থাকবে।

হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য যা জগৎ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোঽনঃ সুতানিব।।২৭

হে মা! শুম্ভ ও নিশুম্ভ বধের সময় যুদ্ধে তুমি যে ঘণ্টাধ্বণিতে সমস্ত জগতকে পরিব্যাপ্ত করে দিয়ে অসুরদের তেজ হরণ করে নিয়েছিল, তোমার সেই ঘণ্টা যেন আমাদের সকল পাপ থেকে রক্ষা করে। কি রকম রক্ষা করবে? মা যেমন নিজের সন্তানকে অশুভ কর্ম থেকে রক্ষা করে, ঠিক সেইভাবে তোমার ঘণ্টা যেন আমাদের সব পাপ থেকে রক্ষা করে। মজার ব্যাপার হল, এখানে বলছেন যে ঘণ্টাধ্বণিতে শত্রুর তেজ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ঘণ্টাধ্বণি করা মানে যারা পক্ষের লোক তাদের আনন্দ হওয়া আর আর বিপক্ষের লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার হওয়া। স্কুলে ক্লাশ আরম্ভ হওয়ার ঘণ্টা পড়লে ছাত্রদের মধ্যে একটা ভীতির সঞ্চার হয়, আর ছুটির ঘণ্টা পড়লে আনন্দে ফেটে পড়ে। আপনি এখন কোন যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করছেন, যুদ্ধ করতে করতে আপনি হয়তো দমে যাচ্ছেন, সেই সময় হঠাৎ একটা ঘণ্টা নিনাদ আপনার কানে এল, আপনি জানেন এই নিনাদ আমার নিজের লোকেদের,

সঙ্গে সঙ্গে আপনার শক্তি বেড়ে যাবে। অন্য দিকে আপনার শত্রুরা পালাতে শুরু করবে। গুণ্ডারা আপনাকে আক্রমণ করল, কিছু করতে পারছেন না, তখন হঠাৎ পুলিশের সাইরেন শোনা গেল, গুণ্ডারা আপনাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল। তাই বলছেন – হে মা! তোমার ঘণ্টাধ্বণি আমাদের যেন রক্ষা করে। এখানে রক্ষা যেটা হচ্ছে সেটা in anticipation হচ্ছে, তার মানে মা জানে তার পাঁচ-ছয় বছরের ছেলের কাছে জগৎ এখন উন্মোচিত হচ্ছে, সেও এখন জগতকে জানতে চাইবে। এখন সে জানে না কোনটা ভালো কোনটা মন্দ। যে কোন বাচ্চা ভালো মন্দের তফাৎ বোঝে না। এখন তার দুটো অবস্থা, একটা হল ভালো মন্দের বিভেদ তার এখনও আসেনি, দ্বিতীয় হল হয়ত তফাৎ বুঝতে পারছে, কিন্তু সেই অনুসারে চলতে পারছে না।

ভালো মন্দের সব সময় বিচার করা হয় সে যে পথকে অবলম্বন করেছে সেই পথকে নিয়ে। যেমন ধরুন যারা স্পাই এজেন্সিতে কাজ করছে, তারা বাবা-মাকেও সত্যি কথা বলবে না, কিসের চাকরি করে, কোথায় কোথায় যাচ্ছে, কোথায় রাত কাটিয়েছে কোন দিন সত্যি করে বলবে না। ওদের ট্রেনিংই হয় মিথ্যা কথা কিভাবে বলতে হবে। দেশের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কিছু লোককে স্পাইয়ের কাজ করতে হবে। এদের কাউকে কিছু দেশের অভ্যন্তরে কাজ করতে হয়, কাউকে বিদেশে কাজ করতে হয়। গলায় পিস্তল ঠেকিয়ে রাখলে বা ব্লেড দিয়ে চিড়তে থাকলেও কোন দিন এরা সত্যি কথা বলবে না। এক এক পরিস্থিতিতে এক এক ধরণের মিথ্যা কথা বলাটা আগে থাকতেই ঠিক করা থাকে। এখানে ধরা পড়লে এই ধরণের মিথ্যা কথা বলবে, ওখানে ধরা পড়লে এই ধরণের মিথ্যা কথা বলবে। এরা যে এত এত মিথ্যা কথা দিনের পর দিন বলে যাচ্ছে, এই মিথ্যা কথা বলাটা ভালো না খারাপ? ভালো খারাপের এখানে কোন প্রশ্নই নেই, সে নিজেকে এখন দেশের সেবায় ঢেলে দিয়েছে, আর দেশের নিরাপত্তা এভাবেই রক্ষা করতে হবে। এখানে পথ ঠিক হয়ে গেছে, আমার এই ধর্ম, এটাই আমার এখন পথ। পথ বা ধর্ম দিয়েই এখন আমার ভালো মন্দের বিচার হবে। যার স্বভাবে ছলচাতুরি করা, মিথ্যা কথা বলা সম্ভব নয় তার এই পথে না যাওয়াই ভালো। আপনার চরিত্রে একটা দিকে প্রবৃত্তি আছে, এই প্রবৃত্তিই আপনার গুণ, এই গুণের জন্যই আপনি হয়ত মহৎ। কিন্তু অন্য জায়গায় এই গুণটাই বিঘ্ন রূপে সামনে এসে যাবে। সিনেমার অভিনেতারা যে অভিনয় করেন, অভিনয় আসলে একটা ছল, যে যত ভালো অভিনেতা সে তত ভালো ছল করতে পারছে। ছল মানে যেটা নয় সেটাকে অভিনেতারা ছল করে দেখিয়ে দিচ্ছে। অভিনেতা মানে এই সে পুলিশ অফিসার, এই সে একজন ক্রিমিনাল, কিছু দিন আগে রাজা, এখন সে ফকির, প্রতিনিয়ত তারা অভিনয় করে যাচ্ছে। বাড়িতে ছেলে যদি দুটো মিথ্যা কথা বলে বাবা তাকে একটা চড় মারবে। হয়ত সে জীবনে একজন বড় অভিনেতা হওয়ার ক্ষমতা রাখে, কিন্তু বাবা-মার কড়া শাসনের ভয় সে বেচারী মিথ্যা কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না, যার ফলে অভিনেতা হওয়ার ক্ষমতাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

জীবনে চলার ক্ষেত্রে এই যে সংঘাত আসে, একমাত্র মায়ই পারে সন্তানকে বাজে কর্ম করা থেকে রক্ষা করতে। ব্রুস লী হংকংএর যে অঞ্চলে থাকত সেখানে সব সময় গ্যাং ওয়ার চলতে থাকে। মারামারি লেগেই থাকত। ব্রুস লীর বাবা একেবারেই চাইতেন না যে ছেলে এই সব গ্যাং ওয়ারে জড়িয়ে থাকে। ব্রুস লী যথারীতি মারামারি করে বাড়ি ফিরত, মুখে মারামারি করার চিহ্ন লেগে থাকত। ওই দেখে বাবা তার উপর আরও মারতেন। ব্রুস লীর মা তাকে লুকিয়ে ডিম সেদ্ধ করে, এটা সেটা করে ছেলের শরীরের আঘাত সারাতে থাকত। অন্য দিকে ব্রুস লীর মায়ের বেশির ভাগ সময় চলে যেতে ছেলেকে বাবার হাত থেকে রক্ষা করতে। সেই ব্রুস লী বড় হয়ে সিনেমায় অভিনয় করে কত বড়লোক হয়ে গেল। আর বেচারী ভোগ করেও যেতে পারল না, অল্প বয়সেই মরে গেল। মায়ের কাজই হল আমার ছেলে যাই করুক আমাকে তাকে রক্ষা করতে হবে। প্রথমে মা চেষ্টা করে ছেলে যাতে ভুল কাজ না করে, সেখান থেকে সরে এসে দেখে পাপকর্ম যেন না করে। তারপরেও যদি কোন পাপকর্ম করে ফেলে তখন তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে যাবে। মায়ের দুটোই কাজ পাপকর্ম থেকে তাকে সরিয়া আনা আর পাপকর্ম করে ফেললে সেই পাপকর্ম থেকে তাকে রক্ষা করা। এই জিনিষটাই এখানে মায়ের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, তোমার যে ঘণ্টা, এই ঘণ্টার ধ্বণি আমাকে যেন পাপকর্ম থেকে রক্ষা করে। শুধু তাই না –

অসুরাসৃগ্‌বসাপঙ্কচর্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্।।২৮

হে মা চণ্ডিকে! তোমার হাতে যে উজ্জ্বল খড়্গ আছে, যে খড়্গ দিয়ে তুমি অসুরদের বধ করেছ, যে খড়্গে অসুরদের রক্ত ও মেদ লেগে রয়েছে সেই খড়্গ যেন আমাদের সব সময় মঙ্গল করে। মায়ের সৌম্য রূপ, মায়ের ত্রিশূল, মায়ের ঘণ্টা আর মায়ের খড়্গ এই কটি জিনিষকে নিয়ে প্রার্থনা করে বলছেন এগুলো যেন আমাদের সব সময় রক্ষা করে। শুধু চব্বিশ নম্বর মন্ত্র হল ভয় থেকে রক্ষা করার প্রার্থনা।

আমাদের সমস্যা হল আমরা সব সময় ভগবানকে দেবতা রূপে দেখি আর দেবতাকে মূর্তি রূপে দেখে থাকি। মূর্তি মানেই objective reality, মানে বস্তু রূপে চিন্তা। আমরা যতই চেষ্টা করি যাই না কেন, যতই আমাদের কেউ ধাক্কা মারতে থাকুক, ভগবানকে objective reality বা বস্তু রূপে চিন্তা করা থেকে আমরা কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারবো না। ভগবানকে বস্তু রূপে ভাবার ফলে আমরা মনে করি ইনি শ্রীরামচন্দ্র, ইনি কালী, ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ। রাম-লক্ষ্মণ সাথে আছে করবি আমায় কী, রাম-লক্ষ্মণের কাজ ভূত তাড়ানো, তাহলে কালী কেন ভূত ভাগাবেন, কালীর অন্য কাজ। সেই রকম দুর্গার অন্য কাজ, শিবের আলাদা কাজ – এগুলো সব বোকা বোকা চিন্তা-ভাবনা। স্বামীজী বলছেন তোমার মধ্যেই সব শক্তি। আধ্যাত্মিকতার শেষ মৌলিক সিদ্ধান্ত হল তুমিই সেই পূর্ণব্রহ্ম। তাই তোমার মধ্যে সমস্ত জ্ঞান, তোমার মধ্যেই সমস্ত শক্তি। জগতে জ্ঞান আর শক্তি ছাড়া আর কিছু নেই। জগৎ মানেই ক্রিয়াশীল, যে কোন ক্রিয়ার জন্য দুটো জিনিষের দরকার – জ্ঞান আর শক্তি, এই দুটো ছাড়া আর কিছু লাগে না। আপনি একটা ট্রেন চালাতে চাইছেন, এখন আপনার ট্রেন বিষয়ক জ্ঞান আর চালাবার জন্য শক্তির দরকার। মঙ্গলে মঙ্গলযান পাঠাবেন সেখানেও রকেট টেকনোলজি আর power দরকার। সমস্ত শক্তি আর সমস্ত জ্ঞান আপনার মধ্যেই। তাহলে কোথা থেকে দুর্গা আর কোথা থেকেই বা রাম এসে ট্রেন আর মঙ্গলযান চালাচ্ছেন। আমরা এতই দুর্বল যে, স্বামীজী যখন ঢাক, ঢোল, কাড়ানাকাড়া পিটিয়ে পিটিয়ে চিৎকার করে বলছেন ওঠো জাগো, এই সিংহের গর্জনেও আমাদের ঘুম ভাঙছে না। একটু আওয়াজ কানে যেতে 'কিসের আওয়াজ হল'? জিজ্ঞেস করে পাশ ফিরে আবার শুয়ে পড়ছি। স্বামীজীর বেদান্ত সিংহের গর্জন আমাদের কাছে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ার আওয়াজ। কিন্তু আমরা যে উঠে দাঁড়াব সেই সামর্থও আমাদের নেই, আমরা এতই দুর্বল, এতই অপদার্থ। শুধু স্বামীজীই নয় আমাদের ঋষিরাও আমাদের অবস্থা জানতেন, তাই ভগবানকে ওনারা আমাদের জন্য semi objectify করে দিচ্ছেন। তার মানে, দুর্গার একটা রূপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, রূপ দিয়ে দেওয়ার পর তাঁর মধ্যে যে গুণ আরোপ করছেন, সেই গুণের মধ্যেও নির্গুণ ব্রহ্মের গুণ রেখে দিচ্ছেন, যাতে আমরা এই গুণকে ধরে নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা করে সেই স্তরে পৌঁছাতে পারি। কিন্তু আমরা হলাম institutional builders, তার মানে ভালো যে কোন জিনিষ যদি এসে যায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমরা institutalised করে দিয়ে শেষ করে দিই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি, এখন শান্তিনিকেতনে কোন রকমে পৌঁছে গেলেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি সব শ্রদ্ধাজ্ঞাপন হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি যে চিন্তন জগতের এমন একটা উচ্চ পর্যায়ে গিয়েছিলেন, যেখান থেকে সৃজনী শক্তির একটা জাহ্নবীর স্রোত বেরিয়ে এসেছিল, আর যেটাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যে ভাবব আমাকেও কিছু একটা করতে হবে, সেই ভাবে আমরা নিজেদের অনুপ্রাণিত করতে পারছি না, সেই চেষ্টাটাও নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিকতাকে যে স্তরে নিয়ে গেছেন, স্বামীজী শক্তির জাগরণকে যে স্তরে নিয়ে গেছেন সেই স্তরে যাওয়ার জন্য কোন অনুপ্রেরণা না নিয়ে মন্দির বানানো, খিচুড়ী পায়েস খাওয়ানোতে সব শক্তি ঢেলে দিচ্ছি। এগুলোরও যে প্রয়োজন আছে তা কেউ অস্বীকার করবে না, কিন্তু এর বাইরেও যে অনেক রকম ভূমিকা আছে সেই ব্যাপারে কেউ চিন্তা ভাবনা করছি না।

প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা ভাবনা আলাদা আলাদা, কারুর শ্রীরামের রূপ ভালো লাগবে, কারুর কালী রূপ ভালো লাগবে, কারুর দুর্গা রূপ ভালো লাগবে। যেটাই ভালো লাগুক সেটাকে ধরে আগে উপরে উঠে এস আর তোমার ভেতরে যে অনন্ত শক্তি ও অনন্ত জ্ঞান সুপ্ত হয়ে আছে সেটাকে বিকশিত কর। কিন্তু আমরা যাই করি না কেন আমাদের ভেতরের অনন্ত শক্তি আর অনন্ত জ্ঞানকে জাগাবার চেষ্টা না করে মা দুর্গার দশটা হাত কেন আর কালীর চারটে হাত কেন, মায়ের ভোগ চৌষট্টি বাটি নাকি একশ আটটি বাটিতে দেওয়া হবে, এই বিচার করতে করতেই সারাটা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি। এখানে যে দেবীর স্তুতি এগুলো ঋষিদের রচনা। ঋষিরা জানতেন যাঁরা মায়ের উপাসক তাঁরা এগুলো পাঠ করবেন, অনুধ্যান করে নিজেদের ভেতরে শক্তি ও জ্ঞানকে প্রকাশিত করার

কাজে লাগাবেন। স্বামীজী বলছেন – be free, উদ্দেশ্য হল be free হওয়া। যে কোন লোকই বলবে I am free, ভারত স্বাধীন আমি ভারতের স্বাধীন নাগরিক, I am free। আরে ভাই! ফ্রিডমের লক্ষণ হল – all your knowledge will get expressed and all power will get manifested। যেটা স্বামীজীকে দেখে আমরা বুঝতে পারছি, কী তাঁর শক্তি কী তাঁর জ্ঞান! যতক্ষণ আমার আপনার মধ্যে সেই expression আর manifestation না হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা কেউই বলতে পারব না I am free। ফ্রী নই মানে আমরা সবাই অপদার্থ। অপদার্থ মানে আমরা পদার্থ নই। একমাত্র পদার্থ হলেন ঈশ্বর। আমরা ঈশ্বরের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছি না বলে অ-পদার্থ। ভয়কে তাড়াবার জন্য চাই শক্তি, ভয় মানে শক্তির অভাব। শক্তির অভাবকে শক্তি দিয়েই পূরণ করতে হবে। সব শক্তি আমাদের ভেতরেই, আমি ঠাকুরের সন্তান আমার আবার কিসের ভয়। তোমার গলা কেটে দেব। কেটে দাও। আমাকে তাড়িয়ে দেবে? তাড়িয়ে দিক। আচ্ছা ঠিক আছে, মেনে নেওয়া গেল আপনার দ্বারা এভাবে হবে না। তাহলে আপনি ঠাকুরের নাম নিন। কোন ঠাকুরের নাম নেব? যে ঠাকুরকে আপনারা ভালো লাগে। কালী ঠাকুর ভালো লাগে, কালী ঠাকুরের নাম কর, শিব ঠাকুরের নাম আপনার ভালো লাগে, করতে থাকুন শিবের নাম। আপনি যদি এখন বলেন, কোন কিছুর দরকার নেই, রাম রাম করলেই হবে। সেতো সবাই জানে, রাম রাম করারও দরকার নেই, আপনাকে কে কী করবে! আপনি তো পূর্ণব্রহ্ম। আলেকজাণ্ডার ঋষিকে বললেন তোমার গলা কেটে দেব। ঋষি বললেন কেটে দাও। গলা কেটে দিলে কী হবে, আমার নাশ তো করতে পারবে না। এই কথাগুলো আমাদের পক্ষে বলা খুবই সহজ, কিন্তু সাধনা করে যতক্ষণ ভেতরের সেই অনন্ত শক্তি আর অনন্ত জ্ঞানকে উন্মোচন না করা হবে ততক্ষণ এই কথাগুলো জীবনে লাগানো সম্ভব হবে না। তার আগে এগুলো শব্দ মাত্র। যতক্ষণ শব্দ মাত্র আছে, ততক্ষণ রামের নামও নেবেন, কৃষ্ণের নামও নেবেন, শক্তিরও নামে নেবেন।

আগেকার ব্রাহ্মণরা যে শৌচ, আচার, নিয়ম-নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জীবন চালিয়ে এসেছেন, এই ধরণের জীবন-যাপন আমাদের পাণ্ডিত্য দেবে আর সত্যিকারের একজন ধার্মিক পুরুষ তৈরী করে দেবে ঠিকই। কিন্তু শুধু এই ভাবে চলতে থাকলে আমাদের জীবনটাও শৌচ আর আচারসর্বস্ব হয়ে দাঁড়াবে, যার জন্য আগেকার ব্রাহ্মণদের কাছে আচার, শৌচ এগুলোই ছিল প্রধান। কিন্তু যেখান থেকে আধ্যাত্মিকতার বীজ অঙ্কুরিত হবে, যেখান থেকে জীবনের একটা ইতিবাচক পরিবর্তন শুরু হবে, তার জন্য তাকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান হতে হবে। নিয়মিত আচার্যের কাছে শাস্ত্র কথা যদি না শ্রবণ করা হয়, নিয়মিত জ্ঞান চর্চা যদি না হয় তাহলে ওই সম্ভবনাটাও অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যাবে। শুনতে শুনতে একটা দুটো কথা কখন যে দুম্ করে ভেতরে ফেটে পড়বে কেউ বলতে পারবে না। স্বামীজী যে বারবার বলছেন all knowledge are within you, এই কথাতো একমাত্র স্বামীজীই বলছেন না, উপনিষদ যে বলছে তত্ত্বমসি, তুমিই সেই, অহং ব্রহ্মাস্মি, আমি পূর্ণব্রহ্ম, এগুলোই হিন্দুধর্মের মৌলিক সিদ্ধান্ত বাক্য। এই সিদ্ধান্ত বাক্যগুলির উপরেই হিন্দুধর্ম দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের যত দেবী দেবতা আছে, যত মন্দির আছে, যত রকমের উপাচার আছে, যে ঋষিরা এই তত্ত্বমসি সিদ্ধান্ত বাক্য সমূহকে পেয়েছেন তাঁরাই তো দেবী, দেবতা, মন্দির, উপাচার এগুলোকে আমাদের পারমার্থিক উত্থানের জন্য নিদান রূপে দিয়ে গেছেন।

ঠাকুরের মত আচার্যকে আমরা পাব কল্পনাই করতে পারিনা, স্বামীজী তাঁকে অবতার বরিষ্ঠ বলছেন, ঠিকই বলেছেন, কোন সন্দেহই নেই। সেই ঠাকুরই সব কিছুতে একমাত্র মন্দিরের মা কালীকেই মানতেন। নরেন বলছেন, উনি এখনও কালী মন্দিরে যান। ঠাকুরের আপনি সব কিছুকে ছেড়ে দিন, তিনি অবতার ছেড়ে দিন, অবতার বরিষ্ঠ ছেড়ে দিন, আপনি ঠাকুরকে একজন সিদ্ধ সাধক রূপেই দেখুন। তোতাপুরির কাছে ঠাকুরের অদ্বৈত জ্ঞান হয়ে গেছে, তারপরেও তো উনি কালী মন্দিরে যাচ্ছেন, তারপরেও তিনি হাততালি দিয়ে গান করে যাচ্ছেন। কেন করছেন? কারণ অদ্বৈত জ্ঞান আর কালী মন্দিরের যাওয়া এই দুটোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। যিনি এটা তিনিই এটা। যাঁর কাছে অদ্বৈত জ্ঞান সত্য তাঁর কাছে মন্দিরের বিগ্রহও সত্য, সেই বিগ্রহ যে দেবতা বা ঠাকুরেরই হোক না কেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমার আপনার কাছে কালীও মিথ্যা ব্রহ্মও মিথ্যা, কালীর মন্দিরটাও মিথ্যা। বাসে যেতে যেতে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে কপালে একটু হাতটা ঠেকিয়ে দেওয়া ছাড়া আমাদের দ্বারা আর কিছু হয় না, আর হওয়া সম্ভবও নয়। রিক্সা করে যেতে যেতে রাস্তায় কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল,

রিক্সাও চলছে আর আমিও তাকে জিজ্ঞেস করে যাচ্ছি, কিরে ভালতো! কেমন আছিস! ততক্ষণে রিক্সাও আমাকে বন্ধুর দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেছে। এই করে কি বন্ধুত্ব হয়! বন্ধুত্ব হওয়ার জন্য প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়, প্রাণপাত করা খাটুনি দরকার। ঈশ্বরের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব গড়ব, ঈশ্বরের সাথে যে আপনত্ব বোধ তৈরী হবে, তার জন্যও প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়। জিটি রোড দিয়ে বাসে করে যাচ্ছি আর বেলুড় মঠের দিকে তাকিয়ে একটা সেলুট ঠুকে দিলাম, তাতে কী আর ঠাকুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যাবে!

ঈশ্বরকে মেনে, দেবী-দেবতাদের মেনে আমরা যা আচার আচরণ করি তার সাথে যারা ঈশ্বর-ফীশ্বর কিছুই মানে না তাদের যে আচার আচরণ, তাতে কোন তফাৎ নেই। তফাৎটা হয় শ্রেষ্ঠদের মধ্যে। যারা ঈশ্বর মানে না, তাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ আর ঈশ্বরকে যাঁরা জানেন, মানেন তাঁদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, এই দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষের মধ্যে বিরাট ব্যবধান থাকবে। এনাদের মাঝখানে আছেন, যাঁরা ঈশ্বরকে মানেন না কিন্তু ধর্মকে মানেন, ধর্ম মানে মূল্যবোধকে মানেন। যেমন ভগবান বুদ্ধ ঈশ্বর মানতেন না কিন্তু ধর্মকে মানছেন বা সক্রেটিস তিনি ঈশ্বরকে মানতেন না, ধর্ম কি জানতেনও না কিন্তু মূল্যবোধকে মেনে চলতেন, তিনি মহৎ হয়ে গেলেন। যাঁরা ঈশ্বরকে মানেন না, ধর্মকেও মানেন না তাঁদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁদের দিকে তাকালে দেখা যাবে এনারা সেই রকম বিরাট কিছু নয়, অতি সাধারণ। ইতিহাস তাঁদের কবেই ভুলে গেছে। আমাদের বৈশিষ্ট্য হল, আমাদের কাছে আধ্যাত্মিকতাই শেষ কথা, তার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আমাদের যে ধর্মাচরণ, সকালে উঠলাম জপ করলাম, গঙ্গাজল খেলাম, স্নান করলাম, তুলসি পাতা খেলাম, শাস্ত্র পাঠ করলাম, বেলুড় মঠ গেলাম, বছরে একবার জয়রামবাটী-কামারপুকুর করলাম, এর কোনটাই আমাদের জীবনের চিরাচরিত ধারাকে পাল্টে গুণগত ধারাতে নিয়ে যেতে পারবে না। গুণগত ধারা মানে, একটা উট পাখি প্রচণ্ড গতিতে দৌড়তে পারে, হরিণও খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে। কিন্তু একটা ছোট্ট পাখি মাটিতে সেও কোন রকমে দৌড়াতে পারে, কিন্তু একটু দৌড়ে সে মাটি ছেড়ে উড়ে যেতে পারে। উট পাখি খুব গর্ব করে ছোট্ট পাখিকে বলতেই পারে, দেখো আমিও পাখি কিন্তু তোমার থেকে কত জোড়ে আমি দৌড়াতে পারি। তাহলে কোনটা বেশি গর্বের, জোড়ে দৌড়ান নাকি মাটি ছেড়ে আকাশে উড়তে পারা? যে পাখি মাটিকে একবার ছেড়ে দিয়েছে তার গুণগত ধারাটাই সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। মাটি ছেড়ে দেওয়া মানে, এবার আপনি এ্যারোপ্লেনের গতি পেয়ে যাবেন, রকেটের গতিতে পৃথিবীর কক্ষ পথকেই অতিক্রম করে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বাইরে চলে যাওয়ার ক্ষমতা আপনার মধ্যে এসে যাবে। কিন্তু যতক্ষণ মাটিতে দৌড়াচ্ছেন ততক্ষণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মধ্যেই আপনি আবদ্ধ। আধ্যাত্মিকতা মানে মাঝে মাঝে মাটিকে ছেড়ে দেওয়ার শক্তি। আধ্যাত্মিকতাকে আপাত ভাবে মনে হবে কিছুই না, এর থেকে সত্ত্বগুণী লোক, মহৎ লোক কতই তো আছেন। কিন্তু স্বামীজীর সাথে কি সত্ত্বগুণী লোকের কখন তুলনা করা যায়! কোন তুলনাই হয় না। একজন লম্পট সন্ন্যাসী একজন সাধারণ সত্ত্বগুণী লোকের থেকে অনেক উপরে, কারণ সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে মাটিকে ছেড়ে দিচ্ছে। ভালো মানুষী, সত্ত্বগুণী, ধার্মিক পুরুষের সাথে আধ্যাত্মিকতার কোথায় পার্থক্য, এই ব্যাপারটা যদি কেউ বুঝে নিতে পারে তখনই তার মধ্যে বেদান্তের মৌলিক সিদ্ধান্ত বাক্যগুলির ধারণা করার ক্ষমতা আসবে। যিনি একদিকে বুঝে নিয়েছেন সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত শক্তি আমার ভেতরেই, অন্য দিকে তিনি ঠাকুর দেবতাও মানছেন, মন্দিরেও যাচ্ছেন, আসলে এই দুটোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এই ব্যাপার গুলো বোঝা আর বুঝে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা খুব কঠিন। এর জন্য অনেক দিন ধরে লেগে থাকতে হয় আর প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়।

একজন নামকরা আইপিএস অফিসার তাঁর জীবনের নানা কাহিনী বলতে গিয়ে এক জায়গায় বলছেন, আইপিএস অফিসারের চাকরি পাওয়ার পর তার ট্রেনিং শুরু হয়েছে। ট্রেনিংএর একটা অঙ্গ আছে যেখানে দড়ি দিয়ে ঝুলে অনেক উঁচু পাঁচিলকে টপকে যেতে হবে। তিনি মোটাসোটা মানুষ ছিলেন। দড়ি ধরে ঝুলছেন, ঝুলতে ঝুলতে বুঝে গেছেন ওনার দ্বারা এত উঁচু পাঁচিলকে পার করা যাবে না। দড়িতে ঝুলতে ঝুলতেই তিনি মনে মনে ঠিক করে নিলেন, আমার আর আইপিএস অফিসার হয়ে কাজ নেই, এই দড়িটা ছেড়ে দিচ্ছি, মাটিতে পড়ে গিয়ে আমার হাত-পা কিছু একটা ভেঙে যাবে, তারপর আমাকে বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। আমার আর আইপিএস হওয়া যখন যাবে না, তখন কোথাও লেকচারের একটা চাকরি জুটিয়ে নেব। নীচ থেকে সেই সময় সার্জেন্ট বুঝতে পেরেছেন কি হতে যাচ্ছে। উনি জানেন এই রকমই হয়ে থাকে। নীচ থেকে সার্জেন্ট তাকে বলে যাচ্ছেন ‘লটকে

রহো সাব, লটকে রহো', ঝুলে থাক, দড়ি ছাড়বে না। আইপিএস ভদ্রলোক বলছেন, ওই মুহুর্তে তাঁর পুরো জীবনটা পুরো পাল্টে গেল। বলছেন, যদি ঝুলেও থাকেন তাতেও আপনার হাতের পেশী মজবুত হবে। সেই ভদ্রলোক আজ এক রাজ্যের পুলিশের ডিরেক্টর অফ জেনারেল। সেই ভদ্রলোক তো তখন ছেড়েই দিয়েছিলেন আমার দ্বারা আইপিএসের চাকরি করা হবে না। একুশ বছর বয়সে আইপিএস অফিসার হয়েছেন আজ তিনি পুলিশের ডিরেক্টর অফ জেনারেল। লটকে রহো, ধরে রাখো, যদি ছেড়েই দেন তাহলে খেলাই তো শেষ হয়ে গেল। যদি ঝুলে ধরে থাকেন তাহলে কিছুটা সুযোগ থেকে যাবে। চণ্ডীর প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে আমরা এতক্ষণ বাস্তব জীবনের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। আবার চণ্ডীর কথায় আসছি, এর পরের মন্ত্রে প্রার্থনা করে দেবতারা বলছেন –

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি।।২৯

প্রচলিত একটি শ্যামসঙ্গীতে সাধক কবি বলছেন 'সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি', শেষে বলছেন 'কারে দাও মা ব্রহ্মপদ কারে করো অধোগামী'। গানের এই ভাবটাই এই মন্ত্রের ভাব। বলছেন, মা! তুমি যদি কারুর উপর প্রসন্না হয়ে যাও তার রোগশোক সব দূর হয়ে যায়। কিন্তু যার উপর তুমি কুপিতা হয়ে যাও তার ভালো যা কিছু আছে সেটাও নাশ হয়ে যায়। তারপরে বলছেন, যিনি তোমার আশ্রয় নিয়ে নিয়েছেন তার উপর কখনই কোন আপদ বিপদ আসে না। তার থেকে আরও বড় ব্যাপার হল *ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি*, যিনি তোমাকেই আশ্রয় করে নিয়েছেন তিনি অপরকেও আশ্রয় দিতে পারেন। ভগবানে যিনি শরণাগতি নিয়েছেন, যার মধ্যে পূর্ণ সমর্পণের ভাব এসে গেছে, তাঁরা আবার অপরকেও আশ্রয় দেন।

আমরা এখানে সবাই অজান্তায় একটা বড় দায়ীত্ব নিয়ে ফেলেছি, আমরা নিজেরাও সেটা জানি না। আমরা এখানে এই যে Indian Spiritual Heritage Course এর মাধ্যমে শাস্ত্র অধ্যয়ন করার সুযোগ পেয়েছি, আমাদের সবারই এখন দায়ীত্ব আমাদের আশেপাশে যারা আছে, যাদের আমরা জানি, যাদের সঙ্গে আমাদের ওঠাবসা, তাদের মধ্যে আমাদের শাস্ত্রের এই ভাবগুলো সঞ্চারিত করা, তাদের দুঃখ-কষ্টে পাশে দাঁড়ানো। পাশে দাঁড়ানো মানেই যে তাকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে হবে তা নয়, দুটো মিষ্টি কথাও তো বলতে পারি। কিন্তু তার থেকে বড় হল আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের আলো সব জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। তবে সবাই যে যা বলবে, ধর্মের নামে উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করবে, সব কথার উত্তর দিতে হবে তাও নয়। পাঁচজন লোকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কারুর সঙ্গে তর্ক করতে হবে না। কিন্তু অনেকে আছেন যাঁরা সত্যিই শাস্ত্রের কথা জানতে ইচ্ছুক কিন্তু পরিস্থিতির জন্য শাস্ত্রের কথা শোনার সুযোগ পাচ্ছেন না, তাঁদের আলো দেওয়ার দায়ীত্ব আমাদের কাঁধে তুলে নিতে হবে। এই কথাই এখানে বলছেন *ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি*। আপনারা যাঁরা ঠাকুরের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি শরণ নিয়েছেন, এই অধ্যাত্ম বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধার সাথে শরণ নিয়েছেন, এখন আপনাদের সবারই দায়ীত্ব আরও পাঁচ জনের মধ্যে এই অধ্যাত্ম বিদ্যার আলো দান করে তাদের আশ্রয় দেওয়া। লোকেরা জানুক আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য কী। কিন্তু এখানে আরও উচ্চস্তরের কথা বলা হচ্ছে। উচ্চস্তরের এইজন্যই বলা হচ্ছে, যিনি একবার ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়ে গেছেন, তিনি আর কোনও কিছুকে ভয় পান না, রোগশোক তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। তাই না, তিনি আরও পাঁচজনের দুঃখ-কষ্টকে নিজের উপরে টেনে নিতে পারেন। যেমন বাড়ির ঠাকুরমা, তাঁর নিজের যা সমস্যা থাকার তা আছে, কিন্তু তিনি নিজেকে ঠাকুরমা রূপে মাতৃত্বের ভালোবাসায় এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন যে, তাঁর নিজের সন্তান, বৌমা, নাতিপোতা বাড়ির সবারই সব রকম ঝামেলাকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে স্নেহ-মমতা দিয়ে সবাইকে বুকে আগলে রেখেছেন। তাই বলছেন, মা! তুমি যার প্রতি প্রসন্না তার সব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যায়, আর যার প্রতি রুষ্টা হয়ে যাও তার ভালো সব কিছু নাশ হয়ে যায়। আর যিনি তোমার শরণাপন্ন তাঁর কখন আপদ-বিপদ আসে না।

এখানে আরেকটি কথা বলার আছে, আমাদের মধ্যে খুব প্রচলিত ধারণা যে ভগবানই সব কিছু করেন। তাহলে কেউ প্রশ্ন করতে পারে, মা কেন কারুর উপর রুষ্টা হয়ে যান? তখন তার উত্তরে তাকে বলে দেওয়া হল, মানুষের কাজের ধরণ দেখে মা কারুর উপর প্রসন্না হন আবার কারুর উপর কুপিতা হন। তাহলে ভগবান কেন তাকে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছেন যে কাজের জন্য ভগবান রুষ্ট হয়ে যাবেন? অদ্বৈত দৃষ্টিতে দেখলে এই প্রশ্নগুলির চটপট সমাধান হয়ে যায়। আমাদের ভেতরে যে আত্মশক্তি আছে, সেই আত্মা, বা চৈতন্য বা চিতি শক্তির প্রতি আমরা যখন শরণাপন্ন হই তখন স্বাভাবিক ভাবে আর এই প্রশ্ন আসবে না। আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্যে বারবার বলছেন শোক আর মোহের নাশই আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতা মানেই শোক আর মোহের নাশ। শোক আর মোহের নাশ হয়ে গেলে ভবলোকটাই দূর হয়ে গেল, তখন বাকি লোককে কে আর তোয়াক্কা করবে! বিপদ সবারই আসে, সাধু-মহাত্মাদেরও বিপদ আসে আবার দুষ্ট লোকেদেরও বিপদ আসে, ঠাকুরের শরীরেও ব্যাধি ছিল আর তাঁর আশেপাশে যাঁরা ছিলেন তাঁদের শরীরেও ব্যাধি ছিল।

এর আগে আর্ত শব্দের আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম, আর্ত ভাব মনেরই একটা অবস্থা। যাঁরা আত্মার প্রতি শরণাগতি নিয়ে নিয়েছেন, তাঁদের এই ভাবগুলো আর স্পর্শ করতে পারে না। তাঁদের কাছে একটাই অপ্রাপ্ত বস্তু, আত্মজ্ঞান, আমি এই আত্মজ্ঞান পেতে চাই। এটাই আধ্যাত্মিকতা। গীতায় ভগবান শ্লোকের পর শ্লোক এই কথাই বলে গেছেন। সেখানে বলছেন প্রসন্নাত্মা, সব সময় তিনি প্রসন্ন থাকেন। প্রসন্ন না থাকার তো কোন কারণ নেই, কারণ জাগতিক কোন কিছুই আর তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। স্কুলে যখন ছুটির ঘণ্টা পড়ে তখন ছেলেরা সব আনন্দে লাফাতে থাকে। তখন দুষ্টুমি করলে বেশির ভাগ সময় শিক্ষকরাও তাদের কিছু বলেন না। যদি কোন শিক্ষক দুটো চড়ও মেরে দেন, তখন ভ্যাঁ করে একটু কাঁদতে না কাঁদতেই স্কুলের গেট দিয়ে বেরিয়ে যাবে। বাড়ি যাওয়ার আনন্দ তাকে এমন করে দিয়েছে যে এই জিনিষগুলোকে সে আর গায়ে মাখে না। কিন্তু সকালে স্কুলে ঢোকার পর ওকে একটু চোখ রাঙালেও সারাটি দিন ওর নষ্ট হয়ে যাবে। ছুটি হয়ে গেলে ওকে যদি পাঁচ বার কান ধরে ওঠবোস করতে বলা হয় তখন আনন্দে দশ বার ওঠবোস করে দেবে। তখন ও কাউকেই গ্রাহ্য করবে না, সে জানে আমি এবার চললাম। আমার আপনার সবার এই দুরবস্থা, সবে আমরা স্কুলে ঢুকেছি, একটু কষ্ট হলেই কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছি। যেদিন দেখবেন আপনি মুক্ত পুরুষ তখন এগুলো কোন গ্রাহ্যই হবে না। মুক্ত পুরুষের আনন্দ স্কুলের ছুটির ঘণ্টা পড়ার পর ছেলেদের আনন্দের মত। সে জানে আমি মুক্ত, এখন পাঁচটা ঝামেলা এসে গেলেও তাঁকে বিচলিত করতে পারবে না, তিনি এখন প্রসন্নাত্মা। তাই না, তিনি আরও পাঁচজনকে গিয়ে বলেন তোমরা কিসের জন্য কাঁদছ, আমরা সবাই ঈশ্বরের দাস, আমরা ভগবানের নিজের লোক, আমাদের এভাবে কান্নাকাটি করার কোন অর্থই হয় না।

এইসব মন্ত্রকে যতক্ষণ অদ্বৈতের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ব্যাখ্যা করা না হবে ততক্ষণ এর অর্থ স্পষ্ট হবে না। তার আগে ব্যাখ্যা করতে গেলে পক্ষপাত দোষ এসে যাবে। তিনি এর প্রতি কেন রুষ্টা হন, ওর প্রতি কেন প্রসন্না হন, ঈশ্বরই যখন সব কিছু করেন তাহলে খারাপ কাজের শাস্তি আমাকে কেন পেতে হচ্ছে, এই ধরণের নানা রকমের উদ্ভট প্রশ্ন চলে আসবে, এই প্রশ্নগুলো দ্বৈতবাদে সব সময় আসে। কিন্তু যিনি বুঝে গেছেন যিনি আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই কালী, তিনি জানেন যাঁর উপর আত্মকৃপা এসে গেছে কোন রোগ, শোক, মোহ এসব তাঁকে আর কাবু করতে পারে না। শরীরের রোগ যে হবে না তা নয়, রোগ-ভোগ সবই হবে কিন্তু শরীরের রোগের জন্য তাঁর মনের প্রসন্নতায় কোন ঘাটতি হবে না। আর্তের ভাব কখন আসবে না। তাঁরা আবার পাঁচজনকে আশ্রয়ও দিতে পারেন। ঠাকুর বলছেন, সাধারণ জ্ঞানী হলেন হাভাতে কাঠ, একটা কাক বসলেও ডুবে যায় আর জ্ঞানীরা হলেন বাহাদুরী কাঠ, নিজেও পারে যান আবার পাঁচজনকেও পার করে দেন। আর বাকি সব পাথর, জলে নামলেই ডুবে যায়। হাভাতে কাঠ আর বাহাদুরী কাঠের তফাৎ কোথায়? বাহাদুরী কাঠ তার আকারটা বৃহৎ হয়ে গেছে আর ওর কাষ্ঠত্ব, যেখানে জলীয় ভাবটা কমে গেছে, সে এখানে কাঠের স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত। কাঠ যদি নিজের স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় সে কখনই ডুবে যাবে না। স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলে কাঠ পচে যাবে, পচা কাঠ ডুবে যাবে। আপনার যে প্রকৃত স্বভাব, সেই স্বভাবে যখন আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবেন তখন আপনি নিজেও পারে যাবেন অপর পাঁচজনকেও নিয়ে যাবেন। মূল কথা হল সচ্চিদানন্দই আছেন, তাই যিনি চৈতন্যবান তাঁর মধ্যেই সব

জ্ঞান, যিনি চৈতন্যবান তাঁর মধ্যেই সব শক্তি। সেইজন্য যিনি যত ঈশ্বরের দিকে এগোবেন তত তাঁর ভেতর থেকে চৈতন্যের প্রকাশ অনেক বেশি প্রকাশিত হয়। যার ফলে রোগ শোক হলেও তাঁরা কাবু হয়ে পড়েন না।

দক্ষিণেশ্বরে থাকার সময় ঠাকুরের কত রকমের সমস্যা, পেট ভালো থাকা কাকে বলে ঠাকুর জানতেনই না, চিরকালের পেটরোগা ছিলেন। তারপর হাত ভেঙে গেল, গলায় ক্যান্সার হয়ে গেল। তিনিও তো মায়ের ভক্ত ছিলেন, কিন্তু কখনই রোগ ব্যাধিরা ঠাকুরকে কব্জা করে ফেলে দিতে পারেনি। তিনি যখন মাকে দেখছেন তখন দেখছেন যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী তিনিই কৃষ্ণ। সাধারণ লোকেদের ক্ষেত্রে একটু অন্য রকম হয়। তারাও হয়ত মায়ের ভক্ত, কিন্তু রোগ হলে বা কোন ঝামেলা এসে গেলে মায়ের কাছে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে কেঁদে বলবে – হায় ঠাকুর! তুমি থাকতে আমার এ কী হয়ে গেল! এগুলো ধারণা করা যেমন খুব কঠিন, ধারণা করে জীবনে নিয়ে আসা আরও কঠিন। কিন্তু এই ভুল যেন আমাদের না হয়, সুখ-দুঃখ সবারই আসবে, ভালো লোক মন্দ লোক সবারই জীবনে আসবে আর অবতারদেরও আসবে। শ্রীরামচন্দ্র একজন অবতার তাঁর স্ত্রীকেই রাবণ অপহরণ করে নিয়েছে। কিন্তু তাঁরা যে জায়গাতে নিজেকে কেন্দ্রিত করে রেখেছেন, centre of gravity যেখানটা, জাগতিক কোন দুঃখ-কষ্ট বা জাগতিক সুখ কোনটাই ওই জায়গা থেকে তাঁদের টলিয়ে দিতে পারবে না। এই ভাবটাই গীতায় বলছেন *আপূর্যমাণচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রাপঃ প্রবশন্তি যদ্বৎ*, জলরাশিতে পরিপূর্ণ সমুদ্রে কত নদী, খাল, নর্দমার জল এসে প্রবেশ করছে, কিন্তু সমুদ্রকে দেখে বোঝাই যায় না, সমুদ্রে কোন ক্ষোভণ হয় না।

আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণা করা অসম্ভব। তাই আমরা একজন ইষ্টকে মেনে চলি, তিনি যেই হন, কালী হন, কৃষ্ণ হন। আমাদের প্রথম ভাব হল আমি মা কালীর ভক্ত, আমি কৃষ্ণের ভক্ত আমার আবার কিসের কষ্ট! আমি এই শ্লোকটি নিয়মিত পাঠ করে যাচ্ছি আর মাথায় আছে আমি শিবের ভক্ত আমার কোন কষ্ট হবে না। এরপর আমার হয়ত সত্যি সত্যিই কোন কষ্ট এল, তখন আমি কি করব? কিছুই করতে হবে না, এই মন্ত্রটাই নিয়মিত পাঠ করে যেতে হবে। তখন দুটো বাস্তবতা, একটা হল কল্পনার বাস্তবিকতা, আমাদের কাছে কল্পনার বাস্তবিকতা হলেন ঈশ্বর আর আসল বাস্তবিকতা হল এই জগৎ। তখন এই প্রার্থনা করতে করতে কোন এক সময় আমার প্রকৃতিটা পাল্টে যাবে, যেটা কল্পনা ছিল সেটা বাস্তব হয়ে যাবে আর যেটা বাস্তব ছিল সেটা কল্পনা হয়ে যাবে। তখন ভেতর থেকেই শক্তির যোগান আসতে শুরু হয়ে যাবে, ভেতর থেকে শক্তি এলে তখন এই ভাবটা দৃঢ় হয়ে যায় – এটাও তাঁরই ইচ্ছা। ইদানিং ঈশ্বর বিশ্বাসী, যাঁরা ধর্মীয় জীবন-যাপন করেন, তাঁদের উপর অনেক লেখালেখি হচ্ছে। দেখা যায় যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, ধর্মে যাঁদের আস্থা আছে তাঁদের জীবনে সব সময় একটা শান্তির বাতাবরণ তৈরী হয়ে যায়, তদুপরি সব কিছু মেনে নেওয়ার একটা শক্তি চলে আসে। শান্তি মানেও তাই, সব কিছুকে গ্রহণ করে নেওয়ার ক্ষমতা।

এটা আজ প্রমাণিত যে যাঁদেরই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস আছে আর ধর্মকে আধার করে যাদের জীবনে চলে তাঁদের জীবনে অনেক শান্তি, এতে সন্দেহ করার কিছু নেই। প্রথমে তাঁরা বলেন, আমার তো ঠাকুর আছে তাই আমার কষ্টের কিছু নেই। কষ্ট যখন সত্যিই আসে তখন বলে আহা! ঠাকুর তুমি থাকতে আমার এমনটি হল! তৃতীয় ধাপে এই ভাবটাই আসে, তিনি ইচ্ছাময়ী বা ইচ্ছাময়, তাঁর কার্য কী বোঝা যায়! এর আগেও কয়েকবার আমরা বলেছি যে, acceptance is spirituality, যেমনটি আছে তাকে তেমনটি গ্রহণ করে নেওয়াই আধ্যাত্মিকতা। ভালো যা কিছু আসছে সেটাও গ্রহণ করে নিচ্ছেন, মন্দ যা কিছু আসছে সেটাও গ্রহণ করে নিচ্ছেন। শ্রীশ্রীমা বলছেন – কারও দোষ দেখো না, শ্রীশ্রীমায়ের এই কথাতেও গ্রহণের কথাই বলা হচ্ছে। যখন বলছেন সবাই ঈশ্বরের সন্তান, তখন আপনি কাকে প্রত্যাহার করবেন? আর কী করেই বা প্রত্যাহার করবেন! আর যদি অদ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেন তাহলে আপনিই তো সব কিছু হয়েছেন। আপনি নিজেকে কী করে প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন, প্রশ্নই উঠবে না। ঠাকুর বলছেন – নারী শরীরে কী আছে! হাড়, মাংস, রক্ত, মল, মুত্র। একজন যুবক আর একজন যুবতীর মধ্যে যখন প্রেম ভালোবাসা হয় তখন একজন একজনের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। সেখানে একজন জ্ঞানী দেখছেন ওই যুবতীর শরীরে শুধু হাড় মাংসই আছে, ভেতরে চর্বি আর মল-মুত্র। মা ছেলেকে কোলে নিয়ে আছে, মা জানে ছেলে এই প্রস্রাব করে দেবে, এক্ষুণি হয়ত মল-মুত্র বিসর্জন করে দেবে বা নাক দিয়ে সিকনি বেরোবে, তাতেও মায়ের আনন্দ। শিশু যখন হাসে তখন মায়ের মুখেও

হাসি, শিশু কাঁদছে মাও কাঁদছে। এটাই অদ্বৈতের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত। স্বামীজীই অদ্বৈতের ব্যবহারিক প্রয়োগের শিক্ষা দিয়েছেন, শত মুখে তুমিই খাচ্ছ, শত মুখে তুমিই হাসছ, শত মুখে তুমিই কাঁদছ। কেউ কোন দিন এর অনুশীলন করল না, অথচ স্বামীজী নিজের জীবন দিয়ে এটাই করে দেখিয়ে দিলেন।

মা আর সন্তান, সন্তানতো মায়েরই অঙ্গ, মায়ের শরীরেই তো ছিল। মায়ের শরীর থেকে মায়েরই আরেকটি শরীর বেরিয়ে এখন আলাদা ব্যক্তি সত্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। মা আর সন্তানে কোন তফাৎ নেই, সত্যিই কোন তফাৎ থাকে না। উপনিষদের মতে সচ্চিদানন্দ থেকেই জগৎ বেরিয়েছে, আমাদের সবারই বাস্তব সত্তা হল আমরা সবাই পূর্ণব্রহ্ম। আমি যদি পূর্ণব্রহ্মই তাহলে জগৎ আমার থেকেই বেরিয়েছে। সন্ন্যাসীদের এটাই ব্রত – *মত্তঃ সর্বং প্রবর্তন্তে*, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার থেকেই বেরিয়েছে। সেইজন্য বলছেন *অভয়ং সর্বভূতেভ্যঃ*, সন্ন্যাসীকে তাই সবাইকে অভয় দিতে হবে, সাপ, বিছে থেকে শুরু করে সমস্ত প্রাণীকে অভয় দিতে হবে। সন্ন্যাসীর কোন অধিকারই নেই কারুকে মারার, কারণ সন্ন্যাসীর থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি। মা আর সন্তান এই দুজনের সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তিত্ব কিন্তু একই সাথে দুজনেই একত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় আছে। যিনি অদ্বৈত জ্ঞানের অনুশীলন করেন, তিনি জানেন আমি আর তিনি আলাদা, কিন্তু আবার আমি আর তিনি এক। তার যে কান্না আমার কান্না, তার যে হাসি আমারই হাসি, এটাই বাস্তব। ভারতে অদ্বৈতকে কখনই এই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি, যেটা স্বামীজী মনে প্রাণে করতে চেয়েছিলেন। তোমার কান্না আমার কান্না, তোমার হাসি আমার হাসি, এটাই তো acceptance। শ্রীশ্রীমা যে বলছেন, কারও দোষ দেখো না, কী করে দোষ দেখবে! সেতো আপনারই সৃষ্টি, আপনার থেকেই বেরিয়েছে। এটাই আমাদের ঐতিহ্যে খুব উচ্চমানের আধ্যাত্মিক সত্য।

জ্ঞানী কী করেন? উনি বলেন – আমি অত ঝামেলায় যাবো না, জগতের সব কিছুর সম্পর্ককে নেতি নেতি করে কমিয়ে আগে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। নেতি নেতি পদ্ধতিতে কোথাও যেন একটা গোলমাল আছে কারণ নেতি নেতি ভাব আমাদের পরম্পরার মূল আধ্যাত্মিকতার ধারণার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, acceptanceকেই নেতি নেতিতে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সব কিছুকে গ্রহণ করার reality এর এক ধাপ নীচে যাঁরা ঈশ্বরকে মানছেন, আর বলছেন তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে, জীবনটাও তাঁর মৃত্যুটাও তাঁর, হাসিটাও তাঁর দেওয়া, কান্নাটাও তাঁর দেওয়া। ঈশ্বরকে ভালোবাসলে তিনি যেটা দেবেন সেটাই গ্রহণ করে নিতে হব, জীবন দিলে জীবন নেব, মৃত্যু দিলে সেটাও নেব, এই উচ্চ ভাবকে ধরে আমাদের মত সাধারণ মানুষ জীবন চালাতে পারে না। যাঁদের মধ্যে একটু চৈতন্য জেগে যায় তাঁরা আর কোথাও নড়াচড়া করতে চান না, কিন্তু আমাদের মত পাঁচজন লোক যদি তাঁর কাছে এসে যায় তিনি তাঁদের আশ্রয় দেন। এই কথাই বলছেন *ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি*।

রামকৃষ্ণ মিশনের এত সুনামের পেছনেও এই ভাবটাই কাজ করে যাচ্ছে। ধনী, দরিদ্র, সুস্থ, অসুস্থ, কারুর চোখে জল, কারুর পেটে অন্ন নেই, কারুর মুখে হাসি নেই, সবাই কত দূর দূর থেকে কত কষ্ট করে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমগুলিতে ছুটে আসছেন। ওরা জানে ঠাকুর হলেন পরম আশ্রয়, গীতাতেও বারবার বলছেন আমি হলাম *পরম নিধানম্*, আমি হলাম সবার শেষ আশ্রয়। মঠের সাধুরা আবার ঠাকুরের শরণাগত হয়ে রয়েছেন, লোকেরা তাই সাধুদের কাছে ছুটে যায়। সাধুরা হয়ত সেভাবে সবাইকে আশ্রয় দিতে পারছেন না, কিন্তু তারা জানে এখানে একটু ছায়া পাওয়া যাবে, যে ছায়ার তলায় দাঁড়িয়ে শান্তি অনুভব করা যাবে। চণ্ডী আমাদের এই কথাই বলে দিচ্ছে। আমরা মনে করি চণ্ডী মানে শুধু মারামারি কাটাকাটি, তারপর স্তুতি, প্রার্থনা এই সব, কিন্তু একেবারেই তা নয়। আমাদের যত শাস্ত্র আছে, মহাভারত হোক, রামায়ণ হোক, পুরাণ হোক সবাই বড় বড় কাহিনী বলে যাবে, কিন্তু থেকে থেকে গভীর তত্ত্বে ঢুকে যাবে। শুধুই যদি কাহিনী বলে যেত তাহলে এগুলো কোন দিন আর শাস্ত্র হতে পারত না। হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দুরা এইসব স্তোত্র, মন্ত্র আবৃত্তি করে যাচ্ছে, কিছু না হলে এমনি এমনি তো করতেন না। এই কথা বলার পর বলছেন –

এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য
ধর্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্।
রূপৈরনেকৈর্বহুধাত্মমূর্তিং
কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা।।৩০

মা! এই যে তুমি নিজের স্বরূপকে নানা রূপে বিভক্ত করে অসুরের সংহার করলে, এই কাজ তোমা ছাড়া আর কে পারবে! সত্যিই তাই, ঈশ্বর ছাড়া নিজের স্বরূপকে বিভিন্ন রূপে বিভক্ত করে দেওয়ার ক্ষমতা আর কার আছে! একমাত্র ঈশ্বরই পারেন। অর্জুন মহাশক্তিশালী হতে পারেন, সব যুদ্ধে জয়ী হাতে পারবেন কিন্তু এক অর্জুন দশটা অর্জুন হয়ে কোন দিন যুদ্ধ করতে পারবে না। মহাভারতে এক জায়গায় বর্ণনা আছে, যুদ্ধে অর্জুন বিদ্যুতের গতিতে, চকিতে এমন যুদ্ধ করছিলেন মনে হচ্ছিল যেন তিনি এক সঙ্গে দশ জায়গায় আছেন। কিন্তু সেখানে 'যেন' বলা হচ্ছে। মায়ের ক্ষেত্রে যেন নেই, মা সত্যিকারের দশ জায়গায় আছেন, আর দশটা বিভিন্ন রূপে আছেন। এই ক্ষমতা একমাত্র ঈশ্বরই দেখাতে পারেন, ঈশ্বর ছাড়া অন্য কেউ পারবে না। যদিও যোগশাস্ত্রে বর্ণনা আছে আর পরম্পরাতেও শোনা যায়, যোগীদের ব্যূহকায় বা কায়ব্যূহ হওয়ার ক্ষমতা থাকে। ব্যূহকায় মানে যোগী নিজের সঞ্চিত কর্মকে ক্ষয় করার জন্য নিজেরই একাধিক শরীর দাঁড় করিয়ে দিয়ে কর্মগুলি ক্ষয় করিয়ে দেন। কিন্তু অনায়াসে নিজের শরীরকেই পঁচিশ খানা শরীর করে নিলেন আর পঁচিশ জায়গায় শত্রু বধ করে যাচ্ছেন, এই জিনিষ একমাত্র মায়ের পক্ষেই সম্ভব।

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-
স্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্তেঽতিমহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্।।৩১

জগতে যত রকমের বিদ্যা আছে, তা পরা বিদ্যাই হোক আর অপরা বিদ্যাই হোক, অপরা বিদ্যাতে আবার যে কোন বিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা থেকে শুরু করে এ্যটমিক বিদ্যা পর্যন্ত, অন্য দিকে নৃত্যকলার বিদ্যা, সঙ্গীতকলা বিদ্যার মত যত বিদ্যার শাখা আছে, সব বিদ্যাই হল মায়েরই বর্ণনা। কারণ মা ছাড়া তো কিছু নেই কিনা। মায়ের দুটি রূপ, একটি অখণ্ড রূপ আর দ্বিতীয়টি এই জগৎ রূপ – অর্থাৎ একটি অদ্বৈত রূপ আরেকটি লীলারূপ। ঠাকুরও বলছেন যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। আমাদের যদি বলা হয় ভগবানের নিত্য আর লীলাকে বৃহৎ ভাবে শ্রেণীবিন্যাস করে বর্ণনা করতে হয় তাহলে কত রকম শাস্ত্র লাগবে? মাত্র দু রকমের শাস্ত্র লাগবে – পরা বিদ্যা আর অপরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যার আবার দুটো ভাগ হয়ে যাবে – অপরা বিদ্যার একটাতে শুধু ঈশ্বরীয় কথা বলা হয়। ঈশ্বরীয় কথা যেহেতু বলা হচ্ছে তাই একে বলা হয় শাস্ত্র। যেমন মনুস্মৃতি ঈশ্বরীয় কথা বলছে কিন্তু পরা বিদ্যা নয়, আবার অন্য দিকে মনুস্মৃতি ধনুর্বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, সঙ্গীত বিদ্যার মতও নয়। তাই তিন রকমের বিদ্যা হয়ে যাচ্ছে – একটা হল পরা বিদ্যা, যে বিদ্যা ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে নিয়ে চলে যায়, দ্বিতীয় হল যাঁরা ঈশ্বরীয় কথা বলছেন কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের জ্ঞান পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে না। তৃতীয় হল যাঁরা পুরোপুরি জগৎ লীলাকে বর্ণনা করছেন। এই তিন রকমের বিদ্যার কথাই এখানে বলছেন, *বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপেষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা*।

প্রথমে বলছেন *বিদ্যাসু*, মানে পরা ও অপরা বিদ্যা, দ্বিতীয় বলছেন *শাস্ত্রেষু বিবেকদীপেষু*, যে শাস্ত্রের দ্বারা জ্ঞান, বিবেক জাগ্রত হয়, জ্ঞান মানে ঈশ্বরীয় জ্ঞান। শাস্ত্র শব্দের সংজ্ঞাতেই বলা হয়, যে গ্রন্থের দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে ব্যাখ্যা করা হয় সেই গ্রন্থকেই শাস্ত্র বলা হয়। কিন্তু তারপরেই বলছেন *আদ্যেষু বাক্যেষু*, মানে আদি বাক্য, আদি বাক্য হল বেদ। বেদ বললে আবার বেদের অনেক রকম বিদ্যা এসে যাবে, কিন্তু এখানে বেদের পরা বিদ্যার অংশকে বোঝাচ্ছে। যেখানেই শব্দের ব্যাপার আছে সেখানেই বিদ্যার ব্যাপার জড়িয়ে থাকবে, শব্দকে আবার আমরা মোটামুটি তিনটে শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি – লীলা, শাস্ত্র আর আদিবাক্য। আদিবাক্য মানে যেখানে বলছেন তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি বা প্রজ্ঞানাং ব্রহ্ম, বেদে এই ধরণের যে মহাবাক্য গুলি আছে, যে বাক্য দিয়ে স্বরূপকে বা অক্ষরকে জানা যায় তাকে বলছেন আদিবাক্য। এই বাক্যগুলোকে রক্ষা করার জন্যই পুরো বেদ দাঁড়িয়ে আছে। বেদে তাই দুই রকমের কথা এসে যায়, প্রথমে আসছে আদিবাক্য, দ্বিতীয় আসছে বেদে অন্যান্য যে অন্য ধরণের কথা আছে, যেগুলোকে পুরাণাদি শাস্ত্রে আরও বিস্তৃত করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শেষে আসে লীলার বর্ণনা, যেখানে ধনুর্বিদ্যা, অশ্ববিদ্যা, গজবিদ্যা এই জিনিষগুলিকে বর্ণনা করা হয়েছে। যত রকমের বিদ্যা আছে, যত রকমের শাস্ত্র আছে, যত রকমের বেদ আর যত রকমের আদিবাক্য আছে সব কিছু কি বলছে? *কা ত্বদন্যা*, তোমাকে ছাড়া আর কার কথা বলবে!

স্বামীজী সেইজন্য বলছেন – There is nothing secular in India, secular হল খ্রিশ্চান শব্দ, যার অর্থ হল ঈশ্বরের জ্ঞান একদিকে আর জগতের জ্ঞান আরেক দিকে। খ্রিশ্চানদের মতে ঈশ্বরের জ্ঞান আর জগতের জ্ঞান পুরোপুরি আলাদা, এই দুটো জ্ঞানে কখন মিল হয় না। ঈশ্বরের জ্ঞান হল spirutality আর জগতের জ্ঞান হল secular। কিন্তু স্বামীজী বলে দিলেন there is nothing secular in India। আমাদের কাছে জাগতিক বলে কিছু নেই, কারণ নিত্য আর লীলাই আছে, নিত্য যেমন spirituality লীলাও spirituality। কারণ জগতটা তো তাঁর বাইরে নয়। খ্রিশ্চানদের যাঁরা চিন্তাবিদ ছিলেন তাঁরাও এই কথাই বলতেন, কিন্তু সাধারণ জনগণ জিনিষটা কোন দিন বুঝতে পারেনি আর বুঝতে পারেনি বলে অনুশীলনও কোন দিন করেনি। আমাদের কাছে সবটাই আধ্যাত্মিকতা। আমাদের যত বড় বড় বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ বা ভেষজবিদরা ছিলেন তাঁরা সবাই নিজের কাজ করে যাচ্ছেন, কিন্তু জানতেন আধ্যাত্মিকতার বাইরে কিছু নেই। এনারা একদিকে যেমন নিজের নিজের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী ছিলেন অন্য দিকে প্রত্যেকই বড় ঋষি ছিলেন। ঠিক তেমনি বাল্মীকির মত আমাদের যত বড় বড় কবিরা ছিলেন, তাঁরা একদিকে কবি অন্য দিকে প্রত্যেকেই এক একজন ঋষি। তার মানে তাঁদের কাছে ঈশ্বরের বাইরে কিছু নেই।

আর বলছেন, *মমত্বগর্তেঽতিমহান্ধকারে বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্*, মমত্বরূপী যে সংসার গহ্বর, যেখানে শুধু অজ্ঞানময় অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই, সেখানে মানুষকে যে নিরন্তর কলের পুতুলের মত ভ্রমণ করিয়ে যাচ্ছে সেটাও তুমি ছাড়া আর কে ঘোরাতে পারবে! অজ্ঞান বা অবিদ্যা থেকে জন্ম নেয় কাম, কাম থেকে তৈরী হয় কর্ম। কর্ম থেকে আবার অবিদ্যার জন্ম, সেই অবিদ্যা থেকে আবার কাম, সেই কাম থেকে কর্ম, কর্ম থেকে আবার অবিদ্যা, এইভাবে অনন্ত কাল চক্রাকারে ঘুরতেই থাকে। আমরা যত রকমের কাজ করছি, সব কাজের পেছনে একটাই শক্তি, সেই শক্তিকে বলে কাম বা কামনা। কামনা মানে? আমি অপূর্ণ আমি পূর্ণ হতে চাই। কাউকে যখন ভালোবাসতে চাই, তখন বলি আমি অপূর্ণ ওকে ভালোবাসলে আমি পূর্ণ হব। গাড়ি কেনার আগে ভাবছে, আমার গাড়ি নেই, একটা গাড়ি হয়ে গেলে আমি পূর্ণ হয়ে যাব। আমার টাকা নেই, টাকা হয়ে গেলে আমি পূর্ণ হয়ে যাব। কামনা মানেই হয় কোথাও আমার অভাব বোধ বা অপূর্ণতার বোধ। এই অভাব বোধ কোথা থেকে আসে? অবিদ্যা বা অজ্ঞান থেকে। আমি যে সেই পূর্ণব্রহ্ম, আমি যে সেই শুদ্ধ আত্মা, আমার এই আসল স্বরূপকে ভুলে যাওয়াটাই অবিদ্যা। পূর্ণব্রহ্মের উপর একটা অজ্ঞানের আবরণ এসে যায়। আবরণ এসে যাওয়া হল, যাঁর মধ্যে শুদ্ধ জ্ঞান, যাঁর ভেতর অনন্ত শক্তি তাঁর প্রথমে আসে অহংতা, সাংখ্য যাকে বলছে অহঙ্কার, সহজ করে বললে আমি বোধ, আমি আছি এই বোধ। সচ্চিদানন্দই আছেন, তিনি ছাড়া কিছু নেই, তিনি সর্বদা আত্মারাম। কিন্তু কীভাবে একটা রহস্যজনক পদ্ধতিতে তাঁর উপর একটা আবরণ এসে যায়। আবরণ এসে যাওয়ার ফলে তিনি আত্মারাম থেকে হয়ে যান আমি। সহজ ভাষায় বলে অহং ব্রহ্মাস্মি থেকে হয়ে যায় অহম্ অস্মি, আমি আছি। আমি এসে গেলে তুমিও এসে যাবে। আমি কখনই তুমি ছাড়া হয় না।

সেইজন্য আচার্য শঙ্কর বলছেন, *যুস্মদ্ অস্মদ্ প্রত্যয় গোচর*, যুস্মদ্ হল জগৎ, জগৎ মানে তুমি আর অস্মদ্ মানে আমি। আর কি? বিষয় বিষয়ী রূপ, জগৎ বিষয় আমি বিষয়ী। বিষয় বিষয়ীর সম্পর্ক চিরন্তন। যেমনি আমি আছি এই বোধ এসে গেল তখনই সে জগৎ থেকে আলাদা হয়ে গেল, তখন বিষয়ও এসে যাবে। যখন বিষয় থাকবে না, তখন বিষয় বানিয়ে নেবে। আপনি দিব্যি আছেন, দেখলেন পাশের বাড়িতে নতুন গাড়ি কেনা হয়েছে। আপনার তো বিষয়ও নেই বিষয়ের সঙ্গে একাত্মতাও নেই, পাশের বাড়ি গাড়ি কিনল এবার আপনি বিষয় তৈরী করে নেবেন। কি বিষয়? আমাকেও একটা গাড়ি কিনতে হবে। একটা গাড়ি কিনে নিলেন, বিষয়ের সাথে আপনার একাত্ম হয়ে গেল। শুদ্ধ সচ্চিদানন্দে ঠিক একই জিনিষ হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঠিক এই বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি একা আছেন, ওঁর বোধ হয়ে গেল আমি একা আছি। আমি একা থাকলে কি করে চলবে, *একোহম্ বহুস্যাম্ প্রজায়ামি*, আমি এক আমি বহু হব। বিষয় যদি না থাকে বিষয়ী একা কী করবে! যে বাবুর বাড়ি নেই, বাগান নেই সেই বাবু কিসের বাবু! বাবুর তো বাগানবাড়ি চাই, বাগানবাড়ি না থাকলে তৈরী করে নেবে। আপনাকে গাড়ি কিনতে হলে পরিশ্রম করে টাকা উপার্জন করে টাকা জমিয়ে গাড়ি কিনবেন। ভগবানকে খাটতে হয় না, তাঁর ইচ্ছা মাত্রেই সৃষ্টি হয়ে যায়। অহংতা ছিল, এবার মমতা এসে গেল। মমতা মানে, এটা আমার। অহংতাতে আগে

নিজেকে নিয়েই সামলাতে পারছিলেন না। মমতা মানে বাইরের বিষয়ের সাথে একাত্ম বোধ। এই একাত্ম বোধকেই গীতায় ভগবান বলছেন *অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ*। অসক্তি, নিজের প্রতি, নিজের যে শরীর মনের প্রতি যে আসক্তি, এর থেকে অনাসক্ত হওয়া, আর বাইরে যত বিষয় আছে তার প্রতি যে আপনার আসক্তি, সেই আসক্তিকে ত্যাগ করা। প্রথমটা অহংতা আর দ্বিতীয়টাকে বলে মমতা। সংস্কৃতে মম মানে আমার, মমতা মানে আমি ও আমার বোধ। আমার বোধ চলে গেলে জ্ঞানী হয়ে যাবেন বা ত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন আর আমি বোধ যখন চলে গেল তখন আপনি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে গেলেন।

রামচরিতমানসে সন্ত তুলসীদাস খুব সুন্দর বলছেন, যে কথা ঠাকুর কথামৃতেও বলছেন। অজ্ঞান কী? তুলসীদাস বলছেন ম্যায় ঔর মোরা। আর জ্ঞান কী? তুম্ ঔর তেরা। আমি আর আমার এটাই অজ্ঞান, তুমি আর তোমার এটাই জ্ঞান। তুমিই আছ আর জগৎ তোমার এটাই জ্ঞান। আমি আর আমার এই যে অজ্ঞান, এই অজ্ঞান কোথা থেকে আসছে? সেই আদি থেকে আসছে। এই অজ্ঞান যেটা আসছে সেটাও তাঁরই জ্ঞান শক্তিতে আসছে, এটা খারাপ কিছু না। আমি আর আমার এটাও জ্ঞানেরই একটা রূপ, যেখানে বলছেন যিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, যিনি আত্মারাম, তিনিই আত্মারাম থেকে আত্মা বোধে আমি বোধে এসে যান। কেন আসে, কিভাবে আসে, কতদিনে আসে? এইসব প্রশ্নের কোন উত্তর হয় না। যখন আমি বোধ এসে গেল, তখন মনে করেন একা থেকে কি হবে! তাই তাঁকে বহু হতে হয়। বহু কোথা থেকে হবে? তিনি ছাড়া তো কিছুই নেই, তিনিই নিজেকে বহু রূপে সৃষ্টি করেন। তাহলে তিনি আর তাঁর সৃষ্টি কী আলাদা? কী করে আলাদা হবে! তিনিই তো আছেন, তাঁর বাইরে তো কিছু নেই, সৃষ্টিটাও তাই তাঁর থেকেই হতে হবে। তাহলে শ্রীকৃষ্ণ আর গোপীরা কী কখন আলাদা? যিনি কৃষ্ণ তিনিই গোপী। এরপর চীরহরণ নিয়ে কিসের নিন্দা করা হবে আর রাসলীলাকে নিয়ে কিসের এত নিন্দা হবে! এই জিনিষগুলো বোঝা বা ধারণা করা খুব কঠিন, কিন্তু এটাই একমাত্র সত্য – যিনি কৃষ্ণ তিনিই গোপী। তাহলে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের চীরহরণ করছেন এতে আপত্তি কোথায়!

যিনি ভগবান তিনিই সৃষ্টি। সৃষ্টি যদি জন্মায় আর সৃষ্টি যদি নাশ হয়ে যায় তাহলে আপত্তি কোথায়! সমস্যা হল সেই আদিম অজ্ঞান থেকে নামতে নামতে যখন আমাদের স্তরে এসে পৌঁছাচ্ছি তখন আমরা সম্পূর্ণ ভুলে গেছি আমরা কে, আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি। হাওড়া থেকে দিল্লী যাচ্ছি, ট্রেন যত দিল্লীর দিকে এগোতে থাকে তত মাথা থেকে হাওড়ার কথা নেমে যেতে থাকে। মোগলসরাই পেরিয়ে যাওয়ার পর হাওড়ার কথা মাথা থেকে পুরো নেমে গেছে। যতক্ষণে দিল্লী পৌঁছাচ্ছি ততক্ষণে ভুলেই যাচ্ছি আমি হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে উঠেছিলাম, সেই ট্রেন ধানবাদ, মোগলসরাই ক্রস করেছিল, কিছুই আর মনে থাকবে না। তখন মাথায় শুধু দিল্লী দিল্লী। আর যেমনি বাড়ি ফেরার জন্য ট্রেনে চাপছি দিল্লীতে বসেই দিল্লীর কথা মাথা থেকে হাওয়া হয়ে গেছে। সাংসারিক জীবনে আর আধ্যাত্মিক জীবনে হুবহু এই ব্যাপারটাই হয়। আপনি যেমন যেমন সাংসারিক জীবনে এগোচ্ছেন তেমন তেমন আধ্যাত্মিক জীবনকে ভুলে যাবেন। কিন্তু যেদিন সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে আধ্যাত্মিক জীবনে ঘুরলেন তখন সংসার পড়ে থেকে যাবে, আপনাকে আর কেউ ফেরাতে পারবে না। তখনও আপনি সংসারেই আছেন, কিন্তু সংসার একদিকে পড়ে রইল, এটাই আধ্যাত্মিক যাত্রার সূচনা। সাংসারিক যাত্রা আর আধ্যাত্মিক যাত্রার এটাই পার্থক্য। সাংসারিক যাত্রা কেমন? *মমত্বগর্তেঽতিমহান্ধকারে*, মমতার গর্তে অতি অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছে। অহংতাকে মানুষ ছেড়ে দেয়, কিন্তু মমতাকে ছাড়া অসম্ভব, মা মরে যাবে কিন্তু তাও নিজের জীবনে দিয়ে সন্তানকে রক্ষা করবে। বাড়িতে কেউ মিষ্টি আনলে নিজে না খেয়ে চেষ্টা করে তার সন্তান যেন খেতে পায়। এই মমতা শুধু যে মায়ের সন্তানের প্রতি আছে তা নয়, সবারই কোন না কোন মানুষের প্রতি মমতা, কোন জিনিষের প্রতি মমতা থাকবেই।

এই মমতা কোথা থেকে আসে? *বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্*, এই পুরো বিশ্বকে যে বিভ্রম করে রাখার শক্তি, মমত্বগর্তে সবাইকে যে শক্তি বন্ বন্ করে ঘুরিয়ে যাচ্ছে, সেটা তোমারই শক্তি, তুমি ছাড়া কার এই শক্তি হবে! যখনই এই কথাগুলো আমরা কোথাও পড়ি বা কোথাও শুনি তখনই আমাদের মনে হয় মা কালীর মত একজন মহিলা উপরে কোথাও বসে আছেন, আর হঠাৎ তাঁর ইচ্ছা হল কোন লোকের উপর পর্দা ফেলে দিতে, সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে মায়া রূপ পর্দা পড়ে গেল। আবার হঠাৎ তাঁর ইচ্ছা হল এর মায়াকে সরিয়ে দিতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন পর্দা উঠাও, সাথে সাথে মায়া চলে গিয়ে জ্ঞান এসে গেল। আসলে এভাবে এগুলো

কিছুই হয় না। এই সহজ যুক্তিটা যদি চিন্তা ভাবনা করে একবার স্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে বাকি সব কিছুই স্পষ্ট হয়ে যাবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে আমাদের কাছে জগৎ পুরোপুরি সত্য। ঠাকুরের মত অবতাররা বা বড় বড় ঋষি-মুনিরা যখন সমাধির অবস্থায় চলে যাচ্ছেন তখন তাঁরা দেখছেন চৈতন্য সত্তা ছাড়া কিছু নেই। বেশির ভাগ সিদ্ধ পুরুষরা ঐ অবস্থায় অর্থাৎ নির্বিকল্প অবস্থায় যাওয়ার পর, ঠাকুর বলছেন একুশ দিন পর দেহটা খসে পড়ে যায়। কারণ তাঁরা ওই অবস্থা থেকে আর ফিরে আসেন না। শরীরে যদি খাদ্য-পানীয় না দেওয়া হয় তাহলে শরীর থাকবে কী করে, সেইজন্য দেহত্যাগ হয়ে যায়। কখন সখন কেউ কেউ ওই অবস্থা থেকে বাহ্য জগতে নেমে আসেন, তিনি যিশুই হন, বুদ্ধই হন আর ঠাকুরই হন। নেমে এসে তাঁরা দেখছেন পোকার মত মানুষ মমতার গহ্বরে মহা অন্ধকারে কিলবিল করে যাচ্ছে। মানুষের এই দুরবস্থা দেখে করুণায় এনাদের হৃদয় আর্দ্র হয়ে যায়, তাঁদের একমাত্র চেষ্টা এদের কী করে একটু আলো দিয়ে বাঁচানো যাবে! বাঁচানোর একটাই মাত্র পথ, পরমার্থ জ্ঞান। এদেরকে তাই পরমার্থ জ্ঞানের দিকে নিয়ে যেতে হবে।

উপনিষদ বলছে '*তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়*' যেটাকে জানলে মানুষ এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে অতিক্রম করে যায়, এছাড়া আর কোন বাঁচার পথ নেই। কিন্তু তখনও সমস্যা আসে, যিনি শুদ্ধ চৈতন্য সেখান থেকে এটা কী করে হল! ঠাকুরও এই প্রশ্ন তুলছেন, চৈতন্য থেকে এই স্থূল জগৎ কী করে হল? ঠাকুর তখন নিজেই এর উত্তর দিতে গিয়ে বলছেন, দেখো শুক্রাণু সেই তরল সূক্ষ্ম পদার্থ, সেখান থেকে কীভাবে হাড়-মাংস তৈরী হয়। ঠাকুর এটা উপমার জন্য বলছেন। এরপর অনেকে বলবেন, এর মধ্যে অনেকে জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালস্ আছে ইত্যাদি। চৈতন্য থেকে এই দৃশ্যমান জগতে আসতে তাকে কয়েকটা ধাপ পেরিয়ে আসতে হবে, এটা তো কোন ম্যাজিকের মত হতে পারে না। কোথাও না কোথাও তো শুদ্ধ চৈতন্যকে নিজেকে রূপান্তরিত করতে হবে, কেননা তিনি ছাড়া তো আর কিছু নেই। এই রূপান্তরকে ভক্তরা বলে তাঁর ইচ্ছা। খ্রিশ্চান, মুসলিম, বৈষ্ণব সবাই বলবে তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু যাঁরা ঘোর বেদান্তী তাঁরা বলেন তিনিই এই সব কিছু হয়েছেন। কেন তিনি এত কিছু হয়েছেন? তাঁর লীলাখেলা। কীভাবে এটা হয়? তিনি নিজের উপর একটা আবরণ দিয়ে দেন, কারণ তিনি জ্ঞানস্বরূপ কিনা। জ্ঞানেরই আরেকটি রূপ হল এককে বহু দেখানো। জ্ঞানর ধর্মই হল জ্ঞান কখন একত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকে কখন আবার বহুত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ঠিক যেন চাইনীজ লণ্ঠনের মত, একট সময় লাল আলো দিচ্ছে, অন্য সময় নীল আলো দিচ্ছে, কখন একসাথে তিন-চারটে আলো ঘুরছে আবার কখন একটা আলোই দিতে থাকে। কিন্তু জ্ঞান কেন একত্বে যায় আর কেনই বা বহুত্বে যায় আমরা কোন দিন এর উত্তর জানতে পারব না। বেদান্তীরা বলবেন, সচ্চিদানন্দ সচ্চিদানন্দই আছেন, যেভাবে আমরা সৃষ্টিকে দেখি সেভাবে তিনি কখনই হননি, তিনি কখন বহু হননি। চিন্তার জগতেই সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু পূর্ণ ব্রহ্মের উপর যেন একটা আবরণ এসে যায়। কিসের আবরণ? অজ্ঞানের আবরণ। যিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ তাঁর মধ্যে অজ্ঞান কোথা থেকে আর কীভাবেই বা আসবে! আমাদের বোঝানর জন্য অজ্ঞান শব্দটা বলা হয়। সেইজন্য অনেক দার্শনিকরা আপত্তি করেন বলে অজ্ঞান না বলে বলা হয় শক্তি। মায়া মানেই শক্তি। শক্তি যদি ঈশ্বরেরই শক্তি হয়, তাহলে তো আর কোন ছলনা হবে না।

একবার এক ব্রহ্মচারী মহারাজ একজন বরিষ্ঠ মহারাজকে জিজ্ঞেস করছেন 'ঠাকুরকে তাও অবতার বলে মানা যায়, কিন্তু শ্রীমা যে ভগবতী, এই জিনিষটা মাথায় ঢোকে না'। তখন মহারাজ সেই ব্রহ্মচারীকে বলছেন 'ঠাকুর অবতার এটা তুমি বুঝেছ তো'? 'হ্যাঁ বুঝেছি'। 'তাহলে তোমার কী মনে হয়, অবতার একজন ঘুঁটে কুড়ুনিকে বিয়ে করবেন? অবতারের সাথে যার বিয়ে হবে তাঁকেও তো সেই রকমই হতে হবে, যাকে তাকে তো তিনি বিয়ে করতে যাবেন না'। শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে ছিলেন তখন তিনি শ্রীরাধার মত মেয়ের যে ভালোবাসা সেই ভালোবাসা পেলেন, আর যখন রাজার মত হয়েছেন তখন রুক্মিণীর মত রূপসী মেয়ের সাথে বিয়ে হল। ঠাকুরও আগে থাকতেই বলে দিলেন রামচন্দ্রের ওখানে মেয়ে কুটো বাঁধা হয়ে আছে। সব ঠিক করা আছে, দরকার হলে নিজে তুলে নিয়ে আসবেন আর তা নাহলে কাউকে দিয়ে তুলিয়ে নেবেন। অবতারই যদি ঘুঁটে কুড়ুনি মেয়েকে বিয়ে না করেন, তাহলে বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দের কাছে অজ্ঞান কোথা থেকে আসবে! আমরা যখন মায়া বলছি, অজ্ঞান বলছি, শক্তি বলছি এগুলো শব্দ মাত্র। যিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ তাঁর মধ্যে কি কখন অজ্ঞান থাকতে পারে! আবরণ পড়ে গেল, এই কথাগুলো বোঝানর জন্য বলা হয়। এটা জ্ঞানেরই আরেকটি রূপ। তাহলে আমরা একত্বের বদলে

বহু দেখছি এটা কি সত্য? দুটোই সত্য, শুধু রূপের তফাৎ। দুটো রূপ কী করে হয়? শক্তিতে হয়। যে শক্তির কথা বলে দেওয়া হল, সেই শক্তিকে নিয়েই তারপর ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি, মায়াশক্তি কত রকম শব্দের পর শব্দ ব্যবহার শুরু হয়ে যাবে। জিনিষটা খুবই সহজ, বেশি কঠিন নয় – সচ্চিদানন্দই আছেন, কিন্তু কোন এক কারণে একত্ব বহুত্বে পাল্টে যায়। কি কারণে পাল্টে যায় আমাদের জানা নেই। কারণটা জানা নেই বলে আমরা অনেক নামে বলি, যেমন কখন এটাক শক্তি নামে বলছি। সেই শক্তিকে আমরা কালী বলি, দুর্গা বলি, মা বলি। কিন্তু ওই বহুত্ব হওয়ার জন্য সৃষ্টি ক্রমাগত এগিয়েই চলে যাচ্ছে, অহংতা মমতাতে ডুবে যাচ্ছে আর অহংতা যে কবে শেষ হয়ে মমতা এসে যাচ্ছে সেটাও হুঁশ থাকে না।

একদিকে মা! তুমি আদিবাক্য, বেদবাক্য তুমি, শাস্ত্র তুমি, বিদ্যা যা কিনা মানুষকে উপরের দিকে নিয়ে যায় সেটাও তুমি, আর অন্য দিকে মানুষ যে মমতার মহা অন্ধকার গহ্বরে ডুবে যাচ্ছে সেটাও তুমি, কারণ তোমা ছাড়া তো কিছু নেই। এইভাবে মায়ের গুণের বর্ণনা করার পর আবার গ্রন্থস্তুতি শুরু হয়ে যায়।

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্।।৩২

যেখানেই রাক্ষসদের মত প্রাণী আছে, যেখানেই ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ আছে, যেখানে শত্রু আছে, যেখানে দস্যু আছে, যেখানে দাবানল আছে আর যখন কেউ মাঝ দরিয়ায় কুল কিনারা হারিয়ে ফেলেছে, সব জায়গাতে সঙ্গে সঙ্গে থেকে মা এই বিশ্বকে রক্ষা করেন। দেখা যায় সমুদ্রে একটা জাহাজ কী করে ডুবে গিয়ে সবাই মারা গেল কিন্তু কি করে একজন বেঁচে গেছে। কারুরই তো বাঁচার কথা নয়, তাহলে এই লোকটি কী করে বেঁচে গেল? কোন একটা দৈবী শক্তি আছে বলেই বেঁচে গেছে। সব জায়গাতেই মা বিদ্যমান, সুতরাং মা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। এখানে এই শক্তিকে শুভ শক্তি রূপে বলছেন। যেখানে অশুভ শক্তি আছে সেখানেও দেখা যায় অশুভ শক্তির প্রভাব থেকে কোন ভাবে শুভ শক্তি বেঁচে বেরিয়ে আসে।

বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ।।৩৩

বিশ্বের বিভিন্ন রূপকে নিয়ে বলছেন – হে বিশ্বেশ্বরী! তুমিই বিশ্বকে পালন করছ, তুমি হলে বিশ্বরূপা। বিশ্বরূপা মানে এই সংসার বা জগৎ তাঁরই রূপ। ঈশ্বরের নাম যেমন বিশ্বরূপ ঠিক তেমন মায়ের নাম বিশ্বরূপা। তুমি বিশ্বরূপা তাই তুমি সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বকে ধারণ করে আছ। *বিশ্বেশবন্দ্যা*, ভগবান শিব আপনার বন্দনা করেন। শক্তির আরাধনা সবাইকেই করতে হয়। *বিশ্বাশ্রয় যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ*, যাঁরা ভক্তিযুক্ত ও বিনম্রতার সাথে তোমাকে বন্দনা করে বিশ্বকে আশ্রয় দেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের মধ্যেও এসে যায়। যাঁরা নিজের গর্ভধারিণীকে শ্রদ্ধা করেন তাঁরাই কত মহৎ হয়ে যান, সেখানে যাঁরা জগজ্জননীকে আরাধনা করেন তাঁরা কত মহৎ হয়ে যেতে পারেন ভেবে দেখুন। স্বামীজী তাই বারবার বলছেন, তোরা কেউ মাকে চিনতে পারলি না, মাকে আগে জানার চেষ্টা কর।

দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোহরিভীতেঃ
নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্।।৩৪

হে মা! তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্না হও। সদ্য যেভাবে তুমি অসুরকুলকে নাশ করে আমাদের রক্ষা করলে ঠিক সেইভাবে ভবিষ্যতেও সমস্ত রকম পাপ, শত্রুভয় থেকে আমাদের রক্ষা করবে। এই সংসার মায়েরই রূপ।

পাপ থেকে যে নানান রকমের উৎপাতাদির সৃষ্টি হয়, যার ফলস্বরূপ দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদির মত যে বিভিন্ন রকমের কষ্টভোগ করতে হয়, হে মা! তুমি আমাদের এগুলো থেকে রক্ষা কর।

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব।।৩৫

দেবতারা সব শেষে খুব আর্তি নিয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা করে বলছেন – হে মা! তুমি হলে *বিশ্বার্তিহারিণি*, তুমি হলে জগতের দুঃখনাশিনী দেবী! আমরা তোমার চরণে পড়ে আছি, আমাদের তুমি কৃপা কর, আমাদের প্রতি সদা প্রসন্না হও। তুমি ত্রিলোকের সবারই আরাধ্যা, তুমি পরমেশ্বরী, আমাদের সবাইকে তুমি বর প্রদান কর। এই হল চণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ের বিখ্যাত দেবীস্তুতি। দেবতাদের এখন কার্যোদ্ধার হয়ে গেছে। দেবতারা খুব ভক্তিবিনম্র চিত্তে মায়ের স্তুতি করার পর মা বলছেন –

দেব্যুবাচ।।৩৬
বরদাহং সুরগণা বরং যং মনসেচ্ছথ।
তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্।।৩৭

মা দেবতাদের বন্দনাতে প্রসন্না হয়ে বলছেন – আমি তোমাদের উপর প্রসন্না হয়েছি, তোমাদের কোন চিন্তা নেই। আমি তোমাদের বরদান করতে প্রস্তুত, তোমরা তোমাদের অভিলম্বিত বর প্রার্থনা কর, জগতের কল্যাণার্থে আমি সেই বর অবশ্যই প্রদান করব। তখন দেবতারা বলছেন –

দেবা ঊচুঃ।।৩৮
সর্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনম্।।৩৯

দেবতারা তখন জগতের ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য বর প্রার্থনা করে বলছেন – হে অখিলেশ্বরী! আপনার কাছে এই বর প্রার্থনা করছি যে, এর পরে পরে আমাদের যত শত্রুকুল তৈরী হবে এদের নাশ করবেন আর এইভাবে ত্রিভুবনের সমস্ত বিঘ্নের প্রশমন করবেন। তখন দেবী এক এক করে বলছেন ভবিষ্যতে কবে কবে কোন কোন পরিস্থিতিতে তিনি জগতে আবির্ভূতা হয়ে জগতের কল্যাণ সাধন করবেন। ভগবানকেও আশ্বাস দিতে হয়, যাতে তাঁর ভক্ত আস্বস্থ থাকে। পুরাণের একটা প্রথাই আছে, কোন কোন যুগে ভগবান কোন কোন অবতার রূপ ধারণ করে পৃথিবীর পাপের ভার হরণ করবে, তার বর্ণনা করা। যেমন কল্কি অবতারের কথা বলা হয়েছে। ঠাকুরও বলছেন একশ বছর পর আবার আসতে হবে। এই আশ্বাস দিয়ে রাখতে হয়। দেবীও দেবতাদের সেই আশ্বাস দিয়ে বলছেন তিনি আবার কবে কবে কি কি পরিস্থিতিতে আবির্ভূতা হবেন।

দেব্যুবাচ।।৪০
বৈবস্বতেহন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ।।৪১
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী।।৪২

হে দেবগণ! বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিতম যুগে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে অন্য দুই মহাসুরের জন্ম হবে। সেই সময় আমি নন্দগোপেদের গৃহে যশোদার গর্ভে জন্ম নিয়ে বিন্ধ্যাচলে গিয়ে বাস করব আর এই দুই মহাসুরকে বিনাশ করব। এখানে বোঝাই যাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলা হচ্ছে। এতেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ভাগবত কথা রচিত হওয়ার অনেক পরে চণ্ডী লেখা হয়েছে। যাঁরা গোড়া শাক্ত ভক্ত তাঁরা বলবেন – তা কেন হবে? মা ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন। আর ইতিহাসবিদরা যুক্তি দিয়ে দেখাবেন যিনি চণ্ডী রচনা করেছিলেন তিনি জানতেন কৃষ্ণকথা লোকমুখে আগেই ছড়িয়ে গেছে। এগুলো আর কিছুই না, যখন যাঁর স্তুতি করা হয় তখন তাঁকে অনেক

বড় করে দেখানোর জন্য এইভাবে বলতে হয়। যে যাকে ভালোবাসে এটা নিয়মই যে তাকে বড় করে দেখাতে হবে। তারপর বলছেন –

পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে।
অবতীর্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্তু দানবান্।।৪৩

ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিত্তান্ মহাসুরান্।
রক্তা দন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমীকুসুমোপমাঃ।।৪৪

ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্যলোকে চ মানবাঃ।
স্তুবন্তো ব্যহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাম্।।৪৫

এরপর আবার আমি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূতা হয়ে বৈপ্রচিত্ত নামে দানবের নাশ করব। সেই ভীষণ বৈপ্রচিত্ত মহাসুরদের আমি যখন ভক্ষণ করব তখন আমার দাঁতগুলো ডালিম ফুলের মত লাল হয়ে যাবে। সেইজন্য দেবতারা আর মানুষরা আমাকে স্তুতি করার সময় সর্বদা রক্তদন্তিকা বলে সম্বোধন করবে।

ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা।।৪৬

ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন্।
কীর্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাং ততঃ।।৪৭

তারপরে বলছেন, একবার পৃথিবীতে একশ বছর ধরে অনাবৃষ্টি হওয়ার জন্য প্রচণ্ড জলাভাব দেখা দেবে। মুনিরা সেই সময় আমার স্তব করবেন, তখন আমি অযোনিজা হয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূতা হব। তখন স্তবকারী মুনিদের আমি শত নেত্র দিয়ে অবলোকন করে মুনিদের কৃপা করব। সেইজন্য মানুষ আমাকে শতাক্ষী নামে আমার বন্দনা করবে।

ততোহহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ।।৪৮

শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।
তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।।৪৯

শতাক্ষী হয়ে যখন আবির্ভূতা হব তখন আমার নিজের শরীর থেকে প্রাণধারক বিভিন্ন শাকপাতার সৃষ্টি হবে, আমি সেই শাকপাতা দ্বারা জগতের ভরণপোষণ করব। যত দিন বৃষ্টি না হচ্ছে তত দিন এই শাকপাতাই জগতের সমস্ত প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করবে। এই কাজের জন্য জগতে আমি শাকম্ভরী নামে বিখ্যাত হব। এই অবতারেই দুর্গম নামে এক মহাসুরকেও বধ করব।

দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।
পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।।৫০

রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ।
তদা মাং মুনয়ঃ সর্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্তয়ঃ।।৫১

দুর্গম নামে মহাসুরকে বধ করার জন্য আমি আবার দুর্গাদেবী নামেও বিখ্যাত হব। তারপর যখন আমি ভীমরূপ ধারণ করে মুনিদের রক্ষার জন্য হিমালয়ে বসবাসকারী রাক্ষসদের ভক্ষণ করব, তখন হিমালয়ের মুনিরা সবাই ভক্তিনম্রচিত্তে আমার স্তুতি করবে।

ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।
যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি।।৫২

তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাহসংখ্যেয়ষট্পদম্।
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্।।৫৩
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্বতঃ।
ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।।৫৪
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।।৫৫
।।ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
দেব্যা স্তুতির্নাম একাদশোহধ্যায়।।

ভীমরূপ ধারণ করে মুনিদের রক্ষার্থে রাক্ষসদের ভক্ষণ করেছিলাম বলে সেই সময় আমি ভীমাদেবী এই নামে বিখ্যাত হব। যখন অরুণ নামে এক অসুর ত্রিভুবনে ভীষণ অত্যাচার শুরু করবে তখন ত্রিলোকের রক্ষার্থে ষট্পদবিশিষ্ট অসংখ্য ভ্রমরের রূপ ধারণ করে আমি সেই অত্যাচারী অসুরকে বধ করব। সেই সময় সর্বত্র ভ্রামরী নামে সবাই আমার স্তুতি করবে। এইভাবে যখন যখন সংসারে অসুরদের শক্তি বৃদ্ধি হবে, এদের অত্যাচারে যখন যখন জগতের স্থিতিশীলতা নষ্ট হবে তখন তখন এদেরকে নাশ করার জন্য আমি আবির্ভূতা হব। গীতাতে যেমন ভগবান বলছেন ধর্মের গ্লানি দূর করতে, সাধুদের পরিত্রাণ আর ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে আসি। এই ভাবটাই এখানে দেবী বলছেন *ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি*, জগতের ভারসাম্যকে যখন যখন কোন অশুভ শক্তি বিগড়ে দেবে তখন জগতের ভারসাম্য রক্ষার জন্য আমি আসতে থাকব। মা দেবতাদেরও মা আবার দানবদেরও মা, সবার প্রতি মায়ের সমান ভাব। কিন্তু কোন এক পক্ষ যদি বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে, এবং যার ফলে জগতের ভারসাম্য যদি ক্ষুণ্ন হয়ে যায় তখন মা আবির্ভূতা হয়ে দু চারজনকে বধ করে বা কাউকে বরদান করে শক্তিটা বাড়িয়ে দিয়ে জগতের ভারসাম্য আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

এরপর আসছে দ্বাদশ অধ্যায়। দ্বাদশ অধ্যায় পুরোপুরি গ্রন্থমহিমা। গ্রন্থমহিমা মানে এই চণ্ডী গ্রন্থ পাঠ করলে কি কি লাভ হবে তার বর্ণনা। এই অধ্যায়ে দেবী শুধু বলে যাচ্ছেন চণ্ডী পাঠ করলে কার কি হবে। এখানে ব্যাখ্যা করার কিছু নেই, শুধু এর মন্ত্রের অর্থ বলে দেওয়া হচ্ছে।

অথ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

(দেবী-চরিত্রের পাঠ মাহাত্ম্য)

দেব্যুবাচ।।১

এভিঃ স্তবৈশ্চ মাং নিত্যং স্তোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ।
তস্যাহং সকলাং বাধাং নাশয়িষ্যাম্যসংশয়ম্।।২

দেবী দেবতাদের বলছেন – হে দেবগণ! প্রতিদিন একাগ্র চিত্তে যারা চণ্ডীগ্রন্থের আমার স্তুতিযুক্ত স্তব পাঠ করবে তাদের সমস্ত বাধাবিপত্তি আমি অবশ্যই দূর করব।

মধুকৈটভনাশঞ্চ মহিষাসুরঘাতনম্।
কীর্তয়িষ্যন্তি যে তদ্বদ্ বধং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।।৩

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং নবম্যাঞ্চৈকচেতসঃ।
শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্যমুত্তমম্।।৪

ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ।
ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্।।৫

শক্রুতো ন ভয়ং তস্য দস্যুতো বা ন রাজতঃ।
ন শস্ত্রানলতোয়ৌঘাৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি।।৬

তস্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ।
শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ।।৭

অষ্টমী, চতুর্দশী এবং নবমী তিথিতে যে ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে ভক্তি সহকারে মধুকৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ এবং শুম্ভ ও নিশুম্ভ বধের কাহিনীতে আমার এই উত্তম মাহাত্ম্য পাঠ করবে বা শ্রবণ করবে, সেই ব্যক্তিকে কোন পাপই আর স্পর্শ করতে পারবে না, পাপজনিত কোন বিপদ-আপদও তার আসবে না। ভবিষ্যতে সে কখন দারিদ্রতার মুখ দেখবে না আর প্রিয়বিয়োগজনিত কোন শোকতাপ তাকে দগ্ধ করতে পারবে না। আর শুধু তাই না, শক্রু, দস্যু, রাজা, শস্ত্র, অগ্নি ও বন্যা জনিত কোনও বিপদের ভয় কখনও তার হবে না। সেইজন্য আমার এই কীর্তি কথা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ভক্তির সাথে এক মনে পাঠ করা বা শ্রবণ করা উচিৎ।

উপসর্গানশেষাংস্তু মহামারীসমুদ্ভবান্
তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েন্মম।।৮

যত্রৈতৎ পঠ্যতে সম্যঙ্ নিত্যমায়তনে মম।
সদা ন তদ্‌বিমোক্ষ্যামি সান্নিধ্যং তত্র মে স্থিতম্।।৯

দেবী বলছেন – আমার এই মাহাত্ম্য বর্ণিত চণ্ডীপাঠ মহামারীজনিত সমস্ত উপদ্রব এবং আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ উৎপাত নিবারণ করে। যে গৃহে আমার এই মাহাত্ম্য কথা বিধিপূর্বক প্রতিদিন পাঠ করা হয়, সেই গৃহে আমি নিত্য অধিষ্ঠিত থাকি।

বলিপ্রদানে পূজায়ামগ্নিকার্যে মহোৎসবে।
সর্বং মমৈতচ্চরিতমুচ্চার্যং শ্রাব্যমেব চ।।১০

জানতাজানতা বাপি বলিপূজাং তথা কৃতাম্।
প্রতীচ্ছিষ্যাম্যহং প্রীত্যা বহ্নিহোমং তথা কৃতম্।।১১

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ।।১২

সর্ববাধাবিনির্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।।১৩

বলিদান, পূজা, হোম, মহোৎসব এই সব শুভ অনুষ্ঠানে বা কোন শুভদিনে আমার এই চরিতকথা সম্পূর্ণ রূপে পাঠ ও শ্রবণ করা কর্ত্যব। আমার মাহাত্ম্য পাঠ করার পরেও যদি মানুষ বিধি মেনে বা না জেনেও আমার উদ্দেশ্যে বলিদান, পূজা বা যজ্ঞাদি যা কিছু করবে, আমি অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে তা গ্রহণ করি। শরৎকালের বাৎসরিক মহাপূজায় যে আমার এই মাহাত্ম্য কথা ভক্তিকথা ভক্তিযুক্ত চিত্তে শ্রবণ করে, আমার কৃপায় সে সকল আপদ বিপদ থেকে মুক্ত হবে আর ধন, ধান্য ও পুত্রাদি লাভে করবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রুত্বা মমৈতন্মাহাত্ম্যং তথা চোৎপত্তয়ঃ শুভাঃ।
পরাক্রমঞ্চ যুদ্ধেষু জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্।।১৪

রিপবঃ সংক্ষয়ং যান্তি কল্যাণঞ্চোপপদ্যতে।
নন্দতে চ কুলং পুংসাং মাহাত্ম্যং মম শৃণ্বতাম্।।১৫

আমার এই মাহাত্ম্য, আমার এই আবির্ভাবের কথা, যুদ্ধে আমার পরাক্রমের বর্ণনা শ্রবণ করলে মানুষের মন থেকে সমস্ত রকমের ভয় চলে গিয়ে সেই নির্ভয় প্রাপ্ত হয়ে যায়। আমার মাহাত্ম্য কথার শ্রবণ কর্তার শত্রুনাশ হয়, কল্যাণ প্রাপ্তি হয় এবং বংশে সুখ ও সমৃদ্ধি আসে।

শান্তিকর্মণি সর্বত্র তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে।
গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু মাহাত্ম্যং শৃণুয়ান্মম।।১৬

উপসর্গাঃ শমং যান্তি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণাঃ।
দুঃস্বপ্নঞ্চ নৃভির্দৃষ্টং সুস্বপ্নমুপজায়তে।।১৭

বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম্।
সংঘাতভেদে চ নৃণাং মৈত্রীকরণমুত্তমম্।।১৮

দুর্বৃত্তানামশেষাণাং বলহানিকরং পরম্।
রক্ষোভূতপিশাচানাং পঠনাদেব নাশনম্।।১৯

যত রকমের শান্তিকর্ম আছে আর দুঃস্বপ্ন দর্শন হলে এবং ভয়ঙ্কর কোন গ্রহপীড়া হলে আমার এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করা কর্তব্য। আমার এই মাহাত্ম্য পাঠে বা শ্রবণে সব রকম আপদ বিপদ এবং অশুভ গ্রহপীড়ার শান্তি হয়ে যায়, সাথে সাথে মানুষের সমস্ত দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্নে পরিণত হয়। অশুভ গ্রহ দ্বারা আক্রান্ত বালকদের পক্ষে আমার এই মাহাত্ম্য শান্তিকারক এবং সমাজে বা পরিবারে বিবাদ, বিরোধে বিচ্ছেদ হলে এই মাহাত্ম্য পাঠ মিত্রতা সৃষ্টি করে সবার মিলন করিয়ে দেয়। আমার এই মাহাত্ম্য সমস্ত দুরাচারীদের অশুভ শক্তিকে নাশ করে দেয়। এই মাহাত্ম্য শুধু মাত্র পাঠ করলেই রাক্ষস, ভূত ও পিশাচরা পালিয়ে যায়।

সর্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্।
পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ।।২০

বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈঃ প্রোক্ষণীয়ৈরহর্নিশম্।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রদানৈর্বৎসরেণ যা।।২১

প্রীতির্মে ক্রিয়তে সাস্মিন্ সকৃৎ সুচরিতে শ্রুতে।
শ্রুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি।।২২

আমার এই মাহাত্ম্যের সম্পূর্ণ পাঠ বা শ্রবণে পাঠক বা শ্রোতা আমার সান্নিধ্য লাভ করবে। পশুবলি, পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ, দীপ, গন্ধ ইত্যাদি সব রকম উপাচারে পূজা করলে, ব্রাহ্মণাদিদের ভোজন করালে, যাগযজ্ঞাদি

ক্রিয়াকর্মে, প্রতিদিন অভিষেক, নানা রকম ভোজ্যাদি অর্পণ এবং দানাদির দ্বারা এক বৎসর পূজা করলে আমি যত না সন্তুষ্ট হই, তার থেকে বেশি সন্তুষ্ট হই একবার মাত্র এই মাহাত্ম্য শ্রবণে বা পাঠে। আমার মাহাত্ম্য শ্রবণে সমস্ত পাপ নাশ হয়ে যায় আর সর্বদা রোগব্যাধি থেকে মুক্ত থাকে।

রক্ষাং করোতি ভূতেভ্যো জন্মনাং কীর্তনং মম।
যুদ্ধেষু চরিতং যন্মে দুষ্টদৈত্যনিবর্হণম্।।২৩

তস্মিন্ শ্রুতে বৈরিকৃতং ভয়ং পুংসাং ন জায়তে।
যুষ্মাভিঃ স্তুতয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ।।২৪

ব্রহ্মণা চ কৃতাস্তাস্তু প্রযচ্ছন্তি শুভাং মতিম্।
অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্নিপরিবারিতঃ।।২৫

আমার এই আবির্ভাবের প্রসঙ্গ কীর্তনে সমস্ত ভূতপ্রেতাদির থেকে রক্ষা পায় এবং আমার যুদ্ধচরিত দুষ্ট দৈত্যদের সংহার করে। হে দেবগণ! তোমরা ও ব্রহ্মর্ষিরা আমার যে যে স্তুতি করলে, এই স্তুতি সমূহ শ্রবণ করলে মানুষের আর শত্রুভয় থাকবে না। প্রথমে ব্রহ্মা যে আমার স্তুতি করেছিলেন, সব স্তুতিই মানুষকে কল্যাণময়ী বুদ্ধি প্রদান করে। বনে বা আকাশে বা দাবানলে পরিবেষ্টিত হলে আমার এই চরিতকথা স্মরণ করলে সঙ্গে সঙ্গে সে এই সমস্ত সংকট থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

দস্যুভির্বা বৃতঃ শূন্যে গৃহীতো বাপি শত্রুভিঃ।
সিংহব্যাঘ্রানুযাতো বা বনে বা বনহস্তিভিঃ।।২৬

রাজ্ঞা ক্রুদ্ধেন বাজ্ঞপ্তো বধ্যো বন্ধগতোঽপি বা।
আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে।।২৭

পতৎসু বাপি শস্ত্রেষু সংগ্রামে ভৃশদারুণে।
সর্বাবাধাসু ঘোরাসু বেদনাভ্যর্দিতোঽপি বা।।২৮

স্মরন্ মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ।
মম প্রভাবাৎ সিংহাদ্যা দস্যবো বৈরিণস্তথা।।২৯

দূরাদেব পলায়ন্তে স্মরতশ্চরিতং মম।।৩০

যে আমার এই মাহাত্ম্য শ্রবণ বা পঠন করে, সেই এই সব সংকট থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কি কি সংকট? নির্জন স্থানে দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হলে, শত্রুর হাতে ধরা পড়লে, জঙ্গলে সিংহ, বাঘ, বন্য হাতী আক্রমণ করলে, ক্রুদ্ধ রাজার দ্বারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বা কারারুদ্ধ হলে, মহাসমুদ্রে জাহাজের মধ্যে ঝঞ্ঝাবাত্যায় পড়লে, যুদ্ধে শস্ত্রাঘাতে জর্জরিত হলে অথবা রোগ যন্ত্রণায় পীড়িত হলে, উপর্যুপরি উৎকট বাধা বিপত্তি আসতে থাকলে ইত্যাদি সব বিপদ থেকে সে মুক্ত হয়ে যায়। আমার এই মাহাত্ম্য যারা শ্রবণ বা পাঠ করবে আমার প্রভাবে সিংহের মত হিংসাদি পশু, দস্যু, তস্কর ও শত্রুরা তাদের কাছে থেকে পালিয়ে যায়। এখানে যা কিছু বলা হল এগুলো সবই গ্রন্থস্তুতি। এরপর ঋষি আবার বলছে –

ঋষিরুবাচ।।৩১
ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা।
পশ্যতামেব দেবানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত।।৩২

মেধা ঋষি বলছেন – এই ভাবে গ্রন্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে করতে সেই পরাক্রমশালিনী ভগবতী দেবী সেখানেই সব দেবতাদের চোখের সামনে থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। প্রথমের দিকে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে, শক্তি আর অবতারের আবির্ভাবে তফাৎ হল, অবতার যখন আসেন তখন তাঁকে মায়ের গর্ভ দিয়ে এসে জন্ম নিতে হয়, কিন্তু মায়ের ক্ষেত্রে বা শক্তির আবির্ভাব অন্য রকম, যখন কেউ প্রার্থনা করে তখন তিনি আবির্ভূতা হন।

যে কাজের জন্য তিনি আবির্ভূতা হয়েছেন, সেই কাজ নিষ্পন্ন হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্তর্ধান হয়ে যান। শক্তির দুটো জিনিষ – আবির্ভাব আর অন্তর্ধান।

তেঽপি দেবা নিরাতঙ্কাঃ স্বাধিকারান্ যথা পুরা।
যজ্ঞভাগভুজঃ সর্বে চক্রুর্বিনিহতারয়ঃ।।৩৩
দৈত্যাশ্চ দেব্যা নিহতে শুম্ভে দেবরিপৌ যুধি।
জগদ্বিধ্বংসিনি তস্মিন্মহোগ্রেঽতুলবিক্রমে।।৩৪
নিশুম্ভে চ মহাবীর্যে শেষাঃ পাতালমাযযুঃ।।৩৫
এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ।
সম্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্।।৩৬
তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।
সাঽযাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি।।৩৭

মা অন্তর্ধান হয়ে গেছেন। সব অসুরদের বিনাশ হয়ে গেছে, দেবতারাও আগের মত নির্ভয়ে যজ্ঞভাগ উপভোগ করতে করতে নিজের নিজের কর্তব্য পালন করতে থাকলেন। শুম্ভ ও নিশুম্ভ বধ হয়ে যাওয়ার পর অবশিষ্ট অসুররা পাতাললোকে চলে গেছে। জগজ্জননী মা ভগবতী তিনি নিত্যা, অযোনিজা, কিন্তু এইভাবে বারে বারে আবির্ভূতা হয়ে সংসারকে রক্ষা করেন। তিনিই আবার এই সমস্ত জগৎ সংসারকে মায়ামুগ্ধ করে রেখেছেন। তিনিই এই জগৎ সৃষ্টি করছেন আবার তিনিই প্রার্থনার দ্বারা সন্তুষ্টা হয়ে কাউকে ঐশ্বর্য দেন আবার কাউকে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করে দেন।

ব্যাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর।
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া।।৩৮

মা সবাইকে সমৃদ্ধি প্রদান করেন, সবাইকে সুখ দেন। আবার মহাপ্রলয়ের যখন সময় হয় তখন তিনিই আবার মহামারীর রূপ ধারণ করেন। যুদ্ধ, মহামারী, ভূমিকম্প, বন্যা এগুলো সব মায়েরই রূপ। তিনিই আবার মা কালী রূপে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে তিনি যদি ব্যাপ্ত হয়ে থাকেন তাহলে সবাই সেই মা কালীরই সন্তান, অসুরাও তাঁর সন্তান আবার দেবতারাও তাঁরই সন্তান। সবারই সৃষ্টি মায়ের থেকেই হয়েছে। আমাদের কাছে আমি আছি, আমার বন্ধু আছে আর আমার শত্রু আছে কিন্তু মায়ের কাছে কেউ বন্ধুও নয় আবার কেউ শত্রুও নয়, মায়ের কাছে সবাই সমান। কিন্তু জগতে সবারই নিজের নিজের স্থান নির্ধারিত করা আছে। কারুর স্থানের যদি চ্যুতি হয়ে যায়, কোথাও যদি কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, প্রকৃতির নিয়মকে কেউ যদি উল্লঙ্ঘন করে দেয়, মা তখন এসে কিছু একটা করে দেন যাতে সব কিছু ঠিকঠাক ভাবে নিজের নিজের ক্ষেত্রে অবস্থান করে থাকতে পারে। ইন্দ্রের যদি কখন ক্ষমতা বেড়ে যায়, যখন তাকে আর সামলানো যাচ্ছে না, তখন মা ইন্দ্রের মধ্যে একটু অহঙ্কার জাগিয়ে দেন। ইন্দ্রের সব সময় একটাই গোলমাল, অপরের স্ত্রীর প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়া। অহঙ্কারটা বাড়িয়ে দিতেই ইন্দ্র এবার ফাঁসবে, আর তার সর্বনাশটিও হয়ে যাবে। অসুরদের এভাবে দাবানো যায় না, অসুরদের মারার জন্য মাকে নিজেই আসতে হয়।

সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা।
স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী।।৩৯

মা হলেন জন্মরহিতা, জন্মরহিতা হয়েও সৃষ্টি রূপে তিনি সামনে আসেন। তিনি সনাতনী, মা সব সময়ই আছেন, সবাইকে তিনিই রক্ষা করে যাচ্ছেন। তার সঙ্গে বলছেন *সৈব কালে*, যখন কালের সময় হয় তখন তিনি মহামারীর রূপ ধারণ করেন। এই যে ভাবটা এখানে দেওয়া হয়েছে – তিনি সনাতনী, তিনি আগেও ছিলেন পরেও থাকবেন, তিনিই আবার সৃষ্টিকার্য করছেন, সৃষ্টিকে রক্ষা করে জগতের স্থিতিকার্যও তিনিই করছেন, আবার এই জগতের সংহার তিনিই করছেন। দুঃখ-দারিদ্রটাও তিনি, মহামারীটাও তিনি আবার সৃষ্টিটাও তিনি, এই ভাবকে

ধারণা করা একমাত্র খুব উচ্চ অবস্থাতেই সম্ভব। Acceptance is spirituality, সব কিছু গ্রহণ করাটাই আধ্যাত্মিকতা। প্রথম থেকে দুটো জিনিষই চলে আসছে একটা হল inclusiveness আর আরেকটি হল exclusiveness। Inclusiveness মানে হয় সব কিছুকে গ্রহণ করা, এটাই আধ্যাত্মিকতা। যে ধর্মে বা দর্শনে exclusiveness আছে, এই এতটুকু আধ্যাত্মিকতা আর এতটুকু জাগতিক, বুঝবেন ওখানে গোলমাল আছে, এদের কখনই বিশ্বাস করা যায় না। বেদান্ত মতে exclusiveness কখনই আধ্যাত্মিকতা হতে পারবে না। বেদান্ত মত মানে তোমাকে পুরোটাই নিতে হবে, সৃষ্টিকেও নিতে হবে আবার মহামারীকেও নিতে হয়, আনন্দের ভাবকেও নিতে হবে আবার নিরান্দের ভাবকেও, সুখকেও নিতে হবে দুঃখকেও নিতে হবে।

ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।
সৈবাভাবে তথালক্ষ্মীর্বিনাশায়োপজায়তে।।৪০

মানুষের যখন অভ্যুদয় হয়, লক্ষ্মীরূপে যখন মানুষের বৈভব আসে তখন তিনিই তার বাড়িতে অধিষ্ঠান করেন। লক্ষ্মীরূপে মা যার গৃহে যখন অবস্থান করেন তখন সে যেটাতেই হাত দেবে সেটাতেই সোনা ফলতে শুরু করবে। গৃহস্থের ফসল ভালো হচ্ছে, গরু প্রচুর দুধ দিচ্ছে, ফলের ভারে গাছ উপচে পড়ছে তখন বুঝতে হবে সেই গৃহস্থের দিনকাল ভালো চলছে। দিনকাল যদি ভালো চলে তখন যেটাই করবে, যে কাজে হাত দেবে সবটাতেই সাফল্য পাবে। আবার এর বিপরীতে যখন সংসারে খারাপ সময় আসে তখন তিনিই অলক্ষ্মী রূপে সেই গৃহে অবস্থান করেন। তখন যেটাতেই সে হাত দেবে সেটাতেই তার লোকসান হয়ে যাবে, সোনাতে হাত দিলে সোনাও ছাই হয়ে যাবে। সেইজন্য বলা হয় দিনকাল যখন খারাপ চলে তখন মুখ বুজে পড়ে থাকতে হয়। আপনি কোন মাঠ দিয়ে যাচ্ছেন, সেই সময় প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে, তখন আপনাকে তাড়াতাড়ি একটা গাছের তলায় গিয়ে কোন রকমে নিজেকে গুটিয়ে ছোট্ট করে বসে থাকতে হবে। কারণ একেই তো ঝড় আপনাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, আর আশ্রয় নিয়েছেন একটা গাছের তলায় গাছের ডাল যদি ভেঙে পড়ে তখনতো সব শেষ। সেইজন্য ছোট্ট করে গুটিয়ে কোন রকমে বসে থাকতে হবে।

জগতের প্রতি যাদের ভালোবাসা আছে আবার ঈশ্বরের ব্যাপারেও একটু আধটু ধারণা আছে, তাদেরকে এই জায়গাটা ভালো করে বুঝতে হবে। ভালো সময় যখন চলছে তখন মা লক্ষ্মীরূপে আছেন, খারাপ সময় যখন চলে তখনও মায়ই থাকেন, তবে তখন তিনি অলক্ষ্মী রূপে, দারিদ্র রূপে থাকেন। মায়ের লক্ষ্মী রূপকেই আমরা সবাই চাইছি। সেইজন্য মায়ের এই সব স্তব স্তুতি নিয়মিত পাঠ করে যে দৈবী বিঘ্নের জন্য খারাপ অবস্থা চলছে, সেই দৈবী বিঘ্নকে কাটাতে হয়। কিন্তু আমাদের কর্মে যেটা আগে থেকেই হয়ে আছে, যেমন যেমন কর্ম ও চিন্তা-ভাবনা এখন করেছি তাতে সেই কর্মের প্রভাবগুলো কাটবে না, তবে মায়ের স্তুতি করলে দৈবী বিঘ্নগুলো কেটে যায়। কিন্তু যতই আমরা যজ্ঞযাগ করি, যতই প্রার্থনা করি যখন গোলমাল হওয়ার থাকে তখন কেউই আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। তখন মায়ের মহামারী রোগশোক রূপকেই মেনে নিতে হয় আর নিজের পথ থেকে কখন বিচলিত না হয়ে মায়ের স্তব স্তুতি করে যেতে হবে। নিজেকে তখন গুটিয়ে ছোট করে রেখে দু চার বছর মুখ বুজে পড়ে থেকে মাথার উপর দিয়ে আপদ বিপদ গুলিকে পার করিয়ে দিতে হয়। আবার কয়েক বছর পর যখন ভালো অবস্থা ফিরে আসবে তখন আপনি যেটাতেই হাত দেবেন সেটাই আপনাকে সাফল্য এনে দেবে। শেষ মন্ত্রে ঋষি তাই বলছেন –

স্তুতা সংপূজিতা পুষ্পৈর্ধূপগন্ধাদিভিস্তথা।
দদাতি বিত্তং পুত্রাংশ্চ মতিং ধর্মে গতিং শুভাম্।।৪১

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে ফলস্তুতির্নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ।।

যারা পুষ্প, গন্ধ, ধূপ, দীপাদির দ্বারা পূজা করার পর দেবীর স্তুতি করে তাদের ধন, পুত্র লাভ হয় আর *মতিং ধর্মে গতিং শুভাম্*, তাদের ধর্মে মতি আসে আর উত্তম গতি লাভ করে। এখানে ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষক এই চারটি পুরুষার্থকে নিয়েই বলা হয়েছে। *দদাতি বিত্তং*, এখানে অর্থের কথা বলা হল, *পুত্রাংশ্চ*, মানে কামের

কথা বলছেন। কামের পরিণতি পুত্র। যে কোন কামের পরিণতি যদি পুত্রে না হয়, ওটাকে কাম রূপে গণ্য করা হয় না। *মতিং ধর্মে*, ধর্মে তার মতি হয়, যজ্ঞযাগ করা, তীর্থে যাওয়া এগুলো করার দিকে মন যাবে। আর *গতিং শুভাম্*, শুভ গতি মানে মোক্ষ।

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সবটাই মা দেন। মায়ের স্তুতি করে যে যা চাইবে মা তাকে সেটাই দিয়ে দেন। তন্ত্র দর্শনের এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। তন্ত্র মতে একই মন্ত্র দিয়ে এই চারটে পুরুষার্থই পাওয়া যাবে, শুধু সঙ্কল্পটা পাল্টে নিতে হবে। বেদে কিন্তু এই জিনিষ হবে না। পুত্রেষ্টি যজ্ঞে যে মন্ত্র দিয়ে আহুতি দেওয়া হচ্ছে সেখানে পুত্রই হবে, অর্থ কখনই হবে না। সেখানে সঙ্কল্প যদি ঠিক না থাকে তাহলে পুরো যজ্ঞটাই বৃথা হয়ে যাবে। বেদে যেটার জন্য যজ্ঞ করা হচ্ছে ঠিক সেই ফলই দেবে তার বাইরে অন্য কোন ফল দেবে না। কিন্তু মায়ের আরাধনায় সঙ্কল্প পাল্টে দিলে ফলটাও পাল্টে যাবে। যদিও এটাকে তন্ত্রের বিশেষত্ব রূপে বলা হয়, কিন্তু উপনিষদে যে ওঁ এর সাধনার কথা বলা হয়েছে, সেখানেও একই কথা বলছে। সাধক যা যা কামনা করে ওঁ সাধনা করবে তার সেই কামনা পূরণ হবে। এটাই মন্ত্রশক্তি, মন্ত্রশক্তি এভাবেই চলে। এরপর আমরা চণ্ডীর শেষ অধ্যায়ে প্রবেশ করছি।

অথ ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

(সুরথ আর বৈশ্যকে দেবীর বরপ্রদান)

ঋষিরুবাচ।।১

এতৎ তে কথিতং ভূপ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
এবংপ্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্যতে জগৎ।।২

আমাদের নিশ্চয় মনে আছে প্রথম অধ্যায় যখন শুরু হয়েছিল তখন সুরথ আর সমাধি ছিলেন ক্ষত্রিয় আর বৈশ্য। যার মধ্যে সুরথ নিজের রাজ্য হারিয়েছে আর সমাধি নিজের সম্পদ হারিয়েছে। দুজনে মিলে এক ব্রাহ্মণের কাছে গেছে। ব্রাহ্মণকে সুরথ প্রশ্ন করেছিল যাদের জন্য আমাদের সব কিছু হারিয়েছি বারবার তাদের কথাই ভেবে আমাদের মনে এত কষ্ট হচ্ছে কেন? আমরা পুরনো কথা আর শোককে ভুলতে পারছি না কেন? ঋষি তাদের দুজনকে তখন মহামায়ার কথা বলেছিলেন। মহামায়া কে, তিনি কি করেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ঋষি লম্বা কাহিনী বলার পর এইবার কাহিনীর ইতি টানতে গিয়ে বলছেন। হে রাজা সুরথ! তোমাকে যে দেবীর কাহিনী বর্ণনা করলাম, যিনি এই নিখিল বিশ্বকে ধারণ করে আছেন, এটাই তাঁর শক্তি, এটাই দেবীর মাহাত্ম্য।

বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্‌বিষ্ণুমায়য়া।
তয়া ত্বমেষ বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ।।৩

মোহ্যন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে।
তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।।৪

এই যে দেবী তিনি সমস্ত জগতকে মোহিত করে রেখেছেন, তিনিই বিদ্যা উৎপন্ন করেন, তিনিই সব রকমের জ্ঞান প্রদান করেন, অপরা বিদ্যার জ্ঞান তিনিই দেন, শাস্ত্র জ্ঞান তিনিই দেন আর আদিবাক্যের যে জ্ঞান সেটাও তিনিই দেন। দেবীর যে মায়া এই মায়াশক্তি ভগবানেরই। মায়ার কথা শুনতে শুনতে আমাদের মনে মায়ার ব্যাপারে একটা নেতিমূলক ধারণা হয়ে গেছে। কিন্তু মায়া তা নয়, মায়া আসলে এমন এক শক্তি, যে শক্তি বোঝা যায় কিন্তু ব্যাখ্যা করা যায় না, এই অর্থেই মায়া হয়। যিনি এক তিনি কেন বহু হতে চাইছেন, যিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ তিনি কেন জগৎ সৃষ্টি করেছেন, এগুলোকে আমরা কখনই ব্যাখ্যা করতে পারব না, এর উত্তরও হয় না। বেদান্তে এর একটা ব্যাখ্যার নাম অজাতবাদ, অজাতবাদে বলে সৃষ্টি আদৌ হয়নি, এই বলে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আপনি তো সৃষ্টি আদৌ হয়নি বলে ছেড়ে দিলেন, কিন্তু আমি সামনে যেটা দেখছি এটা তাহলে কী? আপনি বলবেন মনের ভুল। মনের ভুল হতে পারে, কিন্তু এটাই তো আমি দেখছি, আর এটাকে নিয়েই আমাকে লড়াই করে বাঁচতে হবে। তখন বলছেন – তুমি সাধনা কর যাতে ওই জায়গায় পৌঁছাতে পার। অজাতবাদ সৃষ্টির মধ্যেও দেখছে সৃষ্টি নেই, আমাদের মত লোক ঈশ্বর থাকতেও দেখছি ঈশ্বর নেই – এই যে পুরো একটা সমষ্টি সংশয় সৃষ্টি হয়ে আছে, এটাকে আপনি যাই বলুন, এটাই মায়া। অদ্বৈত বেদান্তে প্রথমেই বলে দেয় যে, এমন অনেক কিছু আছে যেগুলোকে কখনই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে না। আপনি যদি বলেন সব ঈশ্বরের ইচ্ছা, সব ঈশ্বরের ইচ্ছা বলা মানেই আমি এর ব্যাখ্যা দিতে পারছি না, জিনিষটাকে ঠিক ভাবে পরিভাষিত করতে পারছেন না। সমষ্টি স্তরে যেটা আছে সেটাই অবিদ্যা আর এটাই যখন ব্যষ্টি স্তরে আসে তখন তাকেই মায়া বলছেন।

ঋষি বলছেন – হে রাজা! তুমি আর এই বৈশ্য আর অন্যান্য যারা বিবেকী পুরুষ, পণ্ডিতরা যে মোহিত হয়ে পড়ে আছে, সেই ভগবান বিষ্ণুর মায়াস্বরূপা ভগবতীর দ্বারাই সবাই মোহিত হয়ে আছে। এগুলোই হল অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেওয়া। অপরের ঘাড়ে দোষ ফেলে দিলে খুব লাভ। আমি কেন অবিবেকীর মত আচরণ করছি? মায়ের ইচ্ছা। আমার কেন দুঃখ? মায়ের জন্য। আর ভালো যখন হবে তখন আর মায়ের জন্য হচ্ছে না, তখন আমার জন্য। সেখানেও যদি মায়ের জন্য বলে দেয় তাহলে তো সে জ্ঞানী হয়ে গেল, সেটা আর কেউ করে না। এখানে বলছেন, সমষ্টিতে যে অবিদ্যা রয়েছে, সেই অবিদ্যার জন্য তুমিও মোহিত হয়ে রয়েছ, এরাও মোহিত হয়ে রয়েছে। হে রাজা সুরথ! একটা জিনিষ মনে রেখ, শুধু এখনই মোহিত হয়ে নেই, এরপরে

আবার সবাই মোহিত হবে। যতক্ষণ এখানে আমরা শাস্ত্র কথা শুনছি ততক্ষণ মনে হচ্ছে সব কিছু পরিষ্কার, কিন্তু এখান থেকে বাড়ি যেতে যেতেই আবার সব কচুরিপানা এসে পুকুরের জলকে ঢেকে দেবে। সুরথ আর সমাধি ঋষির মুখে মহামায়ার কথা শুনছে, তাতে তাদের অজ্ঞান হয়ত ঠিকই চলে যাচ্ছে। সেইজন্য ঋষি সাবধান করে বলে দিচ্ছেন, তুমি উৎফুল্ল হও না, আবার ওই মায়া ভবিষ্যতে আসবে, এসে তোমাদের মোহিত করে দেবে, মায়া তোমাকে ছাড়বে না। যিনি অবতার পুরুষ তাঁকেও মায়া পুরোপুরি ছেড়ে দেন না। জ্ঞানীকেও মায়া একেবারে ছেড়ে দেবে না। এনাদের জন্যও মায়া থাকবে কিন্তু ক্ষতি করতে পারবে না। ঠাকুর বলছেন, আকারটুকু থাকে, কিন্তু ওই দিয়ে সংসার কার্য চলবে না, কিন্তু থাকবে। কিন্তু বাকিদের তো কোন কথাই নেই। আপনি যতবারই মরুভূমিতে মরীচিকা দেখে থাকুন তত বারই আপনি বিভ্রান্ত হবেন। আগামীবার আবার যদি মরীচিকা দেখে থাকেন আবার আপনি ফাঁসবেন। ইন্দ্রপ্রস্থে দুর্যোধনের ঠিক তাই হয়েছিল, যেখানে জল নেই সেখানে জল দেখছে, যেখানে জল সেখানে সে শুকনো ডাঙা দেখছে। মা ছেলের কাছ থেকে কত কষ্ট পায় তাও ছেলের প্রতি ভালোবাসাকে ছাড়তে পারে না। একটা ছেলে কত মেয়ের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে জ্বলেপুড়ে মরে, আবার কোন মেয়েকে দেখে ভাবে এর থেকে ভালোবাসা পাব। এই যে মোহ, মমতাগর্তে অতি অন্ধকারে এটাই মায়া। সেইজন্য ঋষি বলছেন –

আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা।।৫

এই দেবীর যদি তুমি আরাধনা কর, তুমি যদি দেবীর সাধনা কর তাহলে তিনি তোমাকে এই জগতের সব ভোগ দেবেন, স্বর্গও তিনি দেবেন আর অপবর্গও তিনিই দেবেন, এই তিনটে জিনিষই মা দেন। ভোগ দুই রকমের হয় – অর্থ আর কাম।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।।৬

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুরথঃ স নরাধিপঃ।।৭

প্রণিপত্য মহাভাগং তমৃষিং সংশিতব্রতম্।
নির্বিণ্ণোঽতিমমত্বেন রাজ্যাপহরণেন চ।।৮

জগাম সদ্যস্তপসে স চ বৈশ্যো মহামুনে।
সন্দর্শনার্থমম্বায়া নদীপুলিনসংস্থিতঃ।।৯

স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্।
তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্তিং মহীময়ীম্।।১০

অর্হণাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ।
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।।১১

দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্।
এবং সমারাধয়তোস্ত্রিভির্বর্ষৈর্যতাত্মনোঃ।।১২

পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা।।১৩

এরপর চণ্ডী কাহিনীর উপসংহার টেনে মার্কণ্ডেয় মুনি ক্রোষ্টুকিকে বলছেন, রাজা আর বৈশ্য দুজনের ভেতরেই প্রচণ্ড কষ্ট ছিল এরপর মেধা ঋষির মুখে প্রেরণাদায়ী কথা শুনেছেন, ভেতরের কষ্ট আর উজ্জীবিত কথা শোনা, এই দুটো মিলিয়ে রাজার মনটা একটু ক্ষুণ্ন হয়ে গিয়েছিল – কেন আমি বাড়ির কথা, রাজ্যের কথা ভাবতে যাচ্ছি, সমাধির তো আরও দুঃখ, তার স্ত্রী আর ছেলে মিলে সমাধিকে পিটিয়ে তার সব টাকা-পয়সা কেড়ে নিয়েছে। সমাধি বেচারি এখন কার কাছেই বা ফিরে যাবে। তাই সমাধির পূর্ণ বৈরাগ্য এসে গেল আর রাজার অর্দ্ধ বৈরাগ্য এসেছে। রাজার সাম্রাজ্যের প্রতি লোভ আছে কিন্তু নিজের সাম্রাজ্য থেকে বিরক্তি এসে গেছে। তখন তারা দুজনে সেই কঠোর তপস্যাপরায়ণ মহর্ষিকে প্রণাম করে নদীর ধারে গিয়ে ঋষি যেমন ভাবে সাধনা করতে বলে দিয়েছিলেন সেইভাবে সেখানে তারা দুজনে দেবীসূক্তং জপ করতে থাকলেন।

আজকে আমরা সবাই হাতে সহজে চণ্ডী গ্রন্থ পেয়ে যাচ্ছি, কিন্তু তখনকার দিনে তো চণ্ডী ছিল না আর এখন যেমন মন্ত্র জপের প্রথা এসে গেছে কিন্তু বৈদিক যুগে বেদের মন্ত্রগুলোই আবৃত্তি করা হত, তার মধ্যে দেবীসূক্তও ছিল। রাজা সুরথ আর সমাধি বৈশ্য নদীর ধারে বসে এই দেবীসূক্ত জপ করেই যাচ্ছেন, আর বাহ্যিক পূজায় দেবীর প্রতিমা নির্মাণ করে পুষ্প, দীপ ও যজ্ঞ, বলি দ্বারা দেবীর আরাধনা করতে লাগলেন। প্রথমের দিকে দুজনে সংযমিত আহার করে থাকতেন, তারপরে একেবারে পুরোপুরি উপবাসে থেকে দেবীতে সমাহিত চিত্ত হয়ে ধ্যানে তন্ময় হয়ে গেলেন। এইভাবে তাঁরা দুজনেই তিন বছর সংযমিত হয়ে দেবীর আরাধনা করতে লাগলেন। তখন দেবী প্রসন্না হয়ে তাঁদের প্রত্যক্ষ দর্শন দান করে বলছেন –

দেব্যুবাচ।।১৪
যৎ প্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ ত্বয়া চ কুলনন্দন।
মত্তস্তিৎ প্রাপ্যতাং সর্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ।।১৫

হে রাজা! এবং হে বৈশ্যকুলনন্দন! তোমরা তোমাদের মনের অভিলাষ মত বর আমার কাছে প্রার্থনা কর। আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, তোমাদের প্রার্থিত অভিলাষ আমি পূর্ণ করব।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।।১৬
ততো বরে নৃপো রাজ্যমবিভ্রংশ্যন্যজন্মনি।
অত্র চৈব নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ।।১৭
সোঽপি বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বব্রে নির্বিণ্ণমানসঃ।
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্।।১৮

রাজা সুরথ তখন প্রার্থনা করলেন হে দেবী! আমার যেন *অবিভ্রংশন্যজন্মনি*, এর পরের জন্মে আমি এমন রাজ্য পাই যে রাজ্য *অবিভ্রংশ*, যার কখন নাশ হবে না, কোন মতে আর কেউ যেন সেই রাজ্য কেড়ে না নিতে পারে আর এই জন্মে আমি নিজের শক্তিতে শত্রুদের বিনাশ করে নিজের রাজ্যটা ফিরে পাই। কিন্তু বৈশ্য সংসারের উপর পুরোপুরি বিরক্ত হয়ে গেছে, কোন কিছুতেই তার আর আসক্তি নেই। তার সঙ্গে বৈশ্য *মমেত্যহমিতি*, আমি ও আমার এই বোধের পারে চলে গিয়েছিল। মমতা চলে গেলে শুধু অহংতা থেকে যাবে। মমতা চলে গেলে মানুষ ত্যাগী হয়ে যায়, আর অহংতা চলে গেলে মানুষ জ্ঞানী হয়ে যায়। এটাই বৈশ্য দেবীর কাছে প্রার্থনা করে বলছেন আমি যেন *মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্*, আমি আর আমার এই অভিমান যেন আমার নাশ হয়, সঙ্গবিচ্যুতির যে প্রজ্ঞা সেটা যেন পাই, অর্থাৎ মমতা আর অহংতাকে কেটে দেওয়ার জ্ঞানটা যেন আমি পাই। অহঙ্কার অজ্ঞান থেকে হয়, মমতাও অজ্ঞান থেকে আসে, এই অজ্ঞানকে সরানোর একটাই পথ জ্ঞান নিয়ে আসা। ঠাকুর বলছেন – বিচার করে দেখ নারী শরীরে কী আছে, মল, মুত্র, মেদ, মাংস আর রক্ত। এইভাবে আমি আপনি যদি চিন্তা করতে থাকি তাই বলে কি সবার নারী শরীরের প্রতি আসক্তি চলে যাবে! আমরা তো এত কথামৃত পড়ে যাচ্ছি, কথামৃতের লেকচার শুনে যাচ্ছি, তাও কেন আমাদের আসক্তি যাচ্ছে না? কারণ এই সব কল্পনা করে জল্পনা করে কিছু হয় না। আমরা যতই শুনি টাকা থেকে দূরে থাকতে হবে, কিন্তু মনে মনে শুধু টাকাই ঘুরছে। যাচ্ছে না তার কারণ একটাই, আসক্তি অজ্ঞান থেকেই হয়, অজ্ঞানকে নাশ করার একটাই পথ জ্ঞান। মূলে রয়েছে অহংতা আর মমতা। অহংতা আর মমতার যে মিলন হয়ে আছে, এই মিলনকে বিচ্ছেদ করার জন্য জ্ঞান দরকার। জ্ঞান ঈশ্বরীয় শক্তি ছাড়া হয় না।

একটা ছেলে যখন কোন মেয়ের প্রেমে পড়ে যায় তখন তাকে কুচি কুচি করে কেটে দিন, তার মনকে কোন দিন মেয়েটির কাছ থেকে সরিয়ে এনে পাল্টাতে পারবেন না। কারণ ওখানে ছেলেটি সম্পূর্ণ ভাবে আসক্ত হয়ে গেছে। জগতের কোন না কোন কিছুর প্রতি আমরা সবাই কম বেশি আসক্ত হয়ে আছি। ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া এই আসক্তি কখনই কাটবে না। মাথা ঠুকে ঠুকে ঠাকুরের কাছে যতক্ষণ প্রার্থনা না করা হচ্ছে, তার আগে কিছু হবে না। কত দিন প্রার্থনা করবে? যত দিন না ওই আসক্তিটা চলে যাচ্ছে। সারা জীবনেই হয়ত গেল না। সারা জীবনেই যদি না যায় তাহলে কী হবে? একটা সুক্তিকার মধ্যে কোন রকমে একটি বালির কণা চলে গেলে ওই

বালির কণাকে সুক্তিকার ভেতর থেকে আর সরানো যাবে না। সুক্তিকার ভেতরে যন্ত্রণা হতে শুরু করে, ব্যাথার চোটে নিজের ভেতর থেকে উত্তেজনা ছাড়তে থাকে, সেটাই পড়ে একটা দামী মুক্তাতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। দেখা যাবে কোন কোন মানুষের মনের ব্যাথা কোন দিন যায় না। কিন্তু ওই ব্যাথার জন্য ভেতর থেকে ক্রমাগত একটা উত্তেজনা ছেড়ে যেতে থাকে, সেখান থেকে পরে একটা মুক্তা তৈরী হয়ে গেল। ব্যাথা জনিত ওই উত্তেজনাটা কোন দিন যাবে না। আপনি যদি জীবনে কাউকে ভালোবেসে থাকেন, কোন কারণে সে যদি আপনার জীবন থেকে চলে যায়, চলে যাওয়ার দুঃখটা কোন দিন যাবে না। দুঃখ যদি চলে যায় তাহলে পরিষ্কার যে, আপনার ভালোবাসায় কোন গোলমাল ছিল। একমাত্র যাবে মায়ের কৃপায় যখন আপনার জ্ঞান হয়ে যাবে, কিন্তু সেই জ্ঞান মুক্তির জ্ঞান।

এর বাইরে আরেকটা যেটা হয়, এই যে ভেতর থেকে ক্রমাগত ব্যাথা যন্ত্রণার ফলে ভেতরে যে আলোড়ন হয়ে যাচ্ছে, আলোড়নটা যদি না হয় মানুষ পাগল হয়ে যাবে। ওই যন্ত্রণার আলোড়ন থেকেই পরে হয়ত একটা মহৎ সৃজনশীল সৃষ্টি বেরিয়ে আসে, হয়ত সে একজন উচ্চমানের লেখক কিংবা শিল্পী হয়ে গেলেন। আদি কবি বাল্মীকিরও তাই হয়েছিল, ক্রৌঞ্চ মিথুন খেলা করছে, ব্যাধ পুরুষ ক্রৌঞ্চকে বধ করে দিল। স্ত্রী ক্রৌঞ্চের প্রিয়তমের বিয়োগের ব্যাথাটা বাল্মীকি কোন দিন ভুলে যেতে পারলেন না। সেই ব্যাথা থেকে একজন বিরাট কবির জন্ম হয়ে গেল। যে ব্যাথা মানুষ ভুলে যেতে পারে, সেই ব্যাথা কিসের ব্যাথা! আর ব্যাথা ভুলে যাওয়ার সম্ভবনা একমাত্র আসবে এই *সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্* যখন হবে। অহংতা আর মমতা থেকে যে সঙ্গ হয়ে রয়েছে এই সঙ্গকে যখন আলাদা করে দেওয়া হবে। আত্মজ্ঞান ছাড়া অহংতা আর মমতার সঙ্গ থেকে কখন আলাদা হওয়া যায় না। আত্মজ্ঞান মায়ের কৃপা ছাড়া হবে না। *মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ*, অহংতা আর মমতার বিচ্যুতি করতে পারবে একমাত্র প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা মানে খুব উচ্চস্তরের বুদ্ধি, যার জন্য এই বিদ্যাকে বলছেন পরা বিদ্যা। অহংতা আর মমতাই শেষ কথা, এটাই আদিম বন্ধন। সাধারণ বুদ্ধি খুব ছোটখাটো জিনিষের আসক্তিকে কেটে দিতে পারে কিন্তু এই আদিম বন্ধনকে কাটার জন্য চাই খুব উচ্চমানের বুদ্ধি। অহংতা মমতার বন্ধনকে যদি ছাড়িয়েও দেওয়া হয়, এরা আরেকটা জায়গা দিয়ে ফেকড়ি হয়ে বেরিয়ে আসবে। তখন মা বলছেন –

দেব্যুবাচ।।১৯
স্বল্পৈরহোভির্নৃপতে স্বরাজ্যং প্রাপ্স্যতে ভবান্।।২০
হত্বা রিপূনস্খলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি।।২১
মৃতশ্চ ভূয়ঃ সংপ্রাপ্য জন্ম দেবাদ্ বিবস্বতঃ।।২২
সাবর্ণিকো নাম মনুর্ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি।।২৩
বৈশ্যবর্য ত্বয়া যশ্চ বরোঽস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতঃ।।২৪
তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি।।২৫

দেবী বললেন – হে রাজা সুরথ! তুমি অল্প দিনের মধ্যেই সব শত্রুকে নাশ করে নিজের রাজ্য ফিরে পাবে। আর তোমার হৃতরাজ্যও স্থায়ী থাকবে। তারপর মৃত্যুর পর তুমি বিবস্বান অংশে জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে সাবর্ণিক মনু নামে বিখ্যাত হবে। আর হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ! তুমিও আমার কাছে যে ঈপ্সিত বর প্রার্থনা করেছ, সেই বর তোমাকে দিচ্ছি। তোমার মুক্তিলাভের জন্য আমি তোমাকে উপযুক্ত জ্ঞান দিচ্ছি। এই জ্ঞানই পরা বিদ্যা, যে জ্ঞানে মানুষের অহংতা আর মমতা চলে যায়। সমাধি বৈশ্যের মমতা তো চলেই গিয়েছিল, এবার চাইছেন অহংতাও যেন চলে যায়। কারণ অহংতা থাকলে মমতাও এক সময় আবার এসে যাবে। এরপর আবার মার্কণ্ডেয় ঋষির কাছে কাহিনী চলে গেছে –

মার্কণ্ডেয় উবাচ।।২৬
ইতি দত্ত্বা তয়োর্দেবী যথাভিলষিতং বরম্।
বভূবান্তর্হিতা সদ্যো ভক্ত্যা তাভ্যামভিষ্টুতা।।২৭

এবং দেব্যা বরং লব্ধা সুরথঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
সূর্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ।।২৮
সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ ক্লীং ওঁ।।২৯
ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
সুরথবৈশ্যয়োর্বরপ্রদানং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।।

শ্রীসপ্তশতী-দেবীমাহাত্ম্যং সমাপ্তম্।।
ওঁ তৎ সৎ ওঁ

এইভাবে দুজনকে মা বর প্রদান করে আবার অন্তর্হিতা হয়ে গেলেন। পুরাণের বৈশিষ্ট্য হল মন্বন্তরের বর্ণনা করা, মন্বন্তরের বর্ণনা করতে গেলে প্রত্যেক মন্বন্তরে যাঁরা মনু হবেন তাঁদের কাহিনীও এসে যাবে। চণ্ডীর প্রথমের দিকে ক্রৌষ্টিক মুনি মার্কণ্ডেয় ঋষিকে প্রশ্ন করেছিলেন এই অষ্টম মন্বন্তরে যিনি মনু হবেন তিনি কিভাবে মনু হবেন আর তাঁর আগে যে মনু ছিলেন তিনি কিভাবে মনু হয়েছিলেন তার বর্ণনা করুন। মার্কণ্ডেয় ঋষি অষ্টম মন্বন্তরে সার্বণিক মনুর যে কথা বললেন এটাই চণ্ডীর মূল কাহিনী। এইভাবে মহামায়ার আশীর্বাদে বরলাভ করে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সুরথ সূর্যদেবের থেকে জন্ম নিয়ে সাবর্ণি মনু হবেন। এই হল শ্রীচণ্ডীর মাহাত্ম্য। মূল কথা হল মায়ের স্তুতি করা, কিন্তু যাঁর স্তুতি করা হবে তার আগে জানতে হবে তাঁর কি কি গুণ ও বৈশিষ্ট্য, চণ্ডী মায়ের গুণ আর বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করে দেখিয়ে দিল কীভাবে মায়ের স্তুতি করতে হবে।

।।হরি ওঁ তৎ সৎ।।
।।ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।।